

রসসাগর বিদ্যাসাগর

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

রসসাগর বিদ্যাসাগর

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

RASASAGAR VIDYASAGAR
SANKARI PRASAD BASU
Rs. 60·00

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯১
প্রচ্ছদ : ধীরেন শাসমল

ষাট টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রক : আর. বি. মণ্ডল। ডি. বি. প্রিন্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জি লেন। কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

আমার পূজনীয় শিক্ষক

শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

সূচী

নিবেদন

দুই দশকেরও বেশি আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি বইয়ের পরিকল্পনা ও রচনা শুরু করেছিলুম—'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকায় আনন্দ-সাগর বিদ্যাসাগর' নামে তা দু'সংখ্যায় বেরিয়েছিল (৩০ অক্টোবর, ৫ নভেম্বর ১৯৭০); কিন্তু পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার লেখাও থেমে যায়। তারপর অন্য লেখার কাজে জড়িয়ে থাকায় বইটি শেষ করতে পারিনি। তবে ব্যাপারটা মনের মধ্যে ঘুরছিলই। বয়স যখন ৬০ পেরোল, তখন হঠাৎ মনে হলো যে, বিদ্যাসাগরের প্রতি আমার ভক্তি, ভালবাসা ও নমস্কার লেখার মধ্য দিয়ে জানাতে (জীবনের কাজে জানাবার ভাগ্য করিনি) দেরি করা ঠিক নয়। কাল নিরবধি হলেও জীবন নিরবধি নয়। তাই বছর-দুই আগে লেখাটি আবার আরম্ভ ক'রে শেষ করতে পেরেছি। ঈশ্বর এবং ঈশ্বরচন্দ্র আমাকে করুণা করেছেন।

লেখাটি শুরু করার সময়ে এক ধরনের ঝাঁঝালো প্রতিবাদের মেজাজে ছিলুম। কান্নার জোলাপ-খাওয়া বিদ্যাসাগর—বেপরোয়া দানবীর বিদ্যাসাগর—সুকঠিন সুদুর্গম বিদ্যাসাগর—এবং আরও নানা বিদ্যাসাগর—তা ছাড়া কি সহজ স্বাভাবিক হাসিখুশির কোনো বিদ্যাসাগর ছিলেন না? তা তিনি ছিলেনই। সেই কথাটা জোরের সঙ্গে বলতে চেয়েছিলুম। প্রথমে প্রদত্ত 'আনন্দ-সাগর বিদ্যাসাগর' নামে, এবং প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্যে, তার তাপ আছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় রচনাদি থেকে তাঁর নানা জাতের ও ধাতের হাসি-তামাশার সংকলন সেই উদ্দেশ্যে করেছিলুম। ভেবেছিলুম যে, তাঁর জীবন থেকে হাসিটুকু ছেঁকে নিয়ে এবং পরিবেশন করে, কাজ সারব।

কিন্তু কোনো লেখা কি শেষ পর্যন্ত লেখকের হাতে আটকে থাকে—বিশেষত সে লেখার বিষয় যদি হয় বিদ্যাসাগরের মতো ঝঞ্ঝা-চরিত্র? ক্রমে জড়িয়ে গেলুম বিদ্যাসাগর মানুষটির জীবনজালে। অনেক অনেক কাজ করেছেন যে-মানুষটি—আমরা কি দেখতে চাইব না তাঁর চেহারাটি কী রকম ছিল, তাঁর গলার স্বর কেমন, কিভাবে কথা বলতেন—তাঁর রোগ-জ্বালা, আচার অভ্যাস রুচি? সব জড়িয়ে মানুষটিকে কাছে এনে দেখার বিশেষ ইচ্ছা হলো। আমি তো মূর্তি-পূজক হিন্দু, দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখাই আমার স্বপ্নের সাধনা। দেবতাকে কাছে এনে দেখা এবং তাঁদের নিয়ে একটু-আধটু মজা করার অধিকার আমাদের আছেই। তাই যদি হয়, সেকালে 'নরদেবতা' রূপে কথিত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আমাদের সে অধিকার থাকবে না কেন?

এই মেজাজে বইটি যখন শেষ করলুম তখন দেখা গেল যে, 'আনন্দসাগর বিদ্যাসাগর' নাম রাখা যাচ্ছে না—নাম বদলে করতে হলো—'রসসাগর বিদ্যাসাগর'। নবরসের অনেকগুলি রসে তিনি রসময়—হাস্যরসের সঙ্গে করুণ-রস ; বীররসের সঙ্গে রৌদ্ররস। এমন-কি সম্ভাব্য ঈশ্বররস পর্যন্ত।

এই বইয়ে বিদ্যাসাগরের আপাত স্ব-বিরোধ নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করা আছে। আত্মখণ্ডন তাঁর ছিলই। তিনি নিশ্ছিদ্র নিরেট নন। সেই ফাটলের মধ্যে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া-ভরা আলোবাতাস ঢোকার সুযোগ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে, বিরাট মানে বাঁধনছেঁড়া কাণ্ড। অনেক শিকল কেটে তবে কেউ বড় হয়। তিনি গা-ঝাড়া দেবার সময়ে আত্মখণ্ডনের নিন্দাকেও ছিটকে দেন। মাঝারির জন্যই সংগতি—আর অসংগতের জ্বলন্ত টীকা ললাটে নিয়ে অসাধারণের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। গজকাঠির মাপে যা স্ব-বিরোধ বলে মনে হয়, তেমন লক্ষণ বিদ্যাসাগরের জীবনে ভুরিভুরি ছিল। সেসব হাজির করার উদ্দেশ্য—বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালকদের হঠিয়ে দিয়ে কিভাবে স্বাধীন স্বভাবে বেড়ে উঠেছিলেন, তাই দেখিয়ে দেওয়া।

আরও একটা কথা বলে নিই, বড়ো মানুষদের যাঁরা অক্ষয় অপরিমেয় ভক্তি করে যান তাঁরা ভাগ্যবান। সে বস্তুতে সম্পন্ন আমি নই। আমি মনে করেছি, বড়ো মানুষকে যদি ভালবাসতে না পারলুম তাহলে শুধু ভক্তির মালা-চড়ানো কম্মো করে কি লাভ? আমার ভক্তি যেন আমার ভালবাসার শ্বাসরোধ না করে! বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যখন লিখেছি তখন তাঁকে ভালবেসেই সেই কাজ করেছি—তার মধ্যে যদি ভক্তি এসে যায়, সহজ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে।

শ্রীসুনীল মণ্ডল ১৯৬৬, জুলাই মাসে তাঁর মণ্ডল বুক হাউস থেকে দেবকুমার বসু-সম্পাদিত বিদ্যাসাগর রচনাবলীর প্রকাশ শুরু করেন—তিন বৎসরের মধ্যে চার খণ্ডে তা সমাপ্ত হয়। শোভন ও সুলভ মূল্যের সেই রচনাবলীর প্রতি খণ্ডে ছিল বিশেষজ্ঞ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরচিত বিস্তৃত ভূমিকা। ওই রচনাবলীর পাতা উল্টে আলোচ্য বিষয়ে লেখার ইচ্ছা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের একাধিক ছবি ওখান থেকেই নিয়েছি। অন্য তথ্যের ব্যাপারে আমার ঋণ বিদ্যাসাগরের জীবনীকার ও স্মৃতিলেখকদের প্রতি। যথাস্থানে ঋণস্বীকার করেছি।

বইয়ের নামকরণ এবং অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পরামর্শের জন্য পরম বন্ধু মণিশঙ্করের (শংকর) কাছে গিয়েছি। বন্ধুটি অপছন্দ করতে অদ্বিতীয়। তবু হাজার হোক, স্কুলে আমি ওঁর কয়েক বছরের সিনিয়ার—সে স্কুল আবার বিবেকানন্দ স্কুল—সেই সূবাদে আমি দাদা—ফলে নানাভাবে খোঁচাখুঁচি দিয়ে

উনি রায় দিলেন—আপনার যা অভিরুচি তাই করুন। খোঁচাখুঁচিতে অবশ্য উপকারই হয়েছে।

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের কর্মসচিব) বইটির বিষয়ে খুবই আগ্রহ দেখিয়েছেন। বই প্রস্তুত করার ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি কল্যাণীয় সুদীপ বসু ও শঙ্খ বসুর কাছ থেকে। নানাভাবে সাহায্য করেছেন ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা সুজাতা রাহা এবং শ্রীঅরুণ ঘোষ।

প্রেরণায় ও রচনায় সহধর্মিণী শ্রীমতী মায়া বসুর ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীসুধাংশুকুমার দে বইটির কথা জেনে, তৎক্ষণাৎ সেটি গ্রহণ করে, দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। শ্রীধীরেন বাগের সহযোগিতা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বইটি ছাপা চলাকালে একটি গভীর বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে—নবভারত পাবলিশার্সের শ্রদ্ধেয় শ্রীরণজিৎ সাহার সহধর্মিণী শ্রীমতী বিভা সাহা সহসা লোকান্তরিত হয়েছেন। শ্রীমতী সাহা ধর্মপ্রাণা, বিদ্যানুরাগিণী এবং করুণাময়ী নারী ছিলেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহযত্নের অবধি ছিল না। আমার রচনার নিবিষ্ট পাঠিকা ছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই।

বইটি উৎসর্গ করেছি, বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিশোর বয়সে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে অনুভব করেছি—সাহিত্যরসের আমেজ কাকে বলে। সাহিত্যবোধে ও মননে দীপ্ত তিনি—এখনো আমার শিক্ষক—প্রয়োজন হলেই তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয় বুঝে নিই। তিনি সর্বদাই দিয়ে যাচ্ছেন—আমার দেবার মধ্যে আছে বই—তাই দিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি।

১বি, ওলাবিবিতলা লেন, হাওড়া-৪ শঙ্করীপ্রসাদ বসু

২৯ জুলাই, ১৯৯১

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণের শতবর্ষ পূর্তি দিবস)









পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



মাতা ভগবতী দেবী



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



পত্নী দীনময়ী দেবী







একটি বালকের বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আনন্দের ছিল না। প্রথমত 'প্রথম ভাগ' বইখানার চেহারাকে অপছন্দ করেছিলুম। অন্যান্য স্কুলে তখন ভালো আকারের বর্ণপরিচয়জাতীয় বই চালু হয়ে গেছে, তাতে ছবির বাহার কত, আর আমাদের পাঠশালার (আমার বিদ্যারম্ভ পাঠশালাতেই হয়েছিল ; পটলের আকারে খড়ি দিয়ে 'অ-আ-ক-খ' লেখা, তারপরে কিছু উন্নতি হলে লাল বালির কাগজে কঞ্চিকাটা কলমে টানা-লেখা ; সত্যই আমরা একেবারে মধ্যযুগ থেকে একালে অবতীর্ণ হয়েছি।) পুরনোপন্থী গুরুমশায় কিনা পিনপিনে পাতলা লাল মলাটের খাটো আকারের প্রথম ভাগ বজায় রাখলেন! বইটার নির্বাচনে পিতৃদেব নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন, কারণ তার দাম, যতদূর মনে পড়ে, পাঁচ পয়সা ছিল, কিন্তু আমরা তখনো 'বোকা পুরনো বাবা' হইনি, তাই ও-হেন অসুন্দর চেহারার কোনো বই পেয়ে সুখী হওয়া সম্ভব ছিল না। বইটার উপরে একটা বুড়ো মানুষের ছবি ছিল, ভয়ানক কড়া চেহারা, চোখে-মুখে আদর্শ শিক্ষকের কঠোর নীরসতা—শোনা গেল, উনিই বইটির লেখক। গুরুমশায় বইটি নিজের মাথায় ঠেকিয়ে, আমাদের সকলের মাথায় ঠেকাবার নির্দেশ জারি করে, 'কাজ' আরম্ভ করেছিলেন, যে-কাজটা আমার খুবই খারাপ লেগেছিল, কারণ সরস্বতীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলুম না।

বিদ্যাসাগরকে তাঁর কীর্তি (যিনি কি-না ছোট ছেলেদের লেখাপড়ায় বাধ্য করেন) এবং চেহারা কোনো দিক দিয়েই ভালবাসতে পারি নি। অপছন্দ ক্রমেই বেড়েছিল। 'প্রথম ভাগে'র শেষে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নামক কবিতা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদি কাব্য, এ কথা পরে জেনেছি, কিন্তু ঐ অংশও আমার নিরেট গদ্য-মনে কোনো দোলা লাগাতে পারে নি। ছোট বয়সে গোড়া থেকে বানান মুখস্থ করতে কার ভাল লাগে, বিশেষত প্রায় শুরুতেই যদি 'ঐরাবত', 'পারলৌকিক', 'দুঃশীল', 'অধঃপাত' এসে যায়। বানানের ঢেলা কামড়াবার পরে যেই-না 'লাল ফুল', 'ছোট পাতা', 'শীতল জল'-এ এসে একটু জুড়িয়েছি, অমনি উপদেশ—উপদেশের পর উপদেশ—জীবনে যা কাজে লাগবে না :

কখনো মিছা কথা কহিও না ;
কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না ;
কাহাকেও গালি দিও না ;
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না ;
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না ;
পড়িবার সময় গোল করিও না ;
সারাদিন খেলা করিও না।

বা রে, ঐ সব উচিত কাজ যদি না করব তো করব কি ? বাড়িতে যে-সব কথা শুনে-শুনে কান পচে গেছে, পাঠশালায় গিয়ে সেই কথা আবার আওড়াতে হল :

"দেখ রাম, কাল তুমি পড়িবার সময় বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে ভালো পড়া হয় না ; কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি, আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না।"

"নবীন, কাল তুমি বাড়ি যাইবার সময় পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলেমানুষ, জানো না, কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দাও, আমি সকলকে বলিয়া দিব, কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।"

"গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এস নাই কেন ? শুনিলাম, কোনো কাজ ছিল না, মিছামিছি কামাই করিয়াছ ; সারাদিন খেলা করিয়াছ ; রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ ; বাড়িতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু বলিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।"

এর পরেই 'প্রথম ভাগে'র সুবিখ্যাত উপসংহার—গোপাল ও রাখালের চরিতকথা। "গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়।" আর, "গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না ; যা খুশী তাই করে ; সারাদিন উৎপাত করে।" শেষোক্ত রাখালের সঙ্গেই আমার আচরণের হুবহু ঐক্য, তা আমার পরিবারের সকলে সখেদে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগর-চরিত' পড়েন নি, রাখাল ব্যাপারটার মধ্যে গভীর ভালো কিছু থাকতে পারে, একথা জানবার সুযোগ তাঁদের ঘটে নি, স্বয়ং বিদ্যাসাগর রাখাল-জাতীয় বালক ছিলেন—এই জ্ঞানের শিক্ষাতেও তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন ; অপরপক্ষে সত্যই আমার দাদার নাম গোপাল, সত্যই তিনি লেখাপড়ায় ও আচার-আচরণে 'প্রথম ভাগে'র আদর্শ চরিত্র—সুতরাং আমি যে, উল্টোদিকে 'বিদ্যেসাগরের রাখাল'—এ জিনিস সহজেই আমার গুরুজনেরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, ও সেই আহ্লাদে আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে আমার গুণপনার পরিচয় দিতে গিয়ে আমার রাখালী স্বভাবের কথা জানাতে তাঁরা ভুলতেন না। বাংলার সাহিত্য-গদ্যের প্রবর্তক মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সকল বাঙালীর অবশ্যপাঠ 'প্রথম ভাগ' গ্রন্থে আমারই চরিতকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এই গৌরবে অধীর হবার পরিবর্তে, রাগে আমার দাঁত কিড়মিড় করত, এবং সাহিত্য-গুরু বিদ্যাসাগর এই অধম লেখকের কাছ থেকে দন্ত কিড়মিড় কাব্য নামক একটি অলিখিত বাল্যরচনা গুরুদক্ষিণারূপে পেয়ে গিয়েছিলেন।

'প্রথম ভাগে'র বিতৃষ্ণা দারুণ বিদ্বেষে পরিণত হলো 'দ্বিতীয় ভাগে' এসে। উঃ, পৃথিবীটা মরুভূমি, সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, স্নেহ নেই, শুধু 'দ্বিতীয় ভাগ' আর বিয়োগ। আমার জীবনের প্রথম 'বিয়োগ'যন্ত্রণার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগের 'তাড্যমান', 'হ্রিয়মান', 'খটিকা', 'নির্ধৌত'-র 'নিষ্পীড়ন' জড়িয়ে গিয়েছিল।

তাতে কতকগুলো গল্প ছিল, সবগুলিই কিন্তু চোখ-রাঙানো গুরুমশাইমার্কা। যাদব নামক বালকটির লেখাপড়ায় যত্ন ছিল না, বিদ্যালয়ে না গিয়ে পথে খেলা করে বেড়াত এবং সেই সৎ কাজে অন্যান্য বালককে ফুসলাবার চেষ্টা করত ; সচ্চরিত্র অবিচলিত বালকগুলি সেই গুপ্ত মন্ত্রণার কথা গুরুমশায়ের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল ; ফলে যাদবের পাঠশালায় বা বাড়িতে দুর্গতির শেষ ছিল না : "যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন, বই কাগজ কলম যাহা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি তিনি যাদবকে ভালবাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।"

নবীনও যাদবের পথের পথিক, সেও খেলার রসে ডোবাবার চেষ্টা করল অন্যান্য বালকদের। কিন্তু সেই সকল দুর্ধর্ষ আদর্শবান বালকেরা অটল থেকে, নবীনকে নানাপ্রকার সদুপদেশে মথিত করে, স্বকার্যে চলে গিয়েছিল, ফলে নবীনের চৈতন্য হয়েছিল। সে লেখাপড়ায় মন দিয়ে "অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিল।"

এহেন সৌভাগ্য মাধবের হয় নি। বেচারার অভ্যাস ছিল, "না বলিয়া পরের দ্রব্য লওয়া।" পরিণতিতে সে পাকা চোর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। "মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে খাইতে না পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া, দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত।"

একালের পক্ষে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী—চুরি করলে কষ্টে পড়তে হয় ! সেই সঙ্গে ছিল রাম নামক একটি নিপাট ভালোর মঙ্গলকথা : রাম পিতামাতার কথার অবাধ্য হয় না, সে বড় ভাইবোনদের কথা শোনে, ছোট ভাইবোনদের ভালবাসে, বন্ধুদের সম্বন্ধে ভ্রাতৃভাব পোষণ করে, শিক্ষকদের ভক্তি করে, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলে না, ইত্যাদি। এইসব শ্বাসরোধী আদর্শ-কথার মধ্যে একমাত্র হার্দ্য কাহিনী ছিল ভুবনের—কাহিনীটা ভালবেসে ফেলেছিলুম—বিশেষত সেই অংশটা যেখানে চুরির অপরাধে ভুবনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে (একেবারে কাজির বিচার)—সর্ব দোষের মূল মাসীর কানে ভুবন তার বিদায়বাণী শোনাচ্ছে—ঠিক তখনি—কট্াস্—আহা অপূর্ব—ভুবন তার মাসীর কান জোরে কামড়ে দাঁত দিয়ে কেটে নিয়েছে। আমার স্ফূর্তির সীমা ছিল না। উৎসাহে গুরুমশায়কে প্রশ্ন পর্যন্ত করেছিলুম—গোটা কানটা কি ভুবনের মুখের মধ্যে থেকে গিয়েছিল ? 'মাসী, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ'—এই কবিতার ঝঙ্কারে মন-প্রাণ ভরে গিয়েছিল। মাসী ও গুরুমশায় আমার চেতনায় তখন একাকার। 'দ্বিতীয় ভাগে'র এই অংশটা ক্লাসিক, কিন্তু তার আগে—বাপরে—'কুজ্ঝটিকা', 'মদগুর', 'মূর্ধন্য', 'দুষ্প্রবেশ', 'আঘ্রাত', 'কুট্টমিত', 'উষ্মাগম'। আচার্যের কথায় ও কাজে তফাতও দেখলাম। ঐ সব কথা বালকদের শোনাবার পরেও তিনি লিখেছেন : "কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না।"

এই 'দ্বিতীয় ভাগ'—তার উপর বিষফোঁড়া—'ফার্স্ট বুক'। শোনা গেছে,

ফাস্ট' বুকের ঘোড়ার পাতার পরে অনেকের পক্ষেই এগোনো সম্ভব হয় নি। সম্ভব হবে কি করে—যা ঘোড়ার চাট্! দুষ্ট ঘোড়ার চেয়ে শূন্য আস্তাবল ভাল। ফাস্ট' বুকের মহান গ্রন্থকার প্যারীচরণ সরকার নাকি বিদ্যাসাগরের বন্ধু। হতে হবেই! না হয়ে পারে!

এও যথেষ্ট নয়—অংক। অঙ্কের আতঙ্ক নিয়েই বোধ হয় জন্মেছিলুম। অথচ টপ্‌টপ্ অংক কষে ফেলার মতো ধনুর্ধর প্রতিভা পাঠশালায় কম ছিল না। তাদের কৃতিত্বে ঈর্ষা ছাড়া আমি আর কিছুই উপহার দিতে পারি নি। মাথায় গাঁট্টা, আঙুলের গাঁটে টকাস্ টকাস্ কঞ্চি-বেতের ঠোকর এবং অবিরত মনুষ্যেতর প্রাণীদের উপমাশ্রয় হতে-হতে এক-এক সময় বড় বৈরাগ্য এসে যেত। তেমনি মানসিক অবস্থায় একবার একটি যাত্রার নিয়তি-সঙ্গীত পাঠশালায় বসেই গেয়ে ফেলেছিলুম (এখনকার 'সাধ না পুরিল, আশা না মিটিল' জাতীয়)—সেটি কান পেতে শুনেছিল কেলো—ধূম্রপায়ী, কৃষ্ণ-ওষ্ঠ সর্দার-পোড়ো—সেই অসুর তৎক্ষণাৎ নালিশ জানিয়েছিল গুরুমশায়ের কাছে—আমি নাকি যাত্রার গান গেয়ে অন্য ছেলের চরিত্তির খারাপ করে দিচ্ছি। এতবড় অসামাজিক কাজ থেকে আমাকে চিরতরে নিবৃত্ত করবার জন্য গুরুমশায় কোন্ সংশোধনী শারীরশিক্ষা দিয়েছিলেন, তার ইতিহাসে আর নাই গেলুম।

এই পরিস্থিতিতে—অংক না পারার জন্য যখন অসীম লাঞ্ছনা হচ্ছে—তখন হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে ভালবাসার সুযোগ পেয়ে গেলুম। গুরুমশায় তাঁর বদান্য হাত আমার শরীর থেকে সরিয়ে, সেই হাত নিষেধের ভঙ্গিতে উঁচু করে তুলে, ছাত্রগণের মধ্যে আমার লাঞ্ছনাদৃশ্যে যে আনন্দকলরব উঠেছিল তাকে থামালেন; তারপর গল্পটা বললেন। দ্বিতীয় ভাগের অদ্বিতীয় প্রতিভাবান লেখকের বাল্যপ্রতিভার অপূর্ব কাহিনী আমরা শুনলুম। সে কাহিনী বাংলা দেশের প্রায় সকলেই জানেন। বীরসিংহ গ্রাম থেকে হাঁটাপথে বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসার সময়ে পঞ্চমবর্ষীয় ঈশ্বরচন্দ্র পথের ধারে মাইল স্টোনের উপরে ইংরেজী সংখ্যা দেখতে দেখতে ইংরেজী সংখ্যা-রহস্য আয়ত্ত করে ফেলেছিল। খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। সেই তন্ময়তায় অকস্মাৎ শূলাঘাত। গুরুমশায় গল্প থামিয়ে আমার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন—সেই বিদ্যাসাগর আর আমাদের এই বিদ্দেসাগর! তারপরেই আমার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে (যার ফলে অকালে টাক পড়ে গেছে), দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—পথ হাঁটতে হাঁটতে একটা দুধের ছেলে ইংরেজী অংক শিখে ফেললে, আর এই বুড়ো ধেড়ে খোকা (মোটে নয়, মোটেই তখন বুড়ো ছিলুম না!)—লজ্জা হয় না বাঁদর!"

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ক্রমে আমার বাল্যবিদ্বেষ কমেছিল। বিদ্যাসাগর-পুরাণের মধ্যে প্রবেশ না করে আমাদের উপায় ছিল না। সাহেবের মুখের সামনে চটিজুতো নাচানোর কাহিনী শুনে কত হাসলাম; মত্ত দামোদর সাঁতরে পেরিয়ে প্রতীক্ষাব্যাকুল মায়ের কাছে মধ্যরাত্রে হাজির হয়ে ছেলে বলল, মা আমি এসেছি—চমকে শিউরে স্তব্ধ হয়ে রইলাম; ভক্তিতে আবেগে বিগলিত

হয়ে গেলুম—বিদ্যাসাগর পথের উপর থেকে কলেরা রোগীকে বুকে তুলে নিয়েছেন। আমাদের অজান্তে 'প্রথম ভাগে' ছাপা ছবির কঠোর মানুষটি একেবারে ভালবাসার পিতা হয়ে গেলেন—শকুন্তলার পিতা কণ্ব—নাকি বিদ্যাসাগর! শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার অমর রচনা আমার জীবনে প্রথম গভীর সাহিত্যের রস এনে দিল—গভীর অথচ নিকট—কারণ ও-দৃশ্যের সাক্ষী কি আমি নিজে নই, নিজের বাড়িতেই? এই সঙ্গে মজে গেলুম কথামালার গল্পমালায়। সেই জ্ঞানী ও অজ্ঞান, মহৎ ও পাজি, ছিঁচকে মিচকে ঘুঘু কিংবা উদার পশুরাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে সকলের সঙ্গে গাঢ় আত্মীয়তাবোধ এসে গেল (বন্ধুবান্ধব যার বাইরে আমাকে দেখতে গররাজি)।

বিদ্যাসাগরকে নতুন করে জানলুম। বিদ্যাসাগর বিরাট পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্, সমাজসংস্কারক এবং জাতীয় মর্যাদার আপসহীন প্রতিনিধি। জানলুম তাঁর মনুষ্যত্ব ও পৌরুষকে। জানলুম তাঁর অপূর্ব প্রেমকে, যা অশ্রুতে বিগলিত হতো নিরন্তর এবং প্রবাহিত হতো কর্মখাতের মধ্য দিয়ে দুর্গত মানুষের জীবনের দিকে। মানুষের প্রতি ভালবাসায় সহস্র-চক্ষু, সহস্র-বাহু, সেই সকলের 'ঈশ্বর'।

বিদ্যাসাগরের কোন্ ইমেজ আমার এবং প্রায় সকল বাঙালীর কাছে উপস্থিত ছিল? তা হলো ভয়ানক কঠোর বীর্যের একটি মূর্তি, বিরাট এবং সুদৃঢ়; অন্যদিকে বেদনার অশ্রুব্যাকুল মন্দাকিনী। কোনোভাবেই কিন্তু সহজ কাছের মানুষ তিনি নন। বিদ্যাসাগর, চরিত্রে বাঙালী নন; তিনি এত বিরাট ও মহান যে, ক্ষুদ্র দীন হীন বাঙালী আমরা, তাঁকে নিজেদের বলে কখনো দাবি করতে পারি না; বাংলা দেশের সবাই এরণ্ড, বিদ্যাসাগরই একমাত্র মহীরূহ ইত্যাদি। রামেন্দ্রসুন্দর বললেন: "বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁর নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।" আমাদের মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা সম্বন্ধে ধিক্কার দিয়ে তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছেন, "এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মানুষের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত, কখনও নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই।" সুতরাং সেই "প্রকাণ্ড মানবতাকে সংকীর্ণ বাঙালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা", এবং বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত "বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ", অর্থাৎ, "আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া

আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন।"

জন্মে বাঙালী হলেও ধর্মে ও কর্মে বিদ্যাসাগর যে বাঙালী ছিলেন না, একথা রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগর-চরিত' নামক অতুলনীয় রচনার সাহায্যে জেনেছি। আমরা কত সামান্য এবং বিদ্যাসাগর কত অসামান্য, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তা একশেষ করে ঐ লেখায় দেখিয়েছে। "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" এবং—"আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।" বিদ্যাসাগরের দয়া বাঙালির দয়া নয়, তাও জেনেছি: "বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালি-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়।" সুতরাং বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন "বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালি" হওয়া সত্ত্বেও "নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন।" এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য আংশিক সত্য মাত্র, কারণ রামমোহন মোটেই বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন না, কিন্তু বিদ্যাসাগর অবশ্যই তা ছিলেন, এবং রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরের চটিজুতার তত্ত্ব চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা মনে রাখার যোগ্য: "চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত।"

রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথের মতোই বাঙালি চরিত্রের ক্ষুদ্রতার পাশে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বৃহৎ রূপকে উপস্থিত করেছেন—তাহলেও একই সঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগরকে 'খাঁটি বাঙালি' বলেই মনে করেছিলেন। "তিনি খাঁটি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।···যেমন বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালিটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে-কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি।"

রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরের মানবপ্রীতিকে পাশ্চাত্ত্য ফিলানথ্রপির সঙ্গেও এক করে দেখেন নি। "বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না।...কোনো স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে—একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া পারিতেন না।" "সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া ওঠে, কোনরূপ ক্ষতি-লাভ গণনার বা কর্তব্য নির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না"—বিদ্যাসাগরের ছিল সেই স্নেহ। বিদ্যাসাগর তাই কাঁদতেন—অবিরল ঝরত চোখের জল। "রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে, কোনো একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোনো বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ।...ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্য ধারায় যে-ভূমি যুগ যুগ ব্যাপিয়া সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে-জাতিকে সংসার-তাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।"

রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার করি। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে তাঁর রচনার তুল্য আর কিছু সম্ভব কিনা জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছেন। বিদ্যাসাগর অসাধারণ—সর্ববিষয়ে তিনি আমাদের থেকে মহান—তাঁর কাছে দাঁড়াবার যোগ্য আমরা নই—তিনি অননুকরণীয় অত্যাশ্চর্য ব্যাপার—তিনি কেবল আমাদের দিয়েছেন, আমরা দু'হাত বাড়িয়ে নিয়েছি, তারপরে কৃতঘ্নতা দেখিয়েছি—এমন চরিত্র কি কাছের এবং ভালবাসার মানুষ হতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি দিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন, তাহলে অনায়াসে আজ তিনি

অবতারের পদ পেয়ে বসতেন''—বিদ্যাসাগর অবতার হন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিদ্যাসাগর দুর্গম ঐশ্বরিক প্রকাণ্ডত্ব নিয়ে বিরাজমান, সেখানে সাধারণের পক্ষে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এমন চরিত্রকে ভক্তি করা যায়, ভালবাসা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের তুলনায় রামেন্দ্রসুন্দর যেখানে বিদ্যাসাগরের মধ্যে রোদন-প্রবণ প্রাচ্যত্ব দেখেছেন, সেখানে অনেক নৈকট্য বোধ করেছি, মধুসূদনের বিদ্যাসাগর-প্রশস্তির ক্ষেত্রেও, যার মধ্যে প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা এবং ইংরেজের সাহসের সঙ্গে বাঙালী মায়ের প্রাণের কথা ছিল। তবু এই সকল বর্ণনার মধ্যে একটা জিনিস ছিল না, হেমচন্দ্রের উচ্চাঙ্গের বিদ্যাসাগর-চরিতকাব্যের মধ্যেও নয়। হেমচন্দ্র লিখেছিলেন :

"আস্‌চে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্যগুরু, শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর, স্নেহে জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙাল বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুলকাঁটা—পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস্‌',
টোল-স্কুলী-অধ্যাপক দুয়েরই 'ফিনিস'।"

না, এর ভিতরেও সেই জিনিসটি নেই, যা বিদ্যাসাগরের মধ্যে কিন্তু সত্যিই ছিল, যা আমাদের কাছে তাঁকে একেবারে হাজির করে দিতে পারত—বিদ্যাসাগরের হাসি। বিদ্যাসাগর গর্জন করতেন, ক্রন্দন করতেন, হাসতেন না? বিদ্যাসাগরের আর সমস্ত বীরত্ব দেখব কিন্তু হাসির বীরত্ব দেখব না—যা তাঁর যন্ত্রণার অন্ধকারের মধ্যে আলোকসম্পাত করে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং বাকি সকলকে আনন্দে তাঁর কাছে টেনে এনেছিল। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য এবং গাম্ভীর্যের বন্দনা করতে আমাদের লেখকদের শক্তিক্ষয় হয়ে গেছে, কিন্তু সকল শক্তির অক্ষয় উৎস যেখানে, সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গভঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখের বিষয় হয় নি কেন? এক্ষেত্রে একমাত্র স্মরণীয় ব্যতিক্রম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যাঁর লেখায় সহজ সরস অথচ গভীর মানুষটি খুঁজে পাই। বিদ্যাসাগরের জীবনীগুলিতে তাঁর পরিহাসপ্রীতির কিছু নমুনা আছে, কিন্তু তাঁর জীবনে ঐ হাসির তাৎপর্য কী ছিল, তার কোনো পরিচয় সে সকল স্থানে পাই না। তাঁর হৃদয় এত বড় ছিল—তাতে পৃথিবীর দুঃখ বেদনা এমনই আঘাত করত যে, তিনি ভেঙে চুরমার হয়ে যেতেন—যদি-না হাসির স্নেহ ছড়িয়ে কিছুটা ঘাতসহ করে রাখতেন নিজেকে। এবং বিদ্যাসাগরের হাসি শুধুই স্নেহময় নয়, তা রোষের মাণিক্যছুরিকাও হয়েছে কখনো-কখনো।

সে প্রসঙ্গে পরে আসব, এখন আবার অভিযোগ উপস্থিত করছি বিদ্যাসাগরের ভক্ত জীবনীকার ও চরিতাখ্যায়কদের বিরুদ্ধে, ভাস্কর চিত্রকরদের বিরুদ্ধেও। একেবারে শেষ বয়সের বলিরেখাঙ্কিত কঠোর একটি মুখকে চিত্রে ভাস্কর্যে অক্ষয় করার কি প্রয়োজন ছিল ? অথচ কি প্রসন্নসুন্দর লাবণ্যময় ছিলেন, তাঁর যৌবনের ছবিতে তার প্রমাণ রয়েছে। মনের সেই নবীনতা তিনি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। যখন দেখেছেন, শহুরে শিক্ষিত মানুষদের মরুভূমিতে সে মন কেবলই পুড়ছে, চলে যেতেন কার্মাটারে সাঁওতালদের মধ্যে, যারা মানুষ হয়েও সরল, অতি সামান্য পেয়েই খুশি, এবং কদাপি অকৃতজ্ঞ নয়।

রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইংলন্ডের ডঃ জনসনের বিস্তারিত তুলনা করেছেন। সে কাজ অল্পাধিক পরিমাণে করেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যদুনাথ সরকার প্রমুখ। কৃষ্ণকমল প্রধানত ভাষা-ব্যবহারে উভয়ের সাদৃশ্যের কথাই বলেছেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের পণ্ডিত, জনসন ল্যাটিনের ; তাঁদের লেখার ভাষা অতীব সাধু কিন্তু কথাবার্তার সময়ে তাঁরা চলিত ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করতেন না। বিদ্যাসাগর "লোকের সঙ্গে মজ্‌লিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাংলা স্ল্যাং শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। 'ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া', 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও', 'বিদঘুটে', 'বাহবা লওয়া'— এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সেদিকে যাইতেন না।"

যদুনাথ সরকারের মতে, "ইংলন্ডের সাহিত্যে এবং সমাজের ইতিহাসে ডাঃ সেমুয়েল জনসনের যে স্থান, বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তাহাই।" দু'জনেই কঠোর দারিদ্র্য থেকে উঠে প্রতিষ্ঠা ও ধনলাভ করেছিলেন ; দু'জনেই "মিতব্যয়ী, সরল, করুণহৃদয়, নির্ভীক স্পষ্টবক্তা ও কঠোর শ্রমী" ; দু'জনেই প্রাচীন সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং তাঁদের স্টাইল সমকালে অনুকৃত ; দু'জনেরই চরিত্রের দৃষ্টান্ত "দেশের ভণ্ড স্বার্থপর মিথ্যাবাদী মূর্খ নেতাদের নীরব তিরস্কার" করত ; দু'জনেই বহুজনের কাছে বিদ্রূপের পাত্র ছিলেন। "লন্ডনের সৌখিনদল অনেক দিন পর্যন্ত জনসনকে চিড়িয়াখানা হইতে পলাতক ভালুক বলিয়া মনে করিতেন, আর আমাদের তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাস্তায় দেখিলে উড়ে বেহারা হইতে পৃথক ভাবিতেন না।" ঐতিহাসিক যদুনাথ অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে জনসনের তুলনায় বড় বিবেচনা করেছেন। কেননা, জনসন চিরজীবন সাহিত্যিক হয়েই কাটিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষানেতা বা সমাজসংস্কারক হন নি।

যদুনাথ সরকারের অনেক দিন আগেই রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "বাহিরের কাজে বিদ্যাসাগর জনসন অপেক্ষা অনেক বড়ো ছিলেন।" উভয়ের সাদৃশ্য, রবীন্দ্রনাথের মতে, "অন্তরের সরল প্রবল এবং অকৃত্রিম মনুষ্যত্বে। জনসনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে দৃঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন ; জনসনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে

নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন।” রবীন্দ্রনাথ, লেস্‌লি স্টীফ্‌ন্ এবং কার্লাইলের জনসন সম্বন্ধে রচনা উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর ও জনসন-চরিত্রের মর্মের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। সেইসঙ্গে খুবই আক্ষেপ করে বলেছেন, “বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্ কেহ ছিল না। তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই।”

বিদ্যাসাগরের বসওয়েল ছিলেন না, একথা সত্য। অবশ্য একথাও সত্য, বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে জীবনীর ব্যাপারে ভাগ্যবান ছিলেন। বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন—এই দুইজনেরই মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কয়েকখানি বৃহৎ জীবনী রচিত হয়েছিল, অন্য বাঙালীর ক্ষেত্রে যেমন ঘটে নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বসওয়েলের মতো নিত্যসঙ্গী জীবনীকার বিদ্যাসাগর পান নি, যিনি তাঁকে প্রতিদিনের সাক্ষাৎ-রূপে ধরে রাখতে পারতেন। অথচ ধরে রাখলে কী অপূর্ব হতো—রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করেছেন—সেই আশ্চর্য জীবন্ত মানুষটির দৈনন্দিন সান্নিধ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, এবং ইঙ্গিত করেছেন, জনসনের মতো বিদ্যাসাগর মানুষটিও “বাক্যালাপে সুরসিক” ছিলেন—অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখায় সুরসিক বিদ্যাসাগরকে তুলে ধরার চেষ্টা নেই, অধিকাংশ লেখকের লেখাতেও নয়। তার ফলে বিদ্যাসাগরের ভাবমূর্তিতে হাসির আলো পড়ে নি। বসওয়েলের জনসন-জীবনীতে জনসনের রসদীপ্ত মনের উজ্জ্বল ছবি পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় বর্তমান থেকে সেই চরিত্রকে সর্বমানবের কাছে রমণীয় ও আদরণীয় করে রেখেছে। বিদ্যাসাগরের জীবনী-প্রশস্তিগুলি থেকে যেখানে ঐ মহাপুরুষকে সদাসম্ভ্রমে নমস্কার জানাতে বাধ্য হয়েছি, সেখানে বসওয়েলের জনসন সর্বপ্রকার কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁর পরিহাসপ্রিয়তার জন্য উত্তপ্ত আকারে বন্ধুরূপে উপস্থিত আছেন।

বিদ্যাসাগরের পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কনে ভক্তিপরায়ণ বাঙালী লেখকদের ব্যর্থতা বিশেষভাবে ধরা পড়ে বাংলাদেশের একমাত্র বসওয়েলের লেখা পড়ার পরে। শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এখন আর কেবল বাঙালী লেখক নন, স্বামী নিখিলানন্দের ইংরেজি অনুবাদের ফলে তাঁর রামকৃষ্ণ কথামৃত এখন বিশ্বসাহিত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীম ছিলেন বলে অলডাস হাক্সলির পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে—পৃথিবীতে রামকৃষ্ণই একমাত্র ধর্মাচার্য যিনি বসওয়েল পেয়েছেন। শ্রীম-রচিত রামকৃষ্ণ কথামৃতে রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার-বিবরণের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সরস তীক্ষ্ণ বাক্যালাপের যে রূপ দেখেছি, তার থেকেই বুঝেছি, বিদ্যাসাগরের বসওয়েল না থাকায় আমরা কতখানি হারিয়েছি। অথচ একথা না বললেও চলে, রামকৃষ্ণ কথামৃতে রামকৃষ্ণই প্রথম চরিত্র এবং বিদ্যাসাগর দ্বিতীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাতের বিবরণ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল সরকারের লেখা বিদ্যাসাগরের দুই বিখ্যাত জীবনীতেই রয়েছে। বিহারীলাল লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অতি সরল ও সুদৃঢ় বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্যই পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল।"

চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্মগতপ্রাণ সাধুগণের সন্দর্শন-লাভে বড়ই সুখানুভব করিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে এরূপ ধর্মনিরত সাধুগণের সঙ্গে মিলিত দেখিয়াছি।" বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রারম্ভিক কি কথাবার্তা হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার পরে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "এরূপ কথা কাটাকাটির পর পরস্পরের কথাবার্তা খুব জমিয়া গেল, আলাপও বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল। নিকটস্থ সকলে সে আলাপে পরম তৃপ্তি অনুভব করিলেন।"

চণ্ডীচরণ ঐ আলাপের বিবরণ শুনেছিলেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন যিনি, সেই শ্রীম-র রচনা থেকে তখনকার বাংলা ও ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মানুষের সাক্ষাৎ-বিবরণ আমরা দেখে নেব। ওঁরা দু'জন সেরা রসিকও ছিলেন।

তার আগে বিদ্যাসাগরের ধর্মকথায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

ধর্ম-ধ্বজা ও ধর্ম-মজা

॥ ১ ॥

বিদ্যাসাগরের হাসি ধর্ম-কান্ডের উপর গিয়েও পড়েছিল। ধ্বজাধারীদের তিনি অতিশয় অপছন্দ করতেন, কারণ ধ্বজার পিছনে থাকে সশস্ত্র বাহিনী, লুন্ঠন, রক্তপাত, পরস্ব-হরণ। বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন করেন, তার অনেক কাহিনী এই বইয়ে ছড়িয়ে আছে—সেই সঙ্গে অনেক মজার কাহিনীও। এই অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের ধর্মধারণা সম্বন্ধে একটা খসড়া লেখা হাজির করব, ধর্মগোঁড়ামি সম্বন্ধে তাঁর রঙ্গকৌতুকের কাহিনীও নিয়ে আসব। তবে অধ্যায়টি যদি ক্রমে গুরুভার হবার দিকে ঝোঁকে—পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি এই ভেবেছি যে, গুরু ব্যাপার আগে শেষ করে নেওয়াই ভালো।

বিদ্যাসাগর আপাতত ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত হতেন না। ধর্মের লক্ষ্য ঈশ্বর—যে-ঈশ্বরকে প্রতিদিন প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না, অন্তত সকলে পায় না। অপ্রত্যক্ষ সেই ঈশ্বরের সন্ধানে ধাবিত হবো কেন, যখন দেখছি সার দিয়ে পথের দুধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষের দল, যাদের মুখের হাসি, চোখের জল, বুকের তাপের চেয়ে সাক্ষাৎ সত্য আর কিছু নেই।

বিদ্যাসাগর বিশেষত ঘৃণা করতেন ধর্মের নামে সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে। ঈশ্বর যখন আপাতত প্রত্যক্ষগম্য নন, তখন সেই ঈশ্বর নিয়ে দলীয় সংঘাত—সে হলো আকাশপ্রাসাদের অধিকার নিয়ে মারামারি করার মতো পাগলামি। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ধারালো রসিকতা ও তামাশাগুলির কথা মনে পড়বে। একদা এক পাদরীকে নিয়ে তিনি খুবই মজা করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী সে কাহিনী লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে একদিন আমি তাঁহার বাড়িতে যাই। আমার ন্যায় আরও কয়েকজন ব্যক্তিও সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া সেখানে উপস্থিত। আমরা বাড়ির বাহিরের দালানে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় পণ্ডিত মহাশয় [বিদ্যাসাগর] হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া গেলেন, 'তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি আহারপর্ব শেষ করে এখুনি আসছি।'

"ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাদের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন এবং এমন গল্প আরম্ভ করিলেন যে, আমরা হাসিতে হাসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে কিছু মুড়ি পাঠাইয়া দিবার নির্দেশ দিলেন। যথাসময়ে মুড়ি আসিয়া পড়িল। প্রকাশ্য রাজপথের পাশে বারান্দায় বসিয়া তিনি মহানন্দে আমাদের সহিত মুড়ি খাইতে আরম্ভ করিলেন। দৃশ্যটি সত্যই উপভোগ্য। তাঁহার মতো পদস্থ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি যে, এইরূপ সরল ও

সহজ ভাবে রাস্তার ধারে বসিয়া মুড়ি চিবাইতে পারেন, এ-ধারণা কাহারও ছিল না। সকলে মুড়ি খাইতেছি, এমন সময়ে এক পরিচিত খ্রীস্টান ধর্ম-প্রচারক আমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে, দাওয়ায় বসিয়া এইভাবে মুড়ি চিবাইবেন, ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত।"

পটভূমিকা এই। এর পরে মূল মজার শুরু :

"নিকটে আসিয়া এই পাদরীটি আমায় বলিতে লাগিলেন, 'আপনি আপনার ধর্মজীবনে পরিত্রাণের সম্পর্কে কি সত্যই কিছু করছেন? আমার তো মনে হয়, ব্রাহ্মধর্মের সাহায্যে আপনি ত্রাণলাভ করতে পারবেন না।'

"তাঁহার এ-ধরনের কথাবার্তা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ো কৌতুকবোধ করিলেন। কিছুটা রসালাপ করিবার ইচ্ছায় তিনি অগ্রসর হইলেন।

"পাদরী ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগরকে কখনও দেখেন নাই। পণ্ডিত মহাশয় এক গাল হাসিয়া বলিলেন—'আরে মশাই, ওসব অল্পবয়স্ক যুবকদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে কোনো লাভ নেই। পরিত্রাণের কথা চিন্তা করবার অবসর ওদের নেই। তার চেয়ে বরং আসুন আমরাই ধর্মালোচনা করি। আমাদের তো ওপারের ডাক এসে গিয়েছে।'

"পাদরী এ কৌতুকের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। খুব গম্ভীরভাবে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তিনি আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু ক্রমাগতই পরিহাসচ্ছলে নানারূপ কথা বলিতেছিলেন। ইহার রসোপলব্ধি করা পাদরীর সাধ্য নয়। বরং বিদ্যাসাগর যে, ধর্মকথা আলোচনা করিবার যোগ্যপাত্র নহেন, ইহা ভাবিয়া তিনি রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। উত্তেজিত স্বরে তিনি বলিলেন, 'বৃদ্ধবয়সেও আপনি এমন নাস্তিক? মৃত্যুর পরে নরকেও আপনার স্থান হবে না।' অতঃপর ক্রোধভরে পাদরী প্রস্থান করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তখন উচ্চহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন। তারপর আমায় বলিলেন, 'পাদরীকে কিন্তু আমার পরিচয় দিও না, তাহলে সে আরও দুঃখিত হবে। খ্রীস্টান মিশনারিদের ধর্মালোচনার কোনো ক্ষেত্রবোধ নেই। তারা সব সময় পরিত্রাণের গম্ভীর তত্ত্ব নিয়েই ব্যস্ত। এই কথাটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই আমি তার সঙ্গে পরিহাস করছিলাম। কিন্তু মিশনারিদের কাছে রসিকতা যে আবার অমার্জনীয় অপরাধ'!"[১]

পাদরী মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর কী ধরনের তামাশা করেছিলেন, তা জানার উপায় নেই। তবে তার রূপ খানিকটা আন্দাজ করা যায়—বিবেকানন্দের সঙ্গে এক পাদরীর মোলাকাত থেকে। 'বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম' নামক পাশ্চাত্তে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন :

"একদিন একজন খ্রীস্টান পাদরী আমার কাছে এসে বলেন, 'তুমি হইতেছ একজন ভয়ঙ্কর পাপী।' আমি উত্তরে বললাম, 'হাঁ, ঠিক, তারপর?' ভদ্রলোক ধর্মপ্রচারক। আমাকে তিনি ছাড়তে চাইলেন না। আর তাঁকে

আসতে দেখলেই আমি পালাতাম। তিনি আমাকে বলতেন, 'তোমার জন্য অনেক অনেক উত্তম জিনিস রহিয়াছে ; তুমি একটি পাপী, তুমি নরকে যাইবে।' জবাবে আমি বলতাম, 'সন্দেহ নেই, সেটা খুবই উত্তম জিনিস। আর কিছু ?' তাঁকে আমি ফিরে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি যাবেন কোথায় ?' তিনি বলতেন, 'আমি স্বর্গে যাইব।' তখন আমি বলতাম, 'তাহলে আমার নরক ছাড়া গত্যন্তর নেই'।''

পাদরীদের ধর্মপ্রচার নিয়ে অনেক মজার কাহিনী বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিল। বাইবেলী বাংলা নিয়েও রং-তামাশার শেষ ছিল না। কিছুদিন আগেও শহরতলীর বাসে নানা উপদেশ ও সতর্কবাণীর মধ্যে—যথা, 'নো নলেজ উইদাউট কলেজ', 'পকেটমার হইতে সাবধান', 'যে তোমার টাকার থলি চুরি করে সে কিছুই করে না, কিন্তু যে সম্মান চুরি করে, সে তোমার যথাসর্বস্ব হরণ করে', 'পাঁচ বা দশ টাকার ভাঙানি পাইবেন না'—অধিকন্তু এই মহাবাক্য পেয়েছি—'ঈশ্বর মানবকে প্রেম করিয়াছিলেন।' ঈশ্বরের এই সৎকার্য আমাদের মনকে সরস ক'রে, বাসের ধাক্কা ও ঝাঁকানি সামলাবার শক্তি কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, মিশনারিদের মজার গল্পগুলি এখনি সংগৃহীত হওয়া দরকার, (যেমন ধরা যাক, হেরম্ব মৈত্রকে নিয়ে গল্পগুলি), নইলে সেগুলি হারিয়ে যাবে। মিশনারিদের দুটি গল্প বাল্যকাল থেকে আমাদের হাসিয়ে মাতিয়ে রেখেছে। দুটিই মিশনারি-মাতাল সংবাদ। একটিতে, মাতালটি সম্বন্ধে মিশনারি-মুখে নিয়তি-ঘোষণা—"তুমি নির্ঘাত নরকে যাইবে।" মাতাল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিল, আরও কারা নরকে যাবে ? তার অনেক প্রিয়পাত্র নরকের টিকেট পাবে শুনেও সে চুপ করে ছিল, কিন্তু যেই শুনল, মোহিনী রামমণিও নরকে যাবে, তখন মনের সব বাঁধন ছিড়ে গেল—"তাহলে পাদরী বাবা, আমিও নরকে যাব, নরক তো গুলজার।"

দ্বিতীয় গল্পটিতে পাই—এক মিশানারি পার্কে দাঁড়িয়ে হিন্দু দেবদেবীদের নরকস্থ করছিল। শেষকালে, কেবল প্রভু যীশুর তুলনায় নয়, যীশুর অনুগামীদের তুলনাতেও যে, হিন্দুর দেবতারা কত শক্তিহীন তা দেখাবার জন্য, হিন্দু দেবতা তুলসীগাছকে পশ্চাদ্দেশে ঘর্ষণ করে বলেছিল, "দেখিতেছ, আমি কি করিতেছি ? এই কার্যের পরে তোমার দেবতা আমার কী করিলেন ?" বলাবাহুল্য, মিশনারি-অসভ্যতার কাছে হিন্দুর দেবতা পঙ্গু। দেবতার এই লাঞ্ছনা মাতাল শ্রোতাটির মনে বড়ো দাগা দিয়েছিল। সে পরদিন বুনো জলবিছুটি এনে পাদরীর হাতে ধরিয়ে দিল। জলবিছুটির চেহারা তুলসীর মতো। মাতাল বলল, "পাদরী সাহেব, তুমি আমাদের আসল দেবতাকে ধরো নি। আমি আসল দেবতা এনে দিয়েছি। আমাদের এক দেবী আছে—গঙ্গা। গঙ্গাজলে ডোবালে এই দেবতার তেজ বেড়ে যায়।" পাদরী 'ফুঃ' শব্দ ক'রে, মাতালের এগিয়ে দেওয়া ঘটির গঙ্গাজলে জলবিছুটি ডুবিয়ে, নিজের মুক্ত নিতম্বে ভালো ক'রে ঘষল। তারপর বলতে লাগল, "এই তো ঘষিলাম—কি হইল ?" একটু পরেই চিড়বিড় শুরু হলো, ক্রমে বাড়তে লাগল, শেষে

আগুন-জ্বলুনি। এইবার মিশনারির নাচ শুরু হলো, নাচ ক্রমেই বাড়তে লাগল, শেষে ধেই ধেই নাচতে নাচতে বলতে লাগল—"হাঁ হাঁ, তোমাদের দেবতা কিছু কিছু করিতে পারেন বটে।"

বিদ্যাসাগরের হাতে খ্রীস্টান মিশনারি মার খেয়েছিলেন, ব্রাহ্ম-মিশনারিও অব্যাহতি পান নি। বিদ্যাসাগর "প্রচারক হওয়াটাকেই বিভীষিকা" মনে করতেন। স্নেহভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম-প্রচারকের কাজ নেওয়ার পরে তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি নাকি কী একটা হয়েছ?"[২] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশিভূষণ বসু, হেরম্ব মৈত্রের পিতা চাঁদমোহন মৈত্রকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথ খুঁজে না পেয়ে তাঁরা বাদুড়বাগান অঞ্চলে আধ-ঘণ্টার উপর ঘোরেন, তারপর অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর বিদ্যাসাগরের বাড়ির সন্ধান পান। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য যখন প্রচুর ঘোরাঘুরির ব্যাপারটা তাঁরা জানালেন, তখন বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন—শশিভূষণের বাড়ি কোথায়, পরিচয় কি, ইত্যাদি। উত্তরে যখন শুনলেন—ভদ্রলোকের বাড়ি বাদুড়বাগানেই, তখন তিনি চমকে শিউরে যা বলেছিলেন, তা পড়ে এখন আমাদের কৌতুকবোধ হলেও, মনে হয় না, উক্ত ধর্মপ্রচারকের তখন হাসবার অবস্থা ছিল।

বিদ্যাসাগর: এত কাছের বাড়িতে বাস করে এই বৃদ্ধকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসতে তুমি এত বেগ দিয়েছ। তাহলে তুমি কি করে মানুষকে পরলোকের পথ দেখাচ্ছ? একই জায়গায় এধারে ওধারে আসতে তোমার যখন এত গোল-যোগ, তখন তুমি সেই অজানা পথে কি করে লোক চালান দাও? তোমার কাণ্ড খুব বুঝেছি। তুমি ত্বরায় এ-ব্যবসা ত্যাগ করো। এ তোমার কর্ম নয়। যার জানা পথে এত গোল, সে না-জানি অজানা পথে লোকের কত দুর্দশা ঘটায়। তুমি বাপু, এ-কাজ আর করো না।[৩]

বিদ্যাসাগর নিজে কখনো ধর্মোপদেশ দেবার চেষ্টা করেন নি। কেন করেন নি, তা প্রচুর হাসির সঙ্গে একটি গল্প বলে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর মুখে অনেকেই গল্পটি শুনেছেন, তাঁর সকল প্রধান জীবনীতে তার উল্লেখ আছে। রামকৃষ্ণ কথামৃতে তার রূপ এই:

"বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কাউকে বলি না।···মনে করো, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ-টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হলো, তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন, 'ওকে পঁচিশ বেত মারো।' তারপর মনে করো, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি, তার জন্য বেতের হুকুম হলো। তখন আমি হয়ত বললাম, 'কেশব সেন আমাকে ওইরূপ বুঝিয়ে-ছিলেন, তাই আমি ওইরূপ কাজ করেছি।' তখন ঈশ্বর আবার হয়ত দূতদের বললেন, 'কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়।' এলে-পর তাকে হয়ত বলবেন, 'তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু জানিস না, আবার

পরকে উপদেশ দিচ্ছিলি ? ওরে কে আছিস—একে আর পঁচিশ বেত দে।'

"তাই বিদ্যাসাগর বলেন, 'নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! (সকলের হাস্য)! আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু বুঝি না, আবার পরকে কী লেকচার দেবো' ?"[৪]

[রিপোর্টার হিসাবে শ্রীম-র শ্রেষ্ঠত্ব এখানে দেখা যাচ্ছে। বেত খাওয়ার গল্প চণ্ডীচরণে আছে, তবে উল্লেখমাত্র। বিহারীলালের বইয়েও আছে। রাজনারায়ণ বসু বিদ্যাসাগরকে ধর্মপ্রচার করতে অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর ওই গল্পটি বলেন—একথা ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের কাছে বিহারীলাল শুনেছেন। বিহারীলাল-পরিবেশিত গল্পটি এই :

"...বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু রহস্যভাবে বলিয়াছিলেন, 'কাজ নাই মহাশয় ধর্মপ্রচারক হইয়া। আমি যা আছি এবং যাহা করিতেছি, তাহার জন্য যদি দণ্ডভোগ করিতে হয়, তাহা আমি করিব। যাহাদিগকে ধর্মে জপাব, তাহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার মতে ধর্মপালন করিয়াছ, তখন তাহারা যদি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, এবং তাহারা যদি দণ্ড পাইবার পাত্র হয়, তাহা হইলে তাহার দণ্ডটা আমার উপর পড়িবে নিশ্চিতই। আমার অপরাধের জন্য বেত খাইতে পারি, কিন্তু অপরের জন্য কত বেত খাইব ?"[৫]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর বিখ্যাত দাদার কাছে অর্থসমেত অনেক কিছু পেয়েছিলেন, কিন্তু রসবোধ ও রচনাক্ষমতা সবিশেষ পান নি, তা তাঁর বেত-খাওয়া গল্পের পরিবেশন থেকে দেখা যায়। বিদ্যাসাগর "দুইজন ধর্মপ্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য" ভদ্রলোককে গল্পটি বলেছিলেন, শম্ভুচন্দ্রের গদাইলস্করী রচনামতো তার চেহারা এই :

"একদিবস মৃত্যুরাজ, কর্মচারিগণসহ কাছারি খুলিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রহরী এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আনিলে, মৃত্যুরাজ তাহাকে বলিলেন, তুমি অমুকের উপাসনা না করিয়া কি জন্য অমুকের উপাসনা করিলে ? উপাসক বলিলেন, আমার অপরাধ নাই। অমুক ধর্মপ্রচারক আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তদনুসারে কার্য করিয়াছি। এই কথায় মৃত্যুরাজ উপাসকের প্রতি পাঁচ বেতের আদেশ দিয়া তাহাকে এক সন্নিহিত বৃক্ষতলে রাখিতে বলিলেন। এইরূপ তিন-চারিজন উপাসককে দণ্ড দিবার পর, আপনার মতো একজন ধর্মপ্রচারক আনীত হইলেন। ওই ধর্মপ্রচারককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বিদ্যাসাগরের উপদেশানুসারে আমি অমুক উপাসনা করিয়াছি, এবং অনুগামী ব্যক্তিদিগকেও ওই উপাসনার উপদেশ দিয়াছি। মৃত্যুরাজ, প্রথমত তাঁহার নিজের হিসাবে পাঁচ বেত দিয়া, অনুগামী উপাসকদিগকে আনাইয়া, প্রত্যেকের হিসাবে পাঁচ পাঁচ বেতের আদেশ দেন। এরূপ দু' তিনজন প্রচারকের পর আমিও মৃত্যুরাজের সম্মুখে নীত হইলাম। প্রথমত আমাকে নিজের হিসাবে পাঁচ বেত দিয়া, প্রত্যেক উপাসক ও প্রত্যেক প্রচারকের হিসাবে পাঁচ-পাঁচ বেত হুকুম দিলেন। ইহাতে আমার শরীরে তিলার্ধ স্থান রহিল না। তথাপি

বহুসংখ্যক বেত বাকি রহিল, এবং অবশিষ্ট বেত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ বেত খাইতে হইল।"[৬]

বিদ্যাসাগর ধর্মের জন্য বেত খেতে রাজি ছিলেন না, গাঁজা খেতেও। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য, নিষ্ঠাবান হিন্দু, কাশীবাসী হয়েছিলেন। ইনি বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রীতিভাজন। কাশী থেকে মাঝে মাঝে দেশে ফিরতেন। বিদ্যাসাগরের দেহান্তের কিছু আগে, এঁর এমনই এক প্রত্যাগমনের পরে, দু'জনের মধ্যে কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল, সাক্ষাৎদর্শী চণ্ডীচরণ তা লিখেছেন। হরানন্দকে সাদরে কাছে বসিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে তামাক দিতে বললেন। তারপর রহস্যালাপ শুরু হল।

বিদ্যাসাগর : তুমি মরেছ নাকি ?

হরানন্দ : কেন, মরব কেন ? মরলে কি আসতাম ?

বিদ্যাসাগর : আমি বলি—না-মলে কি আসতে ? তা দেখো, আমাকে যেন পেয়ে বসো না।

[হরানন্দ তামাক খেতে লাগলেন]

বিদ্যাসাগর : তোমায় শেষটা কাশীতে খেলে ! মরবার বুঝি আর জায়গা জুটল না ? তা গেছ তো আবার সেখান থেকে এ-রকম সরে পড়ো কেন ? জানো তো, কাশীবাস করে বাইরে ম'লে কি হয় ?

[বাইরে মরলে গাধা-জন্ম হয়]

হরানন্দ : হাঁ, তা জানি। তবু মাঝে মাঝে দায়ে পড়ে আসতে হয়।

বিদ্যাসাগর : শীগ্‌গির শীগ্‌গির পালাও। কাশীর এপারে-ওপারে, ভেতরে-বাইরে অনেক ফারাক। বলি, একটু গাঁজা-টাজা খেতে শিখেছ তো ?

হরানন্দ : কেন, গাঁজা খেয়ে কি হবে ?

বিদ্যাসাগর : একটু অভ্যাস রাখো। কি জানো, কখন কি কাজে লাগে বলা যায় না। মনে করো, যদি তোমার কাশীপ্রাপ্তি হয়, তাহলে তো শিব হবে। শিব হলে তোমার নন্দী-ভৃঙ্গী যখন গাঁজার ছিলিম ধরবে, তখন টানতে হবে তো ! আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে দম আটকে মরে যাবে, আর তোমার এত সাধের শিবত্ব ফসকে যাবে।[৭]

॥ ২ ॥

কাশী-মাহাত্ম্যের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর তাঁর "জীবন্ত দেবতা" পিতা ঠাকুরদাসের অনুগত ছিলেন বলে মনে হয় না। ঠাকুরদাস অনেকদিন কাশীবাস করেছেন, কাশীতেই তাঁর দেহান্ত হয়। মাতা ভগবতীর মৃত্যুও কাশীতেই। পিতার কারণে বিদ্যাসাগরকে কাশীতে যেতে হয়েছিল। বিখ্যাত ব্যক্তি তিনি, বিখ্যাত নির্ধন নন, বদান্য বলেও বহুল খ্যাতি—স্বতঃই তাঁর চতুর্দিকে মধু-লোভী ব্রাহ্মণ-মক্ষিকারা 'দাও দাও' গুঞ্জন তুলে হাজির হলো। বিদ্যাসাগরের বিরক্তির সীমা ছিল না। এই ব্রাহ্মণকুলের সঙ্গেই প্রধানত তাঁকে সমাজসংস্কার

ব্যাপারে লড়াই করতে হয়েছে। এদের মধ্যে কোনও ধর্ম আছে বা থাকতে পারে, কদাপি তিনি মনে করতে পারেন নি। এরা বিদ্যাসাগরকে ছেঁকে ধরে।

ব্রাহ্মণরা : আপনার পিতা আমাদের অনেককিছু দিয়ে থাকেন। আপনি পিতৃপুণ্যপ্রভাবে জগদ্বিখ্যাত। সুতরাং আপনিও পাঁচ-সাত হাজার টাকা দিয়ে নাম ক্রয় করুন।

বিদ্যাসাগর : পিতৃদেব আপনাদের যেমন দিয়ে থাকেন তেমনই দেবেন। আমার কাছ থেকে কিছু হবে না।

ব্রাহ্মণরা (নাছোড়) : আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে। কাশীতে বড়-লোকেরা এসে দান করেন, তাতেই আমাদের কাশীবাস চলে।

বিদ্যাসাগর (ক্রুদ্ধ) : আমি কাশীদর্শন করতে আসি নি, পিতৃদর্শন করতে এসেছি। আপনাদের মতো ব্রাহ্মণকে দান করে যদি কলকাতায় ফিরে যাই, সেখানে মুখ দেখাতে পারব না। যতরকম দুষ্কর্ম করে, দেশ ছেড়ে আপনারা এখন কাশীবাসী। কেবল এখানে আছেন বলে যদি আমি ভক্তিশ্রদ্ধা করি, বিশ্বেশ্বর বলে মান্য করি, তাহলে আমার মতো নরাধম আর নেই।

ব্রাহ্মণরা (চরম প্রশ্ন) : আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?

বিদ্যাসাগর (চড়া স্বরে) : আমি তোমাদের কাশী, বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।

ব্রাহ্মণরা (ক্রোধান্ধ) : আপনি তবে কী মানেন?

বিদ্যাসাগর : আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী।

[পিতামাতার কাছে কতখানি পেয়েছেন তা বলার পরে—]

বিদ্যাসাগর (উদ্দীপ্তভাবে) : এমন জনক-জননীকেই আমি পরমেশ্বর জ্ঞান করি। এঁদের সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আমি নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করব। এঁদের অসন্তুষ্ট করলে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করলে সকল দেবতাই আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। দেখুন, আপনারা শ্রাদ্ধের সময়ে কী বলে থাকেন—পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমংতপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।[৮]

কাশীতে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘর্ষের ব্যাপারটি সহজে মেটেনি। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ওই সময়ে বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশীতে যান। বাঙালী ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ধরে পড়েন—বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মনান্তর মিটিয়ে দেবার জন্য। দ্বারকানাথ এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, "কাশীর ভিক্ষুক প্রতারক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কি আমাকে নিষ্পত্তি করতে হবে? পিতৃদেব এখানে বাস করবার জন্য আসেন নি, তিনি মৃত্যুকামনায় এসেছেন। কাশীর এইসব ব্রাহ্মণরা দল বেঁধে আমাকে ভয় দেখিয়ে প্রচুর অর্থ চান। তা না-দেওয়াতে জব্দ করবেন বলে শাসাচ্ছেন। কাশীর দুর্বৃত্তদের আমি ভালোভাবে

চিনি। এঁরা কাশীতে সমাগত ব্যক্তিদের যথেচ্ছ উৎপীড়ন করে থাকেন।" বাঙালী ব্রাহ্মণদের তুলনায় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "পিতৃদেব এখানে কার্যোপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে থাকেন। ওঁদের আচার-ব্যবহার দেখে আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মেছে।" কাশীবাসী অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণই "দুষ্ক্রিয়াসক্ত, ধর্মজ্ঞানশূন্য ও মূর্খ।" মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর এমন শ্রদ্ধা হয়েছিল যে, "জননীদেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে" আহূত ওইসব ব্রাহ্মণদের পা ধোয়ানোর কাজ নিজেই করেছিলেন। "দাদা ওইসকল ব্রাহ্মণদের পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। [শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন]। ওইসকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুই চারিজনের পায়ে ঘা থাকা-প্রযুক্ত তাহাতে পুঁজ নির্গত হইতেছিল। তাহা দেখিয়াও তিনি কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করেন নাই।"[৯]

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ইদানীং-লিখিত কোনও কোনও রচনায় দেখেছি, 'আমি বিশ্বেশ্বর মানি না'—বিদ্যাসাগরের এই উক্তিকে তাঁর ধর্মবিরোধিতার প্রমাণরূপে হাজির করা হয়েছে। এ কাজ যুক্তিসহ মনে হয় না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথমত বিদ্যাসাগর রাগের মাথায় বলেছিলেন, বিশ্বেশ্বর মানি না—তাও ঠিক নয়—বলেছিলেন, 'তোমাদের' বিশ্বেশ্বর মানি না। পরে বলেছিলেন, সাক্ষাৎ দেব-দেবী পিতামাতাকে সন্তুষ্ট না করলে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা অসন্তুষ্ট হবেন।

উপরের ঘটনার সাক্ষ্যে প্রমাণ না হলেও, অন্য তথ্য থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর প্রচলিত অর্থে মূর্তিপূজক ছিলেন না। শম্ভুচন্দ্রই লিখেছেন, "অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না।"[১০] তাঁর লেখাতে আছে, বিদ্যাসাগর বাল্যকালে সন্ধ্যা-মন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য বিদ্যাসাগরের মতো প্রখর স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন কেউ যদি সন্ধ্যা-মন্ত্র ভুলে গিয়ে থাকেন, তা ঘটেছিল, মন দিয়ে 'সন্ধ্যা' শেখেন নি, বা তা মনে রাখার ইচ্ছা করেন নি, বলে। বিহারীলালের লেখাতে পাই, তিনি ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর কাছে শুনেছেন যে, বিদ্যাসাগরকে মন্ত্রদীক্ষা দেবার জন্য তাঁর পিতা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর-বংশের রীতি ছিল, পিতা, মাতা, পিতামহ বা পিতামহী মন্ত্রদীক্ষা দেবেন। বিদ্যাসাগরের পিতামহীও তাঁকে দীক্ষা দিতে পারেন নি।

পরবর্তীকালের বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন তাঁর ছাত্রাবস্থায় ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মধুসূদন স্মৃতিরত্নের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁদের বলেন, "দ্যাখো, ধর্ম-কর্ম ওসব দলবাঁধা কাণ্ড।" নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি মনুর শ্লোক উদ্ধৃত করেন, "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন দুষ্যতি।" শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন এই বলে, "পিতা পিতামহ যে-পথে চলেছেন, সৎপথ অবলম্বন

করে সেই পথে চলবে, তাতে চললে দোষ হয় না।" তারপর ঠাট্টার সুরে বলেন, "কেন বাপু, সৎপথেই যদি চলবে, তবে আবার পিতা পিতামহ কেন? আর যদি পিতা পিতামহের পথেই চলতে হয়, তবে আবার সৎপথ কেন? দুই পথ না বললে দলরক্ষা হয় না, এই না? পাছে অপর জাতির লোক সৎপথে যায়, দল ভেঙে যায়, এইজন্যই না মনু-ঠাকুরকে এত মাথা ঘামাতে হয়েছে! তাই বলি, ধর্ম-কর্ম ওসব দলবাঁধা কাণ্ড।"[১১]

[বিহারীলালের রচনা অনুযায়ী, বিদ্যাসাগরের ওই মনুব্যাখ্যা তরুণ পঞ্চানন তর্করত্ন মেনে নেননি। তিনি বলেন, উক্ত শ্লোকের 'সতাং মার্গং' শুদ্ধ পাঠ নয়। হবে 'সতাং মার্গঃ'। তাহলে শ্লোকটির অর্থ দাঁড়াবে—পিতা পিতামহের অবলম্বিত পথে চলবে, তাই সাধুগণের পন্থা। বিদ্যাসাগর তর্করত্নের বুদ্ধিতে খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, এত পড়াশোনার পরিণাম তো ভিক্ষাবৃত্তি! "ন্যায় পড়েছ, অন্য দর্শন পড়েছ, বেশ করেছ; এখন বাড়িতে বসে উপোষ করবে; আর ভাবনা কি!"]

হিন্দুধর্মের 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' করে খ্যাত ধর্মপ্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে কথাবার্তার সময়েও বিদ্যাসাগর দর্শনশাস্ত্রের দুর্বোধ্যতা এবং দলবাঁধা প্রচারকাজের অসারতার কথা তুলেছিলেন:

"দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে হিন্দুধর্মের শাদা, রাঙা, নীল, কালো, এমন সকল রঙ কোথায় পেলেন? আমিও দর্শন পড়েছি, কিন্তু দুর্বোধ্য বিষয়, কিছুই ভালো বোঝা যায় না।···আপনাকে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য যাঁরা এনেছেন, তাঁরা যে কেমন-দরের হিন্দু, তা আমি বেশ জানি। তবে আপনি এসেছেন, বক্তৃতা করুন। লোকে বলবে, বেশ ভালো বলেন। এই রকম একটা প্রশংসা পাবেন, আর কিছু না। আমার স্কুলের ছেলেরা যে মুরগির মাংস খায়, আপনার বক্তৃতায় তারা যে মাংস ছাড়বে, আমি তা একেবারেই বিশ্বাস করি না।"[১২]

॥ ৩ ॥

পক্ষপাতী অবিচারী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের মহান বিদ্রোহ—মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সম্পদ। ঈশ্বর মঙ্গলময়! কোথায়—কিভাবে?—বিদ্যাসাগর বিদীর্ণ চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছেন। হাহাকার করে বলেছেন—মিথ্যা, মিথ্যা ও-কথা।

বিদ্যাসাগর (সাশ্রুনয়নে, যন্ত্রণাবিদ্ধ স্বরে): 'স্যার জন লরেন্স' জাহাজ ডুবে গেল। নানা দেশের নানা স্থানের মানুষ মরল। দুনিয়ার মালিক কী নিষ্ঠুর! আমরা যা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হয়ে কেমন করে তা পারলেন? কেমন করে ৭০০-৮০০ লোককে একসঙ্গে ডুবিয়ে মেরে, ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বাললেন? দুনিয়ায় মালিকের কি এই কাজ? এইসব দেখলে, কেউ মালিক আছেন বলে সহসা মনে হয় না।[১৩]

বিদ্যাসাগর: দুষ্ট লোক বিধবার সর্বস্ব চুরি করে নিল, অত্যাচার করল।

জগতের মালিক কোথায় ! তাঁকে পাই তো একবার দেখি। না, তিনি নেই, থাকলে কি এত অত্যাচার সহ্য করেন ?[১৪]

বিদ্যাসাগর : ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার ? জেঙ্গিস খাঁ লুটপাট আরম্ভ করলে অনেক লোককে বন্দী করলে ; ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। সেনাপতিরা এসে বললে, এদের খাওয়াবে কে ? সঙ্গে এদের রাখলে বিপদ, ছেড়ে দিলেও বিপদ। জেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে আর কি করা যাবে, ওদের সব বধ করো। কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকান্ড তো ঈশ্বর দেখলেন ! কই, নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার তো কোনো উপকার হলো না।[১৫]

বড় দুঃখে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত—"এসব দেখে মনে হয় না, দুনিয়ায় কোনো মালিক আছেন।"

পরম সুখে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন :

"বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধহয় তোমরা জানো না। যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেন। ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'হাঁ রে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি ?' ললিত উত্তর দিতেন, 'আছে, বৈকি। আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না-তো থাকিবে কার ?' বিদ্যাসাগর হাসিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন আরব্ধ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। যে-সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলা দেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই। ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া, ভগবানকে সরাইয়া দিয়া, Reason-এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এ-দেশীয় ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাস টলিল, চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি !"[১৬]

তাহলে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দুই দশক পরে, বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে চরম কথাটা কৃষ্ণকমলই বললেন—একটা বিশেষ গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে !! এই সূত্রে তিনি সগৌরবে নিজ পরিচয়ও দিয়েছেন—"আমি পজিটিভিস্ট, আমি নাস্তিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে পড়িতেছে—কৃষ্ণকমল is no যে-সে লোক। He can write and he can fight, and he can slight all things divine."

কৃষ্ণকমলের কথাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, বিদ্যাসাগর ধর্মকে যেমন দল-বাঁধা কাণ্ড বলেছেন, তেমনি তার উল্টোটাও সত্য—না-ধর্মও দল-বাঁধা কাণ্ড। নাস্তিক কৃষ্ণকমল নিজ দলে বিদ্যাসাগরকে জোটাতে চেয়েছিলেন—বিদ্যাসাগরের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই। কৃষ্ণকমল যেহেতু পরকালে বিশ্বাস করতেন না, তাই প্ল্যানচেটে বিদ্যাসাগরকে ডেকে ব্যাপারটা সদ্য জেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে এ-ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিতও নই, কারণ অনেকে ভগবানে বিশ্বাস না করলেও ভূতে বিশ্বাস করেন।

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা কৃষ্ণকমল ভিন্ন বোধহয় আর কেউ বলেন নি। কিন্তু তিনি যে অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, তা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সুদ্ধ অনেকেই বলেছেন, আর সেটাই সাধারণ বিশ্বাস।

"আত্মবিষয়ে মর্মোদ্‌ঘাটন করতে পারি নি," "শাস্ত্রকারেরা যা বোঝাতে গেছে বোঝাতে পারে নি"—এসব বিদ্যাসাগরেরই কথা। কেশব সেনের সমাজের উপাসনাপদ্ধতি সম্বন্ধে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "তারা বলছে শুনলুম—আমরা মুশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, শ্রীচৈতন্যেরও পায়ের ধুলো নিচ্ছি—আরে বাপু, ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য মরে তো ভূত হয়ে গেছে, তাদের পায়ের ধুলো কি রে বাবা!"[১৭] ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব—যার যাতে মঙ্গল, সে তাই করুক, বাঁধাবাঁধির দরকার নেই। নিজের দর্শন পড়া সম্বন্ধে তাঁর উপভোগ্য রসিকতা শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে: "আমিও দর্শন পড়েছি, কিন্তু দুর্বোধ্য বিষয়, কিছুই ভালো বোঝো যায় না। পণ্ডিত মশায় পড়ানোর সময় যখন জিজ্ঞাসা করতেন, 'ঈশ্বর, বোঝা তো?'—আমি বলতাম, 'আপনি যেমন বোঝেন আমিও তেমন বুঝি—পড়িয়ে যাচ্ছেন, পড়িয়ে যান।"[১৮] এবং একটি বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, ঈশ্বর যদি থাকেনও তিনি তো আর "কামড়াবেন না।"[১৯]

ঈশ্বর—ঈশ্বরচন্দ্রকে সত্যই কোনোদিন কামড়েছিলেন, এমন প্রমাণ আমরা পাই নি। যদি সে কামড় খেতেন তাহলে চৈতন্য-রামকৃষ্ণের মতো তাঁকে ধুলো-বালিতে মুখ ঘষতে হতো, পাগলের মতো ছুটতে বা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হতো। তথাপি তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলেন, একথাও প্রমাণিত হয়নি। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বিদ্যাসাগর নিরীশ্বরবাদী তো ননই, অজ্ঞেয়-বাদীও নন—তিনি পরিষ্কার আস্তিক। তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসুর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও অজ্ঞেয়বাদ ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "তাঁর [বিদ্যাসাগরের] ধর্মজীবন সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তাঁর ধর্মজীবন কর্মগত ছিল। কাজ-ই তাঁর কাছে ধর্ম। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন—বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই।...মোটের উপর মনে হয়, তিনি Agnostic (সংশয়বাদী) ছিলেন।"[২০] এখানে বলতেই হয়, যিনি একেশ্বরবাদী তিনি সংশয়বাদী হতে পারেন না।

পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি। রসের রঙ্গের মানুষটিকে দেখাবো, আমার এই ব্যক্ত অভিপ্রায়ের ব্যত্যয় ঘটে গিয়ে লেখাটা গুরুগম্ভীর হবার দিকে। তবু কথাটা যখন এসে গেছে, একটু নাড়াচাড়া করে নেওয়াই ভালো। যদি কেউ এই কাহিনী শুনতে ইচ্ছা না করেন, এর পরে কয়েক পৃষ্ঠা না-পড়ে উল্টে যাবেন।

এই আলোচনায় তবু কিছু মজা আছে। এখন যাঁরা বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক প্রমাণ করতে ব্যস্ত, তাঁরাই বিদ্যাসাগরকে আস্তিক প্রমাণ করার পটভূমি তৈরি করে দিয়েছেন। দয়া-মায়া, কাঁদা-কাটার কাদা মাখিয়ে বিদ্যাসাগরের হিন্দু-মূর্তি নির্মাণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানিয়ে, তাঁরা বহু যত্নে বিদ্যাসাগরের এমন একটি ইমেজ তৈরি করে ফেলেছেন, যাতে দেখি, বিদ্যাসাগর আদর্শে অগ্নিশর্মা, নীতি বা কর্তব্যের ক্ষেত্রে একচুল এধার-ওধার সহ্য করতে প্রস্তুত নন। এক কথায়, এসব ক্ষেত্রে তিনি টগবগ করে ফুটতেন।

নিশ্চয়। আমরাও তাই বলি। আমরা সমস্বরে বলি, তিনি ভণ্ড ছিলেন না। সুতরাং যদি তিনি চিঠির উপরে "শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্" লিখে থাকেন, তাহলে হরিকে (মূর্তির মধ্য দিয়ে না হলেও) অবশ্যই মানতেন। এই "শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্" ব্যাপারটা অনেককেই ফ্যাসাদে ফেলেছে। বড় গলায় যিনি বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলেছিলেন, সেই কৃষ্ণকমলও আমতা আমতা করে বলেছেন, "চিঠির উপরে 'শ্রীহরি' লেখা থাকিলে লোক নাস্তিক হয় কিনা, ইহার উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য।"[২১] চিঠির উপরে শ্রীশ্রীহরির এই অবাঞ্ছিত অস্তিত্বে বিব্রত ও বিরক্ত যেসব লেখক ওটাকে অভ্যাসের ব্যাপার বলেছেন, তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন—মহাশয়গণ, আপনাদের লেখা থেকেই তো জেনেছি, বিদ্যাসাগর লোকাচার বা অভ্যাসের দাস ছিলেন না!! ভরসা করি, বিদ্যাসাগর 'শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্' কথাগুলোর মানে জানতেন না, এমন পাণ্ডিত্যের অভাব তাঁর মধ্যে কেউ দেখবেন না! উল্টোপক্ষে ওই লেখার তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। ডাঃ চন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়িতে বসে বিদ্যাসাগর চিঠি লিখছিলেন। লেখা শেষ হলে চন্দ্রমোহন সেটি দেখতে চাইলেন। তাতে বিদ্যাসাগর হেসে বলেছিলেন, "তুমি যা ভাবছ তা নয়; এই দ্যাখো, শ্রীশ্রীহরিঃ সহায় লিখেছি।"[২২] বিদ্যাসাগরের ধর্মে মতি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ বিহারীলাল এ-ব্যাপারে থমকে থাকলেও চণ্ডীচরণ সন্তুষ্টচিত্তে বলেছেন, "তিনি কেবলমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হইয়া কোনো কাজই করিতেন না। যাহা নিজ হৃদয়ের অনুমোদিত, তাহাই অসঙ্কোচে সম্পন্ন করিয়াছেন।"[২৩]

বিদ্যাসাগরের পত্রচূড় "শ্রীশ্রীহরি" শেষ পর্যন্ত বজায় ছিলেন। মানুষ তার চরম ইচ্ছার কথা লিখে যায় উইলে। যে উইলে বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র পুত্রকে কঠোর নিন্দা করে, নিজ বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন—যা তাঁর মনঃশক্তি ও আদর্শবাদের চরম দলিল বলে কীর্তিত—তার শীর্ষে "শ্রীশ্রীহরিঃ" সিংহাসন সাজিয়ে বসে আছেন।

একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। এখানে আমি বিদ্যাসাগরকে

প্রচলিত অর্থে ধার্মিক প্রমাণ করতে চাইছি না। তিনি বিহ্বল ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন না। ধর্ম বা ঈশ্বর-ব্যাপারকে তিনি প্রকাশ্যে অন্তত এড়িয়ে চলতেন। তা নিয়ে সমকালীন বাংলায় ক্ষোভ ছিল। বিদ্যাসাগরের রক্ষণশীল জীবনীকার বিহারীলাল—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য বিদ্যাসাগর যে 'বাসুদেব চরিত' রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত ছিল"—তা প্রকাশিত না হওয়ার জন্য আক্ষেপ করেছেন। তাঁর "দুঃখ এই, একখানি সুপাঠ্য পুস্তকে হিন্দুসন্তানেরা বঞ্চিত হইয়াছেন। দুঃখ এই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ ভগবানের অবতারত্ব-প্রতিপাদক পুস্তক আর লেখেন নাই।" বিহারীলাল ঈষৎ সান্ত্বনাবোধ করেছেন এই জেনে যে, "বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিতাবস্থায় এ পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় তিনি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান নাই।" পুত্র নারায়ণচন্দ্র তা খুঁজে পান, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে বইটি প্রকাশিত হয় নি।[২৪]

তথাপি বিদ্যাসাগর ধর্মব্যস্ত নন বলে নাস্তিক ছিলেন—একথাও প্রমাণসিদ্ধ নয়। তিনি নাস্তিক হলে অবশ্য পৃথিবী রসাতলে যেত না—হিন্দু-পৃথিবীও নয়। ভারতীয় হিন্দুসমাজে নাস্তিকরা ব্রাত্য নন। প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ, একথা বলতে এদেশের শাস্ত্রীদের আটকায় নি। সুতরাং হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত নাস্তিক বিদ্যাসাগর—আপত্তির কারণ কি? আমাদের আপত্তি অন্য কিছুতে নয়, অযথার্থ কথায়—বিদ্যাসাগর যা ছিলেন না, তাঁকে তাই প্রমাণ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগর কি সত্যকে ভালবাসতে আমাদের শেখান নি?

বিদ্যাসাগর অন্য হিন্দু আচার পালন না করলেও শ্রাদ্ধশান্তি করতেন, বিশেষ যত্নের সঙ্গে। কেন করতেন? পরলোকে যাঁর বিশ্বাস নেই তিনি কি শ্রাদ্ধ করতে পারেন? এখানেও দেশাচার পালনের কথাটা উঠেছে। দেশাচারের বিরুদ্ধে অনলবর্ষী বিদ্যাসাগর তার ফাঁদে ধরা দিলেন কেন? যেহেতু সে শ্রাদ্ধ তাঁর পিতামহী, পিতা বা মাতার? অর্থাৎ তিনি রক্তসম্বন্ধের দুর্বলতার বশবর্তী? যদি বলা যায়, তিনি অন্যের মনে আঘাত করবেন না বলে শ্রাদ্ধাদি পালন করতেন (সেখানে প্রশ্ন, সন্ধ্যাবন্দনা ভুলবার সময়ে, এবং পরবর্তীকালে তা পালন না করার সময়ে, পরিবারস্থ লোকজনের সম্বন্ধে এই মমত্ববোধ তাঁর কোথায় ছিল?)—সেক্ষেত্রে প্রশ্ন, তিনি না-হয় পিতামহী বা মাতার শ্রাদ্ধ করেছিলেন পিতা-মাতা বা পিতার মনে দুঃখ না দেবার জন্য, কিন্তু পিতার শ্রাদ্ধের সময়ে তো মাতার দেহান্ত হয়ে গেছে, তখন বাঁধা পড়েছিলেন কিসে? তাছাড়া, বহু মানুষই তো দেশাচার পালন করে যায় অপরের মনে দুঃখ না দেবার জন্য—সেই বহুর একজন বলে বিদ্যাসাগরকে ভাবব? সংস্কারকদের হিসেবী তেজস্বিতা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোরম কৌতুকটি এখানে আমাদের মনে পড়ে!

ব্রাহ্ম রামতনু লাহিড়ীর নিজ 'কনভিক্‌শন্' সম্বন্ধে খুবই গর্ব ছিল। তাঁর

পিতা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, পূজা-আহ্নিক নিয়ে থাকতেন। নিজ 'কনভিক্শন্' প্রমাণ করতে রামতনু পৈতা ত্যাগ করেন, তাতে তাঁর পিতা অত্যন্ত কষ্ট পান। ব্রাহ্ম-নেতা উমেশচন্দ্র দত্ত পর্যন্ত রামতনুর এই কাজকে পছন্দ করেন নি। বলেছিলেন, "বাপ আপনাকে শুধু পৈতাটি রাখতে অনুরোধ করেছিলেন বৈ তো নয়। কনভিক্শনের কাছে ন্যাচরাল টেন্ডারনেস্কে স্যাক্রিফাইস্ করায় কতটা পৌরুষ আছে বলা যায় না।" এহেন রামতনু লাহিড়ী একবার প্রয়োজনে বিদ্যাসাগরের কাছে হাজির হন।

রামতনু : ওহে, আমাকে একটা রাঁধুনি বামুন জোগাড় করে দিতে পারবে?

বিদ্যাসাগর : কেন হে, তোমার আবার বামুনের দরকার কি? বাবুর্চি-খানসামা হলেই তো চলে।

রামতনু : হাঁ, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে বাড়ির ভিতরে যে বামুন ছাড়া চলবে না।

বিদ্যাসাগর (হেসে) : বাপের কথায় পৈতাগাছটি রাখতে পারলে না। এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ![২৫]

ব্রাহ্ম, সুতরাং জাতিভেদে অবিশ্বাসী রামতনু লাহিড়ী দেখে-শুনে বড় মেয়ের বিয়ে দেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে! প্রসন্নকুমার ঠাকুরেরও ছিল উৎকট ব্রহ্মণ্য-অহঙ্কার। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলতেন, আমি হলুম ব্রাহ্মণ-খ্রীস্টান।[২৬] এরই পাশে বিদ্যাসাগরের একেবারে ভিন্ন আকার! তাঁর একমাত্র পুত্র যখন বিধবা বিয়ে করলেন তখন তা নিয়ে তাঁর গর্বের শেষ ছিল না। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর আদর্শের ক্ষেত্রে দেশাচারের দাস ছিলেন না। কিন্তু তিনি আবার আচারমাত্রকেই দোষের জিনিস বলে মনে করতেন না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্ম—উপবীত মৃত্যুকাল পর্যন্ত দেহলগ্ন; সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা—তা হলেও কুসংস্কারকে তিনি সতেজ প্রত্যাখ্যান করে গেছেন—সংস্কারকদের কুসংস্কার পর্যন্ত। মানুষের জীবন কতকগুলি অতিবুদ্ধিমান লোকের তৈরি করা একটা ছকমাত্র নয়, বিদ্যাসাগরের জীবনে তার প্রমাণ পাই। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, যে বিদ্যাসাগর কাশীতে ঘৃণার সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই আবার মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের সদাচারে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের পা ধুইয়েছেন। কাশীতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর নিম্নোক্তপ্রকার কথাবার্তা হয় :

বিদ্যাসাগর : আপনি আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন কেন?

ভদ্রলোক : শুনলাম, আপনি এসেছেন, তাই দেখতে গিয়েছিলাম। আর ধর্ম সম্বন্ধেও কিছু জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল।

বিদ্যাসাগর : কি জিজ্ঞাসা, বলুন।

ভদ্রলোক : আপনার ধর্মমত কি?

বিদ্যাসাগর : আমার মত কাউকে কখনও বলি না। তবে এই কথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন, তাহলে তাই আপনার ধর্ম।[২৭]

॥ ৪ ॥

শেষ বয়সে লেখা আত্মজীবনীর (অসমাপ্ত) মধ্যে বিদ্যাসাগর যাঁদের চরিত-কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের প্রতিই সর্বাধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। রামজয়, বিদ্যাসাগরের আদর্শ পুরুষ। রামজয়, "নিরতিশয় তেজস্বী", "নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার," "স্পষ্টবাদী" ও "যথার্থবাদী"। কারো কাছে অবনত হয়ে চলা তাঁর ধাতে ছিল না। তিনি "সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী" হয়ে চলতেন; উপকার বা অন্য প্রত্যাশায় "পরের উপাসনা বা আনুগত্য" করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই "নিতান্ত নিস্পৃহ" মানুষটির "স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভালো।"

পিতামহের তেজস্বিতা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। রামজয়ের শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী; তিনি চাইতেন, রামজয় তাঁর বাধ্য হয়ে চলবেন। সে বস্তু রামজয়ের ধাতে ছিল না। "তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না।" ফলে শালার বহু অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, বীরসিংহ গ্রামে তিনি কার্যত একঘরে হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক নীতি গ্রহণ করেছিলেন: "যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন, আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।" এবং তিনি এই ভয়াবহ রসিকতা করে বসেছিলেন, যে-রসিকতার কপালে সত্যের জয়পত্র সাঁটা ছিল:

"তর্কভূষণ মহাশয় সর্বদা সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, এ-গ্রামে একটাও মনুষ্য নাই, সকলেই গরু। একদিন তিনি একস্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন—ওই স্থানে লোকে মলত্যাগ করিত। প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়, ও স্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি? সে ব্যক্তি বলিলেন, ওই স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়? আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক?"

কেবল মানসিক বীরত্ব নয়, শারীরিক বীরত্বও তর্কভূষণের ছিল। "এক লৌহদণ্ড তাঁর চিরসহচর"—ডাণ্ডা দিয়ে তিনি মানুষ ও জন্তু, সকলকেই ঠাণ্ডা করতেন। ডাকাতরা তাঁকে পথে একাকী পেয়ে যখন আক্রমণ করেছে, তখন ওই দণ্ডযোগে তাদের "উপযুক্ত আক্কেলসেলামী" দিয়েছেন। একদা এক ভালুকের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে এই দণ্ডই তাঁর যুদ্ধাস্ত্র হয়েছিল। না, তাও পুরো কথা নয়, অধিকন্তু ছিল তাঁর পদাস্ত্র। "ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে তিনি তদীয় উদরে

উপযু্যপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন।”

তর্কভূষণ ধার্মিক কিন্তু অযথা অহিংস নন। ক্রোধ বোধ করার ন্যায্য অধিকার তিনি ত্যাগ করেন নি। যা ত্যাগ করেছিলেন তা হলো, “অন্যের অনিষ্ট চিন্তনের” প্রবৃত্তি। বিদ্যাসাগর নমস্কার করে বলেছেন, “তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিতেন।”

বিদ্যাসাগর কার কথা লিখছিলেন—তাঁর পিতামহের, নাকি তাঁর নিজেরই? তিনি তাঁর পিতামহকে সারাজীবন বহন করেছেন, নিজের মধ্যে। সে বীরের রক্তস্রোত তাঁর ধমনীতে প্রবল বেগে প্রবাহিত ছিল। জন্মলগ্নে তাঁর ললাট স্পর্শ করেছিল পিতামহের মধুর পরিহাসের আলোকছটা। তাঁর জন্মকালে পিতা ঠাকুরদাস বাড়িতে ছিলেন না, গ্রামান্তরে হাটে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে দেখা হলো তর্কভূষণের সঙ্গে। তর্কভূষণ ঠাকুরদাসকে বললেন, “একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।” বাড়িতে গর্ভিণী গাভী ছিল। ঠাকুরদাস বাড়ি পেঁছে গোয়ালের দিকে এগোচ্ছেন, “তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে কহিলেন, ‘ওদিকে নয়, এদিকে এসো। আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।’ এই বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।”

রসিকতাটি বিদ্যাসাগরের এতই মনোমতো হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে তিনি কিভাবে পিতামহের বাক্য সার্থক করেছেন, তা সানন্দে জানিয়েছেন:

“আমি বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ওই সময়ে তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিদিগের নিকট পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাসবাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, ‘ইনি সেই এঁড়ে বাছুর। বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন। তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে। বাবাজি আমার ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।’ জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর সময়ে সময়ে কর্ম দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।”[২৮]

উদ্ধৃতির শেষ লাইন থেকে আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস প্রমাণ করতে যদি সচেষ্ট নাও হই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবে তা করলে অযৌক্তিক হতো না, অন্তত ‘অবৈজ্ঞানিক’ একটি জিনিস সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের আসক্তির প্রমাণ পাওয়া যেত! যাই হোক, বিদ্যাসাগরের জীবনে তর্কালঙ্কারের ভূমিকা সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ শম্ভুচন্দ্র দিয়েছেন। সংসারত্যাগী রামজয় কেদার পাহাড়ে থাকাকালে স্বপ্নযোগে জেনেছিলেন, তাঁর বংশের তিলক-স্বরূপ হবেন এমন পুত্র জন্মাচ্ছেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে তিনি স্বদেশে ফেরেন। একই সূত্র থেকে আরও জানতে পারি, বিদ্যাসাগর গর্ভে থাকাকালে তাঁর জননী “দশ মাস উন্মত্তার ন্যায় ছিলেন।” রোগ উপশমের অনেক চেষ্টাতেও

ফলোদয় হয় নি। শেষে "পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য" পরীক্ষা করে বলেন, "ইঁহার কোনও রোগ নাই; ঈশ্বরানুগৃহীত কোনও মহাপুরুষ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার তেজঃপ্রভাবে এরূপ হইতেছে।" স্বয়ং বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে জেনেছি, তাঁর মাতামহ তান্ত্রিক মতে শবসাধনা করে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলত, উন্মত্ততার সংশোধিত রূপ উন্মাদনা বিদ্যাসাগরের রক্তেই ছিল। শম্ভুচন্দ্র বলেছেন, বিদ্যাসাগর ভূমিষ্ঠ হবার পরে, নাড়িচ্ছেদনের পূর্বে, রামজয় তাঁর জিভে আলতা দিয়ে কয়েকটি কথা লিখে দেন। এইভাবে জন্মপরেই পিতামহের কাছে বিদ্যাসাগরের মন্ত্রলাভ। পিতামহ বলেছিলেন, "এই বালককে অপর কেউ যেন মন্ত্র না দেয়; আজ থেকে আমিই এর অভীষ্টদেব হলাম।" সদ্যোজাত শিশুর জিভে পিতামহের কঠোর হাত পড়াই নাকি বিদ্যাসাগরের পরবর্তী তোতলামির কারণ। রামজয়ই জাতকের নাম ঈশ্বরচন্দ্র রাখেন। "এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য, অতএব ইহার নাম অদ্য হইতে আমি ঈশ্বরচন্দ্র রাখিলাম।" বিদ্যাসাগরের জীবনে পিতামহ ও মাতামহের সাধনার প্রভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা সমকালে ঘনিষ্ঠ মহলে বলবৎ ছিল। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় প্রতিভায় মোহিত হয়ে, "কোনো কোনো পণ্ডিত সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে, ঈশ্বরের পিতামহ বহুকাল তীর্থক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন; স্বপ্ন দেখিয়া দেশে আসিয়া ঈশ্বর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জিহ্বায় কি মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন; তজ্জন্য দৈবশক্তিবলে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে। কোনো কোনো পণ্ডিত বলিতেন যে, ঈশ্বরের মাতামহ শবসাধন করেন; তাঁহারই আশীর্বাদে এভাবে এত অল্প বয়সে এইরূপ পণ্ডিত হইয়াছে।"

পিতামহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উন্মুক্ত প্রশস্তি আমাদের মনে একটি অনুচিত চিন্তা জাগায়। প্রশস্তি কবার সময়ে কি বিদ্যাসাগর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ দায়িত্বশীল নীতিবুদ্ধিকে বংশগৌরবের দ্বারা আচ্ছন্ন হতে দিয়েছিলেন? বিদ্যাসাগর বিষয়ে ইদানীন্তন আলোচনাদি থেকে মনে হয়েছে, তিনি বৈরাগ্য ইত্যাদি একদম পছন্দ করতেন না, অপরিসীম তাঁর ইহলৌকিকতা, সাংসারিক কর্তব্যবুদ্ধির অভাব ঘটলে কঠোর ভাষায় তার শাসন করতেন, ইত্যাদি। অথচ এহেন বিদ্যাসাগরের আদর্শ পুরুষ হলেন পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ—যাঁর থেকে দায়িত্বহীন, পলায়নী মনোভাবসম্পন্ন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়—যিনি ভাইদের উপর রাগ করে নিজের পত্নী ও শিশু পুত্র কন্যাগুলিকে অপমান ও অনাহারের মুখে ফেলে রেখে বৈরাগ্যের প্রকোপে পালিয়ে গিয়েছিলেন!! তিনি যে পত্নী ও ৬টি শিশুসন্তানকে ফেলে দেশত্যাগ করেছিলেন, সেকথা বিদ্যাসাগরের রচনাতেই পাই—অথচ তার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা তিনি করেন নি, বরং, উল্টোপক্ষে পিতামহের রীতিমতো বন্দনা করেছেন।

এই বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখা যাক।

চন্দননগর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা। তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে পরামর্শ করতে গেলেন।

এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মত প্রকাশে অনিচ্ছুক। "তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে, আমাকে জড়াও কেন?" পণ্ডিত কিন্তু নাছোড়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত তাঁকে জানতে হবেই। অতঃপর উভয়ের প্রশ্নোত্তর :

বিদ্যাসাগর : তোমাদের সংসারে কে কে আছেন?

পণ্ডিত : সংসারে আছেন পিতা, আমার বিমাতা, আমার স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তান।

বিদ্যাসাগর : কী এমন অসুবিধা হলো যে, সংসার ছাড়তে চাইছ?

পণ্ডিত : বিমাতাটি ভালো নয়। তাঁর প্ররোচনায় পড়ে পিতা অসদ্ব্যবহার করেন।

বিদ্যাসাগর : বুঝেছি। তা তোমার স্ত্রীটি কেমন? সতীত্ব আছে তো? শিশুসন্তান দুটি তোমার ঔরসজাত, না অন্য কারো?

পণ্ডিত শুনে হতভম্ব। বাক্যস্ফূর্তি হলো না।

বিদ্যাসাগর : কি হলো, কথার উত্তর দাও?

পণ্ডিত (বিচলিত স্বরে) : না মহাশয়, আমার স্ত্রী অতি সাধ্বী রমণী, পতিপরায়ণা। তার চরিত্রে কোনো দাগ নেই।

বিদ্যাসাগর (কণ্ঠ কঠোরতর) : তাহলে ওই সাধ্বী অনুরক্তা স্ত্রী কী এমন অপরাধ করেছেন যে, সংসারত্যাগ করে তাঁকে শাস্তি দেবে? একের দোষে অন্যে শাস্তি পাবে? বিয়ের সময়ে কি শপথ করো নি, তুমি তাঁকে আজীবন পালন করবে? তোমার শিশুসন্তান দুটিই বা কী দোষে পরিত্যক্ত হবে? অমন কাজ কি অমার্জনীয় অপরাধ নয়?

বিদ্যাসাগর (কোমল কণ্ঠে) : দুঃখ তাপ আছেই। সংসারে এসেছ, কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। সকলের প্রতি কর্তব্যপালন করতে হয়। অমন যে বিমাতা, তাঁর প্রতিও কর্তব্য আছে। তুমি ঠিকমতো কাজ করলে একদিন তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন। এইভাবে চললে সকলকে সংসারে সুখী করতে পারবে।"[২৯]

মনোমতো থিয়োরী তৈরি করে তার দ্বারা বড় চরিত্রকে মাপার বিপদ এই। রামজয় তর্কভূষণের মধ্যে যে বৃহৎ পৌরুষ ও জ্বলন্ত ধার্মিকতা বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন, বা তার বিষয়ে জেনেছিলেন—তার গুণকীর্তন করার আগে তিনি নীতিসুধার পাতা উল্টে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। 'সাহেব' বিদ্যাসাগরের ভারতীয়ত্বও প্রশ্নাতীত। শেক্সপীয়ারের অনুরাগী তিনি, তথাপি কালিদাসকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক মনে করতেন, যাঁর প্রতিভা তাঁর মতে, অলৌকিক। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, কালিদাস ব্রহ্মণ্যসংস্কৃতি-আশ্রিত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-কবি। বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরের একমাত্র কাজ বিধবাদের ধরে ধরে বিয়ে দেওয়া—এমন ধারণা যাঁরা সৃষ্টি করতে চান, তাঁরা মনে রাখতে পারেন, বিদ্যাসাগরের আদর্শ নারী সীতা, যাঁর তুল্য "সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ" করেছেন "এমন বোধ হয় না।" অথচ সীতাচরিত্রের প্রধান গুণ অনন্য পতিভক্তি,

সেজন্য আত্মনিগ্রহ। বিদ্যাসাগর তাঁর 'সীতার বনবাস'-এর শেষে মন্তব্য করেছেন : "তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টি বিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা-গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধহয় বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" সুতরাং সহজেই বলতে পারি, বিধবাদের নব পতি দান করা নয়, তাদের বিয়ের পথে আইনের বাধা দূর করাই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় মনুষ্যসমাজের একার্ধ অধিকারবঞ্চিত ছিল, যখন অপরার্ধ সপত্নীক বা বিপত্নীক যে-কোনো অবস্থাতেই বহু বিবাহে অধিকারী—তিনি এই বৈষম্য কিয়দংশে দূর করতে চেয়েছিলেন, তারই জন্য তাঁর সংগ্রাম। নচেৎ তাঁর ব্যক্তিজীবনের আদর্শ—ভোগ নয় ত্যাগ ; তার প্রমাণ—সীতাকে শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্ররূপে ঘোষণায় (অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরীকে নয়), নিজের বিধবা কন্যার ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতি বেদনাপূর্ণ মমত্বানুভূতিতে, মাতৃবিয়োগের পরে এক বৎসর হবিষ্যান্ন ভোজন ও নির্জনবাসে। অপরের জন্য যাঁর জীবন উৎসর্গিত, তাঁর পক্ষে ভোগদর্শনকে আত্মদর্শন করা সম্ভব নয়।

॥ ৫ ॥

তেত্রিশ বৎসর বয়সে বিদ্যাসাগর সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন। তাঁর এই কথার উপরে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাঁইত্রিশ বৎসরে তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী থেকে বেদান্তকে বাদ দেবার প্রস্তাবের দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিলেন, তা অনেকেই দেখতে চান না। আর যদি তিনি সাংখ্য ও বেদান্তকে শেষ অবধি ভ্রান্ত দর্শন মনে করতেন, তাতেই বা কি প্রমাণ হয় ? বহুজ্ঞাত এই কথা—এই ভারতবর্ষেই হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নানা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে উক্ত দুই দর্শনকে নস্যাৎ করা হয়েছে। কে বলতে পারে, সাংখ্য ও বেদান্ত প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরবাদী দর্শন নয় বলেই বিদ্যাসাগর তাদের অপছন্দ করেছিলেন কিনা ? ওই দুই মতের মধ্যে বিদ্যাসাগরের কাঙ্ক্ষিত মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্থান নেই।

ভারতীর দর্শনের বিষয়ে বিদ্যাসাগর যে আগ্রহশূন্য হয়ে পড়েন নি তার প্রমাণ তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ'। "সর্বদর্শন-সংগ্রহের মধ্যে সংক্ষেপে সকল ভারতীয় দর্শনের বিবরণ রহিয়াছে, সেইজন্য ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"—বিদ্যাসাগর উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন। এ গ্রন্থের পুঁথি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, অথচ এটি সকল সংস্কৃত পণ্ডিতের সংগ্রহে থাকা উচিত, এই বিবেচনায় তিনি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে তা ছাপেন।

বিদ্যাসাগরের 'আস্তিক' জীবনীকারেরা তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসের সপক্ষে তাঁর প্রথম-রচিত কিন্তু অমুদ্রিত রচনা 'বাসুদেব চরিত'-এ ভাগবত-অনুযায়ী কৃষ্ণের লীলাবর্ণনা, ভূগোল-খগোল বর্ণনায় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বা তাঁর 'গোপাল-স্তুতি'-র উল্লেখ করেন। মধুসূদন তর্কালঙ্কার-রচিত 'বামনাখ্যানম্'-এর

বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ এখানে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়। বিদ্যাসাগরের আরও নানা রচনায় ঈশ্বরকথা আছে। তাঁর আখ্যানমঞ্জরী "কতিপয় ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্বক সংকলিত", একথা সত্য, কিন্তু বিষয় নির্বাচন তো তিনিই করেছিলেন! আখ্যানমঞ্জরীর কয়েকটি রচনার নাম: "ধর্মভীরুতা", "ধর্মপরায়ণতা", "ধর্মশীলতার পুরস্কার", "ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা", "ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস," "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।" শেষোক্ত রচনার উপসংহারে পাই:

"ধর্মপথে থাকিলে অবশ্যই সুখ, শান্তি, ও সৌভাগ্যলাভ ঘটে। ধার্মিক ব্যক্তিকে যদিও কোনও কারণে আপাতত কষ্টভোগ করিতে হয়, কিন্তু যদি তিনি ধর্মপথ হইতে বিচলিত না হন, চরমে জয়লাভ স্থির সিদ্ধান্ত।"

'ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস' রচনার উদ্যমী আত্মবিশ্বাসী বালকটি বলেছে:

"দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ-বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।"

আখ্যানমঞ্জরীর অন্য অনেক রচনাতে মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কথা পাই।

'বোধোদয়'-এর ঈশ্বরপ্রসঙ্গই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছিল না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যাসাগরকে "অতি প্রবল ধর্ম-বিশ্বাস বিশিষ্ট লোক" বলে মনে করতেন—তিনি ছেলেদের ওই পাঠ্যপুস্তকে উপযুক্তভাবে ঈশ্বরকথা না থাকার জন্য অনুযোগ করেন। বিদ্যাসাগর তাতে হেসে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।"[৩০] বোধোদয়ে ঈশ্বরবিষয়ে তাঁর রচনা নানা কারণে বিখ্যাত। বিদ্যাসাগর প্রথমে লিখেছিলেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।"

পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হয়ে ব্যাপারটি দাঁড়ায়:

"ঈশ্বর কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু। তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।"[৩১]

বোধোদয়ের মধ্যে আরও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ: ঈশ্বর কেবল প্রাণীদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই।" "সন্তরণের সুবিধার জন্য পরমেশ্বর জলচর পক্ষীর পায়ের অঙ্গুলি, একখানি পাতলা চর্মদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।" "সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবসমূহে পরিবৃত। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।" "ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কোন্ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি, এজন্য

কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে সকল জন্তুই সমান।" "যে-জন্তুর যে-ইন্দ্রিয়ের যেরূপ আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।"

একথা স্বীকার্য, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর আড়ষ্ট। গম্ভীরভাবে ঈশ্বরকথা বলতে গিয়ে তিনি অনিচ্ছায় অনেকের হাসির কারণ হয়েছেন। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" (কথাটা নাকি মূলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের)—ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে এই গুরুতর বিষয়ের উপস্থিতি অনেকের কাছে হাস্যকর ঠেকেছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে পঞ্চানন্দী রসিকতা করেছেন। বিহারীলাল স্তম্ভিতভাবে বলেছেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ—ইহা বালক তো বালক, কয়জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের বোধগম্য হয় বলো দেখি।"[৩২] স্বামী বিবেকানন্দ এই নিয়ে প্রচুর হেসেছেন। তদুপরি বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু তাঁর পছন্দসই ছিল না। তাঁর বন্ধু, শিল্পী ও লেখক প্রিয়নাথ সিংহকে তিনি "ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত কেতাব" লিখতে যখন বলেছিলেন, তখন প্রিয়নাথ উত্তর দেন, কেন "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে।" তাতে "স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বলেন, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, গোপাল অতি সুবোধ বালক—ওতে কোনো কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভালো হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাংলাতে কতকগুলি ইংরেজিতে কেতাব চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।"[৩৩]

[বিদ্যাসাগরের জীবনীকার ইন্দ্র মিত্র বিবেকানন্দের অনুরাগী। তবু এই প্রসঙ্গে না লিখে পারেন নি, "স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের মুখ থেকে নির্গত হলেও বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পর্কে এ-রকম অশ্রদ্ধেয় উক্তি আর কেউ উচ্চারণ করেন নি।"[৩৪] এখানে আমি সবিনয়ে বলতে চাই, স্বামীজীর ওই 'কথিত' উক্তির রিপোর্টে ভুল থাকতে পারে, বা পরিপ্রেক্ষিত ঠিকভাবে উপস্থিত করা না-হতে পারে। ধরে নিচ্ছি, স্বামীজী ওই কথাই বলেছিলেন (বলতে পারেন বলেই আমার ধারণা)—সেক্ষেত্রে তিনি সেকালে প্রচলিত হাসির প্রতিধ্বনিই তুলেছিলেন। ওটি তাঁর অমৌলিক হাসি। তাছাড়া বিদ্যাসাগর-রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলি যদি অপৌরুষেয় কোনো ব্যাপার না হয়, তাহলে তার অসম্পূর্ণতার বিষয়ে বলায় কোন্ দোষ? ওকথা বলে যদি স্বামীজী 'অশ্রদ্ধেয় উক্তি' করে থাকেন, তাহলে স্বামীজীর সমকালীন বিরাট সাহিত্যপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় অনুরূপ অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন যখন তিনি বালক বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সঙ্গে গোপাল অপেক্ষা রাখালের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন, এবং বহুগুণ অধিক অশ্রদ্ধেয় কাজ করেছেন 'সহজপাঠ' তৈরি করে, যা বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য বইগুলিকে বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। 'জল

পড়ে পাতা নড়ে'-র আদিকাব্য রবীন্দ্রনাথকে বেঁধে না রেখে, নতুন করে শিশু-পাঠ্য রচনায় প্রণোদিত করেছিল।]

ব্যক্তিগত কথাবার্তায় বিদ্যাসাগর ধর্মপ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হতে চাইতেন না। বলেছিলেন, ধর্ম নিয়ে তর্ক পৃথিবীর সূচনা থেকে শুরু হয়েছে, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন থাকবে, মীমাংসা হবে না। মহাভারতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন, 'বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়, ধর্মের তত্ত্ব গুহাহিত হয়ে আছে, সুতরাং মহাজন যে-পথে যান সেই হলো গম্য পথ।' আরও বলেছেন, 'ধর্ম কী, বর্তমান অবস্থায় তা জ্ঞানের অতীত।'[৩৫] তবু ধর্মকথা একেবারে বলেন নি তা নয়। চণ্ডী-চরণকে বলেছেন, "এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, তা বেশ বুঝি", কিন্তু ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিসংবাদের বিষয়ে বিতৃষ্ণাও প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, একটা নির্দিষ্ট পথে চললেই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হব, বা স্বর্গরাজ্য অধিকার করব, এমন বোঝানোর চেষ্টা যেন না করা হয়।[৩৬] ডাক্তার অমূল্যচরণ বসুকে বলেছিলেন, "গীতার উপদেশ অনুসারে চললেই ভালো হয়।"[৩৭] ক্ষুদিরাম বসু তাঁর মুখে শুনেছেন, যীশুখ্রীস্টের ধর্ম ইউরোপে গিয়ে অপাত্রে পড়েছে, "ওটা আমাদের ধাতে ঠিক মিশে যেত।"[৩৮]

॥ ৬ ॥

উপস্থাপিত তথ্যগুলি থেকে পাঠক বুঝতে পেরেছেন, ঈশ্বররসিক বলতে যা বোঝায় বিদ্যাসাগর তা ছিলেন না, যদিও তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন, তাও সত্য নয়। আরও দেখি, তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তব্যে বিশেষ রকম শিথিলতা আছে, যা তাঁর মতো পণ্ডিতের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত। বস্তুত, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। সে ঔদাসীন্য কেবল অধ্যাত্মদর্শন সম্বন্ধেই নয়, সর্ববিধ দর্শন সম্বন্ধেই। তিনি কোনো দর্শনেই গভীরভাবে প্রবিষ্ট হবার মতো মেজাজের মানুষ ছিলেন না। ফলে, তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস প্রচলিত মঙ্গলময় ঈশ্বর-ধারণার চারধারে ঘুরপাক খেয়েছে। মানবপ্রেমিক, লোক কল্যাণকামী বিদ্যাসাগর নিজ স্বভাবে মঙ্গলময় ঈশ্বরের ধারণা করেছেন, তার পরেই আবার পৃথিবীতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব দেখে চীৎকার করে বলেছেন—ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় তাহলে জগতে অবিচার কেন? মূর্তিপূজায় তাঁর আস্থা ছিল না। মোটামুটি সগুণ নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু জগতে মন্দের বিজয়ের ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদী ভক্তেরা যে প্রশ্নহীন বিশ্বাসে সবকিছুর পিছনে ঈশ্বরের নিরাকার মঙ্গলহস্ত দেখেন—ততখানি নিরাকার ভক্তিব্যাকুলতা তাঁর ছিল না। অপরদিকে অদ্বৈত বেদান্তকে গ্রহণ করতে পারেন নি বলে জগতের মঙ্গল-অমঙ্গলের দার্শনিক মীমাংসা যে-ভাবে শঙ্করাচার্য করেছেন, তাকেও মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে একটি বিমূঢ়

বালককে নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু মহাসাগরে ঝড় উঠেছিলই। মায়াবাদ মিথ্যা—জগৎ পরম সত্য—সেই তাঁর প্রিয় জগতের মার খেতে খেতে যন্ত্রণায় অধীর হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন, নির্জনবাস করেছেন বারংবার। বৈরাগ্যের মধ্যেও কিন্তু পৃথিবীকে মায়া বলে উড়িয়ে দেবার সাধ্য ছিল না তাঁর। আবার ঈশ্বরকে পরম শরণ বলে বরণ করতেও পারেন নি। ফলে দুদিকে পুড়েছেন। সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন শিশু সঙ্গে; শিশুদের মতোই যাদের মন সেই সাঁওতালদের সঙ্গে; যোগী-বন্ধুর সাহচর্যে; ভক্তিসঙ্গীতের আবহমধ্যে; এবং পিতামাতার পটপূজার সাধনায়। বিদ্যাসাগরের পিতা ও মাতা যথার্থ ভক্তিযোগ্য ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে-ভাবে তাঁদের পূজা করে গেছেন তাতে বোঝা যায় তাঁর পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তিতে অতিরিক্ত কিছু ছিল। পিতা ও মাতা বিদ্যাসাগরের কাছে বহুলাংশে প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন—ইহলৌকিকতার গৌরবাভিমানী বিদ্যাসাগর দেবমূর্তির বিকল্প রূপে পিতা ও মাতার প্রতিমাপূজা করে গেছেন। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "দাদা প্রত্যহ অন্তত দুইবার ওই মূর্তি [পিতা ও মাতার প্রতিকৃতি] দর্শন করিতেন। কর্মাটার ও ফরাসডাঙ্গার বাসাতেও স্বতন্ত্র প্রতিমূর্তি [প্রতিকৃতি] প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন।"[৩৯] চণ্ডীচরণ: "পিতামাতার জীবদ্দশায় ও তাঁহাদের লোকান্তরগমনের পর যখন যেখানে থাকিতেন, আমরণ পিতামাতার মূর্তি-সমক্ষে প্রণত হইয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন। আমরা স্বচক্ষে তাঁহার এরূপ আচরণ দেখিয়াছি এবং সাক্ষ্য দিতেছি।"[৪০] বিহারীলাল বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। একেবারে শেষ সময়ের কথা: "যে ঘরে জননীর চিত্র ছিল, সেই ঘরে তিনি শুইয়াছিলেন। জননীর চিত্র ছিল পূর্বদিকে, তাঁহাকে উত্তর শিয়রে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বাক্‌শূন্য, অচেতন। কিন্তু কি এক মন্ত্রপ্রভাবে সেই মুমূর্ষু মাতৃভক্ত মুহূর্তের মধ্যে ঘুরিয়া, পশ্চিম দিকে মাথা লইয়া যান। সম্মুখে পূর্বদিকে তিনি জননীর মূর্তিপানে নিস্পন্দনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।"[৪১]

লৌকিক ভক্তির অলৌকিক রূপান্তর!

বিদ্যাসাগর শেষজীবনে অধ্যাত্মসঙ্গীত শুনতে চাইতেন। তাঁর সঙ্গীতরুচি থেকেও অধ্যাত্মপিপাসার প্রকৃতি বোঝা যায়। তিনি ভালবাসতেন দেহতত্ত্বের গান:

"তিনি একদিন কয়েকজন বন্ধুর সহিত বসিয়া কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে অখিলউদ্দিন নামে এক অন্ধ ও খঞ্জ ফকির একটি গান করিতে করিতে যাইতেছিল। গানের প্রথম চরণ, 'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন।' শুনিবা-মাত্র তিনি তাহাকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তি আসিলে তাহাকে বসাইয়া ওই

গানটি আদ্যোপান্ত পুনঃপুনঃ প্রাণ ভরিয়া শুনিলেন। যতক্ষণ গান শুনিয়াছেন ততক্ষণ অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন। গান শেষ হইলেও অনেকক্ষণ নীরবে সঙ্গীতজাত ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন।”[৪২]

এই ফকির প্রায়ই বিদ্যাসাগরকে গান শোনাতেন। তাঁর কাছ থেকে বিদ্যাসাগর-শ্রুত কয়েকটি গান চণ্ডীচরণ সংগ্রহ করেছিলেন :

“কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন, নিলয় করবে রে কে !
তুমি কোনখানে খাও, কোথায় থাকো রে মন অটল হয়ে—
কোথায় ভুলে রয়েছ !

তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী, আপনি দাঁড়, আপনি মাঝি।
আপনি হও যে চড়নদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি।
আপনি হও যে হাইল বৈঠা।

তুমি আপনি মাতা, আপনি পিতা,
আপনার নামটি রাখবো কোথা,
সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাইচাঁদ বাউলে বলে,
সে নাম ভুলবো না রে প্রাণ গেলে।

তুমি আপনি অসার, আপনি হও সার,
আপনি হও রে নদীর দুধার, আপনি নদীর কিনারা,
আপনি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই,
সে নাম ভুলবো নারে প্রাণ গেলে।

আপনি তারা, আপনি সারা, আপনি জড়, আপনি মরা,
আপনি সে হও নদীর পাড়া, আবার আপনি হও সে শ্মশানকর্তা গো।
আপনি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিম,
আমি ভেবেচিন্তে হলেম ক্ষীণ।”[৪৩]

আর বিদ্যাসাগর ভালবাসতেন মাতৃসঙ্গীত। মাতৃসঙ্গীতেই তাঁর আত্মা সবচেয়ে গভীর সুরে কেঁপে উঠত। তাঁর বৈবাহিক (কনিষ্ঠ কন্যার শ্বশুর) জগদ্দুর্লভ চট্টোপাধ্যায় ভালো গান গাইতে পারতেন। বিদ্যাসাগর প্রায়ই তাঁকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে গান শুনতেন। “অন্য গান শুনিতেন না ; কেবল যে-গানে ‘মা মা’ থাকিত সেই গানই শুনিতেন।”

“কেহ বিদ্যাসাগরের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া প্রায় রিক্তহস্তে ফিরিত না। কেহ যদি ভিক্ষা করিতে গিয়া বলিত—‘আমার মা নাই’—তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইত।…‘মা নাই’ শুনিলে

বিদ্যাসাগর বিচারাচার করিতেন না।…মা-ই তাঁহার জীবনের সাধনমন্ত্র ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গান-বাজনায় বড় শখ ছিল না। তবে কেহ কখনও মা মা বলিয়া গান গাহিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। গায়ককে তিনি যেন কলিজার ভিতর পুরিয়া রাখিতেন। একজন অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক [অখিলউদ্দিন ?—যিনি দেহতত্ত্বের গান শোনাতেন ?] বেহালা বাজাইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাহিত। সে সঙ্গীতে মা মা ধ্বনি থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইয়া প্রায়ই তাহার গান শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেন না।"[৪৪]

কান্নার সাগরে আলোকিত প্রতিমা—মা !

জীবন-রসিক ও পরম-রসিক

॥ ১ ॥

কোনো একটি সময়ের বিদ্যাসাগরকে চিত্রবৎ স্পষ্ট এবং নাটকীয় চরিত্রবৎ প্রাণবন্ত যদি কেউ দেখতে চান, রামকৃষ্ণ কথামৃতের তৃতীয় খণ্ডের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া তাঁর উপায় নেই।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮২-র ৫ অগস্ট তারিখে। সেদিন শনিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী-তিথি। বিকাল চারটা নাগাদ একটি ঠিকা গাড়ি করে মাস্টার (শ্রীম), ভবনাথ ও হাজরা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই এই সাক্ষাৎকার। শ্রীম'র ভারি সহজ স্নিগ্ধ একটু রচনা :

"ঠাকুরের জন্মভূমি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ নামক গ্রামের নিকটবর্তী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থাকিতে-থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন। মাস্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে ? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাস্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরকম পরমহংস ? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন ?' মাস্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞে না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ ; লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতো পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তাপোষ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে ; সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোনো বাহ্যিক চিহ্ন নাই ; তবে ঈশ্বর-বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশি তাঁহারই চিন্তা করেন।"

কথায় ছবি আঁকার অপূর্ব দক্ষতা শ্রীম'র ছিল। সুতরাং তাঁর বর্ণনায় বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িটিকে যেন চাক্ষুষ দেখা যায় :

"গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ-পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিম ধারে সদর-দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ। পশ্চিম দিকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়।

উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্ব দিকে হল-ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে। এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তকে পরিপূর্ণ। দ্যালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে। হল-ঘরের পূর্ব সীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং ; অনেকগুলি চিঠিপত্র ; বাঁধানো হিসাবপত্রের খাতা ; দুচারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট-বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।"

বিদ্যাসাগরের বৃহৎ জীবনকে সুবৃহৎ জীবনীতেও ধরা যাচ্ছে না—আমরা এখন তা দেখতে পাচ্ছি। আর শ্রীম'র ছিল সংক্ষেপে সার কথা বলার ক্ষমতা। বিদ্যাসাগরের পরিচিত চেহারাকে তিনি সহজে স্বচ্ছন্দে ফুটিয়েছেন :

"টেবিলের উপরে যে-পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে—তাহাতে কী লেখা রহিয়াছে ? কোনো বিধবা হয়ত লিখিয়াছে—আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হবে। কেহ লিখিয়াছে, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোয়ারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে। কোনো গরীব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বহি কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না—আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হবে। তাঁর স্কুলের কোনো শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে ; এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ-বা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিশির দিন নির্ধারিত, আপনি সেইদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।…

"বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম, বিদ্যানুরাগ। একদিন মাস্টারের কাছে এই বলতে বলতে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন—'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে, পড়াশোনা করি, কিন্তু কই তা হলো ! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।' দ্বিতীয়, দয়া সর্বজীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেক দিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়িতে চড়িতেন না—ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন

একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়িতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত না হওয়াতে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ, লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবড় ভাতের কাপড় বগলে করে এসে উপস্থিত। পঞ্চম, মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছেন, ঈশ্বর, তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আসো তা হলে আমার ভারি মন খারাপ হবে—তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী; সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহরাত্রেই বীরসিংহায় মা'র কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিলেন—মা, এসেছি।"

এই বিদ্যাসাগর। জীবনকে ভালবেসে, তার আনন্দ বেদনা নিয়েই কাটিয়ে গেছেন। তিনি ইহলোকে এত মগ্ন মুগ্ধ ছিলেন যে, লোকোত্তরের জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন বিশেষ বোধ করেন নি। অন্যদিকে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবনকে তিনিও ভালবেসেছেন—সে জীবন কিন্তু অনন্ত জীবনের অংশমাত্র। ইহলোক পরলোক সবলোকে তাঁর ঠাঁই। বিদ্যাসাগর কিন্তু নিজের তরী ইহলোকের কূলেই বেঁধে রেখেছিলেন।

॥ ২ ॥

মুখোমুখি রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর। তাঁরা কথা বলছেন—শ্রীম দেখালেন। একথা বলা হয়েছে, বসওয়েল ছিলেন বলেই ডঃ জনসন ইংলন্ডের সবচেয়ে বড়ো কথা-বলিয়ে। তার প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি, শ্রীম ছিলেন বলে রামকৃষ্ণ বাংলার সেরা কথা-বলিয়ে। (এখানে অবশ্য স্মরণে রাখব, রামকৃষ্ণের বাক্-পটুত্ব বিষয়ে ব্রাহ্ম-সূত্র-সহ আরও বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে)। আমরা একথা জেনেছি, বিদ্যাসাগর ঘরোয়া আলাপে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাক্-শিল্পের সেরা নমুনা পাই শ্রীম-র রচনাতেই। অদ্বিতীয় বাকপটু ও রসিক রামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে আর একটি অভিজ্ঞতা দিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম বসুকে বিদ্যাসাগর যে বলেছিলেন, যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক একটিও দেখিনি—সে অভাব তাঁর দূর হয়েছিল রামকৃষ্ণকে দেখে—যিনি কেবল সেকালের নন, সর্বকালের ঈশ্বরবিশ্বাসীদের শীর্ষ পর্যায়ের। আমরা দেখতে পাব, উভয়ের সাক্ষাৎকালে জীবন-রসিক স্মিত আনন্দে তাকিয়ে আছেন পরম-রসিকের দিকে। সে ছিল পরম-রসিকেরই দিন। বিদ্যাসাগর প্রায় চুপ করে আছেন, আর তাঁর সামনে অন্য একজন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, এ-জিনিস ভাবাই যায় না, অথচ তাই হয়েছিল। বাংলায় একজন মানুষই সে-কাজ করতে পারতেন—যিনি বিদ্যাসাগরের কাছে কোনোভাবে প্রার্থী ছিলেন না—ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, কোনো কিছুতেই তাঁর প্রয়োজন

ছিল না—যিনি কোথাও গেলে দেবার জন্যই যেতেন। রামকৃষ্ণকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে বিদ্যাসাগর অবশ্যই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন নি, তাঁর পক্ষে তা হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁর বহু অভিজ্ঞতার জীবনে একটি সুগভীর অভিজ্ঞতা যোগ করতে পেরেছিলেন। বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের মধ্যে তখন জীবনের প্রহারে জীবনোত্তরের জন্য ব্যাকুলতা পাক খেয়ে উঠছিল—অখিলউদ্দিনের মুখে গান শুনে, 'যোগী-সদৃশ বন্ধু' কালীকৃষ্ণ মিত্রের সঙ্গে নির্জনবাস করে, যার স্পর্শ পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন—সেই তাঁর প্রয়োজন ও প্রাপ্য ছিল পরম সত্যের উদ্ভাসন প্রত্যক্ষ করা, তাঁর মতো এত বড় প্রেম শুদ্ধ বস্তু-মানুষে আবদ্ধ থাকবে, এমন হতে পারে না—রামকৃষ্ণ সেই অনন্তের ছবি তাঁর সামনে খুলে ধরেছিলেন। অনন্তের একটি গবাক্ষের নাম রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর কোন্ পরিবেশে মুখোমুখি হয়েছিলেন, দেখে নেওয়া যাক:

"সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটি (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের কামরাটিতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তর পার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা পালিশ-করা টেবিল। টেবিলের পূর্বধারে একখানি পেছন দিকে হেলান-দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ও পশ্চিম পার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু'একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

"ঠাকুর প্রবেশ করিলে-পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্ব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বাম-হস্ত টেবিলের উপর, পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্ব-পরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।"

রামকৃষ্ণ কী দেখেছিলেন, অল্প পরে সে-কথায় আসছি। তার আগে, রামকৃষ্ণের পিছনে দাঁড়িয়ে শ্রীম বিদ্যাসাগরকে সেই সময়ে কী রকম দেখেছিলেন, তা নজর করা যেতে পারে:

"বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২-৬৩ ; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬-১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা, গায়ে একটি হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মতন কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়—দাঁতগুলি সব বাঁধানো। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট, ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ—তাই গলায় উপবীত।"

বিদ্যাসাগরের সম্মুখীন হয়েই রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। "ভাব সংবরণের জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাবো। দেখিতে দেখিতে বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন।...বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন, ও মাস্টারকে [শ্রীমকে] জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কিছু

খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি? তিনি বলিলেন, আজ্ঞা, আনুন না। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, ওগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল। হাজরা ও ভবনাথও পাইলেন। মাস্টারকে দিতে আসিলে-পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্ছে না। [বেচারা ঘরের ছেলে!] …মিষ্টি-মুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক ঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।"

এর পরেই রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সেই সংলাপ—যা সাহিত্যের সম্পদ। এমন সহজ, স্বাভাবিক, সকৌতুক, সুগভীর ও সার্থক বাক্যালাপ সহজে দেখা যায় না। উভয়েই সমান আনন্দে, তীক্ষ্ণতায় এবং যোগ্যতায় বাক্য-বিনিময় করেছেন। অথচ এই দুজনের কেউই প্ল্যাটফর্ম-বক্তা ছিলেন না। রামকৃষ্ণের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, বিদ্যাসাগর তা হতে পারতেন, কিন্তু হন নি। দুজনেই ঈষৎ তোতলা ছিলেন।

উভয়ের সংলাপ-সূচনা এই :

রামকৃষ্ণ : আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেছি ; এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) : তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

রামকৃষ্ণ : না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও। তুমি যে বিদ্যার সাগর। (সকলের হাস্য)। তুমি ক্ষীরসমুদ্র।

বিদ্যাসাগর : তা বলতে পারেন বটে।*

---

* বিহারীলাল এক্ষেত্রে কিছু ভিন্ন সংলাপ দিয়েছেন :

"পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ করিয়া বলেন—'আজি সাগরে আসিয়াছি, কিছু রত্ন সংগ্রহ করিয়া যাইব।' ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলেন, 'এ সাগরে কেবল শামুকই পাইবেন।' ইহাতে পরমহংসদেব পরম পুলকিত চিত্তে বলেন, 'এমন না হইলে সাগরকে দেখিতে আসিব কেন'?"

বিহারীলাল মনে হয় অনেক হাতফিরি-হওয়া সংবাদ পেয়েছিলেন। সেই তুলনায় চণ্ডীচরণের বিবরণ অনেকটা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম-র বিবরণের কাছাকাছি। চণ্ডীচরণ লিখেছেন :

"পরমহংস আসিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি পরমহংস বিদ্যাসাগর-সমীপে গৃহতলে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'খানা ডোবা খাল বিল পার হইয়া এইবার সাগরে আসিয়া পড়িলাম।' প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'এসে পড়েছেন, আর তো উপায় নাই, দু'এক ঘটি নোনা জল তুলিয়া লইয়া যান। এ-সাগরে নোনা জল ভিন্ন আর কিছুই পাইবেন না।' পরমহংস বলিলেন, 'সাগর তো কেবল লবণের নহে, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্র, মধুসমুদ্র প্রভৃতি আরও তো অনেক সমুদ্র আছে। আপনি তো আর অবিদ্যার সাগর নন, আপনি বিদ্যার সাগর। আপনাতে রত্নলাভই হইয়া থাকে, নোনা জল কেন তুলিব'?" (চণ্ডীচরণ, ৪৬৮)।

চণ্ডীচরণ এই বিবরণ রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলেন। [পরপৃষ্ঠায়]

বিদ্যাসাগর যতই রসে-রহস্যে থাকুন, মিথ্যা বিনয়ে সমর্থ ছিলেন না। তাঁর শেষ কথাগুলি তা দেখিয়ে দেয়। রামকৃষ্ণের পক্ষেও মিথ্যা প্রশংসা করা সম্ভব ছিল না। তাঁর ছিল দেহভেদী, মর্মভেদী দৃষ্টি। সেই সত্যদৃষ্টিতে চালিত তিনি, যে-কোনো মানুষের মুখের উপরে স্বচ্ছন্দে এমন-সব কথা বলে দিতে পারতেন, যার চেহারা দেখে এখন চমকে উঠতে হয়। রামকৃষ্ণের প্রথম পর্যায়ের জীবনীগুলিতে এবং কথামৃতে বাংলাদেশের বিখ্যাত কিছু মানুষের বিষয়ে মারাত্মক কিছু উক্তি আছে, যার জন্য ওইসব মানুষের আত্মীয় বা ভক্তরা ক্ষমা করতে পারেন নি। এই রামকৃষ্ণই, অধ্যাত্মচরিত্রের মানুষদের বাদ দিলে, (যাঁদের অধিকাংশই আবার তাঁর কিশোর বা সদ্য-যুবক শিষ্য), বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। অথচ বিদ্যাসাগর ঈশ্বর-বিষয়ে উৎকণ্ঠিত ছিলেন না, আর রামকৃষ্ণ ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানতেন না। সাধারণ সমাজসেবামূলক কাজকর্ম, যার পিছনে কেবল পুঁথি-গত কর্তব্যবুদ্ধি, ততোধিক লোকমান্যের ইচ্ছা—সে সকলকে তুচ্ছ করতে

সাক্ষাৎকারের মাসখানেকের মধ্যে, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ তারিখে, কেশবচন্দ্র সেনের পত্রিকা 'দি নিউ ডিসপেনসেসন'-এ নিম্নের সংবাদ বেরোয় :

Two Great Minds—The venerable Paramhansa lately paid a visit to the eminent philanthropist and scholar, Vidyasagar. Why did he call? What earthly or unearthly advantage did that recluse expect from such a visit? The Paramhansa has a passion for great minds. His curiosity to see distinguished men is most ardent. He is ever asking his friends to show him great things, and in this he is at times most importunate. Now he is off to see a lion. Now his heart is bent on witnessing steam force as it propels a steam launch up the river. He is impatient to have a look at a cathedral with its prayerful thousands. And as among beasts and things inanimate he would honor the great, so also among the human species. Curiosity alone, deep and impulsive, led the devotee of Dakhineswar to Vidyasagar's house in Calcutta. No prospect of earthly good actuated him.

Eminent sage, said the devotee, I come as a little muddy stream into the vast deep sea ('sagar').

Yes, replied Vidyasagar, but you must remember, venerated sire, that the sea is full of salt water, and if a fresh water stream mixes with it, it too becomes salt, and loses all its sweetness.

It is not *avidya* sagar, which indeed is to be shunnned, but *vidya* sagar that draws me into its welcome waters ;—was the rejoinder.

But the sea hath its dangers and perils, said Vidyasagar, and thousands of monsters hide themselves in its treacherous waters.

Are there not pearls in the deep water of the sea? In search of those pearls I am here. The sea is famous for its hidden treasures. Great is your value, Vidyasagar. So said Paramhansa.

('শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : সমসাময়িক দৃষ্টিতে'। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১)।

রামকৃষ্ণের বাধত না। সেকালের বিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য স্মরণ করা যায় : "কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলুম রজোগুণ। তবে হিন্দু, জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, জগতের উপকার করব। আমি বললুম, হাঁ গা, তুমি কে? আর কী উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা যে, তুমি উপকার করবে?"

একই প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্র মল্লিককে তিনি যা বলেছিলেন, সে কথাগুলি তাঁর এতই মনের কথা যে, বারবার বলতেন :

> "শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বললুম, সম্মুখে যেটা পড়ল, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশি কাজ জড়ানো ভালো নয়—ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগল, কালীদর্শন আর হলো না। (হাস্য)। আগে যো-সো করে, ধাক্কা-ধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তারপর দান যত করো আর না করো। ইচ্ছা হয়, খুব করো। ঈশ্বরলাভের জন্যই কর্ম। শম্ভুকে তাই বললুম, ঈশ্বর যদি সাক্ষাৎ হন, তাঁকে কি বলবে, কতকগুলো হাসপাতাল, ডিসপেনসারি করে দাও! (হাস্য)।"

কর্মযোগী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে কথা বলতে শুরু করেছিলেন :

শ্রীরামকৃষ্ণ : তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে-কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে, কিন্তু এ রজোগুণ সত্ত্বের রজোগুণ—এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বরবিষয় শিক্ষা দেবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছ। এও ভালো। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য—তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।

বিদ্যাসাগর : মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়। তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া। (হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) : কলাইবাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ : তুমি তা নও গো। শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা-পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে।

এর পরে দীর্ঘ সময় ধরে উভয়ের মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ হয়। না, কথাটা পুরো ঠিক নয়—রামকৃষ্ণই ধর্মপ্রসঙ্গে নানা কথা বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর মোটামুটি চুপ করে শুনেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সামনে রামকৃষ্ণকে খুবই উদ্দীপ্ত দেখা গিয়েছিল। সকলে "অবাক ও নিস্তব্ধ" হয়ে তাঁর কথা শুনেছিলেন। শ্রীম-র মনে হয়েছিল, "সাক্ষাৎ বাগ্‌বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ।" এই কালে বিদ্যাসাগর নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলেন, তত্ত্ব বোঝাতে সুরসিক বাক্‌নিপুণ রামকৃষ্ণ কিভাবে বৃষ্টিধারার মতো অনর্গল উপমা ও কাহিনীর রাশি বর্ষণ করে যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগরের ভিতরকার রসিক সাহিত্যিক মানুষটি তাতে তৃপ্ত হয়েছিল, আর চিরপ্রশ্নে উৎকণ্ঠিত তাঁর অন্তর্গত মানুষটি জেনেছিল—এখনো এমন মানুষ আছেন যিনি কথা বললে অনুভব করা যায়, সে সকলই অন্তরের আলোকের ধ্বনি-কিরণ। বিদ্যাসাগর অবশ্যই জেনেছিলেন—সত্যকার ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ আছেন—সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মপ্রতিভার একটি বিস্ময়কর প্রমাণ এখানে পাব। সংবাদ-সূত্রে বা অন্তর্দৃষ্টিতে, যেভাবেই হোক, তিনি বিদ্যাসাগরের ধর্মবিষয়ক মোট ধারণার প্রকৃতি জেনেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মন এক্ষেত্রে কোথায় বেধে যায়, তাও বুঝেছিলেন। তারপর রামকৃষ্ণের আত্মার উৎস থেকে যে-বাণীধারা উৎসারিত হয়েছিল, তাতে বিদ্যাসাগরের ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর ছিল। শ্রীম-র কাছ থেকে রামকৃষ্ণ জেনেছিলেন :

"ধর্মবিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাস্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে ? তিনি বলিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই।...মাস্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, তাঁকে তো জানবার যো নাই। এখন কর্তব্য কি ? আমার মতে কর্তব্য—আমাদের নিজেদের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"

দর্শন সীমাবদ্ধ এবং ঈশ্বর অজ্ঞেয়—বিদ্যাসাগরের মনোভাব এই। আগেই জেনেছি, জগতে মঙ্গল অমঙ্গলের সমস্যা, ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপ সম্বন্ধে সংশয়—বিদ্যাসাগরের মনকে আলোড়িত করত। রামকৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছিলেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়—এই ধারণা থেকেই গণ্ডগোলের শুরু। বিদ্যাসাগর যে-বেদান্তকে যৌবনে ভ্রান্তদর্শন বলেছিলেন—তাকেই জীবন্ত সত্য রূপে রামকৃষ্ণ উপস্থিত করলেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ : ব্রহ্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যার পার, তিনি মায়াতীত। এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে। জ্ঞান ভক্তি আছে, আবার কামিনী কাঞ্চনও আছে। ভালোও আছে, আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভালো মন্দ জীবের পক্ষে ; সৎ অসৎ জীবের পক্ষে।

তাঁর ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ-বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ-বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।

"যদি বলো, দুঃখ পাপ অশান্তি, এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও-সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়; সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

"ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে, তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কী, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।"

শেষের কথাগুলি শুনে বিদ্যাসাগর খুশি হয়ে বলেছিলেন, "বা, এটি তো বেশ কথা। আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।"

ব্রহ্ম প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা রামকৃষ্ণ বলেছিলেন। অপূর্ব উপমার পর উপমার ভাষায় অনির্বচনীয়কে স্পর্শ করার সে চেষ্টা।

রামকৃষ্ণ আর একটি জিনিস স্পষ্ট করে তুলেছিলেন—ধর্ম মানে শাস্ত্রচর্চা নয়, তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, তাই সাধনসাপেক্ষ। জ্ঞানপথ কঠিন—ভক্তিপথই সাধারণের পক্ষে শ্রেয়। বিশ্বাসের শক্তির কথাও বলেন। এসেছিল ভালবাসার কথা। "পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ, কিছুই নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তাহলে এসব কর্মের বেশি দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়।"

কথাবার্তার মাঝামাঝি সময় থেকে শেষ অবধি, ঘুরে ফিরে মাতৃতত্ত্ব এসেছিল। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরের মনের তারে শিহরণ আনার মতো অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন। গাঢ় ভাবে বলেন, "বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে, তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি।"

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি। অগ্নি বললেই দাহিকাশক্তি বুঝা যায়; দাহিকাশক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়।"

কিন্তু তত্ত্বে তো প্রাণ সাড়া দেয় না। সাড়া-জাগানো কথাগুলি এই:

"তাঁকেই মা বলে ডাকা হচ্ছে। মা বড় ভালবাসার জিনিস। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

বিদ্যাসাগরের সামনে রামকৃষ্ণ চারটি গান গেয়েছিলেন; সচেতন নির্বাচন কিংবা অসচেতন উৎসারণ, যাই হোক, গান চারটিই মাতৃসঙ্গীত। তার মধ্যে দুটি গানে ছিল উদ্দীপ্ত বীর্যময় ভাবাকুলতা—"আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি/আখেরে এদীনে না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী;"

এবং "ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, / যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। / কালীপদ সুধা-হ্রদে চিত্ত যদি রয় / তবে পূজা হোম যাগ-যজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়।" বাকি দুটি রামপ্রসাদী গানে বিদ্যাসাগরের প্রিয় দেহতত্ত্বের রহস্য-স্পর্শ: "কে জানে কালী কেমন ;" —আরও অধিকভাবে—"মন কি তত্ত্ব করো তাঁরে / যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে / সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত / অভাবে কি ধরতে পারে। / ···সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।"

জ্ঞান ভক্তি এবং যোগ—সব কিছুই যেখানে পৌঁছে দেয়, তারই একটি বাইরের ছবি বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন :

"গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ। দেহ উন্নত ও স্থির। নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।"

কর্মযোগী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে স্বীকৃতি ও সতর্কবাণী দুইই উচ্চারণ করেছেন রামকৃষ্ণ :

"তুমি যেসব কর্ম করছ, এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা', এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভালো। এইরূপ নিষ্কাম করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়।"

রামকৃষ্ণের কণ্ঠে হাসি—তবে নিয়তির হাসি—

"ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 'মা, ভয় কি, আমি তোমার ছেলেকে ভালো করে দিব।' তখন একবার হাসেন। এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে আমি বাঁচাবো!··· তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, 'এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন। এই মনে করে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, এ জায়গা 'আমার', আর 'তোমার'।"

বহির্জীবনের কোলাহলেই যেন মানুষ নিজেকে আটকে না রাখে, যেন সে অন্তর্জীবনের বিরামের সত্যকে স্বীকার করে। বিরামের প্রস্থানের পরে আবার প্রত্যাবর্তনও আছে :

"যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোনো শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্‌কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়।

তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্‌ভন্‌ করে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুন্‌গুন্‌ করে।

"পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ভক্‌ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়। (হাস্য)।"

নিজের পথে তিনি বিদ্যাসাগরকে ডাক দিয়েছিলেন :

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থর বউ-র ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে, ওটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া। আর সংসারের কাজ শাশুড়ি করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

"আরও এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল। ব্রহ্মচারী বললে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে, চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা মানিক। এইসব লয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল।"

ওইসব নিয়ে 'আণ্ডিল' হবার অভিপ্রায় বিদ্যাসাগরের ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা, তোমার কি ভাব?" তখন বিদ্যাসাগর কথাটা এড়িয়ে যাবার ইচ্ছায় বলেন, "সেকথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব।" দুজনেই এসব কথা হাসিভরা গলায় বলেছিলেন। তারপর বিদ্যাসাগর-ভবনে রামকৃষ্ণের ৫ ঘণ্টা অবস্থানের পরে বিদায়কালে আবার উভয়ের সরস বাক্যবিনিময় :

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে): এ যা বললুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে—বরুণরাজার খপর নাই।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে): তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে): হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না, চাকর-বাকরের নাম, (সকলের হাস্য), বা বাড়ির কোথায় কি জিনিস আছে।

কথাবার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে): একবার বাগান দেখতে যাবেন। রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর : যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না!

শ্রীরামকৃষ্ণ : আমার কাছে? ছি ছি!

বিদ্যাসাগর : সে কি! এমন কথা বললেন! আমার বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : আমরা জেলেডিঙি। (সকলের হাস্য)। খাল বিল, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ। কি জানি, যেতে গিয়ে পাছে চড়ায় লেগে যায়। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন। চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : তার মধ্যে এ-সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) : হাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে। (সকলের হাস্য)।

শেষ ছবি এই :

"ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজন-সঙ্গে আগে-আগে যাইতেছেন—হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে-আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী। এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।"

রস-রহস্যের ঢেউ ক্রমেই নেমে গেল মহারহস্যের অতলে।

মানুষটি কেমন

॥ ১ ॥

তাঁকে কিভাবে জানতে চাই

বিদ্যাসাগর মানুষটি কেমন—তার উত্তর একালের বাঙালী শুনে এসেছেন বাল্যকাল থেকে। মানুষটি ভালো, দারুণ ভালো, এমন ভালো যে, বাংলার তাবৎ বড়ো মানুষ বিদ্যাসাগরের গুণগান করেছেন।

তবু মানুষটি কেমন ?

দয়া মায়া প্রেম বীর্য ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণের অফুরন্ত সরবরাহকারী-রূপে কীর্তিত মহাপুরুষের কথা বলছি না, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে এক যে-মানুষটি—তিনি কেমন ? অসাধারণ বিদ্যাসাগরের মধ্যে সেই সাধারণ মানুষের কতখানি সংবাদ আমরা রাখি ? আমাদের দেশে কোনো মানুষ অসাধারণ হন নিজের ভিতরকার সাধারণকে একেবারে মেরে ফেলে। সে-জিনিস না-হয় ধর্মবেত্তাদের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায়, কারণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সর্বাত্মক সংগ্রাম। কিন্তু বিদ্যাসাগর তো ধর্মবেত্তা ছিলেন না, মানুষের স্বাভাবিক দেহধর্মের অধিকারের পক্ষে লড়াই করেই তো তিনি বিখ্যাত—তিনিই তো চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর কি পাষাণময় হইয়া যায় ?···দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে বিসর্জন হইয়া যায় ?"[১]

স্বামী বিবেকানন্দের মহান জীবনীকার লুইস বার্ক আমেরিক সংবাদপত্র থেকে স্বামীজীর চেহারা, কণ্ঠস্বর, চলাফেরা, হাবভাব, ইত্যাদির বিবরণ সংকলন করার পরে, অধিকতর বিবরণের জন্য উৎসুক হয়ে, ভারতীয় রচনাদি সন্ধান করেছিলেন। খুব সামান্য সংবাদ মিলেছিল। হতাশ হয়ে তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—যে-বলিষ্ঠ আদর্শবাদ মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে বস্তুগতভাবে মানুষকে আগ্রহী করে (যা নাকি প্রাচীন ভারতবাসীর মধ্যে বিপুল পরিমাণে ছিল), তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘদিনের পরাধীনতার জন্য।[২] বিদ্যাসাগরের জীবনীগুলি পড়বার পরে একই হতাশা আমাদের জাগে।

ধরা যাক, একটা প্রশ্ন, যা বাল্যকালে মনে প্রায়ই উঠত। সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়ার পরে, কী খাবেন, এই বক্র প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে বলেন, আলু পটল বেচে খাব—অথচ সত্যই তো আলুপটল বেচেন নি, তাহলে খেতেন কি করে, অত টাকা দানই বা করতেন কি করে ? কী উপায়ে তিনি টাকা রোজগার করতেন, তা অল্পস্বল্প তাঁর জীবনীগুলিতে নেই তা নয়, কিন্তু এমন গুরুত্বহীন ভাবে তা বলা হয়েছে যে, মনে দাগ কাটেনি। বিনয় ঘোষই পরবর্তীকালে তাঁর

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' বইয়ে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা, এবং প্রকাশন সংস্থার (ছাপাখানার মালিকানাসহ) সফল ব্যবসায়ী। ওই সূত্রে তিনি হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, বিদ্যাসাগর প্রেসের কাজ খুব ভালো জানতেন, নিজের লেখার প্রুফ নিজেই দেখতেন।[৩] অর্থাৎ বই লিখলেই শুধু হয় না, তা ছাপার দিকে নজর দিতে হয়, পারলে বিক্রির ব্যবস্থাও। বিদ্যাসাগর বই লিখে ও বইয়ের ব্যবসা করেই বড়লোক। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্রের দৌহিত্র) হিসাবমতো, মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগরের বার্ষিক আয় তিরিশ হাজার টাকা।[৪]

এই অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের আকার ও আচারের তথ্যগুলি সংকলন করবার চেষ্টা করব। বলাবাহুল্য, আমি কোনো অজ্ঞাতপূর্ব উপাদানে সহসা ধনী হই নি। পরিচিত জীবনী ও স্মৃতিকথাগুলিই আমার সম্বল। পাঠক দেখবেন, কেবল বিক্ষিপ্ত সংবাদগুলি একত্র করে দেওয়াতেই বিদ্যাসাগরের বাস্তব চেহারাটি কি রকম পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

॥ ২ ॥

তাঁর চেহারা

গোড়াতেই চেহারা। শরীরমাদ্যম্। কোনো সন্দেহ নেই যে, বিদ্যাসাগর সুপুরুষ ছিলেন না। বিবেকানন্দের বুদ্ধ-আকার, বা যৌবনে রবীন্দ্রনাথের খ্রীস্ট-আকার, ও পরিণত বয়সে ঋষি-আকারের কথা বাদ দিচ্ছি, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারা বিরল, কিন্তু রামমোহনের তেজস্বিতা, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাদীপ্তি—তাও বিদ্যাসাগরের মুখের চেহারায় ছিল না। বিদ্যাসাগরের 'জনপ্রিয়' ছবিগুলিতে এক নীরস কঠোর বৃদ্ধকে দেখি, মস্ত কপাল, প্রায় জুড়ে-যাওয়া দুই ভুরু নীচে গভীর অক্ষিকোটর, তীব্র চোখ, ভাঙা গাল, রূঢ় ঠোঁটের রেখা। এই চেহারা সম্বন্ধে আমার বিরূপ বাল্য-প্রতিক্রিয়ার কথা গোড়াতেই বলেছি। বিদ্যাসাগরের বুকের ভিতরের রূপ কুসুমাদপি কোমল, কিন্তু বাইরের মুখের চেহারায় তা ছিল না।

বিদ্যাসাগরের আকার সম্বন্ধে আমার (এবং অনেকের) প্রচলিত ধারণা প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল কয়েক দশক আগে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত একটি 'দুষ্প্রাপ্য' ছবি দেখে। বিদ্যাসাগরের তরুণ বয়সের ছবি। কী অপূর্ব! লাবণ্যের সঙ্গে মর্যাদার এমন সমন্বয় কদাচিৎ দেখা যায়। নিটোল মুখে আনন্দময় প্রশান্তি, আর নিগূঢ় একটু হাসি। উন্মুক্ত চোখে অন্তর্মুখ গভীরতা। সবচেয়ে চোখে পড়ে আন্তরিক শুচিতার আলোক। এক কথায়, সংযমে সদাচারে নির্মিত একটি ব্রাহ্মণশরীর, যাঁর সাধনার কঠোরতা গ্রাস করতে

পারে নি অন্তরের সহজ সৌন্দর্যকে। চেহারার এই প্রসন্ন পবিত্রতার রূপ দেখেছি সুভাষচন্দ্রের একটি ছবিতেও—মেয়র সুভাষচন্দ্রের গায়ে শাল-জড়ানো সেই ছবি—শরৎ আলোর প্রভাতকোমল নির্মলতা তাতে। পবিত্রতার দ্যুতি বিবেকানন্দের নানা ছবিতেও আছে, আশ্চর্য আকারেই আছে, কিন্তু তিনি এমনই জ্বলন্ত যে, সে অগ্নিদ্যুতির সামনে পবিত্রতাও সামান্য কথা।

বিদ্যাসাগরের এই যে-ছবিটির কথা বলছি, এখন যেটি সর্বত্রই দেখা যায়—সে ছবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, তিনি যৌবনে বড় সুন্দর ছিলেন। যৌবনে তিনি যে সুন্দর ছিলেন, সেকথা চণ্ডীচরণের লেখাতেও পাই। বেশ কয়েকবার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তিনি আলোচ্য ছবিটির উল্লেখ করেছেন :

"১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ও তৎপরবর্তীকালের বিদ্যাসাগরমূর্তি এত সুন্দর, এতই চিত্তমুগ্ধকর যে, কি ইংরাজ, কি বাঙালী, যিনি দেখিতেন তিনিই আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেন না। তাঁহার কোমলতাময় বীরত্বব্যঞ্জক সে মুখমণ্ডলে প্রতিভার পরাক্রম পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার সে মধুর লাবণ্যভরা মূর্তি সন্দর্শনে একদিকে যেমন হার্ডিঞ্জ, ডালহৌসি, ক্যানিং ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরাজমণ্ডলী সম্মানসহকারে নত হইতেন, অপরদিকে আবার দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বঙ্গীয় লক্ষপতি জমিদারগণ তাঁহার আত্মীয়তা ও স্নেহদৃষ্টির অনুগত হইয়া চলিতে সুখানুভব করিতেন।"[৫]

বিদ্যাসাগরের যৌবনের সৌন্দর্যমূর্তিদর্শনে আত্মহারা চণ্ডীচরণের সোচ্ছ্বাস উক্তিকে ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়েই নিতে হবে, কারণ ওই চেহারার রূপে মজে গিয়ে দেশী বিদেশী লোকেরা তাঁর ভজনা করেছিলেন—একথায় বিদ্যাসাগরের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তাঁর প্রেমে যাঁরা পড়েছিলেন, তাঁরা সেকাজ করেন রূপবিচারি নয়, গুণবিচারি। তবু কথাটা থেকে যায়—বিদ্যাসাগর ওইকালে লাবণ্যময়। সে বিষয়ে একটি কাহিনীও চণ্ডীচরণ হাজির করেছেন। বিদ্যাসাগরের আলোচ্য ছবিটি ফটো নয়—আঁকা। এঁকেছিলেন হডসন নামে এক ইংরাজ চিত্রকর। তিনি পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে কাজে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন। পাইকপাড়ার রাজারা বিদ্যাসাগরকে "গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি" করতেন—রাজবাড়িতে বিদ্যাসাগরের নিয়মিত যাতায়াতও ছিল। তাঁকে দেখে হডসন-সাহেব মুগ্ধ হয়ে যান, এবং "তাঁহার সে সময় প্রতিভায় উদ্ভাসিত মুখের প্রতিকৃতি লইবার জন্য হডসন-সাহেব বড়ই সাধ্যসাধনা করেন। তিনি প্রথমত সম্মত হন নাই। পরিশেষে সাহেবের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া সম্মত হন।" ছবির জন্য সাহেব কিন্তু কিছুতে টাকা নিতে রাজি হন নি—বিদ্যাসাগর অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ছবিটি এত সুন্দর হয়েছিল যে, পাইকপাড়ার রাজারা চিত্রকরের কাছে সদুঃখে বলেন, "আমরা এত অর্থব্যয় করলুম, আর আপনি বিনা ব্যয়ে কিনা পণ্ডিত মহাশয়কে আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছবি করে দিলেন!" সাহেবের উত্তর: "টাকার কাজে এবং শখের কাজে অনেক তফাত।"[৬] নিজের ছবির জন্য টাকা দিতে না পেরে বিদ্যাসাগর চিত্রকরকে দিয়ে অধিক অর্থব্যয়ে পিতা ও মাতার ছবি আঁকিয়ে নেন। সেই ছবি

দুটি বিদ্যাসাগরের জীবনীতে দেখা যায়।

বিদ্যাসাগরের পরবর্তী সময়ের ছবিতে মুখের চেহারার বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছিল। কারণ তিনি জীবনের আগুনে ঝলসে গিয়েছিলেন। চণ্ডীচরণ লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যৌবনে প্রস্ফুটিত লাবণ্যলীলায় তরঙ্গায়িত মুখকমলের চিত্র দর্শনে—বার্ধক্যের চিত্রে গভীর বিষাদের ঘন রেখাপাত দেখিয়া অনেকে ক্ষুণ্ণমনে, দীর্ঘনিঃশ্বাসভরে, কাতর স্বরে, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মহাশয়, এমন অতুল প্রতিভা ও কমনীয়তার কুসুমকান্তিপূর্ণ সৌম্যমূর্তি কালিমায় পরিণত হইল কেন? ঐ উপরোক্ত পত্রখানিই [বিদ্যাসাগর যাতে নিজের বহু মনঃকষ্টের কথা লিখেছিলেন] কি তাহার সদুত্তর দিতেছে না?"[৭]

চণ্ডীচরণ যৌবনের বিদ্যাসাগরকে দেখার সুযোগ পান নি, বার্ধক্যের বিদ্যাসাগরকেই দেখেছেন। তাহলে বিদ্যাসাগরের পূর্বোক্ত ১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময়ের যৌবনসৌন্দর্যের বিষয়ে তাঁর ধারণা কি কেবল উল্লিখিত অঙ্কিত চিত্রনির্ভর, নাকি তিনি বিদ্যাসাগরের যৌবনবন্ধুদের বা অবহিত ব্যক্তিদের কাছে সংবাদ নিয়েছিলেন? অন্য কোনো সূত্র থেকে আমরা কিন্তু বিদ্যাসাগরের আকারগত সৌন্দর্যের কথা পাই না। চিত্রকর কি তাহলে বিদ্যাসাগরের অন্তরের সৌন্দর্য তাঁর মুখে প্রতিফলিত করে ছবিটিকে আদর্শায়িত করেছিলেন?

এমন সন্দেহের কারণ আছে। এর দশ কি বার বছর পরের আর একটি ছবি বিদ্যাসাগরের রয়েছে। সে ছবিতে বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, পুরন্ত ভারি মুখ, তাতে নৈরাশ্য বা বেদনার কোনো রেখা নেই। সেখানে কিন্তু সুন্দর মুখের মানুষকে পাই না—পাই প্রবল প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী রুদ্রচণ্ড পুরুষকে। ছবিটির বিশেষ লক্ষণীয় চোখ দুটি—কোমলতা তাতে নেই, তীব্র দৃষ্টি, মর্মভেদী। এক শক্তিশালী, দর্পিত, আত্মবিশ্বাসী মানুষ—বঙ্গদেশকে দু'হাতে ধরে নাড়া দিয়েছিলেন যিনি, সেই মানুষ। পূর্বে আলোচিত ছবিটির মতো এটিও বিদ্যাসাগরকে প্রকাশ করছে। প্রথমটিতে আগুনের আলো, দ্বিতীয়টিতে দাহ।

দ্বিতীয় ছবিটিও আঁকা।

বই-হাতে চেয়ারে-বসা বিদ্যাসাগরের একটি ছবি আছে, খুবই অসন্তোষজনক, মনে হয় ফটো। এর একমাত্র গুণ এখানে বিদ্যাসাগর আপাদমস্তক বর্তমান। আর মুখে অল্প হাসির আভাস।

আমার বিশেষ প্রিয় বিদ্যাসাগরের একটি তৈলচিত্র—একেবারে বৃদ্ধ, গালের মাংস শিথিল, পাতলা ঠোঁটের রেখায় স্মিত হাসি, আর অপরূপ করুণ গভীর দুটি চোখ, সমস্ত পৃথিবীর দৌরাত্ম্যের উপরে বিকিরিত স্নেহ যে-চোখের চাহনিতে। এ সৌন্দর্য ভাবের—অভিজ্ঞতার ধুতুরা ফুলের মর্মমধু পান করে আনন্দিত বৃদ্ধ শিবের সৌন্দর্য। বৃদ্ধ না হলে মানুষ সুন্দর হয় না—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন। সত্যই তাই।

বিদ্যাসাগরের আর একটি চমৎকার ফটো কার্যত 'আবিষ্কার' করেছি

রামকৃষ্ণ কথামৃতের পুরনো সংস্করণ থেকে। বৃদ্ধের ছবি, বাঁকা ঠোঁটে চাপা একটু হাসি।

আমরা লক্ষ্য করি, বিদ্যাসাগরের দুটি আঁকা ছবি ও দুটি ফটোতে, মুখে মৃদু হাসির রেখা। চিত্রকর ও ফটোগ্রাফারের সামনে বসে বিদ্যাসাগর জীবনের এই আর একটা মজা দেখে না হেসে পারেন নি।

বিদ্যাসাগরের অন্য দু' একটি ছবিও আছে—তার মধ্যে শ্মশানে তাঁর মৃতদেহের ছবিও পাই।

বিদ্যাসাগরের ছবিগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় একটি ছাড়া অন্য কোনো ছবিতে তিনি সুদর্শন নন—আর সে ছবিটিও আঁকা বলে তার সাক্ষ্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কেবল মুখগঠনের ক্ষেত্রে নয়, শারীরিক সৌন্দর্যের বাকি শর্তগুলিও তিনি পূরণ করতে পারেন নি। চণ্ডীচরণ জানিয়েছেন, তাঁর রঙ ফর্সা ছিল না। নবীন সেন কুণ্ঠা না রেখে বলেছেন, বিদ্যাসাগর কৃষ্ণবর্ণ। তদুপরি তিনি বেঁটে—এবং মাথা বিশেষ রকম বড়। বিহারীলাল সরকারের লেখা উদ্ধৃত করা যাক:

"ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে বাঁটুল ছিলেন। ছাতা মাথায় দিয়া যাইলে মনে হইত যেন একটি ছাতা যাইতেছে। তাঁহার মাথাটা দেহের অনুপাতে একটু বড় ছিল। এইজন্য বালকেরা তাঁহাকে 'যশুরে কৈ' বলিয়া খেপাইত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র সমবয়স্কদের বিদ্রূপোক্তিতে বড় বিরক্ত হইতেন। অনেক সময় তিনি রাগে রক্তমুখ হইয়া উঠিতেন।...ক্রমে 'যশুরে কৈ' নামটি 'কসুরে যৈ' শব্দে পরিণত হইয়াছিল।"[৮]

বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা ও জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'যশুরে কৈ' ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। "যশোহর জেলার কৈ মাছ আট-দশদিন নৌকায় আসিয়া কলিকাতায় গামলায় কিছুদিন থাকিত। এজন্য ওই মাছের মাথা মোটা এবং অপর অংশ সরু হইত।"[৯]

কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাসাগরের চেহারা সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য: "প্রথম বয়সে বিদ্যাসাগরের দেহটি বেশ মজবুত ছিল। আকার খর্ব বটে কিন্তু এদিকে বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা, যাহাকে সংস্কৃতে 'অবষ্টব্ধ' বলে, সেই গোছের ছিল।"[১০]

কৃষ্ণকমল এই গাঁট্টাগোঁট্টা মানুষটির একটি আদরের উপনামের সন্ধান দিয়েছেন—'ঢিপ্‌লে।' বিদ্যাসাগর কোনো শাস্ত্রের, বিশেষত স্মৃতিশাস্ত্রের, সমস্যার ভালোরূপ মীমাংসা করে দিতে পারলে, সংস্কৃত কলেজের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররা আদর করে বলতেন, "আমাদের ঢিপ্‌লে না হলে এমন আর কে করে দিতে পারে?"[১১]

শিবনাথ শাস্ত্রী যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, বিদ্যাসাগর তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। বিদ্যাসাগর তদুপরি শিবনাথের পিতৃবন্ধু। শিবনাথ লিখেছেন: "আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তাঁহার কাজ ছিল আমাকে খুঁজিয়া বাহির করা। তারপর তিনি আদর করিয়া আমার গালে দুই-একটা

ঢোকা মারিয়া সোৎসাহে আমার পেটে দুই আঙুল দিয়া খোঁচা মারিয়া বসিতেন। সে বয়সে আমি আবার কিছুটা পেটমোটা ছিলাম।"[১২]

শিবনাথের স্ফীত উদরের প্রতি বিদ্যাসাগরের রসদৃষ্টি কেন? তা কি নিজের টিপ্‌লে-জীবনের স্মৃতিসঞ্চরণে? আর বিদ্যাসাগর খুব মধুরভাবে কাজটা করতেন তা নয়। "তিনি হাতের দুই অঙ্গুলি চিমটার মতো করিয়া আমার ভুঁড়ির মাংস টানিয়া ধরিতেন। এই ভয়ে তিনি আসিতেছেন জানিতে পারিলেই আমি সেখান হইতে নিরুদ্দেশ হইতাম।"[১৩]*

যাইহোক, কোনো দিক দিয়েই তাহলে বিদ্যাসাগরের চেহারার সৌন্দর্য দর্শন করা যাচ্ছে না। নিজের রূপে গুণে সদা সন্তুষ্ট নবীন সেন তো তাঁকে রীতিমতো কদাকার বলেছেন। নবীন সেনের বায়রনী কথাবার্তায় বায়রন-সোডার ফেনার অংশ ছিল, তবু 'দ্রব্য'গুণেই ফেনা উঠেছিল, একথা মানতে হবে। বাল্যাবস্থায় কলকাতায় প্রথম বিদ্যাসাগর-দর্শনের প্রতিক্রিয়া তিনি এইভাবে লিখেছেন:

"ও হরি! এই কি খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর? সমস্ত বঙ্গদেশ যাঁহার বেতালে আমোদিত, শকুন্তলায় মোহিত, এবং সীতার বনবাসে আর্দ্রিত হইতেছে, এই কি বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্তা সেই বিদ্যাসাগর? যাঁহার নাম প্রত্যেক নরনারীর মুখে, যিনি মৃত হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিই কি সেই বিদ্যাসাগর? এই খর্বাকৃতি, চক্রাকারে মুণ্ডিতমস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ন নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অধরভঙ্গি, গগনোপম উচ্চ প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গলায় বিশদ অমল-ধবল মুক্তাহারসন্নিভ যজ্ঞোপবীত, হস্তে ক্ষুদ্র রজতনলসংযুক্ত একটি সামান্য হুঁকা, মুখে হাসি, মূর্তিতে শান্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি—আমাদের ন্যায় বালকের সঙ্গে পর্যন্ত সমানভাবে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো সস্নেহে আলাপ করিতেছেন—এই কি সেই বিদ্যাসাগর?"[১৫]

নবীন সেনের এত ভাবের কথার মধ্যে মূল কথাটা থেকেই গেছে—বিদ্যাসাগর কদাকার—এমন যে, যখন তিনি নবীন সেনের খোঁজে তাঁর বাসায় এসেছিলেন, তখন সেখানকার ভৃত্য বিশ্বাসই করতে পারে নি, উনি বিদ্যাসাগর হতে পারেন। "চাকরটি দোহাই কুটিয়া বলিতে লাগিল যে, এমন কদাকার পুরুষ কখনও বিদ্যাসাগর হইতে পারে না। পোশাকও সেরূপ। সে কোনও সামান্য দরিদ্র লোক হইবে।"[১৬]

---

* বিদ্যাসাগরের দোষ নেই, আকর্ষণীয় উদর দেখলে কার না আকর্ষণের ইচ্ছা হয়? "মাতাঠাকুরাণীর আহার করানোর গুণে [শিবনাথ লিখেছেন] আমার ভুঁড়িটি বিলক্ষণ বড় হইয়াছিল। রুগ্নাকৃতি হাত-পা, কিন্তু ভুঁড়িটি বিশেষ গোলগাল। সেজন্য শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় আমাকে 'আফিম-খেকো বামন' বলিতেন। এবং আমাকে কাছে পাইলেই দুই আঙুল দিয়া আমার পেট টিপিতেন। আমি ভুঁড়ির জন্য অনেক শিক্ষকের কাছে এই পেট টেপার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এক-একদিন স্কুলে পৌঁছিলেই পণ্ডিত মহাশয় আমার কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় বাঁধিয়া দিতেন এবং পেট টিপিয়া বলিতেন, 'আফিম-খোর বামন, তোমার মা তোমাকে কত ভরি আফিম খাওয়ান?"[১৪]

চেহারার দিক দিয়ে নবীন সেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আর দুই বন্ধু—প্যারীচরণ সরকার এবং কৃষ্ণদাস পালকে জুড়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাসের "স্থূল কৃষ্ণ কলেবর", "স্থূল গণ্ড ও অধরোষ্ঠ" এবং "প্রকাণ্ড মস্তক"। নবীন সেন জমিয়ে লিখেছেন, "দেখিলাম, বঙ্গের তিনজন বড় লোকই—বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস ও প্যারীচরণ—তিনটি কুরূপের আদর্শ। ভগবান নিজেও কি এ-জন্য কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এককালে বিকৃত বামন হইয়াছিলেন?"[১৭] এই তালিকায় আমরা বিদ্যাসাগরের আর এর বন্ধু "কৃষ্ণবর্ণ বীরমূর্তি" দ্বারকানাথ মিত্রকে যোগ করতে পারি।

বন্ধুদের চেহারা নিয়ে বিদ্যাসাগর মজা করতেন। চণ্ডীচরণ এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির বাইরের ঘরে অনেকে উপস্থিত—জজ্ দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল-সহ বিদ্যাসাগরের বন্ধুরা আছেন। পাড়ার একজন লোক অবিরত জানলা দিয়ে উঁকি মারছে দেখে বিদ্যাসাগর তাকে ডাকলেন। সে ব্যক্তি ভয়ে জড়সড় হয়ে হাজির হলে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর: বাপু, অত উঁকিঝুঁকি মারছিলে কেন? মতলব কি?

লোকটি: আজ্ঞে, জজ্ দ্বারকানাথ এসেছেন শুনলুম, তাই তাঁকে দেখবার জন্য উঁকি দিচ্ছিলাম।

বিদ্যাসাগর: তাতে অত উঁকি মারবার দরকার কি? এই তো দ্যাখোনা—এঁকে চেনো কি? ইনি বিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল। এখানে এঁর চেয়ে যেটি সুন্দর, সেইটিই দ্বারিক মিত্তির।[১৮]

কুরূপের প্রতিযোগিতায় যাঁরা স্পর্ধাভরে নামতে পারেন, তাঁদের সহাস্যে চিনিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর—বার্নার্ড শ সংক্রান্ত একটি গল্পের মতো করে।

বার্নার্ড শ স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বসে আছেন জানলার ধারে। একটি লোক প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলে দ্রুত পদে তাঁর কাছে এল। লোকটি এত কুশ্রী যে, তাকে দেখে শ-এর মন বিরক্তিতে ভরে গেল—তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তার পরেই চমকে উঠলেন—তাঁর কোলে কী একটা পড়েছে। দেখলেন, কোলে পড়েছে একটি আপেল, আর ফেলেছে ওই বিশ্রী লোকটাই—এবং তৃপ্তির সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। "ব্যাপার কি? এ কি অসভ্যতা?"—ধারালো গলায় শ জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি বিনীতভাবে বলল, "আজ্ঞে, আপনার জন্য উপহার।" তিরিক্ষি বার্নার্ড শ পর্যন্ত নরম হলেন—লোকটি নিশ্চয় আমাকে চিনেছে, বুঝেছে কত বড় একজন লেখকের দেখা পাওয়া গেল, তাই ভক্তিভরে উপহার দিয়েছে। তবু যাচাই করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, "উপহারের কারণ?" লোকটি কুণ্ঠিত মুখে বলল, "দেখুন, ওই আপেলটি খানিক আগে এক অতি কদাকার লোক আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'এতক্ষণে আমার চেয়ে বাজে দেখতে লোক পেলুম, তাই আপেলটি দিচ্ছি—যতক্ষণ না আরো খারাপ দেখতে লোক পাবেন আপেলটি নিয়ে ঘুরবেন।' হেঁ হেঁ, অনেক কষ্টে আপনাকে পেয়েছি…।"

বিদ্যাসাগর নিজেও জানতেন, তাঁর চেহারাটি কি? যথার্থ রসিক তিনি,

নিজেকে নিয়ে কৌতুক করতে পারতেন। তাঁর স্নেহভাজন কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁর একটি ভালো ছবি জোগাড় করে তার তলায় শ্লোক লিখে নিজের ঘরে টাঙিয়ে রাখেন। শ্লোকটি এই :

শ্রীমানীশ্বরশ্চন্দ্রোঽহয়ং বিদ্যাসাগর সংজ্ঞকঃ।
ভূদেবকুলসম্ভূতো মূর্তিমদ্দেবতং ভুবি ॥

বিদ্যাসাগরকে ছবি ও শ্লোক দেখানো হলে তিনি বলেছিলেন, "শ্রীমানীশ্বর-শ্চন্দ্রোঽহয়ং'-এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই—'শ্রীমান' না হলে কি এমন উড়ে চেহারার রূপ হয়? 'মূর্তিমদ্দেবতং ভুবি'—এ কথার প্রতিবাদ নেই; সাক্ষাৎ দেবতা না হলে এমন কর্মভোগ কার ভাগ্যে ঘটেছে।" এইভাবে নানা ব্যাখ্যার পড়ে তিনি গাঢ় গলায় বলেন, "তোমরা যে আমাকে স্নেহ করো, সেই আমার পরম লাভ; আমি অবতার হতে চাই না।"[১৯]

তবু বিদ্যাসাগর সকলকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতেন। তা কি তাঁর ব্যক্তিত্বের তেজ ও চারিত্রশক্তির জন্য? "ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে গৌরবর্ণ ছিলেন না [চণ্ডীচরণ লিখেছেন], কিন্তু তাঁহার কি এক মোহিনী শক্তি ছিল যে, যিনি একবার তাঁহাকে দেখিতেন, একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, যিনি কয়েকদিন তাঁহার সহিত বাস করিতেন, তিনি আর তাঁহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।"[২০]

॥ ৩ ॥

তাঁর কণ্ঠস্বর ও বাগ্‌ভঙ্গি

এখানেও বিশেষ সুরাহা নেই। তাঁর কণ্ঠস্বরের কথা কোনো লেখায় নেই (অন্তত আমার চোখে পড়ে নি), অথচ আমরা জানি, কণ্ঠস্বর একটা অনস্বীকার্য অশরীরী অস্তিত্ব, যা বক্তব্য বিষয়কে ছাপিয়ে শ্রোতার মনের উপর যাদুবিস্তার করতে পারে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কণ্ঠস্বরের অনেক বর্ণনা আছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রূপালি স্বরের কথা শুনেছি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বরবর্ণ কী, জানবার সৌভাগ্য হয় নি, কেবল কল্পনা করতে ইচ্ছা হয়েছে, তা তাঁর বুকের ভালবাসার মতোই মধুর, চোখের ঝর্ণাধারার মতোই গানে ভরা।

হায়, এখানেও মোহমুদ্গর অপেক্ষমান। শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র আমাকে বলেছেন, তাঁর মায়ের মুখে শুনেছেন, বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর ঈষৎ খোনা ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর মায়ের সংবাদসূত্র কী, তা অবশ্য গজেনবাবু বলতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার ছিল না বলেই কি তাঁর জীবনীকার বা স্মৃতিলেখকেরা এ-বিষয়ে নীরব?

বিদ্যাসাগর আবার তোতলা ছিলেন। বাল্যকালে তো খুবই তোতলা। ওই সময়ে সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা যখন তাঁকে 'যশুরে কৈ' বা 'কসুরে যৈ' বলে

খেপাত (যেকথা আগে বলেছি), তখন ভয়ানক চটে যেতেন, কিন্তু "কথা কহিতে গিয়া আরও হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেন। তিনি তখন বড় তোতলা ছিলেন। সেইজন্য সহজে সকল কথা উচ্চারিত হইত না। তাহাতে সমবয়স্ক বালকেরা হাসির মাত্রা চড়াইয়া বিদ্রূপের মাত্রাও বাড়াইয়া দিত।"[২১]

বাল্যের বিকট তোতলামিকে বিদ্যাসাগর মনের জোরে পরে অনেকটা সামলেছিলেন, সেজন্য পরিণত বয়সে তাঁর তোতলামি বড়-একটা টের পাওয়া যেত না। "তোতলামির প্রধান ঔষধ আস্তে কথা কহা [কৃষ্ণকমল বলেছেন]। বিদ্যাসাগর এরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কখনও জোরে কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। ইহাতে কথা কহিবার সময় কখনও প্রকাশ পাইত না যে তিনি তোতলা।"[২২]

সেকালীন বাংলার একটি প্রধান 'সদভ্যাস' বা বদভ্যাস থেকে বিদ্যাসাগর মুক্ত ছিলেন—তিনি বক্তৃতা করতেন না। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "দাদাকে কোথাও বক্তৃতা করিতে শুনা যায় নাই।"[২৩] একই তথ্য পাই চণ্ডীচরণের লেখায় এবং কৃষ্ণকমলের কথায়। চেষ্টা করেও তাঁকে বক্তৃতা করানো যায় নি। 'মাদক সেবন-নিবারণ সভা'-র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার প্রথম অধিবেশনে প্যারীচরণ সরকার থেকে আরম্ভ করে, পাদরী ডাল সাহেব, ইনস্পেকটার উড্রো সাহেব, মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকেই তাঁকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু "সেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষের ইচ্ছার পরিবর্তন হইল না।" বিদ্যাসাগরের ওই গুরু প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "অন্যে তাঁহাকে যতটুকু বুঝিতেন, তদপেক্ষা তিনি আপনাকে আপনি অধিক জানিতেন। সভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা তাঁহার কার্য নহে, তাহা বেশ জানিতেন।...তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে, যাহা ভালো করিয়া করিতে পারিবেন না বলিয়া বুঝিতেন, সে কার্যে অগ্রসর হইয়া অন্য উপযুক্ত লোকের প্রাপ্য হরণ করিতে ও নিজের অনুপযুক্ততার পরিচয় দিতে কখনও প্রয়াস পান নাই।"[২৪]

চণ্ডীচরণের এইসব ভালো ভালো কথার মধ্যে একটি ছোট্ট কথা লুকিয়ে ছিল, সেটি খুলে ধরেছেন কৃষ্ণকমল—তোতলা ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর বক্তৃতা করতেন না। এমন কি ক্লাসে পড়াতে পর্যন্ত চাইতেন না। "সংস্কৃত কলেজের সহিত তিনি তো অনেক কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। [কৃষ্ণকমল বলেছেন]—কখনও ক্লাসে পড়ান নাই। একবার শুনিয়াছিলাম, তিনি উত্তরচরিত ও শকুন্তলা ক্লাসে পড়াইবেন, কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা ঘটে নাই। আমার বোধ হয়, পূর্বোক্ত [তোতলামির] কারণবশতই তিনি ক্লাসে পড়ানোর ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যখন চাকরি করিতেন তখন বোধহয় সময়ে সময়ে তাঁহাকে এক-একজন সিভিলিয়ান ছাত্র লইয়া বাংলা পড়াইতে হইত।"[২৫]

কেবল বক্তৃতা নয়, বিদ্যাসাগর প্রকাশ্য সভায় রচনাপাঠ পর্যন্ত করতেন না।

শম্ভুচন্দ্র সেকথা বলেছেন, কৃষ্ণকমলও। "বেথুন সোসাইটিতে পঠিত হইবার জন্য 'সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি প্রবন্ধ বাংলায় রচনা করিয়াছিলেন। নিজে কতকটা তোতলা বলিয়া স্বয়ং পড়েন নাই, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী পড়িয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি ওই বিষয়ের অদ্যাবধি চূড়ান্ত রচনা-স্বরূপ হইয়া আছে"—কৃষ্ণকমল জানিয়েছেন।[২৬]

॥ ৪ ॥

তাঁর রোগ-জ্বালা

বিখ্যাত বাঙালীদের অনেকেই দীর্ঘায়ু নন। রামমোহনের দেহান্ত ঊনষাট বৎসরে, রামকৃষ্ণের পঞ্চাশে, বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চান্নয়, কেশবচন্দ্রের ছেচল্লিশে। সুভাষচন্দ্র সাতচল্লিশে অদৃশ্য। বিবেকানন্দ তো শঙ্করাচার্যের আয়ু ও ভূমিকা দুইই নিয়েছিলেন—শঙ্কর গিয়েছিলেন বত্রিশে, বিবেকানন্দ ঊনচল্লিশে। মধুসূদন ঊনপঞ্চাশে গেছেন, গিরিশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র ষাটের কোটা পেরোন নি। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য প্রায় আশি ছুঁয়েছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ আশি পেরিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরকে অল্পায়ু বলা যাবে না—একাত্তর বৎসর বেঁচেছিলেন। সেকালের হিসাবে এই মোটামুটি দীর্ঘজীবনে তিনি বহু রোগভোগ করেছেন—শৈশব থেকেই যার শুরু। এ-সম্বন্ধে নিজেই লিখেছেন :

"[বীরসিংহ গ্রামের] পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি এ-যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমত এইরূপ আশা ছিল না। কিছুদিনের পর প্রাণনাশের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল কিন্তু একেবারে বিজ্বর হইলাম না। অধিক দিন জ্বরভোগ করিতে করিতে প্লীহার সঞ্চার হইল। জ্বর ও প্লীহা উভয় সমবেত হওয়াতে শীঘ্র আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু রোগের নিবৃত্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"[২৭]

রোগের সংকট অবস্থায় বিদ্যাসাগরের বড় মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ তাঁকে পাতুলে নিয়ে গিয়ে ভালো কবিরাজের চিকিৎসায় সেযাত্রা বাঁচিয়ে দেন।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য আট বৎসর বয়সে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বড়বাজারে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে আশ্রয় পাবার কয়েক মাস পরেই 'রক্তাতিসার' রোগে আক্রান্ত হন। কলকাতায় চিকিৎসা করিয়ে ফল না পাওয়ায় তাঁকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। "বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিনা চিকিৎসায় সাত আট দিনেই আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলাম"—বিদ্যাসাগর লিখেছেন।[২৮]

কলকাতায় এসে রোগে পড়া ব্যাপারটা বিদ্যাসাগরের কোনো মৌলিক কীর্তি নয়। তখনকার দিনে গ্রামের মানুষ কলকাতায় এলে রোগে পড়তেন এবং গ্রামে ফিরে গেলে ভালো হয়ে যেতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এ-বিষয়ে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়-

চন্দ্র রায়ের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

"তৎকালে মফঃস্বলের যে-সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণরোগ হইত। এ পীড়াকে 'নোনা লাগা' কহিত।··· অত্যল্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত, এ-কারণে আমি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল, এবং ক্রমশ বল একেবারে গেল। মৃৎপাত্রে অধিকদিন লবণ থাকিলে যেমন তাহা শীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ঔষধ সেবনে কোনও উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল।"[২৯]

মফঃস্বলের লোকের দোষে নয়, কলকাতার গুণেই মফঃস্বলীদের ওহেন অবস্থা ঘটত। কলকাতা তখন আধি-ব্যাধির বর্ধিষ্ণু নগর। কলকাতার অবস্থার অনেক উন্নতি নাকি পরে হয়েছিল, এমন উন্নতি যে, গ্রামের লোক কলকাতায় স্বাস্থ্য ফেরাতে আসত। সুখের কথা, এই অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেন নি ঐতিহ্যবাদী পৌরপিতারা। তাঁরা আদি কলকাতার ব্যাধিজীবনকে ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁদের আদর্শ কলকাতার বর্ণনা শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে পাই :

"এখন মফঃস্বল হইতে পীড়িত হইয়া লোকে সুস্থ হইবার জন্য কলিকাতা নগরীতে আগমন করে ; [আর] তখন কলিকাতাতে দুই মাস থাকিলেই শরীর ভগ্ন হইত এবং কলিকাতা হইতে বাহির হইলে তৎপর দিনই সুস্থ হইতে আরম্ভ হইত। সে সময়ে কলিকাতার যে-অবস্থা ছিল তাহাতে এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র ছিল না। তখন কলের জল ছিল না ; প্রত্যেক ভবনে এক-একটি ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই-চারিটি পুষ্করিণী ছিল। এই সকল পচা দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল।···এই পুষ্করিণীগুলি জ্বরের উৎসস্বরূপ ছিল।···শহরের বহিরাকৃতি অতি ভয়ংকর ছিল। এখনকার ফুট-পাতের পরিবর্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে এক-একটি সুবিস্তীর্ণ নর্দমা ছিল। কোনো কোনো নর্দমার পরিসর আট-দশ হাতের অধিক ছিল। ওই সকল নর্দমা কর্দম ও পঙ্কে এরূপ পূর্ণ থাকিত যে, একবার একটি ক্ষিপ্ত হস্তী ওইরূপ একটি নর্দমাতে পড়িয়া প্রায় অর্ধেক প্রোথিত হইয়া যায়, [নর্দমার উপকারিতা !], অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল। ওইসকল নর্দমা হইতে যে-দুর্গন্ধ উঠিত, তাহাকে বর্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃহেই পথের পার্শ্বে এক-একটি শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ দিন রাত্রি অনাবৃত থাকিত।···মাছি ও মশার উপদ্রবে দিন রাত্রির মধ্যে কখনই নিরুদ্বেগে বসিয়া কাজ করিতে পারা যাইত না। এই সময়েই বালক-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'দিনে মশা রেতে মাছি, দুই নিয়ে কলকেতায় আছি'।"[৩০]

শিক্ষাজীবনে কলকাতায় থাকাকালে বিদ্যাসাগর বারবার ভারী অসুখে

পড়েছেন। যে-পরিবেশে তিনি থাকতেন তাতে অসুখ না হয়ে পারে না। তাঁদের কলকাতার আশ্রয়দাতা বড়বাজারের জগদ্দুর্লভ সিংহের অবস্থা পড়ে যাওয়ায় তাঁর বাড়ির বড় অংশ ভাড়া দিতে হয়। ফলে বিদ্যাসাগরদের ঠাঁই নিতে হলো একেবারে নীচে অতি জঘন্য ঘরে। ভালো বাসা নেবার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। এই বাসার নরকবৎ অবস্থার কথা বিদ্যাসাগরের সব জীবনীতেই আছে। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও সেই শোচনীয় অবস্থার কথা বলতেন। বিভিন্ন জীবনী থেকে সে-বিষয়ে তথ্যসংকলন করে দিচ্ছি :

"শয়নের অবস্থা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে তাঁহার শয়ন-ব্যাপারের এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি। নারায়ণবাবু বলেন, 'একদিন চন্দননগরের বাসাবাড়িতে আমি বলিলাম, বাবা, এ ছোট ঘরে শুইতে আপনার কষ্ট হইবে না তো? বাবা বলিলেন, ছেলেবেলায় বড়বাজারের বাসায় আমি দেড় হাত চাওড়া ও দু'হাত লম্বা একটি বারান্ডায় প্রত্যহ শয়ন করিতাম। বারান্ডার আলিসা আমার বালিশ ছিল। আমি বারান্ডার মাপে মাজুরি করিয়াছিলাম, সেই মাজুরিতেই শয়ন করিয়াছিলাম। একদিন রাত্রিকালে দেখিলাম, সেই মাজুরির উপর আমার একটি ভ্রাতা (সম্ভবত শম্ভুচন্দ্র) শুইয়া আছে। আমি তাহার নিকট গিয়া অনেক ডাকাডাকি করিলাম। সে কিন্তু কিছুতেই উঠিল না। তখন আমি তাহার নিজের বিছানায় গিয়া শুইলাম। শুইবামাত্র আমার গায়ে বিষ্ঠা লাগিয়া গেল।"[৩১]

"যে ক্ষুদ্র গৃহে ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা পাক করিতেন, সেই ক্ষুদ্র কুটীর এইরূপ ['মলমূত্র ও কৃমিপূর্ণ পূতিগন্ধময়'] নরককুণ্ডের অতি সন্নিকটে সংস্থাপিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন কৃমিসকল দলে দলে তাঁহার ভোজনপাত্র আক্রমণ করিতে আসিত। [বিহারীলালের বর্ণনায়, 'মলমূত্রের কীটসকল কিলিবিলি করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিত'] তাহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র আহারের সময়ে প্রতিদিনই এক ঘটি জল লইয়া বসিতেন। সেইসকল কৃমি নিকটস্থ হইলেই ঘটি হইতে জল ঢালিয়া দিতেন, আর তাহারা সেই প্রক্ষিপ্ত জলস্রোতের সহিত দূরে পড়িত। দুর্গন্ধের তো কথাই ছিল না। যে ন্যক্কারজনক গরলকণা নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে লোক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ওঠে, ঈশ্বরচন্দ্র সেই পরিমল-পয়োধিমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নীরবে ভোজনপাত্র শূন্য করিতেন।...পাকশালাগৃহ এমন স্থানে স্থাপিত ছিল যে, মধ্যাহ্নসূর্যের একটি কিরণও কোনোদিন ভ্রমক্রমেও গৃহের সে অঞ্চলে উঁকি মারিত না।...অনেক দিন দিনের বেলায় তথায় প্রদীপ জ্বালিয়া পাককার্য সমাপন করিতে হইত। এজন্য সে কুটীরে আরসোলাকুল পরম সুখে বাস করিত।...কখনো কখনো অন্নব্যঞ্জনে পড়িত।...একদিবস একটু অসাবধান হওয়াতে [তিনি] ভোজনের সময়ে তরকারির মধ্যে একটা আরশোলা দেখিতে পাইলেন। তখন সে কথা প্রকাশ করিলে, কিংবা ভোজনপাত্রের নিকটে সে পোকা ফেলিয়া রাখিলে, পাছে ঘৃণাপ্রযুক্ত অপর সকলের আহারের ব্যাঘাত

জন্মায়, এই ভয়ে নিরুপায় হইয়া ব্যঞ্জনসহ সেই আরসোলাটিকে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন।"[৩২]

এই পরিস্থিতিতে ব্যাধি যদি আক্রমণ না করে তাহলে ব্যাধির মানবপ্রেমের অভাব সম্বন্ধে আমরা সংশয়ী হয়ে উঠব। সে সংশয় দূর হয়েছে শম্ভুচন্দ্রের রচনা থেকে :

"বড়বাজারের নিম্নতলস্থ গৃহ অত্যন্ত আর্দ্র। তাহাতে শয়ন করিয়া অগ্রজ মহাশয় বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্টভোগ করেন। সর্বদা আমবাতের মতো হইত।"[৩৩]

"নিম্ন-গৃহে অবস্থিতি-প্রযুক্ত অগ্রজ মহাশয় পীড়িত হইলেন। চিকিৎসকগণ পিতৃদেবকে বলিলেন, 'কলিকাতায় নিম্ন-গৃহে, বিশেষত বড়বাজারে অবস্থিতি করা রোগীর পক্ষে কদাপি উচিত নয়। নিম্ন-গৃহের শয়ন-প্রযুক্ত ইতঃপূর্বে তিনি একবার বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্টে আরোগ্যলাভ করেন। তথাপি আপনারা ওরূপ গৃহ পরিত্যাগ করেন না। ওরূপ গৃহে শয়ন করিলে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। রাত্রিতে সমস্ত শয্যা যেন জলসিক্ত বোধ হইয়া থাকে। অতএব যত শীঘ্র পারেন, আপনারা এই গৃহ পরিত্যাগ করুন।"[৩৪]

ব্যাধি সৃষ্টিতে কেবল পরিবেশ নয়, পরিশ্রমের দানও ছিল :

"বাসায় প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া [তিনি] অধ্যয়ন করিতেন।··· অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রচুর রক্তভেদ হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া ঔষধাদি দ্বারা রোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না, অগত্যা দেশে আসিতে হইল।"[৩৫]

বিদ্যাসাগর ভাগ্যবশে বেঁচে উঠলেও তাঁর দুটি ছোট ভাই কলকাতায় কলেরায় মারা যান। ১২ বৎসর বয়সে চতুর্থ সহোদর হরচন্দ্রের মৃত্যু হয়—বিদ্যাসাগর তাতে অসহ্য কষ্ট পান। হরচন্দ্র "অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন" ছিলেন, সে-কারণে বিদ্যাসাগর তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। পঞ্চম ভাই হরিশ্চন্দ্রও কলকাতায় কলেরায় মারা যান ৮ বৎসর বয়সে। "উপর্যুপরি দুই বৎসর দুইটি ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি হতাশ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন যে, 'দাদা, আমার বিবাহে বাজনা করিতে হইবে'—এজন্য অদ্যাপি অগ্রজ অপর লোকের বিবাহে বাদ্যের শব্দ শুনিলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অশ্রুবিসর্জন করিতেন।"[৩৬]

পুনশ্চ ব্যাধি প্রসঙ্গ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার ৬-৭ মাস পরে তিনি রোগে পড়েছিলেন। "কিছু সুস্থ হইবার পরে শিরঃপীড়া ও দন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণাভোগ করেন। অনেক চেষ্টা করিয়া কিছু সুস্থ হন। কিন্তু শিরঃপীড়া হইতে একেবারে নিষ্কৃতি করিতে পারেন নাই, বহু দিবস ব্যাপিয়া শিরঃপীড়ার সূত্র ছিল।"[৩৭]

শম্ভুচন্দ্র, ভাই ও সঙ্গী বলে বিদ্যাসাগরের আরও কিছু অসুখের উল্লেখ

করেছেন। ১২৭২ সালে পেটের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পেয়েছেন। কবিরাজ তাঁকে যবভস্মের নুন থেকে প্রস্তুত ওষুধ খাইয়ে আরাম করেছিলেন।

পড়াশোনা ও অন্য কারণে বিদ্যাসাগরকে অনেক অনিদ্র রাত্রি কাটাতে হয়েছে। শোক তাপ ও দুশ্চিন্তার তো শেষ ছিল না ; ধারাবাহিক অনিদ্রা রোগে ভুগতেন কিনা, সে সম্বন্ধে জীবনীগুলিতে তথ্য পাই নি, তবে এককালীন অনিদ্রারোগের এই সংবাদ শম্ভুচন্দ্র দিয়েছেন :

"যৎকালে অগ্রজ মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে নানা কারণে ষোল দিন রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই। সমস্ত রাত্রি ছাদে বেড়াইতেন। তাঁহার পরম বন্ধু বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক অ্যালোপ্যাথি ঔষধ সেবন করান, তথাপি নিদ্রা হইল না। অবশেষে অগ্রজের পরম বন্ধু, তৎকালের কবিরাজশ্রেষ্ঠ হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ মহাশয় মধ্যমনারায়ণ তৈল ও ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং প্রায় দুই ঘণ্টা-কাল তৈল মর্দন করাইবে, এইরূপ বলিয়া দেন। দুই-তিন দিন তৈল মাখাইলে-পর, একদিন তৈল মাখাইয়া মাত্র দলন করিতেছে, অমনি নিদ্রাকর্ষণ হইল।"[৩৮]

বিদ্যাসাগর বহুকাল হাঁপানিতে ভুগেছেন।

তাঁর ব্যাধির বিবরণ আরও বাড়ানো যায়, দরকার নেই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, কিভাবে তিনি সে সব সহ্য করেছেন। বিদ্যাসাগরের অসীম বীরত্ব এখানেও। প্রভূত সহ্যশক্তি ছিল তাঁর। একবার তাঁর "সাংঘাতিক কার্বাঙ্কল" হয়। সেই নিয়ে তিনি পার্শিবাগানের দীননাথ মল্লিকের বাড়িতে কোনো সালিশী বিষয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়েছিলেন। কথাবার্তার মধ্যেই ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ কার্বাঙ্কলে অস্ত্রোপচার করেন। সেকাজ তিনি যখন করছিলেন, বিদ্যাসাগর তখন দিব্যি তামাক খেতে খেতে সালিশীর আলোচনা করছেন—যন্ত্রণার শব্দমাত্র উচ্চারণ করেন নি। দীননাথ মল্লিক যখন বললেন, এবার অস্ত্র করার কাজটা হয়ে যাক, তখন তিনি শুনে হতবাক যে, তা আগেই সমাধা হয়ে গেছে।[৩৯]

বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগরের শেষ রোগযন্ত্রণাকালে সহ্যশক্তির এই বর্ণনা দিয়েছেন :

"ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১২ই শ্রাবণ সোমবার একরূপ অচৈতন্য অবস্থা ছিল। মুখের ভাব বিকৃত হয় নাই। ভাবে বোধ হইত, ভিতরে ভয়ানক যন্ত্রণা। বিরাট পুরুষ বিদ্যাসাগর সে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন।

"রোগের সঙ্গে যাতনা বাড়িল, কিন্তু সাগরের ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই। অন্তরের যাতনানুভূতি তিনি বাহিরের লোককে বাহ্যাকারে বুঝিতে দিতেন না। যতক্ষণ-না চৈতন্যলোপ হইয়াছিল ততক্ষণ তিনি কাহাকেও সহজে মল মূত্র বা বমনাদি পরিষ্কার করিতে দিতেন না। সে পক্ষে কেহ উদ্যোগী হইলে বরং বিরক্ত হইতেন। কাহারও কোনও কষ্ট দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, কিন্তু নিজের অসহ্য কষ্ট তাপেও তিনি কখনও কাতর হইতেন না। তিনি নিরশ্রু ভীম হিমগিরিবৎ অচল অটল থাকিতেন। একবার তিনি আপনার কনিষ্ঠ কন্যার

পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কোনও পুস্তকাগারে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার পায়ের উপর একটা ভয়ানক ভারী লৌহ-চাপ পড়িয়াছিল। অপর কেহ হইলে হয়ত উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি অম্লানবদনে উঠিয়া পালকীচ াপিয়া বাড়ি আসেন। যাতনা যৎপরোনাস্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে যাতনায় বাহ্যাবয়বে বিকৃতির লেশমাত্র হয় নাই। দৌহিত্র যতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাতনা হইতেছে কি ?' তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'যাতনা যা হইতেছে, তোদের হইলে ডাক্তারের ডাক বসাইতে হইত, আমাকেও পাগল করিতিস'।"[৪০]

[শম্ভুচন্দ্রের লেখায় পাই, বিদ্যাসাগর লালবিহারী মিত্রের হোমিওপ্যাথি-ডিসপেনসারিতে হোমিওপ্যাথি বই কিনতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বুড়ো আঙুলের উপর লোহার কর্কপ্রেসার পড়ে যায়। প্রচণ্ড আঘাত লাগলেও, পাছে লালবিহারী মনঃকষ্ট পান, সেজন্য নির্বিকার মুখে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু ওই আঘাতের জন্য তাঁকে মাসাবধি শয্যাগত থাকতে হয়েছিল।[৪১] মনে হয়, উপরের লৌহচাপ পড়ার ঘটনা, ও এই ঘটনা একই।]

নানা রোগতাপ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য সাধারণভাবে ভালো ছিল। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৬-তে উত্তরপাড়ায় গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ার পর থেকে তাঁর সত্যকার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। উত্তরপাড়ায় তিনি বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মিস কার্পেন্টার এবং উড্রো ও অ্যাটকিনসন প্রভৃতি সাহেবদের সঙ্গে। ফেরার পথে দুর্ঘটনা :

"বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে সকলেই গাড়ি করিয়া ফিরিয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি ভদ্রলোকের সহিত একখানি বগী করিয়া আসিতেছিলেন। গাড়ি চড়িবার সময় তিনি সঙ্গী ভদ্রলোকটিকে বলেন, 'বাপু, আমি কখনও বগী চড়ি নাই ; হাঁকাইও না ; দেখো, সাবধানে হাঁকাইও।' ভদ্রলোকটি অবশ্য তাঁহাকে খুবই আশাভরসা দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গাড়িখানি কিছুদূর আসিয়া মোড় ফিরিবার সময় একেবারে উল্টাইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই পড়িয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া যান। তাঁহার যকৃতে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মিস কার্পেন্টার তাঁহাকে বুকে তুলিয়া, আপন রুমাল ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ও উড্রো সাহেবের শুশ্রূষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় চৈতন্যলাভ করেন। পরে অনেক কষ্টে কলিকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটস্থ বাসায় ফিরিয়া আসেন। এই দৈব দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে দেখিতে যান। পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া সুকিয়া স্ট্রীটে নিজের বাটীতে লইয়া যান। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার চিকিৎসা করেন। ভয়ানক আঘাতে উরুদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। এক মাসের সুচিকিৎসায় তিনি একরকম সারিয়া ওঠেন। কিন্তু যে-কালরোগে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়, তাহার অংকুরোৎপত্তি এইখানে। চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁহার যকৃৎ উল্টাইয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ইহার পর তাঁহাকে প্রায়ই শিরঃপীড়া

ও উদরাময় রোগ ভোগ করিতে হইত। পরিপাকশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং আহারও লঘু হইয়া পড়ে। দুগ্ধ সহ্য হইত না। প্রাতে মাছের ঝোল, ভাত এবং রাত্রিকালে বার্লির রুটি, কখনও কখনও গরম লুচিমাত্র আহার ছিল। পরে তাহাও অসহ্য হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি রাত্রিকালে দুই-একগাল মুড়ি খাইয়া থাকিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—বাল্যে পয়সার অভাবে দুগ্ধ খাই নাই, বয়সেও রোগের জ্বালায় তাহা হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বমুখে শুনিয়াছি, উত্তরপাড়ার পতনের পর হইতে তাঁহার সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায়, চেষ্টা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি যা-কিছু সকলেরই হ্রাস হইয়াছিল।"[৪২]

[উত্তরপাড়ার দুর্ঘটনাসূত্রে কিছু বাড়তি সংবাদ আছে, যা সাধারণ বাঙালী বা ভারতবাসী সম্বন্ধে মোটেই প্রশংসাযোগ্য নয়। গাড়ি উল্টে যাবার পরে বিদ্যাসাগর যেখানে অচেতন অবস্থায় রয়েছেন, তার কাছেই গাড়িসমেত ঘোড়া পড়ে ছিল। বহু দেশীয় লোক ছুটে গেলেও কেউ এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া সরায় নি, অথচ ঘোড়ার লাথিতে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসম্ভাবনা ছিল। উড্রো ও অ্যাটকিনসন ঘোড়া সরিয়েছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের লেখায় তা পেয়েছি।[৪৩] অচেতন বিদ্যাসাগরের শুশ্রূষাতেও কেউ এগিয়ে আসে নি, যদিও, চণ্ডীচরণের রচনামতো, "পথের ধারে লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিল।" মিস কার্পেন্টার এক আলাদা গাড়িতে ছিলেন, খবর পেয়ে দৌড়ে এসে পথের পাশে পড়ে-থাকা বিদ্যাসাগরের মাথা কোলে তুলে নিয়ে শুশ্রূষা করেন। বিদ্যাসাগর চণ্ডীচরণকে বলেছিলেন, "যখন আমার চেতনা হইল, আমার বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, আর স্নেহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন। স্বশরীরে সেই একবার স্বর্গভোগ করিয়াছিলাম। সে দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আমি মিস কার্পেন্টারের সেই স্নেহপূর্ণ বাৎসল্যলাভ করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম।" এই কথাগুলি বলার সময়ে "তাঁহার মুখের ভাবে ও অশ্রুজলে কৃতাজ্ঞতাপূর্ণ গভীর ভক্তির চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল।"[৪৪]

পত্নীবিয়োগের পরে বিদ্যাসাগর যে-দুই বৎসর বেঁচেছিলেন, সেই সময়ে তাঁকে একটানা রোগভোগ করতে হয়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বায়ুপরিবর্তন করেও বিশেষ ফল হয় নি। দুর্ঘটনার পরে যকৃতে বেদনা তো ছিলই, অধিকন্তু উদরাময়। রোগ সারাবার জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি আধিদৈবিক ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে, নানা প্রকার আধিভৌতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল—অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, হেকিমী—কিছুই বাদ যায় নি। শরীরের পাশে একটি বেদনার জন্য ইলেকট্রো-হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করা হয়। কলুটোলার হেকিম আবদুল লতিফ তাঁকে কয়েকদিন দেখেন। তাঁর ওষুধে ফল না হওয়ায়, এবং হিক্কা বেড়ে যাওয়ায়, ডাক্তার হীরালাল ঘোষ ও ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু পরীক্ষা করে, পরামর্শের জন্য অ্যালোপ্যাথ ম্যাকোনেল সাহেবকে আনান। ম্যাকোনেল আবার বার্চ সাহেবকে আনান। শেষোক্ত দুজন

পরামর্শক্রমে স্থির করেন, রোগ হলো পেটে ক্যানসার। রোগলক্ষণ তখন বেদনা, হিক্কা, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং জ্বর। অতঃপর আসেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ শালজার। তিনি বলেন, পেটে ক্যানসার নয়, পাকস্থলীতে টিউমার। সেটা মারাত্মক নয়, মারাত্মক হলো ন্যাবা। অম্লপিত্তও ছিল। ডাঃ শালজারের চিকিৎসায় কিছুদিন একটু ভালো বোধ হলেও হিক্কার পুনঃবৃদ্ধি ঘটে। তা বন্ধ করার জন্য রজনীগন্ধার ফুল বেটে খাওয়ানো হয়েছিল। তাছাড়া গাধার দুধও খাওয়ানো হতো। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে কষ্ট হতো বলে বাড়ির পাশের রাস্তায় খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। এর পর এসেছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তাঁর মতে, "পুরাতন গ্রহণী যত অনিষ্টের মূল।" মৃত্যুর পূর্বদিন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনকে এনে পরামর্শ করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের পুরাতন জীবনীগুলি থেকে আর দুটি সংবাদ পেয়েছি—"জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুন্দর জ্ঞান ছিল"—এবং তিনি যতক্ষণ পেরেছেন, অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও রসিকতার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর বোধ হয় তুলসীদাসের সুবিখ্যাত দোহার উদাহরণস্থল হতে বদ্ধপরিকর ছিলেন—যখন এই পৃথিবীতে তুমি আসবে তখন তুমি কাঁদবে, আর সবাই হাসবে; যখন তুমি চলে যাবে তখন সবাই কাঁদবে, আর তুমি হাসবে। তাঁর দুঃখজয়ী, মৃত্যুজয়ী সেই হাসির বিষয়ে বিহারীলাল লিখেছেন, "কণ্টকময় অন্তিম শয্যায় ...যাতনার অগ্নিকুণ্ড হইতে যথাপাত্রে যথাযোগ্য রহস্যভাষের সুধাধারা বর্ষিত হইত।" চণ্ডীচরণ দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করেছেন:

"বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ সীমায় সমুপস্থিত। তখন আর তাঁর বাক্যস্ফুরণ হয় না। সুরেন্দ্রবাবু [সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] দেখিতে আসিয়াছেন। অতি স্নেহে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, স্বাভাবিক রহস্য-প্রিয়তা পরিচালিত হইয়া, নিজের পরিপক্ব শ্মশ্রু স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, 'তোমার এত শীঘ্র কেশ পক্ব হইল!' এইরূপে যত লোক দেখিতে আসিয়াছিলেন, সকলকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শনে আপ্যায়িত করিয়াছেন।"[৪৫]

॥ ৫ ॥

তিনি চিকিৎসক

নিজে বহু অসুখে ভুগেছেন তার যন্ত্রণা, অপরকে ভুগতে দেখার যন্ত্রণা—'পণ্ডিত' বিদ্যাসাগরকে 'চিকিৎসক' বিদ্যাসাগর করে তুলেছিল। তাঁর জীবনী-গুলিতে চিকিৎসায় তাঁর উৎসাহের বেশ-কিছু সংবাদ পাই। সে-সকল থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি—অন্য অনেক ব্যাপারের মতো একটি চিকিৎসাপদ্ধতির পক্ষে তিনি অন্যতম প্রধান আন্দোলনকারী—তা হলো হোমিওপ্যাথি।

কলকাতার দেশীয় সমাজে হোমিওপ্যাথি প্রবর্তনের নায়ক বউবাজারের ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। হিন্দুকলেজে পড়ার সময়ে ইনি কিছুদিন মেডিকেল কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে যোগ দেন। ফলে চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি তাঁর যে-অনুরাগ জন্মেছিল, তা প্রথমে ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন ও তার দ্বারা দীনদরিদ্রদের সেবায় তাঁকে প্রণোদিত করে। সেই কাজে ব্রতী থাকার সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিষয়ে আকৃষ্ট হন—বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার টনেরির সঙ্গে সংযোগই তার মূলে। টনেরি ছাড়াও একাধিক সাহেব হোমিওপ্যাথ এই সময়ে কলকাতায় ছিলেন। রাজেন্দ্র দত্ত, ডাঃ টনেরিকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর সহযোগিতায় একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। হাসপাতালটি কিছুদিনের মধ্যে উঠে গেলেও উক্ত পদ্ধতির সম্বন্ধে ডাঃ দত্তের মনে আগ্রহ কমে নি। "তাঁহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে, এই চিকিৎসাপ্রণালীর দ্বারা তিনি দরিদ্রজনের বিশেষ উপকার করিতে পারিবেন।"[৪৬] ১৮৬৬ সালে হোমিওপ্যাথ ডাঃ বেরিনী কলকাতায় আসেন। তাঁর কাছে রাজেন্দ্র দত্ত আরও শিক্ষা নেন। বিদ্যাসাগর এই রাজেন্দ্র দত্তের দ্বারাই হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হন। [শম্ভুচন্দ্র বলতে চেয়েছেন, বিদ্যাসাগরই রাজেন্দ্র দত্তকে হোমিওপ্যাথিতে উৎসাহিত করেন।[৪৭] তাঁর এই দাবি কেউই সমর্থন করেন নি।]। রাজেন্দ্র দত্ত প্রথমত বিদ্যাসাগরের শিরঃপীড়ার উপশম ঘটান। তারপর তিনি যখন বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ানক মলকন্টক রোগ সারালেন তখন বিদ্যাসাগরের মনে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে পুরো বিশ্বাস জন্মাল। "ঔষধের উৎকৃষ্টতা, মূল্যের অল্পতা এবং সেবনের সুবিধা সন্দর্শনে" মুগ্ধ বিদ্যাসাগর এর পরে প্রথমে নিজে চিকিৎসক হয়ে দাঁড়ালেন।[৪৮] কারণ তিনি সর্বদাই ভবব্যাধিহরণের পার্থিব ঈশ্বর। তারপর তিনি দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, বিহারীলাল ভাদুড়ী, অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতিকে এই পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করলেন। এই বিদ্যার বহু বই এবং উপযুক্ত ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থাও করলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় জয় মহেন্দ্রলাল সরকারের ক্ষেত্রে। মহেন্দ্রলাল বাংলায় বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সংগঠক, স্বয়ং বিখ্যাত অ্যালোপ্যাথ। হোমিওপ্যাথির বিন্দুগুণে স্বতঃই তাঁর আস্থা ছিল না। বিদ্যাসাগরের মতো যুক্তিবাদী মানুষও ফোঁটা-পড়া চিকিৎসায় বিশ্বাসী হলেন, সে-বিষয়ে যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তিনি তর্কবিতর্ক করেছেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। শেষে এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরপন্থী হতে বাধ্য হন। তার ফলে অ্যালোপ্যাথ-মহলে তাঁর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তাঁর অ্যালোপ্যাথিক উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়।"[৪৯]

মহেন্দ্রলালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি দ্বন্দ্বযুদ্ধের একটা বর্ণনা দিয়েছেন শম্ভুচন্দ্র :

"এক দিবস মহেন্দ্রবাবু ও দাদা ভবানীপুরে অনারেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে উভয়ে বাটী আসিবার জন্য

এক শকটে আইসেন। আমিও উঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম। গাড়িতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা উপলক্ষে ভয়ানক বাদানুবাদ হইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আমি বলিলাম, 'মহাশয়! আমাকে নামাইয়া দিন। আপনাদের বিবাদে আমার কর্ণে তালা লাগিল'।"[৫০]

[শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইয়ে মহেন্দ্রলাল সরকারের যে জীবনচিত্র দিয়েছেন, তাতে হোমিওপ্যাথি গ্রহণের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের প্ররোচনার উল্লেখমাত্র নেই। সেখানে পাই, রাজেন্দ্র দত্তর সঙ্গে বিচার-বিতর্কের দ্বারাই মহেন্দ্রলাল প্রথম ওই বিষয়ে মনোযোগী হন। তারপর মর্গান-লিখিত 'ফিলজফি অব হোমিওপ্যাথি' বইয়ের 'পুস্তক সমালোচনা' করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়, ওই পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা উচিত। পরীক্ষাফলে চমৎকৃত হয়েই তিনি পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার মস্ত হোমিওপ্যাথ হয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি এক ঐতিহাসিক মিলনের অন্যতম পাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন। এই বিখ্যাত যুক্তিবাদীর সঙ্গে সম্পূর্ণ ঈশ্বরময় রামকৃষ্ণের মনোরম সংঘর্ষময় কিছু সংলাপ রয়েছে রামকৃষ্ণ কথামৃতের পৃষ্ঠায়।]

হোমিওপ্যাথিতে মহেন্দ্রলালের সাফল্য কিছু করুণরসের সৃষ্টিও করেছিল—আর বিদ্যাসাগর তার নিমিত্ত। বিহারীলালের রচনা এই :

"মহেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শিরোধার্য করিয়া বলেন, আমি এক্ষণে আর হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিব না ; তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ইহার কি গুণ। পরীক্ষায় তিনি হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ক্রমে অল্পদিনের মধ্যে ওই চিকিৎসায় তিনি যশস্বী হইয়া ওঠেন। তাঁহার যশঃপ্রভায় বেরিনীর প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছিল। এ দেশের লোক প্রায় বেরিনীকে না ডাকিয়া মহেন্দ্রবাবুকেই ডাকিতেন। মহেন্দ্রবাবুরই উপর সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ১৮৬৯ সালে বেরিনীকে শূন্য পকেটে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময়ে ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'কত সাহেব এদেশে আসিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় পকেট ভরিয়া টাকা লইয়া যান, আপনি কিন্তু রিক্ত পকেটে ফিরিতেছেন।' এতদুত্তরে বেরিনী সাহেব বলিয়াছিলেন, 'আমি পাঁচ হাজার টাকা পকেটে পুরিয়া লইয়া যাইতেছি।' রাজেন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'সে কিরূপ ?' উত্তর হইল, 'মহেন্দ্র যে হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী হইয়াছে, ইহারই মূল্য পাঁচ সহস্র টাকা'।"[৫১]

হোমিওপ্যাথিকে বরণ করার পরে বিদ্যাসাগর বহু ব্যয়ে বিদেশ থেকে প্রচুর বই আনাতে লাগলেন। 'একটি বাক্স, একটি বই, ও রোগীর ভাগ্য ঈশ্বরের হাতে'—এই নিয়তিবাক্যে আবদ্ধ না থেকে 'কতকগুলি নরকঙ্কাল' পর্যন্ত কিনে ফেলেছিলেন, যেহেতু 'শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা ব্যর্থ' হয়। বিদ্যাসাগরের চিকিৎসক ভূমিকা মোটেই অবসরবিনোদন-কর্ম ছিল না। যেখানে যেতেন ওষুধপত্র সঙ্গে থাকত, এবং প্রথম সুযোগেই চিকিৎসা শুরু করে দিতেন। কাজের ফাঁকে তাঁর চিকিৎসা করার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের চিকিৎসক-ভূমিকাকে "রণসজ্জায় সজ্জিত", "দিবারাত্রি প্রস্তুত" অশ্বারোহী নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করেছেন : যাঁর শত্রু—পীড়িতের পীড়া, দুঃখীর দুঃখ ; বাহিরের অস্ত্র—সাগুদানা, মিছরি, বেদানা, কিশমিশ, ঔষধপত্র, শুশ্রূষা ; আর মনের অস্ত্র—স্নেহ, মমতা, প্রেম। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে ডাঃ প্রতাপ মজুমদারের হার-মানা রোগীর লিভার অ্যাবসেস সারিয়েছিলেন, রীতিমতো স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে জরায়ুর ক্যানসারের চিকিৎসা পর্যন্ত করেছেন—এই তথ্য ইন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরের চিকিৎসা-ডায়েরির কিছু অংশ প্রকাশ করার পরেই জানতে পেরেছি।

বৈজ্ঞানিক মনের বিদ্যাসাগর একটি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-বিধান দিয়েছিলেন, এই সংবাদ অপরপক্ষে আমাদের বিচলিত করে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর শূলরোগ নিরাময়ের জন্য সন্ন্যাসীপ্রদত্ত ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়—সংবাদ চমৎকার !!

বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন :

"শূল কেমন ভয়ানক রোগ তাহা যিনি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তিনিই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই রোগ জন্মিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিছুদিন হইল এক সন্ন্যাসী আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। [কি আশ্চর্য ! বিদ্যাসাগরের বাড়িতে সন্ন্যাসীর টিকিট ছিল !]। আমার মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন তাঁহার নিকট হইতে শূলরোগের এক ঔষধ পান। তিনি ওই ঔষধের পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। যত ব্যক্তিকে ঔষধ সেবন করান, সকলেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে শূলরোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন। এই সংবাদ শুনিয়া এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া আমিও কলিকাতা ও তন্নিহিত স্থানের কতকগুলি লোককে উক্ত ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে শূলরোগের মহৌষধ, সে-বিষয়ে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়, যিনি এই ঔষধ সেবন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে শূলরোগের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবেন।"[৫২]

দেখা গেল, বিদ্যাসাগর এমন জীবনবাদী ছিলেন না যে, সন্ন্যাসী দেখলেই দূর দূর করে খেদিয়ে দেবেন। এবং তিনি এহেন বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের বশবর্তী ছিলেন না যে, মেডিকেল জার্নালে ছাপার অক্ষরে না বেরোনো পর্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অগ্রাহ্য করবেন। তাছাড়া তিনি সন্ন্যাসীপ্রদত্ত ওষুধটির পেটেন্ট নিয়ে ব্যবসাও করতে চাননি, তার উপাদান ও নির্মাণপদ্ধতি পর্যন্ত ছেপে দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রত্যক্ষ সত্যবাদ তাঁকে এমন একটি ঔষধ ব্যবহার করতে ও ব্যবহার করাতে উৎসাহিত করেছিল—যার নাম শুনলেই গা সিঁটিয়ে যায়, এবং শরীর ঘুলিয়ে ওঠে :

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাঁপানি রোগ বহুকালব্যাপী ছিল এবং শীতকালে বিশেষত মধ্যে মধ্যে বাড়িত। তাঁহার অভ্যাস ছিল, প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দু'বেলা গরম গরম চা পান করা। ইতিমধ্যে একদিন চা পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ লাভ করিলেন এবং হাঁপানির টান যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস বোধ করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আজ চা কে তৈয়ারি করিয়াছিল ?' ভৃত্য উত্তর দিল, 'আমিই তৈয়ারি করিয়াছি।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ উহা পান করে আমার হাঁপানির টান এত কমিল কেমন করিয়া ? উহাতে শুঁট কি আদার রস মিশাইয়াছিলে কি ?' ভৃত্য কহিল, 'না, কিছু না। যেমন প্রত্যেক দিন তৈয়ারি করি, আজও তদ্রূপ করিয়াছি, তবে অন্য দিন অপেক্ষা আজ কিছু তাড়াতাড়ি করে, কেটলি না ধুয়ে, অমনি জল চাপাইয়া চা প্রস্তুত করিয়াছি। এই কেটলি আনি, দেখুন না।' তিনি কেটলি আনিতে হুকুম দিলেন, এবং পরে কেটলি খুলিয়া যা দেখিলেন তাহাতে একেবারে হতভম্ব এবং অবাক হইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে একটুকু ঘৃণার উদয় হইল বটে কিন্তু মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন যে, হাঁপানির এক উৎকৃষ্ট ঔষধ তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, এক কেটলি জলে যখন দুইটা আরশোলা পড়িয়া তাঁহার হাঁপ অর্ধেক কমাইয়াছে, না জানি বহু পরিমাণে উহা জলে ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া, পরে অ্যালকোহলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া ডাইলিউট করিয়া হোমিওপ্যাথি-মতে ঔষধ বানাইয়া লোকের বা রোগীর অজ্ঞাতে সেবন করাইয়া, এবং নিজেও ব্যবহার করিয়া দেখিব, হাঁপ-কাশি সারে কিনা ? পরে তাহার পরীক্ষা, কার্যে পরিণত করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছিলেন, এবং হোমিওপ্যাথি-মতে উক্ত ঔষধ তৈয়ারি করিয়া কাহাকেও না জানাইয়া বহু লোকের উক্ত ব্যাধি বিনাব্যয়ে অনেক উপশম করিয়াছিলেন।"[৫৩]

মূল্যবান এবং উপকারী আবিষ্কার। এর জন্য আরশোলা ও মানুষ—সকলেই কৃতজ্ঞ। বাল্যকালে আরশোলা চিবিয়ে খেয়ে বিদ্যাসাগর আরশোলাকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন (দেবতার ভোগে লাগলে সকলেই ধন্য), তা অব্যাহত রেখেছিলেন আরশোলা-নির্যাস পান করে এবং করবার নিদান দিয়েও। সাধারণ মানুষ উপরের রচনাংশ পড়ে পুলকিত হবেন—অনেক বাড়িতেই হাঁপানি আছে, এবং চা পান করা হয় না, এমন বাড়ি বিরল। আরশোলা শিল্পেও আমরা পেছিয়ে নেই। কেবল প্রয়োজন—বিদ্যাসাগরীয় নির্বিকারত্ব।

॥ ৬ ॥

তাঁর ব্যায়াম ও খেলা

বিদ্যাসাগর খেলারসে মগ্ন থাকতেন—সংবাদ বটে !

নানা রোগ শোক সত্ত্বেও তিনি যে মধ্যবয়স পর্যন্ত শরীর পটু রাখতে পেরেছিলেন, তার কারণ অবশ্যই শরীরের স্বাভাবিক বলিষ্ঠ গঠন। সেই গঠনকে

মজবুত রাখার চেষ্টাও তাঁর ছিল। তিনি খেলাধুলা ও ব্যায়াম করতেন! সংবাদটি আপাতত এমনই অভিনব যে অনেকেই হেসে ফেলবেন। সুখের বিষয়, পরবর্তীকালে হয়ত-গড়ে-উঠবে এমন ইমেজের মান রাখতে বিদ্যাসাগর আগে-ভাগে তাঁর স্ফূর্তির খেলাধুলাকে বর্জন করেন নি। সে খেলা—তাস, পাশা নয়।

তাঁর একেবারে শৈশবের খেলাগুলির গলায় নীতিমাল্য দুলত না। বাল্যকালে তিনি যে 'একগুঁইয়া' ছিলেন, একথা মৃদু গৌরবের সঙ্গে নিজেই জানিয়েছেন। নিজের 'এঁড়ে বাছুরলীলা' প্রসঙ্গে বলেছেন :

"ছেলেবেলায় আমি বড় দুষ্ট ছিলাম। পাড়ার লোকের বাগানে ফল পাড়িয়া চুপি চুপি খাইতাম। কেহ কাপড় শুকাইতে দিয়াছে দেখিলে তাহার উপর মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতাম।"[৫৪] ঈশ্বরচন্দ্রের এই ধরনের 'ত্যাগ' ক্রিয়ায় ব্যতিব্যস্ত হতেন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের পরিবার। উল্টোদিকে বাল্যবজ্জাতির ফলও ভুগতে হয়েছে। খেতের উপর দিয়ে যাবার সময়ে অভ্যাস ছিল—শস্যের শীষ চিবানো। একবার যবের সুঙা গলায় ফুটে প্রাণ যায় যায়।[৫৫] মনে হয় না, তাতে খুব কিছু শিক্ষা হয়েছিল। পিতা ঠাকুরদাস যদি বলতেন, আজ তোমাকে স্নান করতে হবে না, তখন সেই 'ঘাড়-কেঁদো' বালকের বিবেচনায় স্নান করা অবশ্য কর্তব্য। স্বেচ্ছায় তেল মেখে জলে নেমে যদি বুঝে ফেলতেন, বাবার ইচ্ছা স্নান করেন, তাহলে "জলে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, প্রাণান্তেও ডুব দিতেন না। শেষে অনেক প্রহারের পরে বহু কষ্টে তাঁহাকে বলপূর্বক স্নান করাইতে হইত।"[৫৬] অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, উল্টোকাজ করতে বলে তবে সিধে কাজ করানো যেত।

উপরে যে-সব 'ঈশ্বর'-কীর্তির কথা বললাম, সেগুলো ঠিক খেলাধুলার পর্যায়ে পড়ে না—বড়জোর তাদের কৃষ্ণোচিত বাল্যলীলা ভেবে আমরা পুলকিত হতে পারি। এইসব থেকে আরও বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর বাল্যকাল থেকে খুবই স্বাভাবিক চরিত্রের—প্রথমাবধি উচ্চ আদর্শতাড়িত মানুষ নন, যেমন ছিলেন, ধরা যাক সুভাষচন্দ্র, যিনি দশ বছর পেরোতে না পেরোতে গুরুগম্ভীর বাণীবহুল পত্র লিখে নিজ জননীকে আনন্দে কাঁদিয়ে দিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রিয় খেলা কপাটি। খেলাটি বিশেষভাবে স্বদেশী—খেলতে শারীরিক সামর্থ্য ও কৌশল দরকার হয়। দুই গুণই ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল। তিনি যে গ্রামের চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় ছিলেন—সকল সংবাদসূত্র থেকেই জানা যায়। "অমানুষিক বলবিক্রমশালী" গদাধর পাল, যাঁর শারীরিক সামর্থ্যের অনেক কাহিনী চলিত ছিল—তাঁকেও ঈশ্বরচন্দ্র কপাটিতে হারিয়ে দিতেন। বীরসিংহ গ্রামের 'শচী বামুনি' নামক দিঘির ধারে তাঁরা খেলতেন। "ক্রীড়াক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের আক্রমণে গদাধর যখন ধরাশায়ী হতেন, তখন সকল বালকই আনন্দে দিশাহারা হইয়া করতালি ও অট্টহাস্যে পুষ্করিণী ও প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিত।"[৫৭]

জীবনের দুঃখের দিনেও বিদ্যাসাগর খেলা ছাড়তে পারেন নি। ছাত্রাবস্থায় যখন ঘোর আর্থিক সংকট চলেছে, আহার্য তালিকা থেকে দুধ, মাছ কি ভালো তরকারি বাদ, আধপয়সার ভিজানো ছোলা ছিল কলকাতার সংসারে সকলের বৈকালী জলযোগ, তারই কিছু অংশ বাঁচিয়ে রাত্রের কুমড়োর তরকারির স্বাদ-বৃদ্ধিতে প্রযুক্ত, যখন তিনি একাধারে ছাত্র, পুত্র, ভৃত্য এবং পাচক—তখনো সারাক্ষণ "প্রসন্ন ও হাস্যপূর্ণ"—এবং গ্রামে গিয়েই কপাটি খেলায় মত্ত।[৫৮]

না, এ এমন কিছু দৃষ্টান্ত নয়। যে ছেলে খেলার প্রেমে পড়েছে তাকে মাঠ থেকে টেনে আনা যায় না। কিন্তু বালক না হয়ে যদি পরিণত যৌবনের কোনো সর্বমান্য পুরুষ হন—যিনি লাটসাহেবের বন্ধু হবার মতো সেকালের কল্পনাতীত সৌভাগ্যের অধিকারী—তিনিও কি গ্রামে গিয়ে কপাটি খেলবেন, বিশেষত যখন বাড়িতে সদ্য ডাকাতি হয়ে গেছে? বিদ্যাসাগর-পুরাণের একটি উৎকৃষ্ট কাহিনী এই :

ঘটনাকাল ১১ মে ১৮৫২। বিদ্যাসাগরের বয়স ৩২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তিনি। গ্রামে এসেছেন, যথারীতি পরোপকারে নিয়োজিত। উপকারের বস্তুসম্ভারও এনেছেন। তার ফলে অনেকের সঙ্গে কিছু ডাকাত তাঁকে লুণ্ঠন-যোগ্য বলে ধরে নিয়েছিল। ডাকাতরা মাঝরাতে তাঁর বাড়ি চড়াও হলো। বাড়িতে যদিও ৩০ জন পুরুষ এবং ২ জন গ্রাম্য চৌকিদার—তবু ডাকাতরা যখন মশাল জেবলে মধ্যদ্বার ভাঙছিল, তখন "অত্যন্ত ভীত" বিদ্যাসাগর পলায়নই শ্রেষ্ঠ পন্থা বিবেচনা করে, খিড়কি দিয়ে বাড়ির লোকজনকে নিয়ে সরে পড়েন। ডাকাতরা টাকাকড়ি বিশেষ না পেলেও অন্য জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে চলে যায়। পরদিন অন্য নাটক। খবর পেয়ে ঘাটাল থানা থেকে দারোগাবাবু হাজির, যাঁর সম্বন্ধে চণ্ডীচরণ রাগত রসিকতা করে বলেছেন, "কলির অবতার, ধড়াচূড়া বংশীধারী", "যুগাবতার", "বীরকেশরী", ইত্যাদি। দারোগাবাবু উপস্থিত হয়ে বিধিমতে দক্ষিণা চাইলেন। তা তো পেলেনই না, অধিকন্তু উপদ্রুত বাড়ির কর্তা গ্রাম-বৃদ্ধটির মুখে এই উদ্ধত কথাগুলি শুনলেন, "আপনি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে বলে আপনার মর্যাদা রাখতে পারি, কিন্তু কিছু দিতে পারব না।" এই বলে, অবাক কাণ্ড, আর কোনো খাতির না দেখিয়ে, তিনি হাট থেকে থালাবাটি ও অন্য জিনিসপত্র কিনতে চলে গেলেন, কারণ ডাকাতরা কিছুই রেখে যায় নি।

বৃদ্ধের অসহনীয় আচরণ। তাঁর পুত্ররাই বা কম কিসে? "বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র নিজের সহোদরগুলিকে ও পাড়ার যুবকবৃন্দকে লইয়া বাটীর সম্মুখে সুবিস্তৃত মাঠে কপাটি খেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন।" এই পরিস্থিতিতে অনন্ত সহ্যশীল ভগবানের পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন, সেখানে দারোগা তো কেবল ভগবানের 'অবতার'!

দারোগা (জ্বলে উঠে): ও বামুনের এত কি জোর যে, আমি দারোগাবাবু, আমার মুখের উপর বলে দেয়, এক পয়সা দেব না? (বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্রকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) আর ওই ছোঁড়াটাই বা কি রকমের লোক? কাল ডাকাতি

হয়েছে আর আজ বাড়ির সামনে কপাটি খেলছে !

ফাঁড়িদার : হুজুর, চুপ চুপ। এ ছোঁড়া সে ছোঁড়া নয়। ওঁর সঙ্গে লাটসাহেবের খাতির। তিনি জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দারোগা (সভয়ে) : বটে ! বটে ![৫৯]

ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দেখা হলে এই প্রসঙ্গ উঠল। বিদ্যাসাগরের পলায়ন-ব্যাপারটা ইংরেজ-পছন্দ নয়। আর বিদ্যাসাগর দিব্যি গেলে সর্বাবস্থায় ইংরেজ হতে বদ্ধপরিকর ছিলেন না।

হ্যালিডে (খোঁচা দিয়ে) : সে কি পণ্ডিত, বাড়িতে ডাকাত পড়ল, তাদের বাধা না দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন ? এ তো বড় কাপুরুষতা হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর (মিষ্ট স্বরে) : মহামান্য মহাশয়, আপনারা বড় মজার লোক। প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলুম, তাতে বললেন, কাপুরুষ। আর যদি ৪০-৪৫ জন ডাকাতের সঙ্গে একা লড়তে গিয়ে প্রাণ দিতুম, তাহলে বলতেন, লোকটা তো আচ্ছা আহাম্মক, অতগুলো সশস্ত্র লোকের সামনে একলা লড়তে গিয়ে বেহক প্রাণ দিল ! আপনাদের মন বোঝা কঠিন। এগোলেও দোষ, পিছুলেও দোষ।[৬০]

[পাঠক আমার উপর রাগ করবেন না—বিদ্যাসাগর "অত্যন্ত ভীত" হয়ে পালিয়েছিলেন, একথা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রই লিখেছেন। তবে কাজটা অস্বাভাবিক কিছু হয়নি। তিনি বিদ্যাসাগর হয়েছেন বলে কি জড় পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন, একটুও ভয় পাবেন না ? যথাকালে ভয় পাওয়া মানুষের দেহধর্ম। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, স্বয়ং প্রভু নিত্যানন্দ প্রথমবার জগাই মাধাইয়ের ত্রাণ করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। তাতে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে কিছু বিদ্রূপ করেন। কিন্তু তিনি নিজেও ওই দুই মাতালের কাণ্ড দেখে দূরে দূরে থাকতেন। পরে দৈবগতিকে নিত্যানন্দ যখন মাধাইয়ের হাতে মার খেলেন, তখন তাঁর রক্তাপ্লুত অবস্থা দেখে শ্রীচৈতন্য শঙ্খ-চক্র-গদা ইত্যাদিকে আহ্বান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই সময়েই নিত্যানন্দ তাঁর বিখ্যাত কথাগুলি বলেছিলেন, 'মেরেছিস কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না ?' বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এসব কথা আছে।]

কপাটির সঙ্গে ছিল লাঠিখেলা। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই লাঠি—হায় লাঠি—যে-লাঠির দিন গিয়াছে—কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতে নয়। "[তিনি] সমবয়স্কদিগকে লইয়া লাঠি খেলিতেন।"[৬১] সহ-খেলোয়াড়দের একজন ছিলেন মদনমোহন মণ্ডল।[৬২] কিন্তু মনে হয় না তিনি কপাটির মতো লাঠিখেলায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। লৌহদণ্ডধারী তাঁর পিতামহের কথা জেনেছি তাঁর রচনা থেকেই, কিন্তু লাঠিধারী বিদ্যাসাগরের বর্ণনা পাই নি। তাঁর পিছনে অবশ্য সময়বিশেষে একজন লাঠিধারী খাড়া থাকত। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের

সময়ে তাঁর জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা গেলে, তাঁর পিতা গ্রামের শ্রীমন্ত সর্দারকে পাহারার জন্য পাঠিয়েছিলেন। দু'একবার সত্যই আক্রমণ ঘটতে যাচ্ছিল।

বিদ্যাসাগর (হাঁক দিয়ে) : কই রে ছিরে, সঙ্গে আছিস তো ?

শ্রীমন্ত (লাঠি ঠুকে, গলা ছেড়ে) : তুমি এগিয়ে চলো, নোকর সঙ্গে আছে।

শ্রীমন্তর এমনই সাহস যে গোরাদের বন্দুকের সঙ্গে লাঠি-অস্ত্রে লড়াই করতে প্রস্তুত। সিপাহী যুদ্ধের সময়ে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজ সৈন্য আস্তানা করেছে। শ্রীমন্ত সেখানে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল—ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। সৈন্যরা বন্দুক তুলল, শ্রীমন্ত লাঠি-হাতে প্রস্তুত। সৈন্যদের কর্তা ও বিদ্যাসাগর এসে অবস্থা সামলালেন। তারপর :

বিদ্যাসাগর (সন্ত্রস্ত) : এখনি গেছ্‌লিরে ব্যাটা।

শ্রীমন্ত (সগর্বে) : দেশের সব লোককেই তো নাড়াচাড়া করে দেখেছি—আজ সুযোগ পেয়ে সাহেব পরখ করছিলুম। হাতে লাঠি থাকতে কার সাধ্য গায়ে হাত দেয়।

বিদ্যাসাগর (ভরসা না পেয়ে) : তোর কি গায়ে হাত দিত ? বন্ধুকের গুলি তোকে সাবাড় করে দিত।

শ্রীমন্ত (বেপরোয়া ভঙ্গিতে) : যদি গুলিতে মরব তবে লাঠিগাছা ধরি কেন ? ওদের বন্দুক ভরতে হয়, আমার লাঠিগাছা সমানে চলে।[৬৩]

এখন এখানে একটি কর্তব্যই বাকি থাকে—বঙ্কিমচন্দ্রের লাঠিবন্দনা 'কোট' করা। বাহুল্যভয়ে নিবৃত্ত থাকছি।

বিদ্যাসাগর যথেষ্ট ব্যায়ামও করতেন। "সকাল সন্ধ্যা মুগুর ভাঁজিতেন, ডন ফেলিতেন, এমন-কি রীতিমতো ব্যায়ামও করিতেন।"[৬৪] উদরাময় ও শারীরিক দুর্বলতা কাটাবার জন্য হিন্দুস্থানী পালোয়ান রেখে ব্যায়ামাদি শিক্ষা করেছিলেন।[৬৫] শরীরে এমনই শক্তি ছিল যে, রীতিমতো ভারী মটুক ঘোষকে স্বচ্ছন্দে দু'হাতে তুলে ধরতেন। ব্যায়ামাদির ফল কিন্তু বাড়াবাড়িরকম ভালো হয়ে দাঁড়ায়। "ইহাতে তাঁহার দেহে এত রক্ত জন্মে যে, ডাক্তারেরা তাঁহার একটা কঠোর পীড়া হইবে বলিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি তখন ভালো করিয়া ঘাড় বাঁকাইতে পারিতেন না। [ব্যায়ামে ? নাকি স্বভাবে ?]। কঠোর পীড়ার আশঙ্কা করিয়া ডাক্তার নীলরতন মুখোপাধ্যায় দুইবার তাঁহার ঘাড়ের ফস্ত খুলিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। [আমাদের সন্দেহ, ব্লাড প্রেসারের কারণেই তা করা হয়েছিল]। তখনকার সে তেজস্বিনী মূর্তির একখানি প্রতিকৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে এখনও দেখা যায়। সে প্রতিকৃতি দেখিলে মনে হয় যে, উন্নত ললাট, তেজঃপুঞ্জ সুন্দর পুরুষের গণ্ডস্থলে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে।"[৬৬]

কপাটির পরেই বিদ্যাসাগরের প্রিয় খেলা কুস্তী। কুস্তীতে—খেলা ও

ব্যায়ামের সমন্বয়। তিনি কুস্তী এত ভালবাসতেন যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পরে যখন কিছুদিন কলেজের বাড়িতে থাকতেন তখন মালির ঘরের পিছনে কুস্তীর আখড়া করেছিলেন। এই আখড়াতে পণ্ডিত-কুস্তীগীরদের কোস্তা-কুস্তীর সুন্দর বর্ণনা পাই হরিশ্চন্দ্র কবিরত্নের রচনায়:

"সংস্কৃত কলেজের ঈশান কোণে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলানো থাকিত।···ওই ঘণ্টাগৃহের পূর্বদিকে একটি মালির ঘর ছিল।···ওই গৃহের পূর্বদিকে আর একটি বৃহৎ হল্-ঘর ছিল। ওইটিতে পণ্ডিতগণ কুস্তী প্রভৃতি ব্যায়াম করিতেন। আমি 'পণ্ডিতগণ' বলিলাম, তাহার কারণ, ঊর্ধ্বতন অধ্যাপক মহাশয় চতুষ্টয়, অর্থাৎ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ওই কুস্তীর আড্ডায় যোগ দিতেন না। অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, এবং তারাশঙ্কর কবিরত্ন—এই কয়েকজন কুস্তীর আড্ডায় যোগ দিতেন।···এই ব্যায়ামকর্ম বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থাপন করেন এবং ওই কার্যে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল।"[৬৭]

বিদ্যাসাগর মাটি মাখতেন—মাটি মাখার খেলা খেলতেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালীর কাছে নরদেবতা বিদ্যাসাগরের মাটি-মাখা-খেলার স্মৃতিতে আবিষ্ট এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আচ্ছন্ন কণ্ঠ শুনেছেন বিপিনবিহারী গুপ্ত:

"যাহা হারাইয়াছে, এক একবার মাঝে মাঝে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া একাগ্রভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে কি? একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার স্ট্রীটের যে-একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ির যে-ঘরটিতে বিদ্যাসাগর থাকিতেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় কলেজের যে-ঘরটিতে বাসা করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনো দণ্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের সম্মুখে যে-মাটি তিনি কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তীর আখড়া করিয়াছিলেন, যে-মাটি তিনি নিজে গায়ে মাখিয়া কুস্তী করিতেন, সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাটি আছে তো? না, সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাষাণবৎ সান-বাঁধানো হইয়াছে! সেই মাটি মাখো, মাটি মাখো। গ্রীক পুরাণের অসুরের মতো সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান হইবে। মাটি মাখো, মাটি মাখো। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে ভালো করিয়া চিনিতে পারি নাই, অথচ মনে বড় দম্ভ ছিল যে, তাঁহাকে চিনিতে আমার বাকি নাই।···তাঁহাকে হারাইয়াই কি ভালো করিয়া পাইলাম! কলিকাতা পর্যটন করিয়া তাঁহার পুরাতন বাসস্থানগুলি দেখিয়া আসিবার সামর্থ্য আমার নাই···।"[৬৮]

॥ ৭ ॥

তাঁর পা-গাড়ি

অনেক বৃহৎ বিষয়ে অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের গুণতালিকায় একটি ক্ষুদ্র বিষয় যোগ করে দিতে চাই—পায়ে হাঁটার ক্ষমতায় তাঁর কালে তাঁর তুল্য কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ—অন্তত নামী-দামী ব্যক্তিদের মধ্যে। তবে কিনা, নামী হতে গেলে প্রথমেই পায়ে হাঁটা নামক গ্রাম্য কাণ্ডটি পরিহার করে গাড়িতে উঠে পড়তে হয়। বিদ্যাসাগর অপরপক্ষে চিরকালের গ্রামীণ মানুষ—সেই অবস্থাতেই তাঁর দেশজয়ের সংগ্রাম।

বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের প্রথম কাহিনীর জন্ম এই হাঁটা সূত্রেই। তাঁর সকল জীবনীতেই সে কাহিনী আছে। আমরা তাঁর স্বরচিত বিবরণের উপরই নির্ভর করব।

ঈশ্বরচন্দ্র সেই প্রথমবার পিতার সঙ্গে বীরসিংহ থেকে কলকাতা যাচ্ছেন। ১৩২৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষভাগ। তাঁর বয়স আট। বিদ্যাসাগর তাঁর বাল্য-স্মৃতির পুনরুদ্ধার করেছেন :

“প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময় সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া বাটনাবাটা শিলের মতো একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোঁতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোঁতা আছে কেন? তিনি আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল স্টোন। আমি বলিলাম, মাইল স্টোন কী, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইংরাজি কথা; মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ, স্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ-আধ ক্রোশ অন্তরে এক-একটি পাথর পোঁতা আছে, উহাতে এক দুই তিন প্রভৃতি অক্ষর খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।”[৬৯]

বুদ্ধিমান ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছ থেকে উনিশের ‘এক’ ও ‘নয়’ চিনে নিল। সেই সঙ্গে ধারণা করে নিল যে, এর পরে ‘আঠার’, ‘সতর’ ইত্যাদি সংখ্যা আসবে। এহেন জ্ঞানে বলীয়ান বালক পিতাকে আশ্বস্ত করে বলল, “বাবা আজ পথে যাইতে যাইতেই আমি ইংরাজির অঙ্কগুলি শিখিয়া ফেলিব।”

অবশ্যই চিনিয়া ফেলিল। মনবেড়ে চটিতে দশম মাইল স্টোন দেখে সে ঘোষণা করল, “বাবা, আমার ইংরাজি অঙ্ক চিনা হইল।”

বাবা ছেলের বুদ্ধি জানতেন। ছেলের অতিবুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহও তাঁর ছিল। ভেবেছিলেন, হয়ত পুরো সংখ্যাজ্ঞান হয় নি, চালাকি করে নয়ের পরে আট, তারপর সাত ইত্যাদি বলে যাচ্ছে। তাই—

“পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল স্টোনটি

দেখিতে দিলেন না। অনন্তর পঞ্চম মাইল স্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন্ মাইল স্টোন বলো দেখি ? আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল স্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে। এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।"*

যত কড়া মেজাজের বাবাই হোন, ছেলের এহেন বুদ্ধি-কাণ্ডে "অতিশয় আহ্লাদিত" না হয়ে পারেন না। "সমভিব্যাহারীরাও" তাই হয়েছিলেন। কলকাতায় পৌঁছে সে কাহিনী তাঁরা বন্ধুবান্ধব ও পরামর্শদাতাদের শোনালেন। তাঁরা একবাক্যে বললেন, "ইহাকে রীতিমতো ইংরাজি পড়ানো উচিত এবং যদি হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে তাহলে "বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পারিবেক ; হিন্দু কালেজে পড়িলে ইংরাজির চূড়ান্ত হইবেক।"

সেই ভবিষ্যৎ থেকে পুত্রকে বাঁচালেন পিতা ঠাকুরদাস। তাঁরা "পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী।" সংস্কৃত না পড়ে ইংরেজি পড়ায় তাঁর "আন্তরিক অসম্মতি ছিল।" দারিদ্র্যের জন্য নিজে সংস্কৃত শিখতে পারেন নি—পুত্র তার ক্ষতিপূরণ করুক। তাঁর দৃঢ় ইচ্ছায় ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমে হলেন বিদ্যাসাগর—এদেশে বিদ্যাসাগর-কুলে অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। নচেৎ গোড়া থেকে ইংরেজি শিখলে হয়ে দাঁড়াতেন সেকালে বৃটিশ-ভারত-সভা জাতীয় কোন সংস্থার এক বাজে রাজনৈতিক বক্তা—তিনি যে তোতলা ছিলেন, আগেই জেনেছি।

বাবার সঙ্গে বীরসিংহ থেকে কলকাতা যাওয়ার আর একটি বর্ণনা বিদ্যাসাগর করেছেন। এবার বরাতে প্রশংসার পুরস্কার জোটেনি। প্রথমবার কলকাতা যাওয়ার সময়ে শিশুপুত্রকে প্রয়োজনে বহন করবার জন্য একজন ভৃত্যকে নেওয়া হয়েছিল। এবার ঠাকুরদাস যখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, সঙ্গে লোক নিতে হবে

* বাঙালী জীবনে সাংস্কৃতিক উৎসাহের এপিডেমিক মাঝে মাঝেই ঘটে। কয়েক দশক আগে সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালীকে নৃত্যনাট্যের মহামারী ধরেছিল। প্রমথনাথ বিশীর এক সরস লেখায় পড়েছি—পথের ধারে এক জায়গায় লোকজনের ভিড়, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পথে যেতে যেতে তা দেখে কৌতূহলী হয়ে এক ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কী হচ্ছে বাবা ?" ছোকরা গম্ভীরভাবে বলল, "নৃত্যনাট্য।" বৃদ্ধ বললেন, "নৃত্যনাট্যে কী হয় বাবা ?" ছোকরা বিরক্ত হয়ে বলল, "কি আবার হবে, নাচ হয়, নেচে নেচে সবকিছু দেখানো হয়।" বৃদ্ধ নাছোড়—"এখানে কি নিয়ে নাচ হবে বাবা ?" ছোকরা—"সিরিয়াস জিনিস নিয়ে নাচ—বিদ্যাসাগর।" "অ্যাঁ, বিদ্যাসাগর ?" "হ্যাঁ। বিদ্যাসাগর ছোট বয়সে রাস্তায় হাঁটবার সময় মাইল স্টোন দেখে ইংরেজি নাম্বার শিখেছিল, তাই নিয়ে নাচ।" বৃদ্ধ চমৎকৃত—"কারা নাচবে বাবা ?" ছোকরা—"সবাই।" বৃদ্ধ—"বিদ্যাসাগর নাচবে ?" চোকরা—"নিশ্চয়ই।" বৃদ্ধ—"বিদ্যাসাগরের বাবার সঙ্গীরা নাচবেন ?" ছোকরা—"নাচবেই তো।" বৃদ্ধ (বিস্ফারিত দৃষ্টি)—"বিদ্যাসাগরের বাবাও নাচবেন নাকি ?" ছোকরা (অবজ্ঞার ভঙ্গিতে) "আচ্ছা বুদ্ধু তো আপনি ! সেকথা বলার দরকার আছে ? তাঁরই তো মেন পার্ট। তিনি সারাক্ষণ ড্যান্স দেবেন।" বৃদ্ধের মুখ এবার রাগে টকটকে লাল। পায়ের চটি খুলে ছোকরাকে ফটাস্ করে কষিয়ে বললেন—"শূয়ার, বাঁদর, কি বললি, আমার বাবা নাচবেন ? তোর আস্পর্ধা তো কম নয়।" এই বলে আরও কয়েক ঘা চটি কষিয়ে বললেন, "আমিই বিদ্যাসাগর।" বলেই অন্তর্ধান।

কিনা, তখন "আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম [বিদ্যাসাগর লিখেছেন] লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না।" বীরসিংহ থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতার মাতুলালয় ছয় ক্রোশ দূরে। সেই পথ ঈশ্বরচন্দ্র অবলীলাক্রমে হাঁটলেন। সেদিন পাতুলে থাকলেন। পাতুল থেকে পরদিন তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের অসুস্থ ছোট পিসি অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখতে আরও ছয় ক্রোশ দূরের রামনগর গ্রামের দিকে চললেন। তারপর কী হল, বিদ্যাসাগর তার হাস্যকরুণ বর্ণনা করেছেন :

"প্রথম দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সংকট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া আমার পা এত টাটাইল যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না।...অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকি রহিল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া পিতৃদেব বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভালো তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব—এই বলিয়া তিনি লোভপ্রদর্শন করিলেন, এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকিতে দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্যন্ত রহিল না।···পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া দুই-একটা থাবড়াও দিলেন।"

শেষ পর্যন্ত ছেলেকে কাঁধে তুলতে হয়েছিল। কিন্তু পিতা "স্বভাবত দুর্বল ছিলেন, অষ্টম বর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত।" তবু ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ বহু কষ্টে তাঁকে করতে হয়েছিল। বাবার কাঁধে চড়া ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে তরমুজের মতো মিষ্ট লেগেছিল কিনা সেকথা লেখেন নি, ধরে নিতে পারি, তা লাগেনি কারণ মধ্যপথে নির্ঘাত আরো কিছু "যথোচিত তিরস্কার" এবং "থাবড়া" তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল।[৭০]

বাবা মার কাছে শিক্ষাই সেরা শিক্ষা, এমন কথা আমার প্রায়ই শুনি—সেকথা ছেলেকে কোচিং-গোয়ালে পাঠিয়ে বাবা-মাই বলে থাকেন। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে কিন্তু পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষা বিফলে যায় নি। ফল কথা, পরবর্তী জীবনে বিদ্যাসাগর অদ্বিতীয় হন্টন-বীর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কেবল চলতেন না, মাঝে-মধ্যে লাফিয়েও চলতেন।

"বাড়ি যাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে-মধ্যে ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন। পথে কৌতুক করিবার জন্য কোনো নালা-নর্দমা দেখিলে তিনি লাফাইয়া পার হইতেন এবং মধ্যম ভ্রাতাকে সেই নালা নর্দমা পার হইবার জন্য উপরোধ করিতেন। মধ্যম ভ্রাতা বাহাদুরি দেখাইবার

ডাক্তার বলিলেন, 'যতক্ষণ-না ক্লান্তি বোধ করেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, 'তাহলে তো রাত-দিন হাঁটতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি না।"[৭৫]

বিদ্যাসাগর হাঁটছেন কিন্তু সেই সময়ে চোখ চেয়ে দেখছেন না, বা কাজ করছেন না, বা কাঁদছেন না—এমন কখনও হয়? তা যে হয়না, ঘটনার পর ঘটনায় দেখা যায়। তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বিদ্যাসাগর একবার তাঁকে কোনও একটা চাকরি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে যখন ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ খালি হলো তখন কর্তা মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ওই পদ নিতে বললেন। বিদ্যাসাগর তখন ৫০ টাকা বেতনে চাকরি করছেন, আর উক্ত ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদের বেতন ৮০ টাকা। 'পরের জন্য কাষ্ঠাহরণে ব্রতী' বিদ্যাসাগর স্থির করলেন, পদটি তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে দিতে হবে। তাঁর নির্বন্ধে পড়ে মার্শাল সাহেব রাজি হলেন। দিনটি ছিল শনিবার। সোমবারের মধ্যে তর্কবাচস্পতির কাগজপত্র পাওয়া দরকার। তর্কবাচস্পতি তখন অম্বিকা-কালনায় তেজারতি ব্যবসা করছেন, সেইসঙ্গে টোল চালাচ্ছেন। জায়গাটি কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চিঠি গিয়ে উত্তর আসবে না। "এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইদিনই একজন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া কালনাভিমুখে যাত্রা করেন। …তিনি ও সেই সংগী-আত্মীয় সারারাত পদব্রজে চলিয়া পরদিন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন।" এক্ষেত্রে যদি তর্কবাচস্পতি ও তাঁহার পিতাঠাকুর "চমৎকৃত" হন, "শতবার ধন্যবাদ" দেন, এবং "বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে স্পষ্টাক্ষরে" বলেন, "ধন্য বিদ্যাসাগর, তুমিই নরাকারে দেবতা", তাহলে তাঁরা বাড়াবাড়ি কিছু বলেছেন এমন বলতে পারি না।[৭৬]

বিদ্যাসাগর আবার খালি পকেটে হাঁটা পছন্দ করতেন না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তিনি সকাল সন্ধ্যায় মাইল চারেক হাঁটতেন। "ভ্রমণ করিতে যাইবার সময় সঙেগ কুড়ি-বাইশ টাকার সিকি, দুয়ানি ও আধুলি লইতেন। পথে অনাথ, কুষ্ঠরোগী, কানা, খঞ্জ, কালা, রুগ্ণ দেখিলেই অবস্থানুসারে দান করিতেন।"[৭৭]

হাঁটাপথে কেবল দান নয় গ্রহণও ছিল। তবে মানুষটি যখন বিদ্যাসাগর তখন 'গ্রহণ' মানে পরের ভার গ্রহণ। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল তখনও একদিনে হেঁটে কলকাতা থেকে বীরসিংহ যেতেন। এমনই যাওয়ার মধ্যে যদি সংগীরা নিজেদের মোট বইতে কষ্ট বোধ করতেন, সেই বোঝাও তিনি মাথায় তুলে নিতেন। একবার পথে তাঁকে সেই অবস্থায় কলেজের দুজন দারোয়ান দেখে ফেলে। তারা বোঝা বইতে চাইলেও বিদ্যাসাগর রাজি হন নি।[৭৮]

বোঝা বওয়ার বেদনাকরুণ কাহিনীও আছে।

"একবার তিনি বীরসিংহ গ্রাম হইতে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন। এক মাঠের মাঝে তিনি দেখিলেন, একটি অতি বৃদ্ধ কৃষক মাথায় মোট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, লোকটির বাড়ি সেখান

জন্য কখন-কখন লাফাইতে গিয়া পড়িয়া যাইতেন। সেইসঙ্গে হো-হো হাসির রব উঠিত। তিনি মধ্যম ভ্রাতাকে লইয়া এইরূপ কৌতুক প্রায়ই করিতেন।"৭১

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানা স্মৃতিকথায় তাঁর হাঁটার বিশেষ উল্লেখ আছে।

বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বলেছেন :

"সংস্কৃত কলেজে চাকুরি করিবার সময় একদিন বাবার বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় একদিনে আসিবার প্রয়োজন হয়। তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উদ্যোগ করেন। সেই সময় মদন মণ্ডল নামে একজন পাইক বাবাকে বলিল, 'দাদাঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব। 'বাবা বলিলেন, তুমি আমার সহিত হাঁটিতে পারিবে ?' সে স্বীকার করিল। পরে উভয়েই হাঁটিতে লাগিলেন। ৪/৫ ক্রোশ পথ আসিয়া মদন মণ্ডল দেখিল, বাবা তাহাকে ছাড়িয়া ৩/৪ রশি অগ্রসর হইয়াছেন। সে 'হা-রা-রা' করিয়া লাঠি ঘুরাইয়া, আপনি দু'চার পাক ঘুরিয়া, দ্রুতপদে বাবাকে ধরিবার চেষ্টা করিল এবং ছুটিয়া বাবাকে ধরিল। উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। দশ-বার ক্রোশ দূরে গিয়া মদন বাবাকে বলিল, 'দেখ, আজ আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না, এই চটিতে থাকা যাক।' বাবা হাসিয়া বলিলেন, 'আমাকে যাইতেই হইবে। তুমি এই পয়সা লইয়া চটিতে থাকো। কাল তখন যাইও।' মদন চটিতে রহিয়া গেল। বাবা কলিকাতায় আসিলেন।"৭২

লাঠিধারী মদন পাইক যেখানে হার মানে সেখানে শহুরে ছেলে-ছোকরাদের কা কথা! ছোকরা দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বৃদ্ধ দাদা-মশায়ের কাছে পরাজয়ের কথা বলেছেন :

"একদিন কর্মটারে আমি, দাদা-মহাশয় এবং আর কয়েকজন প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করি। আমি বলিলাম, 'দাদা-মহাশয়, আজ আপনাকে দেখি আপনি কেমন আমাদের অপেক্ষা হাঁটিয়া যাইতে পারেন।' দাদা-মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ভালো, তাহাই হইবে।' এই বলিয়া আমরা সকলেই হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন ; আমি কেবল তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি, দাদা-মহাশয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চটিজুতা পায়ে চট্-চট্ করিতে-করিতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। আমি চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। দাদা-মহাশয় দূর হইতে হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'কি, হারাবি না' ?"৭৩

ছোকরারা হারত, মাঝ-বয়সীরাও হারত। ব্রজনাথ দে তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন। "ব্রজবাবুর প্রাণ যায়—বিদ্যাসাগরের সঙ্গে চলিতে গিয়া প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িল। তিন-চারবার বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রজবাবুকে পশ্চাতে ফেলিয়া, শেষে আবার গুছাইয়া লইয়া বলিলেন, 'আমার চলাটাই কেমন একটু বেশি-বেশি। সঙ্গে যারা থাকে পেরে ওঠে না'।"৭৪

বলা বাহুল্য। গতি কেবল তাঁর মনে ও জীবনে নয়, শরীরেও। শেষের দিকে যখন তিনি অসুস্থ, হজম হচ্ছে না, ডাক্তারদের কাছে বিধান চাইলেন, তাঁরা বললেন, খুব করে হাঁটুন। "তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতক্ষণ করিয়া হাঁটিব ?'

হইতে দুই-তিন ক্রোশ দূরে। তাহার যুবক পুত্র তাহার মাথার মস্তকে বোঝা চাপাইয়াছে। বৃদ্ধ এখন চলচ্ছক্তিহীন। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া এবং পুত্রের ব্যবহারের কথা শুনিয়া চক্ষের জলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের মস্তক হইতে সেই বোঝা আপন মস্তকে তুলিয়া লইলেন এবং বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ি পর্যন্ত গেলেন।"[৭৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কার্মাটারে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেছেন। খানিক কথাবার্তার পরে একটু অন্য কাজ সেরে এসে দেখেন বিদ্যাসাগর নেই। "কিছুক্ষণ পরে দেখি [হরপ্রসাদ লিখেছেন] একটা আল্‌পথে বিদ্যাসাগর মহাশয় হন্‌-হন্‌ করিয়া আসিতেছেন, দর্‌-দর্‌ করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। আমাকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই এখানে কেন? আমি বলিলাম, আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, ওরে খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনি আসিয়াছিল; সে বলিল, বিদ্যাসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু-হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি করে নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য দেখিলাম, এক ডোজ ওষুধে তার রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা তো মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই কাজ হয়।...আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদূর গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, ওই-যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে। আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব হাঁটিতে পারিতেন।"[৮০]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যও কলকাতা থেকে ৪০ মাইল দূরে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের একদিনে হেঁটে যাওয়ার কথা বলেছেন। পায়ে থাকত চটিজুতো, বারো-আনা পথ কিন্তু খালি পায়েই হাঁটতেন, গ্রীষ্মের দুপুরকেও পরোয়া করতেন না। এমনই এক গমনকালে বিদ্যাসাগর নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন, যাকে করুণরসের সেরা কথাসাহিত্যও ছাপিয়ে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ।

"তিনি [বিদ্যাসাগর] বলিতেন, 'আমি একদিন বাড়ি যাবার সময় দুপুরের রোদে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য একটি খোড়ো বাড়ির বাহিরের রোয়াকে বসে আছি, এমন সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে গুটি দুই-তিন ছেলে নাচতে-নাচতে আর গানের সুরে চেঁচাতে-চেঁচাতে বেরিয়ে এল। তাদের মুখে এই বুলি—আজ আমাদের ডাল হয়েছে। আমি তো শুনে অবাক। ভাবলুম যে, এদের এত দুরবস্থা যে, বছরের মধ্যে পাল-পার্বণের মতো দু' একদিন ডাল রান্না খেতে পায়!' এই গল্প করিতে-করিতে কখনও কখনও তাঁর চক্ষুতে জল আসিত।"[৮১]

'চরৈবেতি চরৈবেতি।' চলো চলো পথে চলো। বিদ্যাসাগরের এই জীবনমন্ত্র। 'পথে যে চলে ইন্দ্র তাহার সখা।' না, এই অংশ বিদ্যাসাগরের জন্য নয়। বিদ্যাসাগর পথে চলতেন নিজেকে সঙ্গে নিয়েই। আর তিনি চলতেন সোজা পথে —পথ পতন-অভ্যুদয় হলেও।

"খর্মাটারে অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন। ...তিনি সর্বদাই সোজা পথে চলিতেন। যেখানে পথ ঘুরিয়া গিয়াছে, সেখানে লতা-গুল্ম, উঁচু-নীচু উপেক্ষা করিয়া সোজা যাইতেন। জুতা অচল হইলে খালি পায়ে চলিতেন। পায়ে আঘাত লাগিলে গ্রাহ্য করিতেন না।"৮২

উপরের উদ্ধৃতিতে বিদ্যাসাগরের পথ-চলা সম্বন্ধে বাস্তব সত্য এবং প্রতীকী সত্য, দুইই পাওয়া গেছে।

॥ ৪ ॥

তাঁর ঘোড়ার গাড়ি

তাই বলে বিদ্যাসাগর সর্বদাই পায়ে হাঁটতেন না। বিশেষ বিশেষ সময়ে শহরে পালকি করেই যেতেন। তিনি ঘোড়ার গাড়ি চড়া পছন্দ করতেন না। "নিজের গাড়ি-ঘোড়া রাখিবার অর্থ-সামর্থ্য ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। বহু পূর্বে তিনি গাড়ি-ঘোড়া রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে তাহা তুলিয়া দেন।"৮৩ পালকি ভাড়াও পারতপক্ষে করতেন না। একবার শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন না পেয়ে ফিরে আসতে হয়। তাতে যাতায়াতে মোট দশ আনা গাড়ি-ভাড়া লাগে। খুবই আক্ষেপ করে বলেছিলেন, দশ আনা পয়সা মিথ্যা মিথ্যা গেল। সেকথা শুনে সঙ্গীরা হেসে উঠেছিলেন। কেননা অমন "কত দশ আনা পয়সা যাইতেছে।" বিদ্যাসাগর কিন্তু এই "অপব্যয়ে" খুবই দুঃখিত। সঙ্গীদের একজন বললেন, "কত লোক আপনাকে প্রবঞ্চনা করে কত টাকা নিয়ে যাচ্ছে, তাতে বুঝি অপব্যয় হয় না?" বিদ্যাসাগর মুখভঙ্গি করে বললেন, "আরে ওটা অপব্যয় কোথায়? একজনকে তো হাতে তুলে দিলাম, সে উপকার বোধ করল তো! আর এ-যেন ন দেবায় ন ধর্মায়।" এর পরে বিদ্যাসাগর যে-কথা বলেছিলেন বলে চন্ডীচরণ লিখেছেন, তা দুর্বোধ্য ঠেকবে। এমন-কি তা বিদ্যাসাগরের চরিত্রানুরূপ উক্তি বলে মনে হবে না। তিনি বলেন, "যে-ব্যক্তি [গাড়ির চালক] পাইল, সে তাহার পারিশ্রমিক বলিয়া লইল; আর আমি দিলাম বটে, কিন্তু আমার কোনও উপকারে আসিল না।"৮৪

এর মানে দাঁড়ায়, পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া অপেক্ষা অনুগ্রহযুক্ত দান করাকে বিদ্যাসাগর পছন্দ করতেন। একথা মেনে নেওয়া কি সম্ভব? এবং ঘোড়ার গাড়ির বদলে পালকি চড়ার পক্ষে বিদ্যাসাগর যে-যুক্তি দিয়েছিলেন বলে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাকেও যথেষ্ট টেকসই বলে মনে হয় না। "বিদ্যাসাগর পালকি চড়িতেন [কৃষ্ণকমল বলেছেন], ঘোড়ার গাড়ি সহজে চড়িতে রাজি হইতেন না। বলিতেন যে, পালকি চড়ায় কোনো দোষ আছে মনে করি না। ঘোড়ার গাড়ি চড়ায় কিন্তু আমার বিশেষ আপত্তি। ঘোড়াগুলোকে তাহাদের অনিচ্ছায় আমাকে বহন করিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু পালকির

বেয়ারারা স্বেচ্ছায় অর্থের প্রত্যাশায় আমাকে বহন করে। এইজন্য এক হিসাবে ঘোড়ার গাড়ি চড়া কতকটা immoral মনে করি।"[৮৫]

বিদ্যাসাগরের এই কথাগুলি যদি ঘোড়ার গাড়ির চালক শুনতে পেত, তাহলে সদুঃখে বলত, হে দীনবন্ধু, করুণাসিন্ধু, আপনারা না চড়লে যে আমার পেটের ভাত জুটবে না, আর ওই অনিচ্ছুক ঘোড়াও দানাপানির অভাবে খতম হয়ে যাবে। প্রভু, পেটের দায়েই সবাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটাখাটুনি করে।

যাই হোক, বিদ্যাসাগরের পালকি-যাত্রা পদযাত্রার মতোই জনহিতকর ছিল। "তাঁহাকে প্রায়ই মফঃস্বল পরিদর্শনে যাইতে হইত। পরিভ্রমণকালে কোনো পীড়িত চলৎশক্তিহীন লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তিনি আপন পালকি হইতে অবতরণ করিয়া সেই আতুর লোককে পালকির ভিতর তুলিয়া দিতেন এবং স্বয়ং পদব্রজে চলিয়া যাইতেন। পরে কোনও চটি পাইলে পীড়িত ব্যক্তিকে সেই চটিতে রাখিয়া চটির কর্তাকে টাকাকড়ি দিতেন।"[৮৬]

আর ঘোড়ার গাড়ি চড়ার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তিতে যত দুর্বলতাই থাক, তার বিপদ বিষয়ে সঠিক ছিল পূর্ব-সংস্কার। উত্তরপাড়ায় তাঁর গাড়ি দুর্ঘটনার কথা আগে সবিস্তারে বলেছি।

॥ ৯ ॥

যখন বসেন

যে-মানুষটি চলেন—তিনি বসেনও। কোথায়? যত্রতত্র—পথে ঘাটে মাঠে—এর ঘরে, তার দাওয়ায়। কিন্তু যখন নিজের ঘরে বা মজলিশে আছেন? তখন বসতেন চেয়ারে। পোশাকে-আশাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হলেও চেয়ারে বসার সাহেবিয়ানা ছিল। কৃষ্ণকমল বলেছেন:

"বিদ্যাসাগর বরাবরই চেয়ারে বসিতেন। কখনও ফরাসে বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মেছোবাজারের সেই ছোট বাড়িটিতে তো ফরাসের ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় সুন্দর ফরাসের বিছানা ছিল। বিদ্যাসাগর কখনও সেখানে বসিয়া গল্প করিতেন না, সন্নিকটবর্তী একখানি চেয়ারে হেলান দিয়া কথাবার্তা কহিতেন, আমরা বিছানায় উপবেশন করিতাম।"[৮৭]

উত্তম। অন্যরা যখন ফরাসে গড়াগড়ি, বিদ্যাসাগর তখন কাঠের চেয়ারে আসীন। [ফরাসে একেবারে বসতেন না, এই কৃষ্ণকমল-বাক্য বেদবাক্য না হতে পারে। যেখানে কেবল ফরাস, চেয়ার নেই, সেখানে কি বিদ্যাসাগরের জন্য তৎক্ষণাৎ চেয়ার কিনিয়ে আনা হতো, আর তার আগে পর্যন্ত তিনি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতেন ??]। কিন্তু ওই-যে কৃষ্ণকমল বললেন, বিদ্যাসাগর চেয়ারে হেলান দিয়ে গল্প করতেন—কথাটা যেন মানানসই হলো না। চেয়ারে তাঁর

খাড়া হয়ে বসাই তো উচিত। এবং সেই উচিত সংবাদটি দিয়েছেন তাঁর নিপাট ভক্ত জীবনীকার চণ্ডীচরণ :

"সৌভাগ্যবশত তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বহুবার তাঁহার গৃহে গিয়াছি। কিন্তু কখনো তাঁহাকে চেয়ারে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিতে দেখি নাই। সুস্থতায় কি পীড়ায়, আহারে কি অনাহারে, সকল সময়েই তিনি সোজা হইয়া বসিতেন, তাঁহার উপবেশনে ক্লান্তিবোধক চিহ্ন কখনও দেখিতে পাই নাই।"[৮৮]

তাহলে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কী? সহজ সমাধান এই—সাধারণভাবে তিনি চেয়ারে হেলান দিতেন না, তবে চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ সম্বন্ধে অস্পৃশ্যতাবোধ ছিল না বলে মাঝে মাঝে সেখানে হেলতেনও।

॥ ১০ ॥

তাঁর নেশা

বিদ্যাসাগর মস্ত সমাজসংস্কারক হলেও টেমপারেন্স সোসাইটি বা মাদকবর্জন সমিতির সক্রিয় সদস্য হয়ে পড়েন নি। পান, তামাক, নস্য, আফিমে অভ্যস্ত ছিলেন। খুব চা খেতেন। কার্যগতিকে তাঁর আরসোলা-সুদ্ধ চা-পানের চমৎকার কথা আগে বলে এসেছি।

বিদ্যাসাগরের আদি নেশা কি? গুলি? কোনো জীবনীকারই এ-বিষয়ে মনোযোগ দেন নি। হয়ত ব্যাপারটা কৈশোরে যৌবনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ঘটেছিল। কিন্তু সত্যই কি ঘটেছিল? না-কি বিদ্যাসাগর 'গল্প' বানাবার ঝোঁকে নিজের উপর নেশাটি টেনে নিয়েছিলেন? যাই হোক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথা থেকে কাহিনীর ভূমিকা অংশ তুলে দিচ্ছি :

"আপনি জানেন [পূর্ণচন্দ্র নামক জনৈক পক্ক যুবককে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন] সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দু স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত, আমরা দেখিতাম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া-দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা কতকগুলি উপর-ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট-দশ ছিটে পর্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম। তখন আমাদের একটা শখ হইল—বাগবাজারের আড্ডায় গিয়া বড়-বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব।"[৮৯]

এই কাহিনীর পরের অংশ অন্যত্র দেব।

বিদ্যাসাগরের আদি জীবনীকার, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগরের নেশাগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করেছেন, উদ্দেশ্য এই দেখানো—শখ থেকে নেশার শুরু হয় নি, হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। যেমন,

ঘুমাইয়া পড়িলে বা ক্লান্ত হইলে তিনি কাহাকেও না ডাকিয়া স্বয়ং তামাক সাজিয়া খাইতেন।"৯২

এখানে পরিচিত কাহিনীটি মনে পড়ে যাচ্ছে। ঘোর মদ্যপ ছেলেকে মদ ছাড়াবার জন্য বাবার অবিরাম উপরোধ-অনুরোধের চোটে ছেলে একদিন তিতি-বিরক্ত হয়ে বলল, "মদ আমি ছাড়ব, কিন্তু তার আগে তোমাকে চেখে দেখতে হবে, জিনিসটা কী রকম?" বাবা কি করেন, রাজি হলেন। তারপর কয়েকদিন চুপচাপ কাটল। ছেলে শেষে অস্বস্তিতে পড়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হলো, তুমি কিছু বলছ না যে?" বাবা দৃঢ়স্বরে বললেন, "হাঁ বলছি, শোনো, মদ যদি ছাড়ার হয় তুমি ছেড়ো, আমি বাবা ছাড়ছি না।"

তামাক ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ডাক্তার নবীনচন্দ্রকে তেমন কিছু বলেছিলেন কিনা আমরা জানি না।

বিদ্যাসাগর তামাকে কীভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন কৃষ্ণকমলের স্মৃতি-কথায় তা পাই: "তাম্রকূট সেবন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। সটকা-নল লাগাইয়া নহে, হুঁকা চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহার হাতে থাকিত।"৯৩ আর পাছে আগন্তুকদের মুখে হুঁকো পৌঁছতে কালবিলম্ব হয় সেজন্য পূর্বাহ্ণে ব্যবস্থা করেও রাখতেন। "তিনি আগন্তুকদের ব্যবহারের জন্য ৪/৫-টি হুঁকা রাখিতেন। বলিতেন, একটি হুঁকায় তামাক সাজিলে ইহার অপেক্ষায় অনেককে থাকিতে হয়, তাহাতে [তাঁহাদের] অসুবিধা হয়।"৯৪

বিদ্যাসাগরের পক্ষে কোনো ক্ষেত্রেই কাহিনী সৃষ্টি না-করা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ চন্দননগর-বাসের সময়ে ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাছে এসেছেন—বিদ্যাসাগর তাঁর হাতে হুঁকো তুলে দিলেন। ইন্দ্রকুমার না খেয়ে সরিয়ে রাখলেন। বিদ্যাসাগর যখন প্রশ্ন করলেন, তুমি তামাক খাও কিনা, ইন্দ্রকুমার চুপ করে রইলেন। বিদ্যাসাগর বুঝলেন। সমীহ করে বাবুর তামাক খাওয়া হচ্ছে না। ও-সব জ্যাঠামি তিনি ভালবাসেন না, এই কথা বলে, আবার তাঁর হাতে হুঁকো ধরিয়ে দিলেন। "তামাক খাওয়া যদি অন্যায় মনে না করো, আমার সামনে খাবে না কেন?" জ্যাঠামির ভারমুক্ত হয়ে ইন্দ্রকুমার বিদ্যাসাগরের সামনে তামাক টেনেছিলেন।৯৫

এও যথেষ্ট বিদ্যাসাগরী কাহিনী নয়। নিম্নের কাহিনী তা নিঃসন্দেহে:

"ফরাসডাঙ্গায় থাকিয়া বিদ্যাসাগর-মহাশয় প্রায়ই নিকটবর্তী স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। একবার তিনি ভদ্রেশ্বরের একটি ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র ছিলেন। ব্রাহ্মণের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পুত্র তামাক সাজিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অম্লানবদনে নির্বিকারচিত্তে তামাক খাইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে ভ্রাতা বলিলেন, 'আপনি কেমন করিয়া কুঠের হাতে সাজা তামাক খাইলেন?' বিদ্যাসাগর মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর দেন, 'যদি তোমার বা আমার কুষ্ঠ হইত তাহা হইলে কী করিতাম'?"৯৬

সংস্কৃত কলেজে চাকরিকালে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের গ্রামে গিয়েছিলেন জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে। "তথায় রাত্রিজাগরণে ও হিমলাগায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবার পর তাঁহার জ্বর হইল, পরে নাসারোগ দৃষ্ট হইলে পর, তৎকালীন বহুবাজারস্থ বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জ্বর ভালো হইলেও নাসারোগের নিবৃত্তি না হওয়ায় কয়েক বৎসর নস্য ব্যবহার করিয়াছিলেন।"৯০

অর্থাৎ ঔষধার্থে নস্য। শম্ভুচন্দ্রের লেখার ওই অংশটি স্বচ্ছন্দে নস্য কোম্পানী বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে পারবেন। আমরা তো জানতাম, তামাক ও নস্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের চিন্তার নিত্যসঙ্গী! তামাকের ব্যাপারেও শম্ভুচন্দ্র সহায়ক অসুস্থতা এনে ফেলেছেন:

"বাল্যকাল হইতে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অগ্রজ মহাশয়কে কখনও তামাক খাইতে দেখি নাই। পরে তামাক খাইতে আরম্ভ করেন। প্রথমত বাসায় কাহারও নিকট খাইতেন না, গোপনে অপরের বাটীতে খাইতেন। তামাক খাইবার বিশেষ কারণ এই যে, রাত্রিজাগরণ করিয়া লেখাপড়ার অনুশীলন করিতেন, তজ্জন্য দাঁতের গোড়া ফুলিত। তৎকারণেই বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয় সর্বদা উপদেশ দিতেন যে, তামাকের ধূমে দন্তমূলের যাতনার অনেক লাঘব হইবে। একারণ, অগত্যা ডাক্তারের উপদেশানুসারে তামাক খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে বাটী আগমন করিয়া পনের দিবস অবস্থিতি করিলেও আমরা কখনও তাঁহাকে তামাক খাইতে দেখি নাই। ছোট-ছোট ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি কেহই না-দেখিতে পায় এরূপ গোপনভাবে তিনি তামাক খাইতেন।"৯১

এখানেও সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট বিদ্যাসাগর পেলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছ থেকে। বাঙালী সমাজে তামাক তখন প্রায় একটা সর্বজনীন নেশা। তবে গুরুজনসমাকুল স্থানে অথবা বোধোদয় কালে বালকদের সামনে অনেকেই তামাক খেতেন না, এও জানি। মহৎ ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। নরেন্দ্রের তামাক টানা দেখে পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মুখ টিপে হেসে সরে গিয়েছিলেন—এবং নরেন্দ্রের হাতে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ হুঁকো ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

বিহারীলাল, বিদ্যাসাগরের তামাক-প্রিয়তা সম্বন্ধে পুত্র নারায়ণচন্দ্রের মুখে যা শুনেছেন তাতে শম্ভুচন্দ্রের সাধু রচনার সমর্থন নেই। বারাসত-নিবাসী ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু, এবং বিশেষ তামাকপ্রিয়, তাঁরই তাগিদে পড়ে, ইচ্ছে না থাকলেও, বিদ্যাসাগর একবার তামাক না টেনে পারেন নি। তার পরে সেই সুপরিচিত 'কমলী নেই ছোড়্‌তা'-র কাহিনী:

"পরদিন নবীনবাবুকে আর তামাক খাইবার কথা বলিতে হয় নাই। বাবা স্বয়ংই হুকুম করিয়া তামাক আনাইলেন। বন্ধু নবীনবাবু কিন্তু সে তামাকের কলিকা পাইলেন না। এই সময় হইতে বাবা তামাকে অভ্যস্ত হন। তিনি তামাক ও পান বড় ভালোবাসিতেন। বাবা তামাক খাইতেন বটে, কিন্তু ইহার জন্য চাকর-চাকরানিকে কখনও বিরক্ত করিতেন না। চাকরগুলো

তামাক খাওয়ার মতো পান খাওয়াতেও তাঁর বিশেষ আসক্তি—আসক্তির সঙ্গে যত্নও। পুত্র নারায়ণচন্দ্র জানিয়েছেন, পান তিনি প্রায়ই স্বহস্তে সাজতেন। পানের সুপারি কাটা থাকত, খয়ের চুন ইত্যাদি মশলা সাজানো থাকত, তিনি পান চিরে সেজে নিতেন। উদ্বৃত্ত সুপারির কুচি শিশিতে ভরে রাখতেন সযত্নে। তেমন অনেক শিশি ছিল।[৯৭]

পানের রসের সঙ্গে তামাকের ধোঁয়া না মিশলে পোষ্টাই হতো না। তাঁর চিবানো পানের সম্বরা নেবার জন্য নাতিপুতিরা কাড়াকাড়ি করত।

পান তামাক নেশার মধ্যে নয়—সেকালে। কিন্তু আফিম তখনকার দিনেও রীতিমতো নেশা। বিদ্যাসাগর আফিমের রসে মজেছিলেন। তবে তারও সূত্রপাত অসুখ থেকে। শম্ভুচন্দ্রের বয়ান :

"উত্তরপাড়ায় গাড়ি হইতে পতনের দোষে দাদা যকৃতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এই সূত্রে উদরাময় পীড়ার সূত্রপাত হয়। ১২৯১ সালের বৈশাখ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত পীড়া এতদূর প্রবল হয় যে, তাহাতে দাদার জীবনসংশয় হয়। চিকিৎসক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আফিম খাইতে আরম্ভ করেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ত্রিশ ফোঁটা লডেনম ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহাতে ত্বরায় ওই পীড়ার উপশম হইল। কিন্তু দুই-তিন মাস পরে পুনর্বার পীড়ার উদয় হইল। আফিমের মাত্রায় উপকার না হওয়ায় আফিম পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কোনোমতেই ত্যাগ করিতে পারিলেন না।"[৯৮]

আমরা একই সূত্র থেকে জেনেছি, শেষ অসুখের সময়ে অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসকরা বলেছিলেন, "অহিফেনের মাত্রা এত অধিক পরিমাণে থাকিলে আমাদের চিকিৎসায় উপকার দর্শিবে না।" কলুটোলার হেকিম সেখ আবদুল লতিফ চিকিৎসা করতে এসে, আফিম ছাড়াবার জন্য বিকল্প মাদক-ওষুধ প্রয়োগ করেও ফল পান নি, উপরন্তু অসুখ বেড়ে কয়েকদিন প্রলাপ পর্যন্ত বকতে থাকেন।[৯৯] বিদ্যাসাগর নিজে বুঝেছিলেন, আফিম ছাড়া উচিত, কারণ আফিমের সঙ্গে দুধ অবশ্যসেব্য, অথচ দুধ পেটে সয় না।[১০০] বুঝেও আফিম ছাড়তে পারেন নি।

অর্থাৎ আফিম নামক নেশাটি তাঁর জীবনে শেষ পর্যন্ত জড়িয়েই ছিল।

॥ ১১ ॥

নানা শখ—গান, গাছ এবং বই

'মানুষটি কেমন' বিষয়ে আরও অনেক কথাই আছে। সব বলে শেষ করা যাবে না। তবু আরও কিছু বলে নিই।

বিদ্যাসাগর থিয়েটার দেখা পছন্দ করতেন না। অনুরোধ এড়াতে না পেরে পাইকপাড়ার রাজবংশের বেলগাছিয়ার ভবনে নাটক দেখেছেন। বিধবা বিয়ের

নাটক দেখে তিনি যে, চোখের জলে ভাসতেন, তা নাটকের রচনাগুণের জন্য নয়, নাটকের বিষয়বস্তুর জন্য। গিরিশচন্দ্র তাঁর সীতার বনবাসের অভিনয় বিশেষ অনুরোধ করেও বিদ্যাসাগরকে দেখাতে পারেন নি।[১০১] সাধারণভাবে তাঁর গান-বাজনার শখ ছিল না, তবে মাতৃনাম আছে বলে শ্যামাসঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন।[১০২] কবিগানের প্রতি তাঁর প্রীতির কথা শম্ভুচন্দ্র বলেছেন : "তৎকালে কলিকাতায় কবি ও কৃষ্ণযাত্রা হইত। দাদার কবি শুনিবার অত্যন্ত শখ ছিল। কোথাও কবি হইলে তিনি শুনিতে যাইতেন। যখন দেশে যাইতেন ভাই বন্ধু লইয়া কবিগান করিতেন।"[১০৩] বাল্যকালে সমবয়স্ক বালকদের জুটিয়ে তিনি কবিগান গেয়েছেন। বিদ্যাসাগরের তীব্র কবিগান-প্রীতির একটি কাহিনী বিহারীলাল শুনিয়েছেন। স্বগ্রাম থেকে কলকাতা আসার পথে চটিতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে যাত্রা করার সময়ে কাকে যেন অতি মিষ্ট স্বরে কবিগান করতে শুনলেন। লোকটি কে ? খোঁজ নিয়ে জানলেন, তার বাড়ি ছয়-সাত ক্রোশ দূরে ; তার বাড়িতে অনেক কবিগানের সংগ্রহ আছে। সেকথা শুনে, কলকাতা যাত্রা স্থগিত রেখে, হেঁটে হাজির হলেন লোকটির বাড়িতে, এবং গানগুলি লিখে নিলেন। শুধু এখানেই নয় ; যেখানেই তিনি কবিগান শুনতেন, সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতেন। "তাঁহার নিকট কবির গানের একখানি প্রকাণ্ড খাতা ছিল।"[১০৪] বিদ্যাসাগর যে অখিলউদ্দিনের মুখে দেহতত্ত্বের গান শুনতে ভালবাসতেন, একথা আগেই জেনেছি।

কঠিন পথ ধরে তিনি উঠেছেন, অভিজ্ঞতার কোনো অংশকেই বর্জনীয় মনে করেন নি, সেক্ষেত্রে তিনি যে অপচয়ের প্রশ্রয় দেবেন না, তা বলার দরকার নেই। পরের বেলায় তিনি মুক্তহস্ত, নিজের বেলায় ব্যয়কুণ্ঠ। পাতে ভাত পড়ে থাকতে দিতেন না, সহজে গাড়িভাড়া করতে চাইতেন না। এসব জেনেছি। আরও জানা দরকার, তিনি এক টুকরো দড়ি বা কাগজ পর্যন্ত কুড়িয়ে রাখতেন। ছোট ছোট নাতি-নাতনিদের কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকত। একবার ছোট দৌহিত্র, বিদ্যাসাগর রাত্রে শুয়ে পড়লে, চুপিচুপি আলমারির মাথা থেকে দড়ি আনতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। "বালক ভয়ে জড়সড়। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবামাত্র উত্তর আসিল, 'আমি যতি।' 'অন্ধকারে কী করছিস ?' 'একটু দড়ি নেব।'...'থাম, আমি দিচ্ছি'।" এর পরে বিদ্যাসাগর নাতিকে এই মধুর কথাগুলি শুনিয়েছিলেন, "দাদা, যখন এই বুড়ো দড়িগুলো কুড়িয়ে রাখে তখন ভাবো, দাদামশাই কি বোকা, কেবল ছেঁড়া দড়ি আর ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে মরে। এখন চুপি চুপি সেই ছেঁড়া দড়ি সরাতে এসেছ ! বলি, বুড়ো কুড়িয়ে না রাখলে এত রাত্রে দড়ি কোথায় পেতে বল তো ?"[১০৫] যেসব চিঠি পেতেন, তাদের অংশবিশেষ কেটে রাখতেন, অন্য ছোট চিঠি লেখবার জন্য বা প্রেসকপি করবার জন্য। দাসী যখন বাটনা বাটার সময়ে হলুদের জল ফেলে দিচ্ছিল, তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। দাসী অবাক। "দাদামশাইয়ের কত দিকে কত টাকা যাচ্ছে সেদিকে নজর নেই, আর এই হলুদের জলটুকুতে চোখ পড়েছে !"

বিদ্যাসাগর উত্তরে বলেন, "দ্যাখো, হলুদের জলটুকু তরকারিতে দিলে কাজে লাগত। আর আমি তো টাকা জলে ফেলে দিই না, লোককে দিই। ও-জলটুকু নষ্ট হবে কেন?"[১০৬]

বিলাসী নন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। রুচি ছিল। গাছ ফুল ভালবাসতেন। বাগান তৈরির ঝোঁক ছিল। শেষ জীবনের বাদুড়বাগানের বাড়িতে নানা ফুলের গাছ করেছেন।[১০৭] কার্মাটারে বাগানের কাজ করতেন, তার শুধু উল্লেখ শম্ভুচন্দ্র করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে বিষয়ে অধিক তথ্য দিয়েছেন: "কর্মাটাঁরে একটি ই-আই-আর লাইনের স্টেশন হইয়াছে। উহা জামতাড়া ও মধুপুর স্টেশনের মধ্যে। ১৮৭৮ সালে স্টেশনের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলা ছিল। বাংলাটিতে দুটি হল, চারটি ঘর, দুটি বারান্দা ছিল। বাংলার চারিদিকে একটি চার-চৌরশ জমি, চার-পাঁচ বিঘা হইবে—সেইটি বাগান। বাগানটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা দেশ হইতে আঁবের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি লতানে আঁব গাছ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় গাছগুলির বিশেষ যত্ন করিতেন। বাগানে আরও নানা রকমের গাছ ছিল। বাগানের বাহিরে গোটাকতক সেকেলে অশ্বত্থ গাছ ছিল।"[১০৮]

চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের বাগানে প্রবেশ করে হরপ্রসাদের মতো সাদাসিধে বর্ণনা করে কাজ সারতে পারেন না। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পড়ে বিদ্যাসাগরীয় রচনার মেজাজ আয়ত্ত করেছেন। সুতরাং ভাবভরে লিখলেন:

"এই উপবন পরিশোভিত নির্জন বাসভবন অতি রমণীয়। ইহার সৌন্দর্য-বৃদ্ধি বিষয়ে ভৃত্য অভিরামকে লইয়া তিনি নিজে অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সে উদ্যানের অনেক বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও কুসুমকুঞ্জ তাঁহার স্বহস্তরোপিত। আমরা যখন এই উপবন-পরিশোভিত গৃহ ও ইহার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম, সেই উদ্যানের প্রীতিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আমাদের প্রাণে বিষাদমাখা গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বোধ হইয়াছিল, তিনি যেন সংসারের শোক মুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম কলেবরে পরমানন্দে সেই সাধের নির্জন বৃক্ষবাটিকায় মহাধ্যানে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। বোধ হইয়াছিল যেন সে-উদ্যানের প্রত্যেক তৃণলতা পর্যন্ত তাঁহার সাকার সহবাস-সুখে বঞ্চিত হইয়া মনের দুঃখে নতমস্তকে বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।"[১০৯]

মোট কথা, বিদ্যাসাগর যত্ন করে বাগান তৈরি করেছিলেন। অনেক গাছের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি ও সংস্কার জড়িয়ে ছিল। তাঁর পিতামহী গ্রামে একটি অশ্বত্থ গাছ বসিয়েছিলেন, তার যত্ন করবার জন্য তিনি শম্ভুচন্দ্রকে নির্দেশ দেন। পরে গভীর দুঃখ ও ক্রোধের সঙ্গে শোনেন যে, অহঙ্কারী এক নবকুমার ডাক্তার নাড়াজোল রাজবাটীর হাতি এনে সেই গাছের ডাল ভেঙেছেন। তা কাটবার জন্য ওই ব্যক্তি করাত প্রভৃতিও এনেছিলেন। বাধাদানে তাতে নিরস্ত হন।

নবকুমার গত হলে তাঁর পত্নী গাছটি শেষ করতে সচেষ্ট হন। মামলা মোকর্দমা বেধে যায়। মামলায় বিদ্যাসাগর-পক্ষ জয়লাভ করেন। বিদ্যাসাগরের তখন রুদ্রমূর্তি—পিতামহীর বসানো গাছ, যার উদ্দেশ্য পথিকদের জন্য ছায়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, সেই গাছ অর্থের অহঙ্কারে একজন নষ্ট করে দেবে—বিশেষ সেই লোকটির অর্থোপার্জন যখন বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল !! মোকর্দমায় পরাজয়ের পরে নবকুমার-পত্নী মিটমাটের জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। দেখলেন কী কঠিন মূর্তি, অকৃতজ্ঞতার বিরুদ্ধে রোষের বিস্ফোরণ :

"তোমার স্বামী নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি নিজ-ব্যয়ে লেখাপড়া শিখাইয়া, কলিকাতাস্থ মেডিকেল কলেজে পড়াইয়াছিলাম। পরে সে নাড়াজোলের রাজার ডাক্তার হইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে বীরসিংহায় আসিয়া, আমার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষের কতকগুলি ডাল হাতির দ্বারা ভাঙাইলেন। এই ঘটনার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলে সৌভাগ্যজ্ঞান করিতাম। পিতামহীর গাছের শাখা না কাটিয়া আমার হাত-পা কাটিলে এত দুঃখ হইত না। পরে আবার উহার মূলে করাত লাগাইলেন; এবং তুমি তাঁহার উপযুক্ত পত্নী, ঐ বৃক্ষে বেড়া দিয়া, বৃক্ষ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উহার শিকড় কাটিয়া বাঁশবৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছ, এবং আমার ভাইকে কয়েদ দিবার জন্য বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছিলে। এক্ষণে আবার আমার নিকট আসিয়া উদারতা ও সরলভাব দেখাইতেছ। তুমি মকদ্দমায় জয়লাভ করিলে কখনই আসিতে না। পরাজয় হইয়াছে তজ্জন্যই আসিয়াছ।"[১১০]

বিদ্যাসাগরের সংস্কার-আনুগত্যের অন্য ক্ষেত্রও ছিল। 'নিমতলার কলে শবদাহ' করবার প্রস্তাব যখন উঠেছিল, তখন "বিদ্যাসাগর মহাশয় মর্মাহত হন." এবং "ইহা যাহাতে না হয় তাহাই করিবার জন্য তাঁহার প্রাণান্ত পণ হইল।" তিনি টাউন হলে সভা ডাকিয়ে, তাতে বাগ্মী রামগোপাল ঘোষকে দিয়ে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়ে, সেটি রদ করতে সমর্থ হন।[১১১]

বিদ্যাসাগরের সেরা শখ গাছ নয়—বই। ভুললে চলবে না, তাঁর অর্জিত উপাধি 'বিদ্যাসাগর'। শ্রীম'র লেখায় বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারের বর্ণনা পেয়েছি। শিবনাথ শাস্ত্রী স্মৃতিকথায় বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরিটি ছিল দর্শনীয় বস্তু। বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে তিনি ইহার জন্য মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।...ইহা যেন তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ছিল।"[১১২] বিদ্যাসাগর যে বাদুড়বাগানে নিজের বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন, তার মূলেও এই গ্রন্থাগার। ভাড়াটে বাড়িতে বই রাখার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। কলকাতায় নিজের বাড়ি করলে জন্মগ্রামের উপর টান কমে যাবে, সেজন্য আগে বাড়ি করেন নি। এখন উপায়ান্তর নেই দেখে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। পিতার দুঃখ ছিল, তিনি নিজে অর্থাভাবে বিদ্যার্জন করতে পারেন নি। পুত্র তাঁর অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করেছে দেখে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের

প্রার্থনার উত্তরে তিনি পুত্রের পিতার মতো উত্তর দেন, "তুমি পুস্তক রাখিবার উপলক্ষে বাটী প্রস্তুত করিবে, এ সংবাদে পরম সন্তোষলাভ করিলাম। ত্বরায় বাটী প্রস্তুতের উদ্যোগ করো।"[১১৩]

অন্য সূত্র থেকে দেখেছি, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারে কেবল বহুসংখ্যক সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি বই ছিল না, অনেক সংস্কৃত পুঁথিও ছিল। ইংরাজি বইগুলি গৃহশোভা নয়, রীতিমতো সেসব পড়েছেন ; প্রয়োজনে শেক্সপীয়ার, মিলটন, স্কট, হক্স্‌লি, টিনডাল, মিল, স্পেনসারের উক্তি উদ্ধৃত করতেন।[১১৪] হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচুর বই ছিল। সেকালের হিসাবে লক্ষাধিক টাকার গ্রন্থসংগ্রহ তাঁর। "পুস্তকালয় তাঁহার জীবনাবলম্বন বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।"[১১৫]

গ্রন্থ সংগ্রহ করা যায় কিন্তু সে সংগ্রহ অটুট রাখা যায় না—বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিদের ভালবাসার টানে। পুরনো বিলাতী রসিকতায় আছে : এক ব্যক্তির উত্তম গ্রন্থসংগ্রহ দেখে পুলকিত কোনো বন্ধু সংগ্রাহককে প্রশ্ন করেন, "কিভাবে এই বই জোগাড় করলে ?" উত্তর : "ধার করে।" "কিন্তু বইগুলো গুছিয়ে রাখোনি কেন ? চারদিকে যে ছড়িয়ে আছে !" "কি করব, ধার করে বই আনা যায়, কিন্তু ধার করে বইয়ের আলমারি আনা যায় না !"

বই ধার দেওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরের হয়েছিল। এক বন্ধুকে দুষ্প্রাপ্য একটি সংস্কৃত বই পড়তে দেন, সে বই জার্মানী ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। উক্ত বন্ধু বইটি বেমালুম গায়েব করে নির্লজ্জের মতো বলেন, "সে বই তো ফেরত দিয়েছি।" ফেরত তিনি দেন নি, তবে নিজের কাছেও রাখেন নি, কিছু অর্থের বিনিময়ে চালান দিয়েছিলেন পুরনো বইয়ের দোকানে। বিদ্যাসাগরকে বেচবার জন্য দোকানদার বইটি এনে হাজির করে। দেখে শুনে বিদ্যাসাগর আগুন গরম। বইটি আবার কিনে নেন। "এই ঘটনার পর থেকে আর কখনও কাহাকেও এক টুকরা কাগজও পুস্তকালয় হইতে লইয়া যাইতে দিতেন না।"[১১৬]

এই একটি জায়গায় বিদ্যাসাগরের উদারতার অভাবে আমরা বিচলিত। স্মরণ করা যাক, জর্জ বার্নাড শ-এর একটি কাহিনী। পুরনো বইয়ের দোকানে গিয়ে শ দেখেন, তাঁর এক প্রিয় বন্ধুকে উপহার-দেওয়া বই সেখানে রয়েছে। সেটি কিনে নিয়ে শ তাঁর বন্ধুকে আবার পাঠালেন—আর যেখানে আগে লিখেছিলেন, 'With compliments', ঠিক তার তলায় লিখে দিলেন—'With renewed compliments.'

বিদ্যাসাগরের সমস্ত শিল্পানুরাগ যেন জড়িয়ে ধরেছিল বইগুলিকে। "তেমন সুন্দর বিলাতী বাঁধানো পুস্তক আর কোনও পুস্তকালয়ে আছে কিনা সন্দেহ।"[১১৭] এ কাজে প্রচুর খরচ করতেন। এই ছিল তাঁর সরস্বতী সাজানো।

এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সরস বাকপটুত্বের একাধিক কাহিনী আছে।

এক ধনী ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সোনার জলে নাম-লেখা বাঁধানো বইগুলি দেখছেন। কী অপব্যয়! বাবুটি ক্ষুণ্ণ হলেন।

বাবু : এত টাকা খরচ করে বিলেত থেকে বই বাঁধিয়ে এনেছেন, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

বিদ্যাসাগর : এতে মাথা খারাপের কি আছে? এতে দোষ কি?

বাবু : কী বলছেন—দোষ নেই? ওই টাকায় কত লোকের উপকার হতে পারত।

লোকের উপকার। ঠিক। বিদ্যাসাগর যেন অন্যমন হয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর তো লোকের উপকার করবার জন্যই মায়ের পেট থেকে পড়েছেন। তামাক টানতে টানতে তিনি একথা সেকথায় চলে গেলেন। বাবুটির গায়ে দামী শাল ছিল। সোনার চেন-বাঁধা ঘড়িও ছিল। দেখে বিদ্যাসাগরের খুব ভালো লাগল। বললেন, "ঘড়ির চেনটি তো বড় সুন্দর। দাম কত?" বাবু খুশি হয়ে দাম বললেন। "আহা শালটি আরও সুন্দর।" আরও পুলকিত হয়ে বাবু শালটির গুণবর্ণনা করে গেলেন।

বিদ্যাসাগর (নিরীহ কণ্ঠে) : তা শালটির দাম কত?

বাবু (উৎফুল্ল) : আজ্ঞে পাঁচশো টাকায় খরিদ ছিল।

বিদ্যাসাগর (ধারালো গলায়) : একগাছি দড়ি দিয়েও তো ঘড়ি বাঁধা যায়—সোনার চেনের দরকার কি? পাঁচসিকের কম্বলে তো শীত ভাঙে—পাঁচশো টাকার শালের দরকার কি? আমি তো মোটা চাদর গায়ে দিয়ে থাকি। [১১৮]

একই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ছুরি-বেঁধানো গলা অন্যত্রও শোনা গেছে।

জনৈক বিদ্যাসাগর-ভক্ত : এত খরচ করে এ-সকল বই বাঁধিয়ে আনার দরকার কি?

বিদ্যাসাগর : ভালবাসি বলে। তুমি তোমার কুরূপা স্ত্রীকে অত রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে টাকা নষ্ট করো কেন? [১১৯]

রস রসনা রসিক

॥ ১ ॥

আগে কূর্মাবতারের অর্থাৎ উদরদেবতার পূজা চাই—বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাঁর বাণী ও রচনাতে ও-ব্যাপারটি ওতঃপ্রোত। বিবেকানন্দ যেখানে বৃহত্তর জনসমাজের খাদ্যসমস্যায় নিবিষ্ট, সেখানে বিদ্যাসাগরের মনোযোগ নির্দিষ্টে —আর সে কী নিবিড় মনোযোগ! খাদ্য খাদন খাদক ব্যাপারটা তাঁর জীবনের কতখানি অংশ জড়িয়ে বর্তমান ছিল, তার হিসাব করা দুষ্কর। শেষ পর্যন্ত আমাদের দ্বিধান্বিত হতে হয়—বিদ্যাসাগর কোন্ ক্ষুধার উপশমে অধিক সচেষ্ট —মানুষের বাসনার ক্ষুধা (বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা যে-চেষ্টা করেছেন; বিধবাকে সধবা করতে পারলে অধিকন্তু পূর্ণ পরিতৃপ্ত সংসারজীবনেও তাকে স্থাপন করা হয়)—নাকি, পেটের ক্ষুধা? সিদ্ধান্ত করতে চাইছি না। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেব, দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু দেখে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন।

তাঁর বাল্যের কঠোর দারিদ্র্যের কথা আগে বলেছি। উত্তরজীবনে যখন অবস্থা ফিরেছে, বহু আয়োজনে প্রিয়জনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছেন, তখনও পাতে ভাত রেখে কেউ উঠে পড়বে, তা সহ্য করতে পারতেন না। নিজের পিতার উল্লেখ করে বলতেন, "একটি ভাত পাতের পাশে পড়ে থাকলে আমার বাবা আমাকে প্রহার করতেন—'তুই এত জিনিস নষ্ট করবি, তা হতে পারে না, ওগুলি সমস্ত খেতে হবে'।"[১]

'একটি ভাত' কী করে 'এত জিনিস' হয়? হয়—হয়। বিদ্যাসাগর-লিখিত তাঁর পিতার সংগ্রামকাহিনীর কিছু অংশ উপস্থিত করলেই তা বোঝা যাবে।

ঠাকুরদাস শহরে এসেছেন ভাগ্যান্বেষণে, ভাগ্য বিমুখ, তাই ঠাকুরদাসকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি পড়ে থাকতে হয়, মাঝে মধ্যেই পুরো অনাহার, আহার জুটলেও ভরপেট জোটে না, দিন-দিন শীর্ণ ও দুর্বল। এর পর:

"ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটি ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটিটিতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এক পয়সার শালপাত কিনিয়া রাখিলে ১০।১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক; সুতরাং থালা না থাকিলে কাজ আটকাইবেক না। [মেঝেয় ভাত ঢেলে খেলেও আটকায় না!]। অতএব থালাখানি বেচিয়া ফেলি। বেচিয়া যা পাইব তাহা আপনার হাতে রাখিব। যেদিন দিনের বেলায় আহারের জোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া তিনি সেই থালাখানি নূতন বাজারে কাঁসারীদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারীরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরান বাসন কিনিতে পারিব না। পুরান বাসন কিনিয়া কখনও কখনও বড় ফেসাদে পড়িতে হয়। অতএব

আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস বড় আশা করিয়া থালা বেচিতে গিয়াছিলেন ; এক্ষণে সে আশায় বিসর্জন দিয়া বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।"[২]

আত্মচরিতের কয়েক পৃষ্ঠাতে বিদ্যাসাগর যথার্থ সাহিত্যিক। পিতার অবস্থা বর্ণনায় প্রতি শব্দে নিবিড় মমতার স্পর্শ।

নিজের দুই মহাসম্পত্তি, পুরান থালা ও ঘটি বেচতে না পারায় পরে ঠাকুরদাসের অবস্থা কী দাঁড়াল ?

"একদিন মধ্যাহ্নে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছো কেন ? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই ? তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছু খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা করো। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন। পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবেক।

"পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্যপ্রদর্শন করিতেন না।"[৩]

তাই বিদ্যাসাগর যখন কোনো নারীর মুখে অন্ন তুলে দিতেন তখন সেই মুখে পূর্বোক্ত নারীর (বা অনুরূপ দয়াময়ী নারীর) মুখচ্ছবি দেখতেন। পুরুষদের অন্নদানের সময়ে তাঁদের মুখে কোনো হৃদয়বান পুরুষের মুখ কি দেখতেন না ? তাও দেখতেন। বড় মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণের সমাদরমূলক

যে-বর্ণনা বিদ্যাসাগর আত্মচরিতে করেছেন, তার একাংশে আছে : "ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে-অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদরে অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[৪]

বিদ্যাসাগরের পিতার মাইনে যেহেতু কখনও ১০ টাকার বেশি হয়নি, তখন টাকার দাম এখনকার তুলনায় যত বেশিই হোক, তাতে তাঁকে পিতা, মাতা, একাধিক ভ্রাতা ও ভগিনী এবং স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালন কায়ক্লেশেই করতে হতো। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন্ নারকীয় পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল, তা কিছুটা আগে জেনেছি। এই সময়ে সকল গৃহকর্ম ঈশ্বরচন্দ্রকেই করতে হয়েছে। তিনি বাজার করতেন, তা করতে ভালবাসতেন, যখন দেশবিখ্যাত তখনও বাজারের মোট বইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, কাশীবাসী পিতামাতার জন্য নিজেই বাজার করতেন, এই সবই তাঁর বিষয়ক রচনাদিতে পাই। বাজার করতে তিনি লজ্জিত না হলেও অপরে লজ্জা পেতেন।

সেই অপর ব্যক্তি : চাকর দ্বারা যে-কাজ করা যায়, তা নিজে করতে আপনার লজ্জা হয় না? আমাদের যে দেখে লজ্জা হয়।

বিদ্যাসাগর : তাহলে আপনারা পথে আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। বাবার জন্য বাজার করতে আমার গভীর তৃপ্তি। যাঁরা তা পারেন না তাঁরা চাকরের দ্বারাই ও-কাজ সমাধা করুন।[৫]

বাজার করা অপেক্ষা রান্না করার বিষয়েই আমাদের বেশি নজর। তাঁর রান্নার অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই। "অগ্রজকে [শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন] দুইবেলা সকলের পাকাদি-কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। বাসায় কোনো দাসদাসী ছিল না। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া বড়বাজারের টাঁকশালের গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আসিবার সময় বড়বাজার কাশীনাথবাবুর বাজারে যাইতেন। তথা হইতে মৎস্য ও আলু পটল প্রভৃতি তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পঁহুছিয়া প্রথমত হরিদ্রাদি ঝাল-মশলা বাটিয়া, উনুন ধরাইয়া, মুগের দাউল পাক করিয়া, মৎস্যের ঝোল রন্ধন করিতেন। তখন বাসায় চারিজন লোক ভোজন করিতেন। ভোজনের পর সমুদয় উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার ও বাসনাদি ধৌত করিতে হইত। হাঁড়ি মাজিয়া, বাসন ধৌত করিয়া ও স্থান পরিষ্কার করিয়া, দাদার অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও নখগুলি ক্ষয় হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্য হস্তে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত।"[৬]

তবে রান্নার কাজে সবসময়ে যে বেশি পরিশ্রম করতে হতো এমন নয়। বিদ্যাসাগরের মুখে চণ্ডীচরণ শুনেছেন : "কখনও অন্ন জুটিত, কখনও জুটিত না। যখন জুটিত তখনও সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেন না। যখন পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত তখন আবার অনেক সময়ে ব্যঞ্জনের অভাবে কেবল নুন-ভাতে দিনপাত করিতেন। যখন তরকারী ও মৎস্য পাইতেন তখন মৎস্যের ঝোল

রাঁধিয়া, একবেলা ভাত আর সেই ব্যঞ্জনের ঝোল খাইয়া, বৈকাল বেলার জন্য তরকারি ও মৎস্য রাখিয়া দিতেন; বৈকালে সেই ব্যঞ্জনের তরকারীর দ্বারা অন্ন উদরস্থ করিয়া মাছগুলি পরদিনের জন্য রাখিয়া দিতেন। পরদিন সেই মাছের অম্বল রাঁধিয়া তাহার দ্বারাই সেদিনকার আহার সমাপন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।"[৭]

যাই হোক, রান্নার জিনিস পেয়ে রাঁধুন, বা না-পেয়ে না-রাঁধুন, শেষপর্যন্ত "পাকশালায় উৎকৃষ্ট পাচক" হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং অত কষ্টের রান্নার সময়েও মনের সুখ হারান নি। "বালক বিদ্যাসাগর রন্ধনাদি করিয়া ভ্রাতা ও পিতাকে মনের আনন্দে আহার করাইতেন এবং সতত আত্মপ্রসাদে প্রফুল্ল থাকিতেন।"[৮]

রান্নার স্ফূর্তির আরও কথা পাই। বাল্যে যাঁকে দারিদ্র্যের জন্য স্বহস্তে রান্না করতে হতো, পরজীবনে তিনি আনন্দের জন্য স্বহস্তে রাঁধতেন।

"স্বচ্ছন্দে উপার্জনে সক্ষম হইয়াও অনেক সময়ে কেবল পিতৃসেবার্থে কেন, অনেককেই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়ানো তাঁহার একটা শখ ছিল। খাওয়াইয়া তিনি পরম প্রীতিলাভ করিতেন। খাওয়াইতে বসিয়া প্রায়ই প্রীতিপ্রফুল্লতা-ভরে বলিতেন:

হুঁ হুঁ দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়ঞ্চ করকম্পনে।
শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে॥"[৯]

ঈশ্বরচন্দ্রের অনবদ্য এক বাল্যরচনা—সরস সংস্কৃতে খাদ্যবন্দনা—যার পটভূমিকায় ছিল সরস্বতী পূজা। কিন্তু বিদ্যাদেবী এখানে স্তুতি পাননি, (বিদ্যার স্তুতি অবশ্য তাঁর আছে), পেয়েছিল তাঁর সুবাদে প্রস্তুত আহার্য-গুলি। বিদ্যাসাগর নিজেই সূত্র নির্দেশ করে কবিতাটি হাজির করেছেন:

"পূজ্যপাদ [জয়গোপাল] তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রতি বৎসর বিলক্ষণ সমারোহে সরস্বতীপূজা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন অথবা করিতেছেন সেই সকল ছাত্র, অর্থাৎ সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত, এই পাঁচ শ্রেণীর ছাত্রবর্গ তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। আমরা পূজার দিন তাঁহার বাটীতে দুইবেলা উত্তম আহার পাইতাম, বিকালে ও রাত্রিতে গান শুনিতাম। ফলত, সেদিন আমাদের নিরতিশয় আমোদে অতিবাহিত হইত। পূজার পূর্বদিন তিনি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পদ্যে সরস্বতী বর্ণনা করিতে বলিতেন। আমি কখনই সম্মত হইতাম না। তাঁহার পীড়াপীড়িতে একবার মাত্র শ্লোকে সরস্বতীর বর্ণনা করিয়াছিলাম। শ্লোকটি দেখিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছিলেন এবং অনেককে ডাকাইয়া আনিয়া, স্বয়ং পাঠ করিয়া, শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন। ঐ কৌতুককর শ্লোকটি নিম্নে মুদ্রিত হইতেছে:

লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।

যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তানিরন্তরম্ ॥"[১০]

॥ ২ ॥

'সেই ধন্য নরকুলে', যে খাওয়াতে ভালবাসে। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পিতৃস্মরণ করেই শুরু করা যাক। মধুরসে মাখানো কাহিনীটি এই :

বিদ্যাসাগরের অবস্থা ফিরেছে। পিতা মাতাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় টাকা সেখানে পাঠান। বাইরের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন পিতা, ভিতরের সংসার দেখেন মা। বুড়ো বুড়ি। বুড়ো কর্তার মেজাজ কড়া, রুক্ষের ধার ঘেঁষে যায়। বুড়ি গিন্নীও মেজাজী। ফলে দুজনে 'টুগরোমুগরি' বেধে যেত। তখন গিন্নী দুম্ দুম্ পা ফেলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। গোঁসাঘরে প্রবেশ। কর্তা এবার পড়েছেন বিপাকে। এসব ক্ষেত্রে চিরকাল পুরুষেরই পরাজয়। মানভঞ্জন পালা শুরু হয়। মানভঞ্জনের একটি নিশ্চিত উপায় কর্তা জানতেন। তিনি বেরিয়ে পড়ে যেভাবে হোক একটি বড় মাপের রুই কি কাতলা জোগাড় করতেন। তারপর বাড়িতে এসে গিন্নীর ঘরের সামনে, কি উঠোনে, সজোরে আছাড় মেরে মাছটি ফেলতেন, যাতে গিন্নীর কানে শব্দ যায়। ধড়াস্ করে মাছ পড়া—সে হলো গিন্নীর কাছে শ্যামের বাঁশি। দরজা খুলে চোখ মুছতে মুছতে তিনি বঁটি ও ছাই সংগ্রহ করে মাছটির দিকে এগোতেন। এইবার কর্তার তেজবৃদ্ধি। তাঁর হুঙ্কার, "খবরদার, আমার মাছে হাত দিও না বলছি।" গিন্নী পরোয়া না করে নিজ কাজে অগ্রসর। কর্তার পুনশ্চ হুঙ্কার, "সাবধান, আমার হুকুম না পেলে যে মাছে হাত দেবে সে মজা টের পাবে।" চোখে জল, মুখে হাসি, গিন্নী অকুতোভয়ে কাজ শুরু করে দেন। কর্তাও আনন্দে ছলোছলো চোখে খানিক তাকিয়ে, বিষয়ান্তরে সরে যান। অন্তরাল থেকে নবীনা বধূরা বুড়ো বুড়ির কাণ্ড দেখে নিজেদের হাসিমুখ কষ্টে ঢেকে রাখেন ঘোমটার আড়ালে।[১১]

খাওয়াতে পারলেই সুখ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে পড়ার সময়ে মাসিক আট টাকা বৃত্তি পেতেন, তা অন্য ছাত্রদের বিকালে জলখাবার খাওয়াতেই খরচ করে ফেলতেন, এমন সংবাদ শম্ভুচন্দ্র জানিয়েছেন। কথাটা পুরো মাপে সত্য বলে গ্রাহ্য হবে না, কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের তখনও সে অবস্থা আসেনি। তবে আমরা জেনে সুখী যে, "ঠনঠনিয়ার চৌমাথার কিছু পূর্বে বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিঠাইয়ের দোকানে" তিনি বিকালে জলযোগ সারতেন, এবং "কলেজের যে-কোনো ছাত্র সম্মুখে থাকিত সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন।"[১২]

মেট্রপালিটান ইনস্টিটিউশন স্থাপনের পরে বিদ্যাসাগরের কাছে ছাত্ররা একবার পৌষ-পার্বণের ছুটি চেয়ে পেয়েছিল। কিন্তু পৌষ-পার্বণ মানে তো পিঠে-পার্বণ। অনেক ছাত্র কলকাতায় বাসা করে থাকে। তাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই কথাবার্তা :

বিদ্যাসাগর—তোদের অনেকেরই তো বিদেশে বাড়ি। কলকাতার বাসায় পিঠে পাবি কোথায় ?

ছাত্রগণ—কেন, আপনার বাড়িতে।

বিদ্যাসাগর (হেসে)—তাই হবে।

"তিনি বালকদিগের জন্য বাড়িতে প্রচুর পিণ্টকের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।"[১৩]

শিক্ষকরাও কিছু বঞ্চিত হতেন না। "স্কুলের শিক্ষক বা অধ্যাপক কোনো কার্যসূত্রে স্কুলের কার্যান্তে বাড়িতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বাগ্রে তাঁহাকে জলযোগ করাইতেন। এমন শুনিয়াছি যে, তিনি স্বহস্তে আম কাটিয়া খাওয়াইতেন।"[১৪]

আম কেটে খাওয়ানো বিদ্যাসাগরের প্রায় অভ্যস্ত কাজের মধ্যে ছিল। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে ফরাসডাঙ্গায় থাকার সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে (ইনি 'ব্যাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ নন বলে ইন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন) আম কেটে খাওয়াচ্ছেন। ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের কলেজে চাকুরির প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন।

"কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল, তিনি উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, তা হবে না, কিছু খেয়ে যেতে হবে। বলিয়াই পিছনের হলঘরে ঢুকিলেন। দেখিলাম সেখানে পাঁচ-সাতটি কাঁচের আলমারি আছে, প্রত্যেক তাকে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের আঁব। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে একখানি আসনে বসাইয়া সামনে একখানি রেকাবি দিয়া নিজে ছুরি দিয়া আঁব কাটিতে বসিলেন। একবার এ-আঁবের এক চাক্‌লা দেন, একবার ও-আঁবের এক চাক্‌লা দেন—পাঁচ-সাত রকমের আঁব তাঁহাকে খাওয়াইলেন।"[১৫]

আমের প্রতি আসক্তির কথা শম্ভুচন্দ্রও জানিয়েছেন। "দাদা নিজে আঁব প্রায় খাইতেন না [শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন]; কিন্তু প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ এই তিন মাসে প্রায় পনর শত টাকার আঁব ক্রয় করিয়া [সেকালে ১৫০০ টাকার আম !!] আত্মীয় লোকের বাটীতে পাঠাইতেন এবং বাটীস্থ লোক ও চাকর, চাকরানি, মেথর প্রভৃতিকে আপনি দাঁড়াইয়া আঁব খাওয়াইতেন।"[১৬]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মনে পড়ে যায় :

"আম একা খাইতে নাই। ইষ্টদেবতাকে দিয়া, ব্রাহ্মণসজ্জন পল্লীর প্রতিবেশী সকলকে, এবং কাঙাল ফকির সকলকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া তবে নিজ পরিবারবর্গসহ আম খাইতে হয়।"[১৭]

বিদ্যাসাগর যখন অপরকে খাওয়াচ্ছেন তখন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর নিজের খাওয়া প্রায় নেই। তবু কোন্ আনন্দে খাওয়াতেন, শব্দে-শব্দে তার ছবি এঁকেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি বিদ্যাসাগরের ফরাসডাঙ্গার বাসায় গেছেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে।

বিদ্যাসাগর—তুই এখানে কোথা এসেছিলি ?

হরপ্রসাদ—আপনি এত কাছে আছেন তাই মনে করেছি যদি আপনার পায়ের ধূলা আমার বাড়িতে পড়ে।

বিদ্যাসাগর—কেন, তুই আমাকে ঘটা করে খাওয়াবি নাকি ?

হরপ্রসাদ—সে ভাগ্য কি আমার হবে ?

[ইতিমধ্যে হরপ্রসাদ পূর্বোক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে আম কেটে খাওয়ানো দেখেছেন।]

বিদ্যাসাগর—আমি কি খাই তা জানিস ? বেলশুঁঠোর সঙ্গে বার্লি সেদ্ধ করে তাই একটু-একটু খাই। তবে এই-যে আঁব দেখছিস, ও আমার জন্য নয়। যে নিজে কিছু খেতে পারে না, অন্যকে খাইয়েই তার তৃপ্তি। তাই তো আশুকে অত করে নিজে হাতে আঁব খাওয়াচ্ছিলাম।

বিদ্যাসাগর (বিষণ্ণ কণ্ঠে)—যা হোক, তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। কিন্তু আমি তোকে জিজ্ঞাসা করব না—তোর বাড়ির কে কেমন আছে ? হয়ত তুই বলবি, অমুক মারা গিয়েছে, অমুক ব্যামোয় ভুগছে। এসব শুনতে আর আমার ইচ্ছা হয় না। আমার বড় কষ্ট হয়।

বিষাদের ভাব ঝেড়ে ফেলে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন—বাড়িতে পায়ের ধুলোর কথা বলছিলি, তোরা কি নতুন বাড়ি করেছিস নাকি ?

হরপ্রসাদ—একটু কুঁড়ে বেঁধেছি বই-কি।

বিদ্যাসাগর—আমি গেলে আমায় কী খাওয়াতিস ?

হরপ্রসাদ—বাড়ির মেয়েরা স্বহস্তে পাক করে কী খাওয়াত জানি না। আমাদের দেশের দুটো ভালো জিনিস আছে, আমি মনে করেছিলাম তাই খাওয়াব।

বিদ্যাসাগর—কি কি ?

হরপ্রসাদ—নৈহাটির গজা আর রসমুণ্ডি।

বিদ্যাসাগর—আচ্ছা, তা তবে আনিস।

হরপ্রসাদ—আপনি যখন আনিস বললেন তখন শুভস্য শীঘ্রং—আসছে রবিবারেই নিয়ে আসব।[১৮]

পরের রবিবারে রসমুণ্ডি ও গজা নিয়ে ফরাসডাঙ্গায় গেলেন। হতাশ হয়ে শুনলেন, বিদ্যাসাগর জরুরী কাজে কলকাতা চলে গেছেন। তাঁর ছোট জামাই শরৎ দেখেই বুঝলেন, হরপ্রসাদ বিদ্যাসাগরের জন্য মিষ্টির হাঁড়ি এনেছেন। অবলীলায় তিনি সেগুলি চেয়ে নিয়ে অন্দরমহলে চালান দিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ। বিদ্যাসাগরের পরবর্তী জীবনীকারদের সরবরাহ করার জন্য তিনি এই তথ্য জোগাড় করে রাখছিলেন, "তিনি তো আর খান না, আমরাই খাই। তিনি তো খাইয়েই খুশি।" হরপ্রসাদ কিন্তু জামাই শরতের মতো খুশি হতে পারেন নি। তাঁর ঈপ্সিত পরবর্তী গজা রসমুণ্ডি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে বা ওষ্ঠে পৌঁছয় নি। অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের দেহান্ত হয়।

খাওয়া নয়, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে খাওয়ানোই আসল। কখনো দেখা গেছে তিনি বিয়েবাড়িতে কোমর বেঁধে লুচি পরিবেশন করছেন, কখনো বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের পাতে বসিয়ে বহুক্ষণ ধরে খাওয়াচ্ছেন বহু যত্নে। বিয়ে বাড়িতে লুচি পরিবেশনের ব্যাপারে তাঁকে বোধহয় সবচেয়ে খুশি দেখা গিয়েছিল প্রথম বিধবাবিবাহকারী গিরিশচন্দ্র কবিরত্নের বড় মেয়ের বিয়ের রাতে। অনেকেই গণ্ডগোল পাকাবার তালে ছিল, কিন্তু স্বয়ং বিদ্যাসাগর যখন পরিবেশনকর্তা তখন মাথা গুঁজে খেতে হয়েছিলই।[১৯]

বিদ্যাসাগর প্রায়ই নিজের বাড়িতে আত্মীয় ও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। যখন বড়মাপের আয়োজন করতেন তখন "এদেশীয় পদ্ধতি অনুসারে বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত উপবাসে অপেক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণভোজন হইতে ইতরজাতীয় প্রত্যেক লোকটির আহারের পরিসমাপ্তি না হইলে নিজে আহার করিতেন না।"[২০]

নিমন্ত্রণ করে বিদ্যাসাগর কিভাবে খাওয়াতেন তার একটা ছবি শশিভূষণ বসুর বর্ণনা থেকে দেখে নেওয়া যায়। শশিভূষণ তখন হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের বাড়িতে থাকতেন। সেখানে হেরম্বচন্দ্রের পিতা চাঁদমোহন মৈত্র এসেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁদের সকলকে "দুটি ডাল ভাত" খাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এঁরা বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাসায় উপস্থিত হলে তিনি ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছেন। তারপর সকলে আহারস্থানে গেলেন।

"আমরা ভোজনে বসিলে [শশিভূষণ লিখেছেন] বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি মোড়ার উপর আমাদিগের নিকট উপবেশন করিলেন, করিয়া বলিলেন, 'আমি পীড়িত, অম্বলের পীড়ায় ভুগিতেছি, তাই আমি ১০টার সময় আহার করি, সেজন্য বাপু তোমরা কিছু মনে করিও না।' আহারের আয়োজন দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম, সুখী হইলাম। প্রত্যেকেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থালার উপর সুন্দর চাউলের অন্ন ও থালাগুলি চারিদিকে ব্যঞ্জনপূর্ণ বহু বাটিতে বেষ্টিত।"

রসনা পরিতৃপ্তির বহুবিধ উপাদেয় আয়োজন—কম উপাদেয় ছিল না বিদ্যাসাগরের সরস গল্পের রসান :

"বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ সুরসিক পুরুষ ছিলেন। আমরা যখন ভোজনে রত তখন তিনি হুঁকা হাতে করিয়া নানারূপ গল্প জুড়িয়া দিলেন। একটি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া নিমন্ত্রণে ভোজনের বিষয়ে বলিলেন, জন্ম বার-বার হইতে পারে কিন্তু নিমন্ত্রণ সকল সময় ঘটিয়া ওঠে না ; সেজন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের উচিত, ভোজনের সময় লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উচিত মতোই ভোজন করা, ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ মিষ্ট গল্পের সঙ্গে আমরা মিষ্ট ব্যঞ্জনাদি দ্বারা রসনারও তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলাম।"[২১]

বিদ্যাসাগর এমন দুই ব্যক্তিকে খাইয়েছেন যাঁদের একজনের খ্যাতি বাংলা

ছাড়িয়ে ভারতে ছাড়িয়েছে, অন্যজনের ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বে। প্রথম জনের নাম বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয়ের নাম রামকৃষ্ণ।

বঙ্কিমকে খাওয়ানোর সময়ে শেষ পাতে কিছু অম্লরস অধিকন্তু বাক্যে পরিবেশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তারকনাথ বিশ্বাসের স্মৃতিকথায় এই নতুন কথাটি পাই যে, বিদ্যাসাগর অনেক সময় নিমন্ত্রণ করে নিজেই রেঁধে খাওয়াতেন। তাতে আয়োজনের বাহুল্য থাকত না, কিন্তু রন্ধনের নৈপুণ্যে তা অসামান্য হয়ে উঠত।

"তিনি [বিদ্যাসাগর] বর্ধমানে আসিলে [তারকনাথ লিখেছেন] পিতৃদেব সময়ে সময়ে তাঁকে ভোজ দিতে অনুরোধ করিতেন। শরীর সুস্থ থাকিলে অনুরোধ প্রায়ই রক্ষিত হইত। এ ভোজ তাঁহার স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করানো মাত্র। একদিন ভোজ আমাদের বাসায়। ভোক্তা বাবু দুর্গাদাস মল্লিক, বঙ্কিমবাবু, সঞ্জীববাবু এবং আরও দুই-একজন লোক। সাগরের একটা কড়া বাঁধ ছিল। সে বাঁধনীর ভিতর না আসিতে পারিলে তিনি খাওয়াইতেন না। সেটি এই যে, তিনি স্বয়ং যাহা পাক করিতে পারিবেন তাহার অতিরিক্ত কোনও দ্রব্য ভোক্তারা আহার করিতে পারিবেন না। সুতরাং মেনু অতি সামান্যই হইত। কথিত দিনের মেনু—ভাত, পাঁঠার ঝোল এবং আম-আদা দিয়া পাঁঠার মেটের অম্ল। আহারের সময় গগনভেদী বাহবা পড়িতেছে। আর দেবহৃদয় বিদ্যাসাগর-মহাশয় স্বহস্তে উপবীত গলায় জড়াইয়া সহাস্যে পরিবেশন করিতেছেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এমন সুস্বাদু অম্ল তো কখনও খাই নাই।' সঞ্জীববাবু সহাস্যে বলিলেন, 'হবে না কেন, রান্নাটা কার জানো তো, বিদ্যাসাগরের।' বিদ্যাসাগর-মহাশয় তেমনই হাসির সহিত উত্তর দিয়া বলিলেন, 'না হে না, বঙ্কিমের সূর্যমুখী আমার মতো মূর্খ দেখে নি।' বঙ্কিমবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু একটা হাসির তুফান উঠিয়াছিল।"[২২]

নিজের জীবনের পৃষ্ঠা ওল্টাবার সময়ে বিদ্যাসাগর দেখেছেন, তার কোনো পরিচ্ছেদই অপাঠ্য নয়। সেই ফেলে আসা পাতাগুলো দেখার সময়ে অনুভব করতে চাইতেন, ওরা আমারই অংশ। তাই তিনি পরবর্তী সম্পন্ন অবস্থাতেও মাঝে মাঝে নুন-ভাত খেতেন। কোনোদিন-বা শেষের পদ থেকে শুরু করে প্রথমের পদে ফিরে আসতেন—প্রথমে মিষ্টি, তারপর ক্রমান্বয়ে টক, তরকারি, ঘি, নুন দিয়ে ভাত এবং শুধু ভাত। কেন? বিদ্যাসাগর নিজেকে পরীক্ষা করতেন— তিনি স্বচ্ছন্দে নিজ জীবনের সকল কক্ষে যাতায়াত করতে পারেন কি-না? মানুষের দশ দশা। পুরনো দশা ফিরে এলে স্বাভাবিক থাকার উপরেই নির্ভর করে মানুষের আত্মমর্যাদা।[২৩]

এখানে পুনশ্চ স্মরণ করব তাঁর সেই মহাবীর্যের ঘোষণা। চাকরি গেলে কি করে খাব? খাব, আলু-পটল বেচে। কি খাব?—ডাল ভাত।

রামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগর যখন খাইয়েছিলেন তখন তাতে কোনো অম্ল ব্যাপার ছিল না—শুধুই মিষ্টান্ন। আগেই সে কাহিনী আমি উপস্থিত করেছি।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সে জিনিস বিদ্যাসাগরের অদৃষ্টপূর্ব। সমাধিভঙ্গের কালে তাঁর অভ্যস্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ, 'জল খাবো'। বিদ্যাসাগর কথাটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থার কথা বাদ দিলেও, রামকৃষ্ণ অবশ্যই কিছু চেয়ে খেতেন, কারণ তাতে গৃহস্থের কল্যাণ। আর, বিদ্যাসাগর কোনো অতিথিকে না খাইয়ে যেতে দিয়েছেন, ভাবাই যায় না। রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তিনি ঈষৎ সংকোচে ছিলেন, এই ধরনের মানুষ কি বিদ্যাসাগরের মতো ধর্ম-উদাসীনের বাড়িতে আহার্য গ্রহণ করবেন? তাই যখন 'জল খাবো' শুনলেন, তখনই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রামকৃষ্ণকে তিনি মিঠাই খাইয়েছিলেন।

সর্বোচ্চ অধ্যাত্মপুরুষ থেকে অতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের জন্যই বিদ্যাসাগরের প্রসারিত সেবার হাত। একবার বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করেছেন। বালকপুত্র-সহ দ্বারকানাথ মিত্র আছেন। মস্ত আয়োজন। ছোট ছেলেটি সব কিছু সামলাতে পারছে না। বিদ্যাসাগর আহার বিষয়ে তাকে শিশুশিক্ষা দিয়েও যখন যথেষ্ট শিক্ষিত করতে পারলেন না, তখন নিজেই তার কাছে বসে গিয়ে "জননীর মতো অন্নব্যঞ্জন মাখিয়া, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র গ্রাস প্রস্তুত করিয়া, তাহার খাবার সুবিধা করিয়া দিলেন।"[২৪] এক পাগলিনীকেও ওইভাবে ৬ মাস খাইয়েছেন। ইনি সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী, বিদ্যাসাগরকে বাবা বলে ডাকতেন। উন্মাদিনী হয়ে পড়ার পরে একমাত্র বিদ্যাসাগরই তাঁকে খাওয়াতে পারতেন। "বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময়ে একাদিক্রমে ছয় মাস কাল বেলা দশটার সময় সেই কন্যাস্থানীয়া মহিলাকে আহার করাইয়া গিয়াছেন।"[২৫]

দুর্ভিক্ষের সময়ে নিজ গ্রামে বিদ্যাসাগর কিভাবে অজস্র মানুষের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ইতিহাস হয়ে আছে। শম্ভুচন্দ্র তাঁর সাদা-মাঠা কলমে ১২৭২ সনের দুর্ভিক্ষের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা রচনাগুণে নয়, তথ্যগুণে প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের বিখ্যাত দুর্ভিক্ষ বর্ণনার কাছে পেঁছে গেছে।

"সন ১২৭২ সালে এ প্রদেশে অনাবৃষ্টি-প্রযুক্ত কিছুমাত্র ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয় নাই। ...ঐ সালের পৌষ মাসে কোনও-কোনও কৃষক যৎসামান্য ধান্য পাইয়াছিল, তাহাও প্রায় মহাজনগণ আদায় করেন। কৃষকদের বাটীতে কিছুমাত্র ধান্য ছিল না। দুঃসময় দেখিয়া ভদ্রলোকেরা, ইতরলোককে কোনও কাজকর্ম করান নাই। সুতরাং যাহারা নিত্য মজুরি করিয়া দিনপাত করিত তাহাদের দিনপাত হওয়া কঠিন হইল। জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোনা প্রভৃতি গ্রামে অধিকাংশ তাঁতীর বাস। ...যে-অবধি বিলাতী কলের কাপড় হইয়াছে...তৎকালে ইহাদের বস্ত্র বিক্রয় হইত না। ঐ সময়ে টাকায় পাঁচ সের চাউল বিক্রয় হইত, তাহাও সকল সময়ে দুষ্প্রাপ্য। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই তিন মাস অনেকেই ঘটি-বাটি ও অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করে। পরে চাউল-ক্রয়ে অপারগ হইয়া কেহ-

বুনো ওল ও কচু খাইয়া দিনপাত করে, এবং নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিয়া অনাহারে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। শত শত ব্যক্তি সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া পেটের জ্বালায় কলিকাতায় প্রস্থান করে। ···তৎকালে কেহ জাতির বিচার করে নাই। জননী সন্তানকে পথে ফেলিয়া দিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করে। অনেক কুলকামিনী জাত্যভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া জাত্যন্তরিতা হয়। চতুর্দিকেই হাহাকার শব্দ, কেহ কাহারও প্রতি দয়া করে নাই। ···আমাদের বীরসিংহবাসী অধিকাংশ লোক প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। ···কোনো-কোনো দিন রাত্রিতেও সন্নিহিত গ্রামের ভদ্রলোকগণ উদরের জ্বালায় দ্বারে-দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিত, তাহাদিগকে খাইতে না দিলে সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিত।"

বিদ্যাসাগর যথাসম্ভব দুর্ভিক্ষসেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর নিজের বাড়িতে অন্নসত্র হয়েছিল। তাঁর চেষ্টায় সরকার অন্যত্র অন্যসত্র খুলেছিল। বিদ্যাসাগর এই সময়ে প্রায়ই গ্রামে যেতেন। প্রথম দিকে অবস্থা এমন ভয়াবহ ছিল যে, পাতে খিচুড়ি পড়লে মা ছেলেকে না দিয়ে নিজেই তা খেয়ে ফেলত। সময়-বিশেষ মধুরেণ ব্যাপারও ঘটেছে। এক গর্ভবতী নারী প্রতিদিন ভোজনে আসত। তার সাধভক্ষণের আয়োজন হয়েছিল—মাছ, দই, পায়েস, মিষ্টান্ন, ইত্যাদি যোগে। অনেকে আবার রোজ খিচুড়ি খেয়ে অরুচি বোধ করবার পরে আবদার ধরেছিল, সপ্তাহে একদিন ভাত-মাছ হলে ভালো হয়। "এ-কারণ প্রতি সপ্তাহে একদিন অন্ন, পোনা মৎস্যের ঝোল ও দধি হইত।"

আর সেই ছবিটি—মাতা বিদ্যাসাগরের !! মধুসূদন বিদ্যাসাগরের মধ্যে বাঙালী মায়ের প্রাণ তো দেখেছিলেনই।—

"অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া, দুঃখিত হইয়া, তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত তাহারা পাছে মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোককে স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত। ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকের মস্তকে তৈল মাখাইয়া দিতেন।···সেই অবধি সকলে তাঁহাকে বলিত যে, ইনি দয়াময় দয়ার সাগর। নীচজাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় স্বয়ং তৈল মাখাইয়া দেন, ইনি তো মানুষ নন—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।"২৬

দুঃখী মানুষের স্বপ্নের কিছু আবদার থাকে, আর স্বপ্নের দেবতা তা পূরণ করেনও। এক অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক, স্ত্রীর হাত ধরে ভিক্ষা করে বেড়ায়। একদিন সারা শহর ঘুরেও ভিক্ষা মেলেনি। উপস্থিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের ফরাসডাঙার বাসায়। বিদ্যাসাগর তার মুখে সব কথা শুনে কয়েকটি পয়সা ভিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর স্বভাবমতো জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোর কী খেতে ইচ্ছা হয়?" সে বলেছিল, "লুচি দই খেতে ইচ্ছা হয়।

অনেকদিন খাইনি।" বিদ্যাসাগর নিজ কন্যাকে দিয়ে লুচি ভাজিয়ে ভিক্ষুক ও তার স্ত্রীকে পেট ভরে খাইয়েছিলেন। তারপর দুটি টাকা হাতে দিলেন। তাদের ঘরভাড়ার জন্য প্রতি মাসে আট আনা দেবেন তাও বললেন। শেষ করলেন এই বলে, "তোরা প্রত্যেক রবিবারে এসে লুচি খেয়ে যাস।"[২৭]

তাঁর করুণার স্রোত মানুষকে ছাপিয়ে প্রাণীজগৎ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কুকুর বেড়ালকে মারা সহ্য করতে পারতেন না, তাদের মারলে তাঁর চোখে জল ঝরত।"[২৮]

পক্ষীকুলে অতীব অসুন্দর যে কাক, সেও তাঁর কাছে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতো না। শিক্ষাবিৎ ক্ষুদিরাম বসু তাঁর কাছে এসেছেন, বিদ্যাসাগরের দেওয়া কমলালেবু খেয়ে তার ছিবড়াগুলো ফেলে দিতে যাচ্ছেন—বিদ্যাসাগর বাধা দিলেন, "ওসব ফেলো না, ও-জিনিস খাবার লোক আছে।" ক্ষুদিরাম বসু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "লেবুর ছিবড়ে খাবে কে?" বিদ্যাসাগর বললেন, "জানলার বাইরে রাখো, দেখবে যারা খাবার তারা আসবে।" ক্ষুদিরাম বসু কথামতো কাজ করলেন, কিন্তু খাবার জন্য কেউ এল না। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কই কাউকে তো দেখছি না।" বিদ্যাসাগর বললেন, "তোমার চোগা-চাপকানের বহর দেখে তারা আসছে না। তুমি সরো দিকি।" এই বলে তিনি জানলার ধারে দাঁড়ানো-মাত্র কা-কা রব তুলে কাকের দল এসে তাদের খাদ্য তুলে নিয়ে চলে গেল।[২৯]

॥ ৩ ॥

অপরকে তো বিদ্যাসাগর খাওয়াতেন—নিজে কী রকম খেতেন? ইতিমধ্যে যেসব তথ্য দিয়েছি তাতে তাঁর দুই প্রান্তের খাওয়ায় কথা আছে—বাল্যে দারিদ্র্যের জন্য যৎসামান্য ভোজন এবং পরিণত বয়সে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে অতি অল্পাহার। মধ্যপর্বে যখন অর্থ ও স্বাস্থ্য দুইই আছে তখন কী পরিমাণে কত রকম আহার করতেন, সে-বিষয়ে স্মৃতিলেখক বা জীবনীকাররা প্রায় নির্বাক। মনে হয়, বিদ্যাসাগরকে নিরন্তর উপবাসী দেখালে তাঁর মহিমাবৃদ্ধি হবে, এমন ধারণা তাঁদের মনে গড়ে উঠেছিল। শম্ভুচন্দ্র তো বিদ্যাসাগরের জীবদুঃখকাতরতার সঙ্গে তাঁর দুধ না-খাওয়াকে জুড়ে দিয়েছেন: "এই সময়ে [যখন চাকরি করেন] তিনি দুগ্ধ ও তদ্দ্বারা যে-সকল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তৎসমস্ত ভোজন করিতেন না। ইহার কারণ এই-যে, গাভী দোহনসময়ে বৎসকে আবদ্ধ রাখায় সেই বৎস স্তন্য-পানার্থে ছটফট করে। কিন্তু মনুষ্য এমন নৃশংস ও স্বার্থপর যে, তাহার মাতৃদুগ্ধ তাহাকে পান করিতে দেয় না। এইরূপ গাভীর দোহন দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত মানসিক কষ্ট হইত। কখনও-কখনও চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল তিনি দুগ্ধ ও ঘৃতের দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি ভোজন করিতেন না, এবং তৎকালে মৎস্যও ত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন করিতেন।...পরে

জননীদেবীর অনুরোধের বশবর্তী হইয়া মৎস্য খাইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তদবধি দুগ্ধ অসহ্য হইল, অর্থাৎ দুগ্ধ পান করিলে ভেদ ও বমি হইত।"[৩০]

বেশ ভালো। দাদার সম্বন্ধে ভাইয়ের কথায় 'না' বলা যায় না। তবে বিদ্যাসাগরের নিজের কথাই বা ঠেলি কি করে, যার উল্লেখ আগে করেছি, দুধ পেটে সহ্য হতো না বলেই তিনি দুধ খেতেন না, বিশেষত উত্তরপাড়ায় গাড়ি দুর্ঘটনায় পরে। সে সংবাদ আগেই দিয়েছি। ব্যাপারটা শারীরিক, মোটেই মানসিক নয়। আর, দুধ না খেলেও দুগ্ধজাত দ্রব্যে তাঁর অরুচি ছিল না। ছানাবড়ার উপর তাঁর খুবই টান ছিল। ছাত্রাবস্থায় যিনি 'লুচী কচুরী মতিচুর' ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক লিখে সরস্বতীকে লক্ষ্মীলাভের উপায় বলে কার্যত নির্দেশ করেছেন (লুচি কচুরি লক্ষ্মীদেবীর ভাণ্ডারের বস্তু), তাঁর রুচি বুঝতে অসুবিধা হয় না। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক উপাদেয় কাহিনীর মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর যে পিতার উচ্ছিষ্ট ভোজন করতেন ভক্তিভরে—একথা তিনি ভক্তিভরেই লিখেছেন। কিন্তু চণ্ডীচরণ যখন লিখলেন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে বিদ্যাসাগর মাঝে-মাঝে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের ছাত্রাবাসে হাজির হয়ে, মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে, ভিজে কাপড়েই ছাত্রদের পাত্র থেকে এক-এক গ্রাস আহার্য তুলে উদরপূর্তি করে নিতেন[৩১]—তখন শম্ভুচন্দ্র খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ, প্রথমত, তিনি লিখলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরিচিত ভিন্নশ্রেণীর ছাত্রবর্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন, এই অসম্ভব বৃত্তান্তটি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া, অনেক হিন্দুর মনে বিদ্যাসাগরের প্রতি অশ্রদ্ধার বীজ স্থাপন করিয়া, চণ্ডীবাবুর কি ইষ্টসিদ্ধি হইল তাহা তিনিই জানেন। আমরা কিন্তু কখনও এই বৃত্তান্তের অণুমাত্রও শ্রবণ করি নাই। এমন-কি আমি তাঁহাকে পিতা-মাতা ভিন্ন অন্য কাহারও কখনও উচ্ছিষ্ট খাইতে দেখি নাই।" দ্বিতীয়ত, শম্ভুচন্দ্র এই প্রশ্নের ছুরিটিও ছুঁড়ে দিয়েছেন: "ঐ সময়ে তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের অন্নপ্রাশন হইয়াছিল কি?"[৩২]

সুতরাং উচ্ছিষ্ট ভোজন ছেড়ে অনুচ্ছিষ্ট ভোজন ব্যাপারে এসে প্রশ্ন করতে পারি, বিদ্যাসাগর কি মাংস ভোজন করতেন? কোনো উল্লেখ এতাবৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে যিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিকে পাঁঠার ঝোল এবং পাঁঠা-মেটের অম্বল রেঁধে খাইয়েছেন, (অপরকেও নিশ্চয় খাইয়েছেন), তিনি 'ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস', ছিলেন কিংবা ঘ্রাণের অর্ধাহারেই পরিতৃপ্ত থাকতেন, এমন বিশ্বাস করি কি করে? আহা, ঈশ্বর গুপ্ত কি কথাই লিখে গেছেন: "রসভরা রসময় রসের ছাগল / তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল। /···শাদা কালো কটা রূপ বলিহারি গুণে / সাত পাত ভাত মারি ভ্যা-ভ্যা রব শুনে। /···মজা দাতা অজা তোর কি লিখিব যশ / যত চুষি তত খুশি হাড়ে হাড়ে রস।"

হয়ত তিনি পাঁঠার ঝোল খেতেন, কিন্তু মুরগি কদাপি নয়। এবং মাতালদের এড়িয়ে চলতেন। কার্মাটারে যখন থাকতেন তখন তাঁর ভালবাসায়

বাঁধা-পড়া সাঁওতালরা সাধ্যমতো উপহার আনত। এক বেচারা সাঁওতালের ছোট একটা মুরগি ছাড়া দেবার মতো কিছু ছিল না। বিদ্যাসাগর নিজের পৈতে দেখিয়ে বলেছিলেন, "বাপু, ওটি কিন্তু নিতে পারব না।" তার কান্নাকাটিতে পড়ে শেষপর্যন্ত সেটি নিলেও, সে বস্তু তাঁর গ্রাহ্য ছিল না।[৩৩] আমরা জেনেছি যে, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ-কেউ মুরগি-ভোজী ও মদ্যপ ছিলেন, কিন্তু ওইসব ব্যক্তি "তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কখনও নিজের বাড়িতে খাওয়াইতে পারিতেন না।"[৩৪]

উপবীতধারী বিদ্যাসাগর, তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র যাই বলুন, কায়স্থ-শূদ্রের পাত থেকে মাছের মুড়ো তুলে খেয়েছেন। তা নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়িতে চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। হরপ্রসাদের বয়স যখন পাঁচ তখন বিদ্যাসাগর তাঁদের বাড়িতে একবার আসেন।

"একদিন সকালে উঠিয়াই দেখি [হরপ্রসাদ লিখেছেন] মেয়েমহলে খুব সোরগোল উঠিয়াছে, 'ওমা, এমন তো কখনও শুনি নি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুই মাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে!' কেউ বলিল, 'ঘোর কলি!' কেউ বলিল, 'সব একাকার হয়ে যাবে।' কেউ বলিল, 'জাতজন্ম আর থাকবে না।' আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে কেড়ে খেয়েছে?' মা বলিলেন, 'জানিস নি? বিদ্যাসাগর।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তিনি কি এখানে এসেছেন?' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল থেকে এসেছেন'।"[৩৫]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা আর একটু উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে বিদ্যাসাগরের ওই প্রকার আচরণ ব্রাহ্মণ-বাড়িতে কী ধরনের অসন্তোষজনক মনে হয়েছিল:

"বাড়ির পুরুষদেরও দেখিলাম সব মুখ ভার। কেউই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ-ব্যবহারটা পছন্দ করেন নাই। না করিবারই কথা। কেন-না সেই বৎসরই প্রথম বর্ষায় একদিন আমার দাদা, আমার নূতন ভগ্নীপতি এবং আমার এক জ্যেঠতুতো ভাই—তিনজনে গোয়ালঘরে লুকিয়ে মুসুর ডালের খিচুড়ি রেঁধে খেয়েছিলেন—এই অপরাধে বাড়ির বুড়োকর্তা তিনজনকেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন। তারা এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় শুইয়া থাকিত। বাড়ি থেকে ভাত বহিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া আসিতে হইত। ক্রমে মার অত্যন্ত সাধ্যসাধনায় বুড়োকর্তা বৈধ গঙ্গাস্নান করাইয়া আমার ভগ্নীপতিকে প্রায় পনর দিন পরে বাড়ি আসিতে দিলেন। বাকি দুজনের আরও পনর দিন লাগিয়াছিল।"[৩৬]

বিদ্যাসাগরের 'বে-হিসেবী' কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়ির লোকেরা যতই রাগ করুন, বিদ্যাসাগর হরপ্রসাদের বাড়ির রান্না প্রত্যাখ্যান করার মতো বেরসিক ছিলেন না—এমন কি প্রৌঢ় বয়সেও। তখন তিনি কার্মাটারে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেখানে গেছেন। সঙ্গে বাড়ি থেকে আগের পরশুদিন ভাজা, কলাপাতায় জড়ানো লুচি আছে। বিদ্যাসাগর সেগুলি সাঁওতালদের দিতে দেন নি, কারণ "ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে?" তিনি সেই বাসি

লুচি বাতাসে মেলে, কাঁচা কলাপাতার গন্ধ দূর করে, তাড়ার মধ্য থেকে চারখানা লুচি রেখে দেন। কেন? "তিনি বলিলেন, 'খাবো রে। তোর মায়ের হাতের ভাজা?' আমি বলিলাম, 'না, বড় বউয়ের।' তিনি বলিলেন, 'তবে আরও ভালো। নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুর বিধবা পত্নীর? নন্দ আমার বড় প্রিয়পাত্র ছিল।"৩৭

ভোজ ব্যাপারটিকে আনন্দের ভোজ করে তুলতে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে ভোজন-সমিতি (gastronomy) তৈরি করেছিলেন। ৯।১০ জন সদস্যের মধ্যে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের কার্যাধ্যক্ষ দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য, মেট্রপলিটানের শিক্ষক প্রসন্নচন্দ্র রায়, হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বিদ্যাসাগর ছিলেন। এঁরা দল বেঁধে এক-একজনের বাড়িতে গিয়ে উৎপাত করতেন। যখন তাঁরা হাজির হতেন, গৃহস্বামী গোড়ায় দূর দূর করে তাড়াতে চাইতেন, কিন্তু সমবেত ক্ষুধার আক্রমণের কাছে তাঁকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হতো—তারপরে অবশ্যই ভূরিভোজ। এহেন এক জাঁকালো ভোজের পরে, এক সদস্য (সম্ভবত দ্বারিক মিত্র) এমন কাত হয়ে পড়লেন যে, সকলকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় লাগতে হলো। ভোজন সমিতির সদস্যের এই লজ্জাজনক পতন দেখে যখন অন্যান্যরা বলতে লাগলেন, 'এর সদস্যপদ কেটে দেওয়া হোক, এর পেটের দোষ আছে', তখন বিদ্যাসাগরের রসালো উক্তি :

"আরে না না, ও কাজ করো না, করলে অধর্ম হবে। এ লোকটা আদর্শের জন্য শহীদ। He is martyr to the cause".৩৮

পাদুকা পুরাণ

আপাদমস্তক দেখাই নিয়ম। অর্থাৎ প্রথমে পা, শেষে মাথা। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে আমি তার বিপরীত করেছি—আরম্ভ করেছি মাথা থেকে। এখন তাঁর শ্রীচরণের দিকে নজর দেবার সময় এসেছে।

এই উল্টো কাজে আমার হয়ত অপরাধ হয়েছে। উল্টোপাল্টা কাজ করার জন্য সারাজীবন ধরে কত ধমকই যে খেলাম! বাল্যকালের কথা মনে পড়ছে। স্কুলে পড়ি। আমাদের এক আদর্শবাদী খ্যাপাটে অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে মুখস্থ করা জ্যামিতির উপপাদ্য লিখে দেখিয়েছিলুম—"ধরো, এ-বি-সি একটি ত্রিভুজ।" প্রথম লাইন পড়েই প্রচণ্ড রাগে খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে তিনি বলেছিলেন—"ধরো এ বি সি একটি ত্রিভুজ! ধরো!! আমি তোমার ইয়ার? তাই লিখেছ, 'ধরো'? কেন, 'ধরিতে হইবে' লিখতে পারো না?" মানুষটি রাগী হলেও ভালো। আমি অবস্থা সামলাবার জন্য আদুরে গলায় বলে উঠেছিলুম—"স্যা-র! আপনি বিদ্যেসাগরী চটি পরেছেন!" এবার আর ধমক নয়, কানে হ্যাঁচকা টান। "নচ্ছার ছেলে, গুরুজনদের সম্বন্ধে কী করে কথা বলতে হয় জানো না? আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামের জিনিস পায়ে পরব? কেন, বলতে পারো না—'আপনি স্যার তালতলার চটি পরেছেন'?"

আমার সেই স্যার জীবিত নেই। নইলে নেতাজী বিড়ি, মহাত্মা খেনো, রবীন্দ্র সেলুন, দেখলে হয়ত প্রথমে খুন-জখম, তারপরে আত্মহত্যাই করে বসতেন।

সেই স্যার, ধরে নিতে পারি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা বিদ্যাসাগরের চটি-বন্দনার কথা জানতেন। মানুষ-সন্ধানে ব্যগ্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বোধহয় অপ্রাপ্তির হতাশাই ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। তখন তিনি খুঁজতে চাইলেন সেই "ধূলায় ধূসর বাঁকা চটিটিকে", যা মাঝে মাঝে উচ্চে উঠে "শিক্ষা দিত অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার।" শাস্ত্রকে শস্ত্র করে তুলে যারা অপরের হৃদয় বিদারণ করে, যাদের তর্ক-বিতর্ক বস্তুতপক্ষে টিকির আন্দোলন ছাড়া কিছু নয়, বিচারকালে যাদের পুঁজি কেবল কতকগুলি যুক্তিহীন অক্ষর—তাদের শাসনের জন্য রয়েছে বিদ্যাসাগরের চটি। কবির ঘোষণা:

"সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।"

এই কবিতা লেখার সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের মনে অবশ্যই কৃত্তিবাস ঘোরাফেরা করেছিলেন। কবি তাঁর আদর্শ করেছিলেন রামের ভাই ভরতকে। কামুক

পিতার দুর্বলতা এবং কামিনী সৎমায়ের রাজ্যলোভের মূল্য দিতে রামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়েছিল। কিন্তু যার জন্য কৈকেয়ীর নীতিঘাতী এবং পতিঘাতী নিষ্ঠুরতা, সেই তাঁর পুত্র ভরত ছিলেন মেরুদণ্ডী পুরুষ। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করবেনই—যখন ভরত তা বুঝলেন, তখন তিনিও স্থির করলেন—ভ্রাতৃসত্য পালন করবেন—রামচন্দ্রের পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে তার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য চালাবেন।

"যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য নয়॥
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে ভরত কাহারে নাহি ডরে॥"

রামচন্দ্র বৃথা বিনয়ে অভিভূত না হয়ে তাঁর পাদুকা ভরতকে দিয়েছিলেন, ভরত সেই পাদুকা শিরে গ্রহণ করে, "ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে" স্বস্থানে পেঁাছেছিলেন।

"বিশ্বকর্মা পাঠাইয়া দেন ভগবান।
নন্দীগ্রামে অট্টালিকা করিল নির্মাণ॥
রত্নসিংহাসনেতে ভরত পট্ট পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসারচর্মে।
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্মে॥"

এ কি ইতিহাস? যদি ইতিহাস হয় তাহলে বিশ্বাস করা শক্ত এমন মহিমার ইতিহাস। সে রাম নেই, সে ভরত নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পাদুকার ইতিহাস তো বেশি পুরনো নয়, কিছু-বেশি একশো বছর আগেকার কথা, নিরতিশয় বাস্তব সত্য। এখানে কেবল বলতে পারি, সে বিদ্যাসাগর নেই, সে বঙ্গদেশ নেই। আর ভরত? বিদ্যাসাগরের কালেও তাঁরা ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর সেজন্য নিজেই নিজের পাদুকার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম করেছেন। তেমন একটি কাহিনী:

"১২৮০ সালের ১৬ই মাঘ বা ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীর কবি হরিশচন্দ্রকে* কলিকাতার 'মিউজিয়ম'

---

* বিহারীলাল পাদটীকায় হরিশ্চন্দ্রের এই পরিচয় দিয়েছেন: "হরিশ্চন্দ্র একজন প্রতিভাশালী হিন্দী কবি। হিন্দী কবিত্বযশে বর্তমানকালে তিনি অতুলনীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। গুণগ্রাহিতার গুণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের প্রগাঢ় সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহে বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র জগন্নাথ তীর্থে যাইবার জন্য কলিকাতায় আসেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

[পরপৃষ্ঠায়]

(যাদুঘর) দেখাইতে লইয়া যান। সঙ্গে রামকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তখন পার্ক স্ট্রীটে যাদুঘর ও এশিয়াটিক সোসাইটি এক বাড়িতেই ছিল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশ—সেই থান ধুতি, থান চাদর ও চটি জুতা। কবি হরিশ্চন্দ্রের পোশাক-পরিচ্ছদ আধুনিক সভ্যজনোচিত—পায়ে ইংরাজি জুতা, গায়ে চাপকান, চোগা এবং মস্তকে পাগড়ি। গাড়ি হইতে নামিয়া তিনজনেই যাদুঘরে প্রবেশোন্মুখ হইলেন। দ্বারবান বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাইতে নিষেধ করিল। হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে নিষেধ রহিল না। সুরেন্দ্রবাবুও নিশ্চিতই সুসজ্জিত ছিলেন; কেননা তিনিও অবাধে প্রবেশাধিকার পাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্য বুঝানো হইল, তাঁহার মতন একজন উড়িয়াকে জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়িতে আসিয়া বসিলেন। এ সংবাদ তৎকালীন এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিট্যান্ট সেক্রেটারি ও কলিকাতার ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আমি আর যাইতেছি না। অগ্রে কর্তাদিগকে পত্র লিখিয়া জানিব, এরূপ কোনো নিয়ম আছে কিনা? আর যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিতে পারি তো আসিব।' এই বলিয়া তিনি সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসেন।"[১]

বিদ্যাসাগর আর কখনো মিউজিয়ামে আসেন নি, কারণ তিনি প্রতিকার করতে পারেন নি।

মিউজিয়ামের সেক্রেটারি এইচ এফ ব্লানফোর্ড-কে তিনি ধারালো চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে দেখিয়ে দেন, যাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় কোন্ বিচিত্র অসঙ্গতি—যারা চটিজুতো পরে গিয়েছে তাদের চটি খুলে হাতে করে নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে, অথচ কিছু পশ্চিমা লোক (অর্থাৎ উত্তর ভারতীয় লোক) দেশী জুতো পরেই ভিতরে ঘুরছে। বিদ্যাসাগর এও দেখেছেন, যাঁরা "সম্ভবত কালীঘাটের প্রসাদী পুষ্পমাল্য" গলায় পরে এসেছিলেন তাঁদের ফুলের মালা বাইরে রেখে যেতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বিস্মিত প্রশ্ন, হাইকোর্টেও যখন চটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা নেই, যাদুঘরের বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ট্রাস্টিদের বাড়িতে ওই প্রকার অসম্মানসূচক ও বিরক্তিকর প্রথা আছে বলে শোনা যায় নি, তখন যাদুঘরে ওহেন নিয়ম রয়েছে কেন?

সহিত তাঁহার আলাপ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আপনার সকল পুস্তকের অনুবাদাধিকার দিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী যখন কাশীধামে ছিলেন, হরিশ্চন্দ্র তখন তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। একদিন হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীকে বলেন—'বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে রুপার খাড়ু।' ইহাতে বিদ্যাসাগরের জননী উত্তর দেন—'সোনা রুপায় কি করে? এই হস্ত রাঁধিয়া সহস্র সহস্র লোককে খাওয়াইয়াছিল। তাহাই উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের শোভা।' কবি হরিশ্চন্দ্র অকালে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ৩৪ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।" (বিহারীলাল, পৃ. ৩২০)।

"এই জুতা-রহস্যের কারণ আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, [বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন]—যাদুঘর তো সাধারণের আরাম-বিশ্রামের স্থান। এখানে এরূপ জুতাবিভ্রাট দোষাবহ। যাদুঘর যখন মাদুরে মোড়া, বা কারপেটযুক্ত বিছানা, বা কারুচিত্রিত নহে, তখন এরূপ নিষেধ-বিধির আবশ্যকতাই বা কি? তা ছাড়া, পায়ে যাহাদের বিলাতী জুতা, কিন্তু আসিয়াছে পদব্রজে, তাহারা যখন প্রবেশ করিতে পাইতেছে, তখন তাহাদের সমান অবস্থাপন্ন লোকে [তাহাদের] পায়ে শুদ্ধ দেশী জুতা বলিয়া প্রবেশ করিতে পায় না কেন, ইহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। অবস্থা যাঁহাদের ইহাদের অপেক্ষাও উন্নত, আসেন গাড়ি পালকি করিয়া, তাঁহাদের উপরই-বা এরূপ নিষেধবিধি প্রবর্তিত হয় কেন?"[২]

কেন—তার উত্তর, দেশী লোকের পায়ে সাহেবি বুট মানে আনুগত্য, আর চটি মানে দেশী স্পর্ধা। তবে কথাটা তো খোলাখুলি বলা যায় না। তাই মিউজিয়াম-কর্তৃপক্ষ ও এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষের মধ্যে চিঠি চালাচালি হল, মিউজিয়াম-কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরকে জানালেন, তাঁরা উক্ত প্রথা বলবৎ করা সম্বন্ধে কোনো প্রকার আদেশ প্রচার করেন নি, এবং চতুরতার সঙ্গে যোগ করলেন, "ওই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার কোনো কারণ উপস্থিত হয় নাই।" অবস্থা রইল যথাপূর্বম্। খবরের কাগজে হৈ-চৈ হলো। হিন্দু পেট্রিয়ট পরিষ্কার লিখল, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অসদ্ব্যবহারের জন্য কোনো দুঃখপ্রকাশ করা হয় নি, দ্বারবানকে দোষীও করা হয় নি। এমন-কি সাম্রাজ্যবাদী 'ইংলিশম্যান' কাগজও লিখল, "বিদ্যাসাগরের মতো একজন পণ্ডিতের সঙ্গে যখন এমন ব্যবহার তখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে আর কোনো পণ্ডিত যাইতে চাহিবেন না।"

ফল এই: বিদ্যাসাগর নিজের চটির মান বজায় রাখলেন, কিন্তু পরের চটির মান রক্ষা করতে পারলেন না। কিছু মানুষ দুঃখিত হলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের চটিকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিবাদী সরকার স্থাপনের ঝঞ্ঝাটে কেউ গেলেন না। আর, মাঝারি ধরনের একটুকরো ব্যঙ্গ রচনা পেলুম 'সাধারণী' পত্রিকায় (১২ জুলাই ১৮৭৪)—'তালতলার চটি'—যাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ আছে, এবং অনুকরণ যে অসাধ্য, তাও দেখা গেছে।—

"রে তালতলার চটি, ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না। ইংরাজ, বট-বিটপীর সহিত সফোটক [স্যাওড়া গাছ] সমান করিয়া তুলিয়াছেন। কেবল বুট-চটির গৌরব এক করিতে পারিলেন না।…ইংরাজ বিচারকার্যের সাহায্য জন্য সাক্ষী ডাকিয়া আনেন, আনিয়া তিনু ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্বভৌমকে দাঁড় করান, আবার সার্বভৌমের স্থানে গুলজার মণ্ডলকে উঠাইয়া দেন, ইংরাজের চক্ষে উঁচু-নীচ নাই; কেবল রে চর্মচটি, তোরই প্রতি তাঁহাদের সমদৃষ্টি হইল না।…চটি, তুই আপনি আপনার কর্মদোষে মারা গেলি। তোকে যে-সকল মহৎ স্থান দেখাইয়া দিলাম, যদি এতদিন সেই সকল স্থানে বিশ্রামের উদ্যোগ করিতিস, তাহা হইলে এতদিন

তোর গৌরব, তোর গুণ, 'সাটার্ডে রিভিউ' সংহিতা পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইত। সেইরূপ উন্নতির উদ্যোগ করা দূরে থাকুক, তুই কিনা সেই নীচস্য নীচ, বাঙালী জাতির মধ্যে কুসন্তান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—তাহারই ফাটা পায়ের আশ্রয় লইয়া মহামন্ত্রপূত যাদুঘরে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করিস? তালতলা-সম্ভূতার এতদূর স্পর্ধা! শৌণ্ডিকালয়ের নিভৃতার্দ্র প্রদেশে যদি ক্রমাগত দশ হাজার বৎসর উপর্যুপরি থাকিয়া লর্ড মেকলের তপস্যা করিতে পারিস, করিয়া, লালবাজারে জন্মগ্রহণ করত পেন্টুলধারী কোনো কেরানীর পদধূলি সর্বাঙ্গে ধারণ করিতে পারিস, তবে এরূপ স্থানে আসিতে আকাঙ্ক্ষা করিস। তোর এ-জন্মে, এ চর্মচটি জন্মে, কুসন্তান বিদ্যাসাগরের বলে তুই এ-স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবি না।"[৩]

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, যে-দারোয়ান চটি পরে ঢুকতে বাধা দেয়, দোষ তার নয়—সে বেচারা মাইনে খায়, মালিকের বা উপরওয়ালার নির্দেশ মাত্র পালন করে। তাই একবার বর্ধমানের রাজদরবারে যখন বহুবিবাহ সম্বন্ধে আবেদনপত্রে সই করাবার জন্য হাজির হয়েছিলেন, তখন তিনি দারোয়ানের নির্দেশে চটি খুলে ভিতরে ঢুকেছিলেন। তারপর দারোয়ান যখন দেখল, রাজার কাছে লোকটির দারুণ খাতির, এবং অন্য লোককে প্রশ্ন করে সে জানল, লোকটি স্বয়ং বিদ্যাসাগর, তখন তার অবস্থা শোচনীয়। ভাবল, বিদ্যাসাগর নির্ঘাত অভিযোগ করেছেন; ফলে তার নিজের গর্দান না যাক, চাকরির গর্দান তো যাবেই। রাজাবাহাদুর বিদ্যাসাগরকে প্রস্থানকালে দ্বারদেশ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যখন বিদায় নিলেন, তখন দারোয়ান হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল, কাতর প্রার্থনা তার—"ক্ষমা করুন। আমি চিনতে পারি নি।" বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "তোমার দোষ কি? যেমন হুকুম তেমনি কাজ।"[৪]

বিদ্যাসাগর চটি ছাড়েন নি, এবং চটিও বিদ্যাসাগর-কাহিনীর সঙ্গ ছাড়ে নি। বাংলার অভিনয়-জগতের সেরা এক কাহিনী বিদ্যাসাগরের চটি নিয়েই। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী নীলদর্পণ নাটকে অত্যাচারী উড-সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। বিদ্যাসাগর দর্শক। অভিনেতা যেখানে অর্ধেন্দুশেখর, সেখানে স্বতঃই অভিনয়গুণে উড-সাহেবের নরপশুত্ব বিকট হিংস্র চেহারা নিয়েছিল, এবং তা দেখে দর্শক বিদ্যাসাগরের ক্রোধের বজ্রেও আগুন ধরেছিল। পায়ের চটি বজ্রের আকারে ছুটে গিয়ে আঘাত করেছিল অর্ধেন্দুশেখরের মাথায়। তাতে অর্ধেন্দুশেখর মরলেন না—অমর হয়ে গেলেন। চটিটি মাথায় নিয়ে তিনি মঞ্চের উপর থেকে প্রণাম জানিয়েছিলেন ন্যায়মূর্তি বিদ্যাসাগরকে।

ঘটনাটি নাকি সত্যি নয়—গবেষকরা তা একেবারে প্রমাণ করে দিয়েছেন। সবিনয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি। কেবল এইটুকু বলব, সত্য দু'-রকম—মাটি সত্য ও খাঁটি সত্য। মাটি সত্যের বাস্তবতা খাঁটি সত্যকে

টলাতে পারে না।

সত্যসন্ধ মানুষ অহঙ্কারী হন, অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয়। আপসের মহাবাণী তো আমরা সংস্কৃত প্রবচন থেকে সংগ্রহ করে ফেলেছি—"সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা বলবে না।" ওই হিসেবী বাণীকে বিদ্যাসাগর নিজের শ্লেট থেকে মুছে ফেলে তবে বোধোদয়ের শিক্ষা নিতে এগিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলতেই পারেন: "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যার নাকে এই চটিজুতা-সুদ্ধ পা'খানা তুলে টক্ করে লাথি মারতে না পারি।"[৫]

এবং নিম্নের অনবদ্য কাহিনীটিও ঘটাতে পেরেছেন, যার মধ্যে বীররস এবং হাস্যরসের মাখামাখি ভালবাসা:

জে কার, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। তার মানে বিরাট ব্যাপার। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের লোক, কার-এর তুলনায় লঘুভার। কার-সাহেবের পায়ে বুট, বিদ্যাসাগরের চটি। কার-সাহেবের গায়ে কোট, পরনে পেন্টুলুন। বিদ্যাসাগর ধুতি ও চাদর-সম্বল। এখন এহেন এক ভারতীয় উক্তপ্রকার মহা-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সাহেবের নীলরক্ত-রীতিতে যা করা উচিত তাই তিনি করলেন—টেবিলের উপর পা তুলে বসে রইলেন এবং দাঁড়িয়ে-থাকা বিদ্যাসাগরের হাত থেকে কাগজপত্র নিয়ে কাজকর্ম সমাধা করলেন। বিদ্যাসাগর ফিরে এলেন জ্ঞানার্জন করে।

চাকার উল্টোপাকও তো হয়! মহামহিম কার-সাহেবকে কয়েকদিন পরে বিদ্যাসাগরের কাছে যেতে হল কী-একটা কাজে। কার-সাহেব এসেছেন শুনে বিদ্যাসাগর তাঁর মাটিতে নামানো স-চটি পা দুখানি টেবিলের উপরে তুলে দিলেন, তারপর কার-সাহেবকে ঘরে ডেকে আনতে বললেন। ঘরে বসবার অন্য কোনো চেয়ার ছিল না। বিদ্যাসাগরের অভ্যর্থনা-রীতি দেখে দণ্ডায়মান সাহেবের ভিতরে ফুটন্ত আগ্নেয়গিরি। তখনকার মতো তার উপরে ধৈর্যের বরফ চাপিয়ে, কোনোক্রমে তিনি কাজ সারলেন, তারপরে ফিরে গিয়ে পণ্ডিতের অশিষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে মনের আগুন ঢেলে দিলেন কর্তা ময়েট সাহেবের কাছে। ময়েট বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন।

তারপর উভয়ের সংলাপ অতীব মনোহারী:

ময়েট: পণ্ডিত, তুমি কার-সাহেবের সহিত অতিশয় অভদ্র ব্যবহার করিয়াছ। তিনি মান্যজন, তাঁহাকে বসিতে দাও নাই। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার সম্মুখে টেবিলে তোমার দেশীয় পাদুকা-সহ পা তুলিয়া বসিয়াছিলে, সাহেবকে দেখিয়াও তাহা নামাও নাই। ইহা তোমার কিরূপ ব্যবহার?

বিদ্যাসাগর: অতিশয় শিষ্ট ব্যবহার।

ময়েট (বিস্মিত ও রুষ্ট): কি বলিলে? ইহা শিষ্ট ব্যবহার?

বিদ্যাসাগর: অবশ্যই।

ময়েট: কি বলিতেছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বিদ্যাসাগর (হেসে) : সাহেব, শিক্ষা আপনাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। আমরা তো অতি অসভ্য, আর আপনারা সুসভ্য ইংরাজ। তাই ভেবেছিলাম, সুসভ্য কার-সাহেব টেবিলের উপর বুটসুদ্ধ পা তুলে আমাকে ইংরেজি-মতে অভ্যর্থনা করেছেন, সেখানে আমি যদি একইভাবে তাঁর অভ্যর্থনা না করি তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন, আমার শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করেছি। এতে আমার কী অপরাধ বলুন ?[৬]

"সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা" বাঙালী সমাজে (যে কথা বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন) বিদ্যাসাগর উলটপুরাণ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সগৌরবে এই সূত্রে যে-কটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই চরম উচ্চারণ—"তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল।"

ওই চরণযুগলের অঙ্গাভরণ—চটিযুগল।

ধুতি চাদরের বর্ম

"স্বামীজী এক্ষণে বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে আমাদের নিকট 'বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকারী ও বহু বিবাহ-রোধকারী মহাবীর' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিষয়ে স্বামীজীর প্রিয় গল্প ছিল সেইদিনকার ঘটনাটি—যেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে তেমন স্থানবিশেষে সাহেবী পরিচ্ছদ বিধেয় কিনা, এই বিষয়ে চিন্তা করিতে-করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, ধীরে-সুস্থে গুরুগম্ভীর চালে গৃহে গমনরত এক স্থূলকায় মোগলের নিকট এক ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, 'মহাশয়, আপনার বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে।' এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির লেশমাত্রও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিল না। ইহা দেখিয়া সংবাদবাহক ইঙ্গিতে ঈষৎ বিস্ময়োচিত বিস্ময় জানাইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভু সক্রোধে তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'পাজি! খানকতক বাঁখারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তুই আমায় আমার বাপ-পিতামহের চাল ছাড়িয়া দিতে বলিস?' এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার পশ্চাতে আসিতে আসিতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন যে, ধুতি চাদর এবং চটিজুতা কোনোক্রমে ছাড়া হইবে না।"[১]

উদ্ধৃতিটি নিবেদিতার 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' বইয়ের অংশ। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে একটি সরস অথচ গভীর বিদ্যাসাগর 'কাহিনী' দান করেছেন। কাহিনীটি কি আক্ষরিক সত্য? জানি না। স্বামীজী বিদ্যাসাগরকে জানতেন। নিকট মহল থেকে এটি সংগ্রহ করতে পারেন। কাহিনীর সরস অংশ বাদ দিলে এই গভীর বিষয়টি পাই—জাতীয়তার সঙ্গে আত্মমর্যাদার যোগ আছে, এবং আত্মমর্যাদাকে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

নিবেদিতা স্বামীজীর মুখে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আর একটি কাহিনী শুনেছেন, এবং সেটি বলবার আগে তিনি বিবেকানন্দের জাতীয়তায় দেশীয় জীবনরূপের প্রতি কোন্ নিবিড় ভালবাসা জড়িত ছিল, তা বর্ণনা করেছেন।

"হাতে করিয়া খাওয়ার মতো হিন্দুজীবনের সহজ রীতিগুলি ইউরোপীয় শিষ্যগণকে শিখাইতে স্বামীজী অসম্ভব যত্ন লইতেন। [নিবেদিতা লিখেছেন]।—'মনে রাখিবে, যদি ভারতকে ভালবাসিতে চাও, তাহা হইলে সে যেমন আছে সেইভাবে তাহাকে মানিয়া লইয়া ভালবাসিবে, নিজের মনোমতো ভাবিয়া লইয়া নয়'—তিনি প্রায়ই বলিতেন। বাস্তব ভারতীয় জীবনযাত্রার মর্যাদার পক্ষে তাঁহার প্রচণ্ড দৃঢ়তা পর্বতের মতো উন্নত মহিমায় বর্তমান থাকিয়া তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যগণের নিকটে যে

অপরূপ কাব্যের সৌন্দর্য ও শক্তিকে উন্মোচন করিয়াছে, তাহার নাম ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনকাব্য। সদ্য দাঁত-ওঠা কোনও মত বা পথের পক্ষে সোৎসাহ সমর্থন জানানোর মতো ব্যাকুলতা তাঁহার কখনও ছিল না। প্রতি দেশের সর্বোত্তম বস্তু তাঁহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পুরাতন হিন্দুই থাকিয়া গিয়াছিলেন। সরল জীবনের সৌন্দর্যে এতই গর্বিত ছিলেন যে, পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই।—'রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী'—মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন। ঐ কথার পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বহুবার বলা গল্পটি আবার বলিলেন: কিভাবে সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত চাদর গায়ে, খড়ম ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে, ভাইসরয়ের আলোচনাকক্ষে হাজির হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার বেশবাসে আপত্তি করা হইলে বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, 'যদি আমার চালচলন এত অপছন্দ তাহা হইলে আমাকে ডাকা হইয়াছে কেন'?"[২]

বিদ্যাসাগরের পূর্বের বিখ্যাত ব্যক্তি—রামমোহন; বিদ্যাসাগরের কালে—বঙ্কিমচন্দ্র। যদি ছবির দিক দিয়ে বিচার করতে হয়—ধুতি চাদর-পরা বিদ্যাসাগর আমাদের বড় কাছের মানুষ, আর রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্‌ঘুটে রকম টুপি বা পাগড়ি পরে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে আছেন। অথচ ওঁদের মুখাবয়বের সৌন্দর্যের উল্লেখ তো অনেকেই করেছেন। আমাদের স্থূল চোখেও তা ধরা পড়ে।

বিদ্যাসাগরের চেহারা ভাবলেই ধুতি চাদরের কথা আসে। সে ছিল তাঁর অহঙ্কারের অঙ্গাভরণ।—যদি তোমরা আমাকে চাও, তাহলে আমার পোশাক-সুদ্ধ আমাকে নিতে হবে। তোমাদের কাছে আদর কাড়বার জন্য সঙ সাজতে আমি পারব না। কথাটা বিদ্যাসাগর সত্যই বলেছিলেন।

তার আগের পর্ব লক্ষ্য করা যাক। স্বদেশী যুগ আরম্ভ হবার বহু পূর্বে বিদ্যাসাগর নিজ সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুচ্চারিত কণ্ঠে এই গান গেয়েছেন, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

"বীরসিংহ হইতে জননীদেবী [শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন] চরখায় সুতা কাটিয়া, উভয় পুত্রের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। উভয় ভ্রাতা সেই মোটা বস্ত্র পরিয়া অধ্যয়নার্থ পটলডাঙার কলেজে যাইতেন। এক্ষণে সেইরূপ চরখাকাটা সুতায় প্রস্তুত মোটা বস্ত্র উড়িষ্যাদেশীয় বেহারা বা জঙ্গলবাসী ধাঙ্গড়গণকে পরিধান করিতে দেখা যায়। অগ্রজ মহাশয়কে বরাবর মোটা বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা গিয়াছে, তিনি কখনই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন নাই।"[৩]

মায়ের প্রভাবই সর্বজয়ী বিদ্যাসাগরের জীবনে। জননী ভগবতী অলঙ্কার পছন্দ করতেন না। অলঙ্কার চোর-ডাকাতের সামনে লোভ নাচানো ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া ওতে আছে অহঙ্কার ও দরিদ্রের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব।

সে-কাজ করি কি করে ?

বিদ্যাসাগর—বেশ সাহেব বেশ ! আপনাদের বেলায় দেশাচার থাকবে, আর আমাদের বেলায় তা থাকতে পারে না !![৯]

বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে এদেশের অনেক বড়লোক দেখা করতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলেন। বাইরে এসে তাঁরা আন্দোলন বাধিয়ে দেন। বিদ্যাসাগর মরমে মরে গিয়েছিলেন স্বদেশবাসীদের ওই প্রভুর সামনে হ্যাংলামি আর পিছনে তড়পানি দেখে। তাঁর বেদনার্ত ক্ষুব্ধ প্রশ্ন: "ওরা যায় কেন ? যদি গেল তাহলে আবার অপমান বোধ করাই বা কেন ?"[১০]

এই অপমানের পঙ্কশয্যার উপরে খাড়া দাঁড়িয়ে ছিলেন বিদ্যাসাগর, মেরুদন্ড সোজা করে। কিন্তু দেশবাসীর অপমান তো তাঁরও অপমান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে-থাকা ধনী-মানীদের সামনে দিয়ে সেখানে সদ্য উপস্থিত বিদ্যাসাগর, অবিলম্বে ডাক পেয়ে ছোট লাটসাহেবের কাছে হাজির হলেন, এবং ক্ষুণ্ণকণ্ঠে আপত্তি জানালেন।

বিদ্যাসাগর—আপনি আমাদের সমাজের অত-সব সম্ভ্রান্ত লোককে এত কষ্ট দেন কেন ?

হ্যালিডে—ওরা আসে কেন ? আমি তো ওদের ডাকিনি। ওরা পাঁচদিন সাক্ষাৎ না পেলে ষষ্ঠদিন আবার আসবে। কিন্তু আপনাকে পাঁচমিনিট বসিয়ে রাখলে আপনি যদি ফিরে যেতেন, তাহলে তো ডাকলেও আসতেন না। এই তফাত।"[১১]

যাই হোক, হ্যালিডের নির্বন্ধে একবার আটক পড়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিতকে দরবারী পোশাক পরে আসতেই হবে—হ্যালিডের বিশেষ অনুরোধ। পণ্ডিত অনুরোধ রক্ষা করলেন। তিনি চোগা চাপকান পেন্টুলন পাগড়ি মোজা বুটজুতা ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু পরে লাটদরবারে হাজির। কিন্তু নিজের চেহারা—কাঁচের বা মনের আয়নায় দেখে শিউরে উঠলেন। লজ্জা লজ্জা ! কষ্টে-সৃষ্টে গোপনে কয়েকবার গেলেন সংকুচিত দেহটিকে অসহ্য আবরণে মুড়ে। কিন্তু আর নয়।

বিদ্যাসাগর—এই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

হ্যালিডে (চমকিত)—সে কি পণ্ডিত ? এমন কি ঘটল যে, আমাদের আর দেখা হবে না।

বিদ্যাসাগর (করুণ হাস্যে)—কয়েদীর মতো যমযন্ত্রণার এই পোশাক পরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা সম্ভব নয়। আমি আর সঙ সাজতে পারব না।

হ্যালিডে (খানিক চিন্তার পরে)—ঠিক আছে, যে-পোশাকে এলে আপনার সুবিধা হয় সেই পোশাকেই আসবেন। আমার পছন্দের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই।[১২]

বিদ্যাসাগর আর কখনো 'সঙ' সাজেন নি। ওই পোশাকে বিদ্যাসাগরকে

পুত্রবধূরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শাশুড়ির মতানুবর্তী ছিলেন। ভগবতীদেবী নিজে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরতেন না, কেউ তেমন পাঠালে বিরক্ত হতেন।[৪] কাশীতে জীবনের শেষপর্যায়ে থাকার সময়ে ইচ্ছা করে "মোটা মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন।"[৫]

বিদ্যাসাগর নিজে ছাত্রবয়সে "নিজের বাড়ির চরখাকাটা মোটা সুতায় প্রস্তুত গুণচটের মতো অনতিদীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ডে কায়ক্লেশে নিজের লজ্জা নিবারণ" করতে পারেন, কিন্তু ওইসময়ে "নিজের ছাত্রবৃত্তির টাকায় গরীব সহপাঠীদিগকে ভদ্রোচিত বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন।"[৬] "লোককে দিবার জন্য ভালো কাপড়, ভালো খাবার, বাজারের বাছা-বাছা জিনিস আনিতেন, কিন্তু নিজের বেলায় থান ধুতি মোটা চাদর, চটি জুতা, সামান্য আহার।"[৭]

বিদ্যাসাগর যে-সব মহলে ঘোরাফেরা করতেন, সেখানে তাঁর ধুতি-চাদর ছিল উগ্র আত্মঘোষণার মতো। এবং সেখান থেকেই শুরু হয়েছে নানা কাহিনী।

সরকারী বেসরকারী সাহেব মহলে বিদ্যাসাগরের বেজায় খাতির। চাষাড়ে পোশাক-পরা, মাথাকামানো লোকটা লাট-বেলাটের কাছে অত খাতির পায় কেন ? হাজির হওয়া মাত্র ওর ডাক পড়ে, অথচ আমরা রাজামহারাজার পুচ্ছ নিয়ে কতক্ষণ বসে আছি, আমাদের ডাক আসে না !! ঈর্ষায় পুচ্ছধারীদের বুক জ্বলে যেত। তেমন একজন, উঁচুপদের কোনো সাহেবের কাছে মনোবেদনা জানিয়ে, তা লাটসাহেবের গোচর করতে বললেন। শুনে লাটসাহেবের উত্তর : "অন্যরা এসেছেন উমেদার হয়ে, নিজ স্বার্থের জন্য। আর বিদ্যাসাগর এসেছেন জনস্বার্থে। আমি তাঁর উপদেশ নির্দেশ চেয়েছি। তিনি নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী। তাই সাক্ষাতে তাঁর অগ্রাধিকার।"[৮]

তবু ছোটলাট-বাহাদুরের অসুবিধা হতোই। শীতের দেশের মানুষ তাঁরা —সারাক্ষণ পোশাকের নিশ্ছিদ্র খাঁচায় শরীরজন্তুটিকে আটকে রাখতে হয়। তাঁরা জানেন, অন্য দেশ শাসন করতে হলে, যত কষ্টই হোক, শ্বেতদ্বীপের আঙরাখা খোলা চলবে না। তাঁদের কেতা-কায়দার প্রতাপ নিয়ে হাস্যকরুণ কাহিনী আছে বিদ্যাসাগর-সূত্রেই।

বীডন সাহেব বিদ্যাসাগরের ধুতি-চাদরে বিরক্ত হতেন। একদিন গ্রীষ্মকালে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন, সাহেব গরমের চোটে পাতলা কামিজ ও পায়জামা পরে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরের চোখে মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

বীডন—দ্যাখো পণ্ডিত, ইচ্ছা হয় তোমাদের মতো পরিচ্ছদ পরিধান করি।

বিদ্যাসাগর—যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাই করুন।

বীডন—কি করব, ওরূপ পোশাক যে আমাদের দেশাচার-বিরুদ্ধ।

দেখার যত লোভই আমাদের হোক, গুরুজনকে সঙের চেহারায় দেখার ইচ্ছা পাপ, এই ভেবে কঠোরভাবে আত্মশাসন করেছি। (একবার তো ইচ্ছেই হয়েছিল, বন্ধু শিল্পীদের দিয়ে বিদ্যাসাগরের ওই সঙ-চেহারা আঁকিয়ে নেব। ছি!)

এমন বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটেছে, চটি-পায়ে নয়—খালি-পায়ে, চাদর-গায়ে নয়—খালি-গায়ে, বিদ্যাসাগর বেলভেডিয়ারে গিয়ে ছোটলাট দর্শন করেছেন। এতখানি অনাবরণ হবার কারণ, তখন পিতৃদায়ে অশৌচ চলছিল।"[১৩] বলাবাহুল্য অশৌচের অন্য চিহ্ন তাঁর তৈলহীন চুলে ও না-কামানো দাড়িতেও ছিল। লাটসাহেব সেদিন কত মোটা রঙিন চশমা পরে বিদ্যাসাগর দর্শন করেছিলেন তা জানতে কৌতূহল হয়।

সে যুগে 'প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর' বাঙালীদের মধ্যে সভ্যসমাজে কোন্ পোশাক উচিত, সে-বিষয়ে একটা স্থায়ী ধারণা বর্তমান ছিল। তাই কোমরে কাপড় থাকে না বলে অভিজাত বাড়িতে রামকৃষ্ণের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এদেশী দরিদ্র মানুষের প্রতি ঘৃণা, তাদের বিষয়ে নানা অবজ্ঞার উক্তি শোনা যেত ভব্যসমাজে (সত্যই ভব্য তো!)। ভিন্ন প্রদেশবাসী দরিদ্র মানুষেরা উড়ে ম্যাড়া ছাতুখোর খোট্টা ইত্যাদি। বাঙালী আজ সর্বপ্রকারে দরিদ্র হয়ে গিয়ে সারাভারতে অনুরূপ নানা অবজ্ঞার বিশেষণে ভূষিত হচ্ছে। ইতিহাসের এই খেলা। সুতরাং উড়িষ্যার সংলগ্ন মেদিনীপুরবাসী বিদ্যাসাগর বাঙালী-সাধারণের চোখে উড়ে—তাঁর মোটা পোশাক এবং সামনের দিকে কামানো মাথার জন্যও বটে। বিদ্যাসাগরের গ্রাম বীরসিংহ আগে অবশ্য মেদিনীপুরের মধ্যে ছিল না—১৮৭২ সালে গ্রামটিকে হুগলি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করেন স্যার জর্জ ক্যাম্বেল। বিদ্যাসাগর এই নিয়ে কৌতুকও করতেন।

"একদিন তিনি হাসিতে-হাসিতে এই গল্পটি করিয়াছিলেন: 'আমি পটলডাঙার পথ দিয়া যাইতেছিলাম। সেইসময়ে তাগা-হাতে, দানা-গলায়, তসর-পরা, বোধহয় কোনো বড় মানুষের ঝি যাইতেছিল। আমার চটিজুতার ধুলা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। মাগী বলে—'আ মর, উড়ের তেজ দেখ।' ক্যাম্বেল-সাহেব সত্যসত্যই আমাকে উড়ে করেছে।"[১৪]

এই অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরের অন্যত্রও হয়েছে। লখনৌ-এ পূর্ণচন্দ্র নামক এক জ্যাঠা ছোকরা বিদ্যাসাগরকে দেখে বলেছিল, "ও মা, এই বিদ্যাসাগর! উড়ে-কামানো [মাথা]। পাল্কীর নীচে গেলেই হয়।"[১৫] বিদ্যাসাগরকে না-দেখে তাঁর সম্বন্ধে কল্পনা যত বিরাট হয়, দেখার পরে আশাভঙ্গও ঘটে সেই আকারে।

বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে হুগলি জেলার এক গণ্ডগ্রামে গেছেন। বিদ্যাসাগর আসছেন—গ্রামে গ্রামে রটি গেল বার্তা। জুটে গেল যত রাখাল ছেলের দল। মহিলারা তো বিদ্যাসাগরকে দেখার জন্য 'লালায়িত'।

বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, কেউ বাদ নেই। বিদ্যালয়-বাড়ির কাছাকাছি সব ঘরের ছাত, জানলা উৎসুক অপ্রবীণাদের দ্বারা ভর্তি। প্রবীণারা দাঁড়িয়ে পথের ধারে। বিদ্যাসাগরের আসতে দেরী হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে সকলে রোদে পুড়েছে। তবু কেউ জায়গা ছাড়েনি। এমন সময়ে রোল উঠল, বিদ্যাসাগর আসছে! বিদ্যাসাগর আসছে! স্কুলের মধ্যে ছাত্ররা সন্ত্রস্ত। শিক্ষকরা করজোড়ে। কুলাঙ্গনারা যতখানি পারেন ঘোমটা ফাঁক করে হাঁ করে তাকিয়ে। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোথায়? কেউই তাঁকে দেখতে পেলেন না। তখন এক বৃদ্ধা, ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ গা, বিদ্দেসাগর কই? তিনি কি এলেন না।" উত্তরে শুনলেন, "কেন, তিনি তো এসেছেন—ওই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়।" বৃদ্ধা চোখ বিস্ফারিত করে বিদ্যাসাগরের দিকে খানিক তাকিয়ে বললেন, "আ আমার পোড়া কপাল। এই মোটা চাদর-গায়ে উড়ে বেয়ারা দেখবার জন্য রোদে ভাজা-ভাজা হলুম। এর না আছে গাড়ি, না আছে ঘড়ি, না আছে চোগা-চাপকান।"

বিদ্যাসাগর তাঁর এই মনোরম অভিজ্ঞতার কথা নিজেই চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুনিয়েছিলেন।[১৬]

নিজের ভূমিতে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর সব সময়েই গর্বিত ও আনন্দিত। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বিদ্যাসাগরের ঘরে সাজানো মিষ্টান্ন-সম্ভারের কথা বলেছেন, যার থেকে তিনি পরিচিত ব্যক্তিদের (অপরিচিতদেরও অনেক সময়) নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতেন। কেবল মিষ্টান্ন নয়, "স্বহস্তে পান সাজিয়া দিতেন। একদিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি নিজে পান সাজেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি যে উড়ে রে! মেদিনীপুরের উড়ে। দেখিস্ নি, উড়েরা নিজের হাতে পান সেজে খায়'।"

কেবল কোনো গ্রাম্য বৃদ্ধা নন, বিদ্যাসাগরের পোশাক-আশাকের দিকে তাকিয়ে অনেক মানুষই বিস্ফারিতনেত্র হয়েছেন, তবে ভিন্ন কারণে। এঁদের মধ্যে এদেশের সেরা মানুষরাও আছেন। একজনের কথা এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলেছি—স্বামী বিবেকানন্দ। অন্য একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যাসাগর নামক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিজ সমাজের ভদ্রবেশ ত্যাগ করে, অন্য সমাজের বেশ অঙ্গে চড়িয়ে, "আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই।" ময়ূরপুচ্ছধারীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কঠোরতর ভাষায় বলেছেন: "সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে-গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি।"

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ধুতি-চাদরের মধ্যে যথার্থ পেট্রিয়টিজমের জয়ধ্বজা দেখেছিলেন। 'পেট্রিয়ট' আর 'ফিলানথ্রপিস্ট'

এক নন। স্বদেশের হিতসাধনকারীরা 'ফিলানথ্রপিস্ট'। কিন্তু যিনি "কায়মনোবাক্যে দেশের স্বকীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী,...যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য এবং মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন তিনিই পেট্রিয়ট।" এরপরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছদ্ম-পেট্রিয়টদের ব্যঙ্গ-ছবি এঁকেছেন, যাঁরা কাট-ছাঁট আঁট-সাট পোশাক অঙ্গে ধরেন, দোকান-সাজানিয়া গৃহসজ্জাতে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন, স্বদেশের সেরা জিনিসকে নাক সিঁটকে ঘৃণা করেন, যেহেতু বিদেশীরা তা করে থাকেন। স্বদেশকে নীচু করে নিজে উঁচু হবার চেষ্টায় যাঁরা সাহেব-সোহাগ-লালসায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হন—তাঁরা অবশ্যই গ্যারিবলডি নন। বিদ্যাসাগর প্রচুর দান করেছেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, দীন-দুঃখী-বিধবার চোখের জল মুছিয়েছেন—তাঁর সেই ফিলানথ্রপিস্ট-মূর্তি কিন্তু বিদ্যাসাগরকে পেট্রিয়ট করেনি। "পেট্রিয়ট তাঁহাকে বলিতেছি অন্য কারণে। যখন তিনি উড্রো-সাহেবের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল অবস্থাতে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক লেখনীযন্ত্র দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, হাঁ ইনি পেট্রিয়ট, যেহেতু ইনি খাওয়া-পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় সারাংশ সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা—বিদ্যা, বিনয়, দাক্ষিণ্য, মহত্ত্ব এবং সদাশয়তা—সমস্তই আপনাতে মূর্তিমান করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে এ-ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্যসত্যই পেট্রিয়ট-ছাঁচে গঠিত।"[১৭]

ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও দ্বিজেন্দ্রনাথ মুক্তধর্মের মানুষ। তাই নির্বোধ পরানুকরণের বিরুদ্ধে যখন তিনি অবজ্ঞা প্রকাশ করছিলেন তখন তাঁর স্ব-সমাজের মানুষেরা লক্ষ্যের বাইরে ছিলেন না। আর হিন্দুসমাজের বিদ্যাসাগর যে, ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী হয়েও, "ব্রাহ্মসমাজে জাতীয় ভাব সুরক্ষিত হয় নাই বলিয়া অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেন", এ কথা স্বয়ং-ব্রাহ্ম চণ্ডীচরণই লিখেছেন।[১৮]

বিদ্যাসাগরের জাতীয়তা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ সংক্ষেপে যে-কথা বলেছেন (অধ্যায় সূচনায় উদ্ধৃত), দ্বিজেন্দ্রনাথের উপরের রচনায় তার চমৎকার ব্যাখ্যা পেয়েছি।

কবিতা রসের খনি

॥ ১ ॥

বিদ্যাসাগর স্বয়ং কবি এবং কবিতার উৎস। বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা কবিতা বাংলায় নয়, (বেনামে বাংলা কবিতা কিছু লিখেছেন) সংস্কৃতে। কিন্তু তাঁর বিষয়ে কবিতা সংস্কৃত এবং বাংলা, দুই ভাষাতেই লেখা হয়েছে। অন্য ভাষাতেও লেখা হয়েছে ধরে নিতে পারি, কারণ তাঁর খ্যাতি প্রদেশ-সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবিতা লেখার কলম ধরেছিলেন এদেশের নামী কবিরা —ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে। আমি এখানে কিন্তু বিদ্যাসাগর বিষয়ে কবিতার সংকলনে নিয়োজিত নই। রঙ্গে ব্যঙ্গে সরস কিছু কবিতার উল্লেখই উদ্দেশ্য।

নিজের সংস্কৃত কবিতার সংকলন বিদ্যাসাগর নিজেই করে গেছেন। এর আগে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রচিত তাঁর 'লুচি কচুরি' শ্লোকের উল্লেখ করেছি। বিদ্যাসাগর তাঁর 'সংস্কৃত রচনা' বইয়ে "রবর্ট কস্ট নামে একটি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব সিবিলিয়ান"-এর বিষয়ে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনার পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন। এই "বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সুশীল ও সৎস্বভাব" ব্যক্তির গুণমুগ্ধ তিনি ছিলেন। সুতরাং যখন উক্ত সাহেব একদিন "বিলক্ষণ আগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক, সবিশেষ অনুরোধ করিয়া" বিদ্যাসাগরকে বললেন, "তুমি যদি আমার বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হই," তখন বিদ্যাসাগর অলপক্ষণের মধ্যে 'শ্রীমান্ রবর্ট' সম্বন্ধে দুটি শ্লোক লিখে উপহার দেন, এবং তা পেয়ে সাহেব ছোকরাটি 'প্রফুল্ল চিত্তে' প্রস্থান করেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরও প্রফুল্ল হয়েছিলেন। সেইখানেই শেষ নয়। বহু বৎসর পঞ্জাবে সিভিলিয়ানী করবার পরে উক্ত রবর্ট কস্ট দেশে ফেরার পথে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেন, সেই 'শেষ সাক্ষাৎকারে' তিনি পুনশ্চ নিজের সম্বন্ধে শ্লোক প্রার্থনা করেন— এবং পঞ্চ শ্লোকে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। এদেশ যখন দুষ্ট সাহেবে ভর্তি ছিল তখন এই শিষ্ট সাহেবটি বিদ্যাসাগরকে খুশি করেছিলেন— যিনি "সদা সদালাপরতোর্নিত্যং সৎপথবর্তিনঃ, সর্বলোকপ্রিয়স্যাস্য সম্পদস্তু সদা স্থিরা।"[১]

রবর্ট কস্ট-এর বিষয়ে শ্লোকাবলি সুখের সঙ্গে রচিত। আর মজার হাসির সঙ্গে রচিত শ্লোক—গোপাল বিষয়ে। জয়গোপাল তর্কালংকার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক, ছাত্রদের মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত পদ্যরচনা করতে দিতেন; তাঁর সবচেয়ে প্রতিভাবান ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু নানা অজুহাতে এড়িয়ে যেতেন।

একদিন ধরা পড়লেন। রসিক গুরু এবং রসিক ছাত্রের আদানপ্রদানের চমৎকার কাহিনী ছাত্রই লিখেছেন :

"বার্ষিক পরীক্ষায় রচনার পারিতোষিক পাইবার পর তিনি বলিলেন, আর আমি তোমার ওজর শুনিব না ; অদ্য তোমায় পদ্যরচনা করিতে হইবেক। এই বলিয়া তিনি পীড়াপীড়ি করাতে নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক আমায় পদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। গোপালায় নমোঽস্তু মে, এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করিয়া, এক ঘণ্টা সময় দিয়া, সকলকে শ্লোক রচনায় নিযুক্ত করিলেন। আমি পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করিব ? এক গোপাল [জয়গোপাল] আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন ; আর এক গোপাল বহুকাল পূর্বে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে কোন্ গোপালের বর্ণনা আপনকার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন। পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আমার এই কৌতুককর জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া হাস্যপূর্ণ বদনে বলিলেন, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর। তিনি এক ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ এক ঘণ্টায় আমি পাঁচটির অধিক শ্লোক লিখিতে পারিলাম না। তিনি শ্লোক পাঁচটি দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশ করিলেন। তদ্দর্শনে আমার যার-পর-নাই আহ্লাদ ও উৎসাহ-বৃদ্ধি হইল।"[২]

গোপাল সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র যে পাঁচটি শ্লোক লিখে আহ্লাদিত হয়েছিলেন, সেগুলি কিন্তু মোটেই মজার শ্লোক নয়, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ভক্তিস্নিগ্ধ বর্ণনা। লেখাটি মজার হতো তিনি যদি জয়গোপাল নামক গোপালকে নিয়ে লিখতেন।

যাই হোক শ্লোক পাঁচটি এই :

যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥
ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥
ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় ননোঽস্তু মে ॥
বৃষ্ণিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িতে।
দৈত্যেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

বিদ্যাসাগরের বৈপ্লবিক নাস্তিকতার পক্ষে প্রচণ্ড প্রমাণ, সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্র ভুলে যাওয়া। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ছাত্রাবস্থায় লেখা গোপালবন্দনার শ্লোক তাঁর এতই মনে আছে যে, বৃদ্ধবয়সেও সেগুলি সংকলন করে ছাপিয়েছিলেন, যার মধ্যে নবনীচোর গোপালকে চতুর্বর্গদায়ী বলে তিনি নমস্কার পর্যন্ত করেছেন, এবং পুলকিত জীবনীকার বিহারীলাল একথা লেখবার

সুযোগ পেয়েছিলেন—"এ কবিতায় গোপালের প্রতি ভগদ্ভাব প্রকটিত।"

উদ্ভট শ্লোকের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রীতি ছিল; অকালে নিদ্রাভঙ্গ, আলস্য, জৃম্ভণাদির সঙ্গে জড়িত সেগুলি, কারণ তাঁর পিতৃদেব খুব ভোরে উঠে সেগুলি মুখস্থ করাতেন। সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের সংকলনও বিদ্যাসাগর করেছেন। কিন্তু একবার তাঁর রোষ নিবারণের জন্য এক পণ্ডিতের রচিত একটি শ্লোকের তুল্য উদ্ভট আর কিছু তিনি জেনেছিলেন কিনা সন্দেহ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন সেখানে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর অধ্যাপক। প্রাণকৃষ্ণের 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতেই প্রমাণ যে, তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন। একবার অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর উক্ত অধ্যাপক বিদ্যাসাগরের উপর খুব চটেছেন। এক্ষেত্রে উত্তম সংস্কৃত শব্দগ্রথিত শ্লোকে কাজ হবে না বুঝে অধ্যাপক-বিদ্যাসাগর উদ্ভট শ্লোক ফাঁদলেন:

মদ্বিধবহুবিধদুর্বিধদৈন্যে
জ্বলদনলস্ত্বং তৃণ ইব মন্যে।
কত ইহ শত শত যতনত এষা
ভবতি ভবভি লিপিরথ সবিশেষা ॥
অহং তবৈবাস্মি নিদেশকারী
তথা তবৈবাস্মি মতানুসারী।
অত্রানুতে কিন্তু বিপত্তি ভারি
যথা তথাস্তাং ভরসা তোমারি ॥[৩]

প্রাণকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। শ্লোক পড়ে বিদ্যাসাগর খুব হেসেছিলেন। হেসে ফেললে রাগ রাখা যায় না।

উদ্ভট কিন্তু স্বকার্য সাধনে উপযোগী শ্লোকের দৃষ্টান্ত আরও আছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এক খুড়ো, তেমন সংস্কৃত জানতেন না, অনুস্বর বিসর্গ বর্ষণ করলেই সংস্কৃত হয়ে যায়, এমন ধারণা তাঁর ছিল। তাঁর চরিত্র এবং শ্লোক-কীর্তির চমৎকার কথাচিত্র দিয়েছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য:

"তর্কালঙ্কারের এক খুড়া ছিলেন, সেটি একটি character। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত পুঁথির Scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের লেখা মুক্তার মতো ঝলমল করিত। লোকটি কিন্তু সংস্কৃত লেখাপড়া জানিত না। তাহা হইলে কি হয়, সে অনর্গল যা-তা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিত। একবার লাইব্রেরিয়ানের নামে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকাণ্ড শ্লোক রচনা করিল। সে কবিতার আর কিছুই এখন আমার মনে নাই, কেবল 'লাইব্রেরিয়ান গরীয়ান' এই দুটি কথা যেন কানে বাজিতেছে। পুনশ্চ,

তারাশঙ্কর শঙ্কর সদয়া
বিদ্যাসাগর সাগর কৃপয়া
বিদ্যামন্দির মধ্য বিরাজে
পুস্তকধক্ষ্যক লাইব্রেরিকাজে।

" 'পুস্তকাধ্যক্ষ' লিখিলে ছন্দ ঠিক থাকিবে না, তাই কথাটা পরিবর্তিত হইল। তারাশঙ্কর তথা বিদ্যাসাগর খুব আমোদ পাইয়াছিলেন।

"আবার রসময় দত্ত চলিয়া যাইবার পর বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসিলেন, খুড়া ঝাঁ করিয়া শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন :

যঃ ঈশ্বরো নিম্নগতঃ করন্তি
সঃ ঈশ্বরো নিজালয়ং নয়ন্তি।"

এ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের পক্ষে বেশ আমোদজনক। কিন্তু তার পরে খুড়ো বেশি যা করলেন (বা করতেন) তা বিদ্যাসাগরের পক্ষে বড়বেশি বলে মনে হয়েছিল, ধরে নিতে পারি :

"লোকটির impudence আবার এত ছিল যে, পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথিতে কাটকুট করিত। আদর্শ পুঁথিতে আছে 'সংকর', খুড়ো ভাবিলেন দন্ত্য স ভুল ; লিখিলেন তালব্য শ, এবং আদর্শ পুঁথিতে 'স' কাটিয়া 'শ' করিয়া দিলেন।"[৪]

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খুব গভীর গম্ভীর স্বভাবের মানী গুণী ব্যক্তি, সারা দেশে বিচারক, শিক্ষাবিৎ ও সমাজনেতা বলে তাঁর খ্যাতি ও খাতির। কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো তিনি বিদগ্ধ ফাজিল ছিলেন না। কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে (কুলোকে যাকে মদ্যোৎসাহিনী সভা বলত) মধুসূদন দত্তকে পানপাত্র উপহার দিয়েছিলেন। মধু ওই মধু-আধারের যথার্থ সদ্‌ব্যবহার করতে পারবেন এহেন বিবেচনায় সেই সমর্পণ। স্যার গুরুদাসও বিদ্যাসাগরকে পানপাত্র উপহার দিয়েছেন, উপলক্ষ অভিনন্দন নয়, মাতৃশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ বিদায় ; সেই পাত্রে জল ছাড়া অন্য কিছু পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই—এমনই পবিত্র চিন্তায় দান। রৌপ্যনির্মিত সেই সুদৃশ্য গ্লাসে খোদিত আছে :

পানপাত্রমিদং দত্তং বিদ্যাসাগরশর্মণে।
স্বর্গকামনায় মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া ॥[৫]

স্বর্গে বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস আছে কি না-আছে তা বিচার না করেই স্যার গুরুদাস মায়ের স্বর্গকামনায় বিদ্যাসাগরকে দান দিয়েছিলেন, কারণ স্বর্গসম্বন্ধীয় চিন্তায় তিনি বিদ্যাসাগরের অনুগামী ছিলেন না। বিবেকানন্দ এই ঘটনার কথা জানতেন কিনা জানি না। জানলে অবশ্যই সোল্লাসে নিবেদিতাদিকে পুনশ্চ বলতেন, দ্যাখো, দ্যাখো, পোশাকী ধর্মের বিষয়ে ভারতের কী অপূর্ব ঔদাসীন্য !

স্বামীজীর মুখে বিদ্যাসাগরের বিষয়ে অনেক কিছু শুনে তার সারসংক্ষেপ নিবেদিতা করেছেন। শেষাংশে পাই :

"যে ব্যক্তি [অর্থাৎ বিদ্যাসাগর] কেবল নৈতিক বলে বহুবিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি যে 'গভীরভাবে আধ্যাত্মিক', তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম। এবং যখন শুনিলাম যে, এই বিরাট পুরুষ ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে, অনাহারে ও রোগে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক

কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মর্মাহত হইয়া 'আর ভগবান মানি না' বলিয়া সম্পূর্ণ-ভাবে অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন—তখন পোশাকী মতবাদ সম্বন্ধে ভারতবাসীর ঔদাসীন্য কিরূপ তাহা উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম।"[৬]

॥ ২ ॥

পুরনো সমাজকে নিয়ে বিদ্যাসাগর এমন ময়দা-ঠাসা করেছেন যে, চটকানো বস্তু থেকে সুখে বা অসুখে নানা শব্দ বেরিয়ে এসে কবিতা বা গানের চেহারা নিয়েছে। বিধবাবিয়ে নিয়েই গান বা কবিতা বেশি। দেশের বেশি লোক বিধবাবিয়ের বিপক্ষে। সমাজ পুরুষশাসিত (সেজন্য পুরুষদের সুখের বহুবিবাহ), আর নারীরা সংস্কারশাসিত। সুতরাং সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গের আশ্রয় হয়েছিল বিধবাবিবাহ আন্দোলন। ঈশ্বর গুপ্ত সাধারণ ভাবে রক্ষণশীল ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত কট্টর বিধবাবিবাহ বিরোধীও নন, কিন্তু মজায় তাঁর বড় সুখ। বড় সুখে তিনি লিখলেন :

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥...
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপা-খাপি, ছাপাছাপি কত ॥"

মজার জন্য করা যায় না এমন কিছু নেই, আর ঈশ্বর গুপ্তের তো সবটাই "ইয়ার্কি, ঘোর ইয়ার্কি," বঙ্কিমচন্দ্র যেকথা বলেছেন। সুতরাং কবিতা লেখার সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের এই ঘোষিত অভিপ্রায়ে গুরুত্ব দেননি যে, তিনি বালবিধবাদের জন্যই পুনর্বিবাহ চেয়েছিলেন। আইন পাস হয়ে যাবার পরে, বিয়ে করার সময়ে বালিকার মতো বৃদ্ধারা এগিয়ে আসবে না, এমন বাঁধন দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের "নারী-গণের পতিনিন্দার" আদলে কৌতুক ঈশ্বর গুপ্তের কলমে :

"কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে ?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী, সিন্দুর পরিবে ॥
বুকে ছেলে, কাঁখে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু বোলে ॥
গিলে গিলে ভাত খায়, দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি, হাত চাপা বুকে ॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাবে চড়াইয়া খাটে।
শাড়ি পরা, চুড়ি হাতে, তারে নাকি খাটে ॥...
সকলেই এইরূপে বলাবলি করে।
ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা ॥

জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাই পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সংবাপ' মায়ের কল্যাণে।"৭

একই বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের অন্য কবিতা—এতে রঙ্গের অপেক্ষা বিতৃষ্ণা ও ব্যঙ্গের ঝাঁঝ বেশি :

"কোলে কাঁখে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, পরে শাঁখা শাড়ী ॥
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥"

হাসি মুছে আতঙ্ক স্থানাধিকার করেছে। কবির সংস্কার আহত হয়েছে এই চিন্তায়, "বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে, সতী বলে সম্বোধন কিসে করি তবে?"

চতুর্দিকে বাদ-প্রতিবাদ, বাক্যের ফুলঝুরি। দিশাহারা কবি লিখলেন :

"বাক্যের অভাব নাই বদন ভান্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দুষিবে কারে ॥...
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ॥"

একমাত্র সাগরই সীমা লঙ্ঘন করতে সমর্থ। কিন্তু সেই সুদূর সম্ভাবনার উপর ভর করে এগিয়ে চললে উপহাসই সার হবে জীবনে :

"সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন ॥
নচেৎ না দেখি কোনো সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই-হই, উপহাস সার ॥"৮

বিধবা বিয়ে নিয়ে দেশে তখন ধুন্ধুমার কান্ড চলছে। মজলিশে প্রতিবাদ, বক্তৃতায় প্রতিবাদ, লেখায় প্রতিবাদ, এমন-কি লগুড়ে-প্রতিবাদের আয়োজন। শেষোক্ত কঠিন ব্যাপার থেকে হাসি নিষ্কাশন করা কঠিন তবু সেখানেও বেপরোয়া মজা নেই তা নয়।

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে শারীরিক প্রতিবাদের আয়োজন বিষয়ে সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জেনেছি :

"বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত। কেহ পরিহাস করিত, কেহ-কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার, এমন কি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত।"৯

এই অবস্থাতেও বিদ্যাসাগরের মজার হাসি কমেনি। সেকালের এক জমিদার-মহারাজা বিদ্যাসাগরকে সাবাড় করবার জন্য লোক লাগিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তা জেনে, ভয় না পেয়ে, সরাসরি উক্ত ধনীর বৈঠকখানায় ঢুকে পড়লেন। ধনী মহাশয় তখন পারিষদদের নিয়ে আমোদিত চিত্তে বিদ্যাসাগরের জীবদেহের শবত্ব প্রাপ্তির মনোহর আলোচনায় নিমগ্ন—চমকে উঠলেন—সামনে সজীব

বিদ্যাসাগরকে দেখে। বিদ্যাসাগর হাসলেন। মধুরভাবে বললেন, "শুনলুম, আমাকে মারবার জন্য আপনার নিযুক্ত-করা লোকজন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তাই ভাবলাম, ওদের অত কষ্ট দেওয়ার দরকার কি! মানুষকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আমি নিজেই এসে গেছি। কোনো অসুবিধা নেই, কাজটা সেরে ফেলুন।"[১০]

মানুষকে কষ্ট না দেবার ব্রত বিদ্যাসাগর অন্য সময়ও হাসতে হাসতে পালন করেছেন। তিনি বর্ধমান থেকে কলকাতায় আসছেন। পাণ্ডুয়ায় এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উঠলেন তাঁরই কামরায়। বিদ্যাসাগরকে সাক্ষাতে তিনি চেনেন না। নাগাড় গালিগালাজ করে যেতে লাগলেন বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে। (কে জানে, তাতে স্বয়ং বিদ্যাসাগরের উস্কানি ছিল কিনা!)। পরে হুগলী স্টেশনে নেমে যেই জানলেন, বিদ্যাসাগরের সামনেই ওই গালিগালাজ করেছেন, তখনি একেবারে অজ্ঞান। এতক্ষণ বেশ চলছিল। এইবার বিদ্যাসাগর পড়লেন ঝঞ্ঝাটে। গাড়ি থেকে তাঁকে নামতে হল, ব্রাহ্মণের মাথায় জল চাপড়ে, হাওয়া করে, তাঁর জ্ঞান ফেরাতে হল (নাকে লংকাপোড়া শুঁকিয়ে ভূত তাড়িয়েছিলেন কি?), তারপর পাথেয় হিসাবে কিছু অর্থসাহায্য করে মানবপ্রেমের প্রায়শ্চিত্তও করলেন।[১১]

আরও মজা আছে। স্কুল-ইনস্পেকটর প্র্যাট-সাহেব বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার বিধবাবিবাহ বইয়ের বিরুদ্ধে কার লেখা সবচেয়ে ভালো? বিদ্যাসাগর রহস্য করে সেই ব্যক্তির নাম করেছিলেন, যাঁর লেখায় উৎকর্ষ না থাক, সবচেয়ে বেশি গালিগালাজ ছিল। এখন প্র্যাট-সাহেবের ন্যায়বুদ্ধি উক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যাসাগরের সম-প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ডেপুটি ইনস্পেকটরের পদ অর্পণ করল। নায়ককে খাতির করলে প্রতিনায়ককেও খাতির করা উচিত—অবশ্যই। তারপর চাকুরিপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি ভয়ে আছেন, এই বুঝি বিদ্যাসাগর সাহেবের কাছে আসল কথা ফাঁস করে দেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ধরে বসলেন, "যা হবার হয়েছে, দেখবেন, চাকুরিটি যেন না যায়।" বিদ্যাসাগর হেসে বলেছিলেন, "তাহলে চাকরি আর হতোই না।"[১২]

॥ ৩ ॥

বাংলার কোনো সমাজসংস্কার আন্দোলনই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মতো ব্যাপক ও গভীর সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন কিছুটা হৈ-চৈ সৃষ্টি করে হঠাৎ স্তিমিত হয়ে যায়, কারণ রক্ষণশীল সামাজিক বোধ পর্যন্ত ভিতরে-ভিতরে এই নিষ্ঠুর প্রথা সম্বন্ধে অস্বস্তিতে ছিল। পরবর্তী সময়ের সহবাস-সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন অতি তীব্র হয়েছিল সন্দেহ নেই, তবু তার সঙ্গে ক্রমোন্মেষিত রাজনৈতিক চেতনার যোগ ঘটেছিল বলেই আন্দোলনের ওহেন প্রবলতা, তাও স্বীকার্য। এই আন্দোলনও হঠাৎ থেমে যায়। বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিশুদ্ধ সামাজিক আন্দোলন এবং তা একক মানুষের সৃষ্টি। সেই মানুষটি কিভাবে সবলে গোটা দেশের মনকে ধরে নাড়িয়েছিলেন, তা বিদ্যাসাগরের ভক্ত 'রক্ষণশীল' জীবনীকার

বিহারীলাল এবং ব্রাহ্ম জীবনীকার চণ্ডীচরণের রচনা থেকে উদ্ধৃত করব।

প্রথমে বিহারীলালের রচনা :

"বিধবাবিবাহের প্রচলন প্রসঙ্গে একটা তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল ; সে আন্দোলন বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবৎ সমগ্র বঙ্গভূমি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, স্ত্রী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ—সকলের মুখে এতৎসম্বন্ধে অবিরাম জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। হিন্দুর গৃহে প্রকৃতই একটা বিস্ময়-বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষে বিপক্ষে কতরকম ছড়া, গান রচিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পথে ঘাটে মাঠে সর্বত্রই নানারূপ গান গীত হইত। গাড়োয়োনেরা গাড়ি হাঁকাইতে-হাঁকাইতে, কৃষক লাঙল চালাইতে-চালাইতে, তাঁতি তাঁত বুনিতে-বুনিতে গান গাহিত।"[১৩]

চণ্ডীচরণ :

"সমগ্র বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।...বিধবাবিবাহের চেষ্টা কতদূর অগ্রসর হইল, সে সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারে এমন লোক, এমন সংবাদপত্র, এমন পুস্তক বা পুস্তিকা, লোকের বহু আগ্রহের জিনিস হইয়া উঠিল। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তরঙ্গ-তুফানে ভাসিয়া বিখ্যাত গায়ক দাশু রায় 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ে এক পালা পাঁচালি প্রস্তুত করেন। নানা স্থানে বিধবা-বিবাহের গানও সেকালে হইত। এতদ্ভিন্ন বিধবাবিবাহ নাটকও রচিত হইয়া কলিকাতায় সেকালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। শান্তিপুরের তাঁতিরা বহুমূল্য বস্ত্রের তাঁতের উপর বিধবাবিবাহের গান তুলিতে আরম্ভ করিল। বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক গানবিশিষ্ট শান্তিপুরের কাপড় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তিকলাপ বিশেষভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। কাপড়ের পাড়ে গান ওঠা এই প্রথম।...বিধবাবিবাহ আন্দোলন উপলক্ষে যে-সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, সেগুলি এত দূরব্যাপী হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশের সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোক ওই সকল গান গাহিয়াছে। আমরা শৈশবকালে 'উঠ গা, তোলো, ওহে নৃপমণি', 'ওরে রামশশী হবি বনবাসী, কে আমারে ডাকবে মা বলে' প্রভৃতি গানের ন্যায় বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক গানগুলিও পল্লীগ্রামে, গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদিগকে পর্যন্ত গাহিতে শুনিয়াছি।"[১৪]

দেখা গেল, বিদ্যাসাগর একেবারে গণকাব্যের উপাদান !!

শান্তিপুরের 'বিদ্যাসাগরপেড়ে' গানটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল :

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমতো পতি লয়ে ॥
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—

আলোচাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে।”

বিধবাদের মুখে বসানো ওই গানটি কী চরিত্রের—রঙ্গের, ব্যঙ্গের, অতৃপ্ত কামনার, অফুরন্ত কান্নার ?

গানটির শেষ এখনো হয়নি :

“আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই।...
একাদশী উপোসের জ্বালা কর্ণেতে লাগিত তালা,
ঘুচে যাবে সেসব জ্বালা, জুড়াবে জীবন,
দুজনাতে পালঙ্কেতে করিব শয়ন।
বিনাইয়া বাঁধব খোঁপা গুজিকাটি মাথায় দিয়ে।
যেদিন হতে মহাপ্রসাদ, শুনেছি ভাই এ-সংবাদ,
সেদিন হতে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম,
পছন্দ করেছি বর না হতে হুকুম,
ঠাকুরপোরে করব বিয়ে, ঠাকুরঝিরে বলে কয়ে।।”

গানটির রচয়িতার মনে মোটেই বিধবাদের কষ্ট সম্বন্ধে কাতরতা ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল রঙ্গব্যঙ্গ। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্রের অন্য গুণ যাই থাক, রসবোধ তার অন্তর্গত নয়। তাই গানটির সূত্রে বলেছেন, “বিধবার বিবাহ হইবে, ইহা শ্রবণে মনে মনে সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।”[১৫] সে আহ্লাদের জাত কী তা ১২ অগস্ট ১৮৫৬, ‘সংবাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় প্রেরিত পত্রে প্রকাশ : “...ইদানীং প্রায় সকল স্থানে ‘বিধবাবিবাহ’ এই মহামঙ্গলকর বিষয়সূচক নানা কথা উদ্ভাবিতা হইতেছে। অধিক আর কি কহিব, কলিকাতা মহানগরীতে এবং অন্যান্য পল্লীগ্রামের প্রকাশ্য পথে বহির্গত হইলে প্রায়শ দেখা যায় যে, অনেকানেক প্রাকৃত লোকে, কেহ-কেহ গরুর গাড়ি চড়িয়া, কেহ বাঁক ঘাড়ে করিয়া, কেহ-বা মদ্যপানে মত্ত হইয়া, ‘বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে’ ইত্যাকার পক্ষী-রচিত গীত করিয়া, আনন্দ লাভ করিতেছে। কেবল যে ইতর লোকেরাই এইরূপ আনন্দে আছে এমত নহে, অনেকানেক ভদ্রলোকেরাও সবান্ধব হইয়া উপযুক্ত সময়ে পক্ষী-রচিত ওই গান করিয়া আমোদিত হন।”[১৬]

সংবাদ ভাস্কর পত্রিকার পত্রলেখকও শম্ভুচন্দ্রের মতো তারিফ ও তামাশার মধ্যে পার্থক্য করতে সমর্থ ছিলেন না।

সকলের সঙ্গে বিধবারাও আমোদ করেছেন গানটি গেয়ে। সে হাসি চোখের জলে মাখামাখি। প্রচলিত একটি গল্প সেই ধাঁচের :

বিদ্যাসাগর কোনো এক গ্রামে গেছেন। তাঁকে দেখতে মেয়েমহলে মহা ভিড়। মহিলারা একটু আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে তাঁকে দেখছেন। ভিড় ঠেলে এক বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন। “কোথায় বাবা বিদ্যেসাগর ? কোথায় বাবা বিদ্যেসাগর ?” বিদ্যাসাগরের সামনে তাঁকে এগিয়ে দেওয়া হলো। বৃদ্ধা ভালো করে দেখতে পান না।

বৃদ্ধা (চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করে) : তুমি বুঝি বাবা বিদ্যেসাগর ?

বিদ্যাসাগর : আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধা তখন বিদ্যাসাগরের চিবুক ধরে বারবার চুমু খেতে লাগলেন, তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বৃদ্ধা : ওরে বাপ বিদ্যেসাগর, সেই তো করলি, আমাদের জৈবন থাকতি করলি না কেন ?

দাশু রায়ের গানের ভঙ্গি একই রকমের :

"বিবাহ করিতে দিদি, আছে বিধবাদের বিধি,...
আমাদের দিতে নাগর, এলেন গুণের সাগর বিদ্যাসাগর,
বিধবা পার করতে, তরীর গুণ ধরেছেন গুণনিধি।"[১৭]

দীনবন্ধুর ছদ্মনামী কবিতাটিতে কিন্তু কেবলই বিধবাদের শূন্য জীবনের হাহাস্বর। তার অংশ :

এমন সুখের দিন কবে হবে বল দিদি,
কবে হবে বল লো, কবে হবে বল।...
বিধবার বিয়ে হবে, এত বড় কল দিদি,
এত বড় কল লো, এত বড় কল।
বিবাদী হয়েছে এবে যত সব খল দিদি,
যত সব খল লো, যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল দিদি,
সব যাবে তল লো, সব যাবে তল।
পরামর্শ করিয়াছে যত যুবা দল দিদি,
যত যুবা দল লো, যত যুবা দল,
ঘুচাইবে আমাদের নয়নের জল দিদি,
দুটি নয়নের জল লো, নয়নের জল।
বিধবার নাহি আর জুড়াবার স্থল দিদি,
জুড়াবার স্থল লো, জুড়াবার স্থল।...
অঙ্গে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল
পোড়া লোকে ধরে ছল লো, লোকে ধরে ছল।
অভয়ে পরিব পায়ে চারি গাছা মল দিদি,
চারি গাছা মল লো, চারি গাছা মল।...
ধবক্ ধবক্ করে মনে সদা দুখানল দিদি,
সদা দুখানল লো, সদা দুখানল।"[১৮]

গদ্যে অজস্র ব্যঙ্গরচনা বেরিয়েছে, তার মধ্যে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬, সংবাদ প্রভাকরে জনৈক পুরুষপ্রবর যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতে বিদ্যাসাগরী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্রোক্তি ছিল, কিন্তু লোভ ও লালসার রসানও কম ছিল না। যেমন :

"...সম্প্রতি এক শুভজনক সংবাদ শ্রবণে বড়ই সন্তোষিত হইয়াছি। শুনিলাম যে, চক্রবর্তী, ঘোষাল, হড়, গড়, গড়গড়ি ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিব্যূহের উপকারক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রীচরণপ্রসাদাৎ এরাজ্যে Second Hand (সেকেন্ড হেন্ড) রমণী অর্থাৎ দোজবরে-কনে চলন হইবেক। এ-কারণে ভরসা করি যে, আমরা অতি সুলভ মূল্যেই মনোহরা মহিলা লাভে সমর্থ হইব ; আর চারি-পাঁচশত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অশীতি ও নবতি বৎসরে নবতি বর্ষীয় বালিকা বিবাহ করিতে হইবে না ; বোধ করি যৌবনরূপ বসন্ত সময়েই আমারদিগের বপুরূপ বিটপিতে উদ্বাহকুসুম বিকশিত হইতে পারে, কেননা সেকেন্ড হেন্ড অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পুরাতন দ্রব্য অল্পমূল্যে পাইবার কোনো প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হইতেছে না।"

এই "ভবানীপুরস্থ কস্যচিৎ বিয়ে পাগলা"-টি বিদ্যাসাগরের কুসংস্কারনাশী লেখনীর শক্তিবৃদ্ধি কল্পে প্রার্থনায় স্বস্ত্যয়ন করেছিলেন—কবিতায়। তার শেষাংশ :

"যে পদ্ধতি প্রচলিত হইবে এখন।
ষোড়শী রূপসী হবে সহজে গ্রহণ॥
কুলীন বংশজে আর থাকিবে না ভিন্ন।
যেদিন এদিন হবে সেদিন কি দিন !!"[১৯]

॥ ৪ ॥

বিদ্যাসাগরকে কবিতা ছাড়ে নি। তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যখন কলম ধরেছিলেন তখন তার টানে আর একদফা কবিতার বান ডেকেছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর একাধিক পুস্তিকায় বহুবিবাহ প্রথার আশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে সক্রিয় হন। তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে পণ্ডিতরা বই লেখেন। তিনি স্বনামে, বেনামে তার উত্তর দেন। বিদ্যাসাগর বই লিখে এবং আন্দোলন সৃষ্টি করে বিধবাবিবাহকে আইনসিদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বহুবিবাহ নিরোধ কিন্তু তিনি করতে পারেন নি, কারণ, সিপাহীযুদ্ধের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে সরকার বুঝেছিলেন, এ-দেশীয় সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কারে হস্তক্ষেপ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

বহুবিবাহ আন্দোলনসূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তিক্ততম আক্রমণ করেছিলেন—এবং বিদ্যাসাগর-ভক্ত কবির হাতে ব্যঙ্গকবিতার মারও খেয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমের হাতে ছিল প্রতিভার অস্ত্র, আর তাঁর প্রতিবাদী কবি প্যারী-মোহনের হাতে ভোঁতা কাটারি।

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম প্রসঙ্গে দু'চারটি কথার মধ্য দিয়ে উভয়ের ধাত ও জাত চিনে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

বিদ্যাসাগরকে বঙ্কিমচন্দ্র, বিপরীত, হয়ত বিরক্তিকর, অবশ্যই নিজ জীবনাদর্শের পরিপন্থী, চরিত্ররূপে দেখেছিলেন। অসীম সাহিত্য-প্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র মূলত মনোজীবী। তাঁর আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা—সকলই গ্রন্থাশ্রয়ী।

সাহিত্যই তাঁর প্রভাবের মূলে। রচনা-ধর্মে তিনি 'ঋষি'—জীবনে নন। তিনি সামাজিক মানুষ, সংসারী, চাকুরীজীবী, সাহেব-কর্তাদের অধীনস্থ। উপর-ওয়ালা সাহেবদের সুপারিশের উপর তাঁর কর্মজীবনের উন্নতি নির্ভরশীল। তাঁদের কাছ থেকে কখনো নিন্দা, কখনো প্রশংসা পেয়েছেন। চাকুরিকালে অল্প-স্বল্প স্বাধীন বুদ্ধি দেখালেও চাকুরিত্যাগ তাঁর কল্পনাতীত। অপরপক্ষে বিদ্যাসাগর চাকুরিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। প্রয়োজনে আলু-পটল বেচব—তাঁর এই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছিল বই ছাপা ও বই বেচার ব্যবসায়ে। তাতে হাজার-হাজার টাকা রোজগার করেছেন—সেসব উজাড় করে দানও করেছেন। সংসারী হয়েও সে-ব্যাপারে পিছুটান রাখেন নি। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বঙ্কিম যেখানে ধীরে-চলো নীতির পক্ষপাতী, বিদ্যাসাগর সেখানে বিদ্রোহী সংস্কারক। শামলা-পরা ডেপুটিরা যাঁদের কৃপাপ্রার্থী সেই সর্বোচ্চ ইংরাজ রাজপুরুষদের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর ধুতি-চাদর পরেই খাতির আদায় করে নিয়েছেন। বঙ্কিম তাঁর অপমানের জ্বালাকে কিছু পরিমাণে প্রকাশ করেছেন সাহিত্যে, বিদ্যাসাগর সেক্ষেত্রে কার-সাহেবের মুখের সামনে চটিজুতো নাচিয়েছেন। রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখের যন্ত্রণার সাহিত্য বঙ্কিম লিখেছেন, আর বিদ্যাসাগর ওই লোকগুলির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কষ্টের অশ্রুতে নিজের অশ্রু মিশিয়েছেন, তাদের ঘরের কলেরা রোগীকে পথ থেকে বুকে করে তুলে এনে শুশ্রূষা করেছেন। বঙ্কিম বড় জোর পাগলাটে প্রেমিক-দার্শনিক কমলাকান্ত সৃষ্টি করেছেন, বিদ্যাসাগর সেখানে মানবপ্রেমের সচল বিগ্রহ হয়ে অবতীর্ণ। মোট কথা, বঙ্কিম দেশপ্রেমের কবি, আর বিদ্যাসাগর মানবপ্রেমের প্রতিমা। যে-ব্যাপক সামাজিক চৈতন্য ও বিশ্বচৈতন্য থাকলে দেশসমস্যাকে মানববিশ্বের বৃহত্তর সমস্যার মধ্যে স্থাপন করে বিচার করা সম্ভব, সে-বস্তু ছিল বঙ্কিমচন্দ্রে, তাই তিনি এদেশে বৃটিশ শাসনের ভূমিকার রূপ কী, ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে তার গ্রহণ ও প্রতিরোধের প্রকৃতি কী হওয়া উচিত, সেসব বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছেন—সেখানে বিদ্যাসাগর প্রায় নীরব। মানুষের সাক্ষাৎ দুঃখের নিরাকরণেই তাঁর জীবনদান। নিজ নিজ ক্ষেত্রে দুজনেই বিরাট ও মহান—কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁরা ভিন্ন। তাই উভয়ের সংঘাতের ক্ষেত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনো-সখনো কিছু উচ্চ বিশেষণে বিদ্যাসাগরকে সংবর্ধিত করলেও বিদ্যাসাগরের চরিতকথা লেখায় অগ্রসর হন নি—নিশ্চয় মনে সাড়া পান নি বলে। তিনি লিখেছেন ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধুর কথা। মৃত মহাত্মা মিলকে ছাড়েন নি—কিন্তু বিদ্যাসাগর নন। দূরের রুশো, মিল, চলতে পারে, কিন্তু কাছের বিদ্যাসাগর গ্রহণযোগ্য নন। তাঁর কাছে, বিদ্যাসাগর যেমন, তেমনি রামকৃষ্ণও অভাবিত ঘটনা। অলৌকিক কাণ্ড-ঘটানো গুহা-গহ্বরের সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর পক্ষে স্বাদু, কিন্তু গান-গাওয়া, সমাধিস্থ হওয়া, কাম-কাঞ্চনকে তুচ্ছ করতে বলা, সাধু রামকৃষ্ণ—কদাপি ন কাদপি ন। বিদ্যাসাগরকে তাই ঠিকভাবে বোঝার মানুষ বঙ্কিম নন—বিবেকানন্দ। সর্বগ্রাসী উদার প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথও।

বিদ্যাসাগরও অপরপক্ষে বঙ্কিমকে সম্পূর্ণ বুঝতে সমর্থ ছিলেন না। বঙ্কিমের উগ্র স্বাজাত্যবোধের মোড়কের মধ্যে অবস্থিত তীব্র পাশ্চাত্ত্যপ্রীতিকে কি দেশসংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক বিদ্যাসাগর মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন কখনো ? পাশ্চাত্ত্যের জীবনরসকে এদেশীয় দেহপাত্রে ঢেলে যে-নতুন সাহিত্যের জন্ম হচ্ছে, কামস্বপ্নের জারক দিয়ে যে-জীবনরস তৈরি করার চেষ্টা চলছে—তার রহস্য কি বিদ্যাসাগরের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল ? বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অগ্রবর্তী। বিদ্যাসাগরের আত্মাভিমানে তাতে ঘা লেগেছিল। সাহিত্যিক হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। সে বিষয়ে খ্যাতিও পাচ্ছিলেন। বঙ্কিম সে খ্যাতিকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দেন। মনীষায় অদ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র তর্কযুদ্ধের সময়েও দেখিয়ে দিলেন, কিভাবে বিপক্ষের যুক্তির মধ্যে ছিদ্র আবিষ্কার করতে হয়। দেখিয়ে দিলেন, বিদ্যাসাগর পণ্ডিত—কিন্তু মনীষী নন। বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনের সময়ে তা দেখা গেল।

বহুবিদ্যাবিশারদ, লেখক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কোমৎ-পন্থী পজিটিভিস্ট, নাস্তিক, বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ, খোলামেলা কথাবার্তায় অভ্যস্ত—তিনি পুরাতন প্রসঙ্গ করার সময়ে তাঁর 'গুরু' বিদ্যাসাগরকে ছেড়ে কথা বলেন নি। তাঁর কথাগুলিতে অসাধারণ গভীরতা আছে এমন নয়, কিন্তু তাতে আছে কিছুটা ভিন্ন চোখে দেখার চেষ্টা এবং বিদ্যাসাগরের দোষত্রুটির ব্যাখ্যান। তার আঁচে বিদ্যাসাগরের মূর্তি পুড়বে না, বরং বেশ তপ্ত তাজা হয়ে উঠবে। কৃষ্ণকমলের কিছু কথা এই :

"অনেক সময় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতাম। এই-যে ভাব, এটা আমার মনে হয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অত নিবিড়ভাবে ছেলেবেলা হইতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হইয়াছিল। এখন অনেক বয়স হইয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তৎকালে আমার যে এইপ্রকার বৃত্তি ছিল, তাহা কেবল মূর্খতামূলক এবং অনভিজ্ঞতা-জনিত। এখন আমি ভাবিয়া লজ্জিত হই যে, সেই মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতাবশত আমার হিতৈষী অনেক ব্যক্তির প্রতি যে-প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল, তা আমার করা হয় নাই।"[২০]

"শ্যামাচরণ সরকার ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন ; ল্যাটিন ও গ্রীক জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন।...শ্যামাচরণবাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন তখন...খাঁটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভালো হইয়াছিল।। কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন—আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যোগ দিলাম। শ্যামাচরণবাবু আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।...বাংলা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।"

"কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজি তর্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন। Encyclopaedia-তে

ইংরেজি ও বাংলা পাশাপাশি ছাপা হইয়াছিল। ইংরাজি তাঁহার নিজের রচনা ছিল না। বামপৃষ্ঠে কোনও ইংরাজি গ্রন্থ, দক্ষিণ পৃষ্ঠে তাঁহার রচিত বাংলা অনুবাদ—এই প্রণালীতে ঐ পুস্তকগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না। কেবল বলিতেন, 'লোকটা কি রকম দেখছ? টুলো পণ্ডিতের মতো কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে।"

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটা ইংরাজিতে একজন ধনুর্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখতে খুব মজবুত। কিন্তু সাহেবদের কাছে বলে বেড়ায়, 'ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি; যদি কিছু আমার জানা-শুনা থাকে, তা সংস্কৃতশাস্ত্রে।' ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন—বাস্ রে। ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না-জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে! এইরূপ কোনও এক আসরে বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মতো বুদ্ধিমানও নেই, নির্বোধও নেই। তোমরা যে বুদ্ধিমান তাহা বলা বাহুল্য, তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দিকে দেদীপ্যমান। কিন্তু তোমাদিগকে নির্বোধ এইজন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্মণ্য অনেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে; আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।'...

"ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন, সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাংলা ভাষার গঠন বিষয়ে কেহই সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন—তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন, 'অক্ষয় লিখতে-টিখতে বেশ পারে, আমি দেখে-শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দুজনের স্টাইল, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

"বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। Blank Verse তাঁহার একেবারে অসহ্য।...তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। ম্যাটার সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না, কিন্তু ম্যানার সম্বন্ধে, স্টাইল সম্বন্ধে, তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে, Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabbe and Cowper in English literature—যে-রেভল্যুশনের চূড়ান্ত হইল ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ-এ। এডিনবরা রিভিউ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে গোড়াতেই চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—'This will never do।' কিন্তু কবি অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইলেন ও Poet Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন, 'কান্নার জোলাপ'।

"বিদ্যাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না। আমার দাদার বেকনও

তিনি পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে সংস্কৃত কথার সহিত ছোট-ছোট সাধারণ বাংলা কথা ছিল। আমি তো পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের ওই একটা প্রধান দোষ ছিল, তাঁহার narrowness, তাঁহার bigotry, তাঁহার একান্ত 'বামুন পণ্ডিতি' ভাব। এক হিসাবে catholicity তাঁহার ছিল না। যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাঁহাকে নগণ্য মনে করিলেন; যে তাঁহার অনবরত-বিগলিতবাষ্পাকুলিতলোচনের মতো ভাষা প্রয়োগ না করিল, তাহার উপর তিনি খড়্গহস্ত। 'পরগুণপরমাণূন্ পর্বতীকৃত্য নিত্যং / নিজহৃদিবিকশন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ'—এই দুই ছত্রে 'ভাবিনীবিলাস'-এর কবি জগন্নাথ পণ্ডিত যে-উদারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের সে উদারতা কোথায়? পরগুণের পরমাণুগুলিকে পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলা তো দূরের কথা, তিনি ইংরাজিশিক্ষিত লেখকদিগের গুণ দেখিতেই পাইতেন না।

"বঙ্কিমের হাতে বাংলা সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিল। একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাতটা খারাপ করে গেছেন।' আমারও অনেকটা ওই রকম মত।"[২১]

বিদ্যাসাগরকে যিনি গুরু মেনেছেন, যৌবনে যিনি বিদ্যাসাগরের ভাষাকে সমর্থনের জন্য কোমর বেঁধেছিলেন, সেই কৃষ্ণকমল কখি আলগা করে বিদ্যাসাগরের ভাষার এবং স্বভাবের কঠোরতম সমালোচনা করলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মানুষের বোধোদয় যে-কোনো সময়েই হতে পারে। একই ঝোঁকে তিনি বাঙালী সমাজে বিদ্যাসাগরের প্রতিপত্তির কারণ নির্দেশও করেছেন:

"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি [কালীপ্রসন্ন সিংহ] অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্যে ব্রতী করিয়াছিলেন। যে-পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক। সেকালে সমস্ত বড়লোক বিদ্যাসাগরের অনুগত ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহার কথায় উঠিতেন বসিতেন। তাঁহার কথায় কোনো সিকিউরিটি না লইয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ দিয়াছিলেন।...বিদ্যাসাগরের প্রতি এই-যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত, 'সাহেবদের' কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন।...আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে-সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙালীর 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়েও বেশি প্রতিপত্তি হয়। পূর্বে আমি যে তাঁহার literary jealousy-র কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিলনা, একথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে

এইটুকু দৌর্বল্য ছিল, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। সাহেবদের নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না ; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে সাহেব-সমাজে যে-প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।"২২

'যে-সে লোক নয়', এমন একজন মনীষী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নানা দৌর্বল্যের কথা জানা গেল। কিন্তু একই দোষ আবার অন্যের চোখে গুণ বলেও তো মনে হতে পারে! সবই আপেক্ষিক। বিদ্যাসাগর তাঁর অপছন্দের বস্তুকে পছন্দ করতেন না (কে করে ?), এক্ষেত্রে তিনি অনুদার 'একগুঁইয়া' ছিলেন—সেই তো তাঁর চরিত্র। 'কী ভাই' বলে পাঁচজনের পিঠ চাপড়ে দাদা সাজার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। 'ক্যাথলিসিটি' অবশ্যই মহৎ গুণ। কিন্তু 'আম্মো ভালো, তুম্মো ভালো, সব্বাই ভালো'—এই নিপাট ভালোমানুষি অনেক সময়ে ক্যাথলিসিটির নাম ধরে আমাদের মোহিত করে ফেলে। বিদ্যাসাগর যখন 'অনুচিত' নিন্দা করেছেন, করেছেনই অনেক সময়, তখন তার নাম বিদ্যাসাগরী নিন্দা—বিদ্যাসাগরী চটির মতো ধুলিধুসর, সশব্দ, এবং গর্বোদ্ধত। বিদ্যাসাগর অনেক সুবোধ সুশীল নীতিকথা তাঁর বইয়ে লিখেছেন—বাঁচোয়া, তিনি সেই সকলের ডামি হন নি।

এইখানে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে-কবিতা আগে উদ্ধৃত করেছি তার দু'একটি বিশেষ শব্দ পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দিই :

"উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি।"
"প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম।" "স্বাতন্ত্র্যে শেকুল-কাঁটা।"

বিধবাবিবাহ বিষয়ক রচনাদির মতোই বহুবিবাহ বিষয়ক নানা রচনায় বিদ্যাসাগরকে কেবল হৃদয়বান মানুষ-রূপে নয়, গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন মানুষ হিসাবেও দেখা গিয়েছিল। এমন একাধিক কাহিনী তিনি বলেছেন যাদের মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে ফুটেছে কৌলীন্যপ্রথার অভিশপ্ত রূপ। কৌলীন্যপ্রথা এবং বহুবিবাহ প্রথা কিভাবে সমাজে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে, পদস্খলনের পথে অসহায় নারীদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেসব কাহিনী বীভৎস, এখানে আর সংকলন করতে চাই না। এর উল্টোদিকে বর্বর পুরুষের আস্ফালন—ঘৃণ্য। একটি উদাহরণ :

"কোনও প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়, আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সে-সকল স্থানে যাওয়া হয় কি ? তিনি অম্লানমুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট পাই সেইখানে যাই।—গত দুর্ভিক্ষের সময়ে একজন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই, বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি। —গ্রামে বারোয়ারী পূজার উদ্যোগ হইতেছে। পূজার উদ্যোগীরা ওই বিষয়ে

চাঁদা দিবার জন্য কোনও ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য একটি বিবাহ করিলেন।"[২৩]

এই কাহিনী অগ্রসর হয়েছে কদর্যতর ছবির পর ছবি হাজির করতে করতে। বিদ্যাসাগর তাঁর রচনামধ্যে বহুবিবাহবীরদের আংশিক তালিকা দিয়েছেন। তার শীর্ষে আছেন হুগলী জেলার জনৈক ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সেই মহাশয় ব্যক্তি ৫৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই ৮০টি বিয়ে সাঙ্গ করেছেন। তাঁর তলায় আছেন ৬৪ বৎসর বয়সে ৭২টি বিবাহকারী ভগবান চট্টোপাধ্যায়। হুগলী জেলার তালিকার সর্বনিম্নে আছেন মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বয়স ১৮, বিয়ের সংখ্যা ৫। যাঁদের বিধানে এবং চেষ্টায় এই প্রথার প্রবর্তন, তাঁদের সম্বন্ধে রাগে অস্থির হয়ে বিদ্যাসাগর অভিশাপ দিয়ে বলেছেন, "যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকবিশারদ নিঃসন্দেহে নরকগামী হইয়াছেন।"[২৪]

বিদ্যাসাগরের লেখা অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে রাগে অস্থির করেছিল। বিদ্যাসাগরের লেখায় যেখানে ছিল তথ্যের সঙ্গে হৃদয়ের তাপ, সেখানে বঙ্কিম তাঁর কলম শানালেন শীতল যুক্তির ঘর্ষণে। এই লেখায় তিনি একাধিকবার বলেছেন—আত্মরক্ষার কারণেই অবশ্য—বহুবিবাহ প্রথা অতীব অনিষ্টকর, তার অনিষ্টকরতা বহুবিবাহকারীরাও স্বীকার করে, এবং এই প্রথা ক্রমবিলীয়মান। বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত তালিকা, তাঁর মতে, অযথা স্ফীত; সে তালিকা যদি ঠিকও হয়, তবু সে সংখ্যা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার তুলনায় কতটুকু ? এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অশালীন তুলনা :

"এমত অবস্থায় বহুবিবাহ-রূপ রাক্ষস বধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন্ কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।"

পুনশ্চ :

"কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক-একজন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই-এক ঘা লাঠি মারিয়া যান—কি জানি, যদি ভালো করিয়া না মরিয়া থাকে ! আমাদের বিবেচনায় ইঁহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই-এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ করে দেখালেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত যদি নাও হয়, তাতে ওই কুপ্রথাধারীদের কোনোই অসুবিধা নেই, যেহেতু দেশ শাস্ত্রে চলে না, চলে লোকাচারে।

[এইখানে লোকাচার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ব্যঙ্গরচনার উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা গেল না :

"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত। আর সেথা নাই-বা কি ? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হতে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

শিব, শক্তি, সূর্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুঁচোদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই-বা কি ?···আর লোকেরই-বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সেদিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হলো, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কী কাণ্ড ! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না। দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ-মুণ্ডু, একশো-হাত, দুশো-পেট, পাঁচশো-ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে-সকল ঠাকুরদেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড়, বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেললেই যথেষ্ট পুজা হয়। কিন্তু আসল পুজা এঁর করা চাই— যিনি দ্বারদেশে। আর ওই-যে বেদ-বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্রসকল দেখছ, ও মধ্যে-মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি ? উত্তর এল—এঁর নাম, 'লোকাচার'।"[২৫]]

বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের তর্কপ্রবৃত্তি ক্রমে নিষ্ঠুরতর হয়েছে। ব্যঙ্গপ্রখর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন, শাস্ত্র যদি মানতে হয় অর্ধেক মানা হবে কেন ? শাস্ত্রের বিশেষ অংশে যদি একথা থাকে যে, যদৃচ্ছা বিয়ে করা চলে না, তাহলে শাস্ত্রের অপর অংশে যেখানে আছে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ বিধেয়, তারও অনুসরণ করা কর্তব্য। সেক্ষেত্রে অবস্থা কী দাঁড়াবে তা দেখিয়েছেন, তার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে ব্যঙ্গকৌতুকের উত্তম নমুনা :

"···আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া, [তারপর] কামতঃ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সহিত বচসা করিয়া বাপের বাড়ি যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব।···এই দুই কোটি বাঙালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা, সেই আর একটি বিবাহ করুক। যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক।···কেননা ইহা শাস্ত্রসম্মত। তদ্ভিন্ন, যাহার কন্যাভিন্ন পুত্র জন্মে নাই,···সকলেই আর এক দারপরিগ্রহ করুন।···কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে। 'সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।' ভার্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্যই অধিবেদন করিবে ! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহার ভার্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্ধনার্থ সদ্যই পুনর্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবত মুখরা, দ্বিতীয়া ভার্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে, তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙালীর মেয়ের মুখ ভালো নহে) তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ 'লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের' অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন।···যাঁহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া স্বামীর উপর তর্জনগর্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন।

যাঁহারই স্ত্রী, যাতার [পতির ভ্রাতৃজায়ার] অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিবেন, 'তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোনও সুখ হইল না', তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া, সম্বন্ধ স্থির করিয়া, সদ্যই অন্য দার গ্রহণ করিবেন। যাঁহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, 'কিছুতেই তোমার মন জোগাইতে পারিলাম না, আমার মরণ হয় তো বাঁচি'—তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, 'মহাশয়, কন্যা দান করুন।' এতদিনে বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল।...বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ-ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বাঙালীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।...[বিদ্যাসাগরের] সেই পুস্তকোদ্ধৃত ধর্মশাস্ত্রের বলে বাঙালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে 'লোকহিতৈষী' বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।"

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু মুসলমান প্রশ্নও তুলেছেন। বাংলার অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। হিন্দুর জন্য আইন হলে হিত হবে মাত্র অর্ধেক প্রজার। মুসলমানেরা আইনের হাতের বাইরে থাকবে। "আরবী কায়দা হেলে না, দোলে না; বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই।" এই কথার পরে আরও কঠিন খোঁচা দিলেন—বিদ্যাসাগর কি সত্যই শাস্ত্রভক্ত? ইঙ্গিতে বোঝালেন, তা উনি নন। উনি সদনুষ্ঠানের জন্য শাস্ত্র ব্যবহারে ঈষৎ কপটতার আশ্রয় নিচ্ছেন—যদি এই যুক্তি দেখানো হয় তাহলে বঙ্কিমের হাতে সমুচ্চ ন্যায়দণ্ড :

"যিনি এই পাপপূর্ণ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।"

[এখানে আমাদের হায় হায় এবং বাহবা বলতেই হয়। উপরে উদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলিকেই কি রবীন্দ্রনাথ মধুরতর ভাষায় 'সত্য ও মিথ্যা' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেই প্রয়োগ করেন নি !!]

এর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য ব্যাজস্তুতি :

"আমরা একথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূন্য। তিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রতি গদগদচিত্ত হইয়া তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতেছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই।"

বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নিয়েও কটাক্ষ :

"এমত হইতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীমধ্যে যে-কয়জন পণ্ডিত আছেন তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ধর্মশাস্ত্রের বিশারদ। কিন্তু সেকথা

পরের মুখেই ভালো শুনায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারেন নাই।”

বঙ্কিমের কণ্ঠ আরও বাঁকা হয়েছে। তাঁর বড় সাধ ছিল, তিনি গোঁড়া পণ্ডিতদের মুখের উপর শুনিয়ে দেবেন, তোমাদের সাহস তো কম নয়, তোমরা বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছ? তিনি যে ধর্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, তা কি তোমরা জানো না? কিন্তু তাঁর আক্ষেপ, সেকথা বলতে পারলেন না, কারণ, বিদ্যাসাগর নিজেই নিজের সম্বন্ধে সেকথা গেয়ে রেখেছেন।

আরও আক্রমণ : …

তর্ককালে বাঙালীর বড় দোষ, প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করা। “বাঙালীর নিম্নশ্রেণীর লেখকরাও পরস্পরের মতভেদ দেখিলে অমনি ভিন্ন মতাবলম্বীকে… উচ্চার্য এবং অনুচ্চার্য কথায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ও সংসর্গ বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগের নিকট অন্য ভাষার প্রত্যাশা করা যায় না; ইতরে ইতরের ব্যবহার্য ভাষাই ব্যবহার করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা ভদ্রের ব্যবহার্য ভাষারই প্রত্যাশা করি।” বঙ্কিম বিদ্যাসাগর-ব্যবহৃত কিছু কটু কথার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর কর্তৃক সংকলিত প্রবোধচন্দ্রিকার অশ্লীল কাহিনী প্রসঙ্গে বঙ্কিম সমূহ ধিক্কার দিয়েছেন: “উপাখ্যানটি এরূপ অশ্লীল যে, বোধ হয় যে, সামান্য ইতর লেখকও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিতেন না, কেননা তাঁহাদের লজ্জা না থাকুক, রাজদণ্ডের ভয় আছে।…বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিবেন না।…আমরা সে উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের পাঠ্য বঙ্গদর্শন কলুষিত করিতে পারি না।”

ধিক্কারের পর ধিক্কারের স্রোত বয়ে গেছে এর পর। জাতিচিত্তকে কলুষিত করবার মতো লেখা বিদ্যাসাগর লিখছেন—এই বেদনা ও বিস্ময় সেই সঙ্গে। শেষকালে কিঞ্চিৎ বাক্যের মধুবাত :

“উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। একথা যদি আমরা বিস্মৃত হই তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি।”[২৬]

॥ ৫ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মচ্ছেদী লেখাটি বিদ্যাসাগরকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র তা জেনেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করার কালে তিনি তখন তীব্র অংশগুলি যথাসম্ভব বর্জন করেন। বিদ্যাসাগরের ভক্তরা লেখাটির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে অত্যন্ত চটেছিলেন। তাঁদের কলমে বঙ্কিমের জোর থাকার কথা নয়, তবে ক্ষোভ ও রোষের ঘাটতি ছিল না। ‘হালিশহর

পত্রিকা'য় তেমন লেখা :

"কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে
নাচিতেছে যাদুমণি হাততালি দিয়ে।
যারে পায় তারে ধরে দিগাদিগ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।
আবোলতাবোল বকে, সকলই নীরস,
'সাগরে' সাঁতার দিতে করেছে সাহস।
কালো চোখে কচি খোকা পরিয়া কাজল
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল।
ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা
সেদিন শহরে আসি দিয়াছিল দেখা।"[২৭]

প্যারীমোহন কবিরত্ন ছড়া-গানে পটু। এই প্রসঙ্গে তেমন ছড়ার অংশ :

"দুটো একটা গল্প লিখে, রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখে,
ধরাটাকে সরাসম জ্ঞান করে।
এ আস্পর্ধা কব কারে গোষ্পদ বলে না যারে
ডাগর সাগরে খোঁচা দিতে ভয় হলো না তার ?
হতেন যদি কূপ কি ডোবা, তা হলেও তো পেত শোভা,
... নদ নদী মধ্যে খুঁজে মেলা ভার।...
এখন গ্রন্থকর্তা ঘরে ঘরে এডিটর বহু নরে,
কিন্তু কলম যে কিরূপে ধরে তা অনেকে জানে না।
ভূষিমাল গর্দাভরা, ভেতরেতে ময়লা পোরা,
কাগজগুলো কেবল ভালো, বাইন্ডিং পরিপাটি।
একখানা বিকোয় না দেশে, মসলা বান্ধে অবশেষে,
তবু কত সর্বনেশে, কলম ধরতে ছাড়ে না।
অতি যাচ্ছেতাই, যা দেখতে পাই,
'সাগর' বই কে লিখতে জানে, কার লেখায় কি উপকার ?"[২৮]

একই প্রসঙ্গে 'বসন্তক' পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা) কার্টুন এঁকেছেন গিরীন্দ্রনাথ দত্ত, যাতে দেখা যাবে, একটি পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে একটি পুষ্ট ষণ্ড, তার গায়ে লেখা বিদ্যাসাগর, আর পুকুরে আছে ব্যাঙের দল—বুড়ো ব্যাঙটির গায়ে লেখা 'বঙ্গদর্শন'। বুড়ো ব্যাঙকে ছোট ব্যাঙগুলি উৎসাহ দিয়ে বলছে, 'বাহবা বাহবা, আর একটু ফুললেই হবে।' ছোট ব্যাঙগুলি হলো, বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'ভ্রমর' পত্রিকা বা বঙ্কিমের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'সাধারণী' পত্রিকা, ইত্যাদি। (ছোট ব্যাঙগুলি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বসন্তকের পরের সংখ্যাতে বেরিয়েছিল)।

বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের উৎসাহী ভক্ত ; পুস্তিকা লিখে, গান লিখে, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথাকে আক্রমণ করেছেন। তিনি

বিদ্যাসাগরের স্নেহ পেয়েছিলেন। একটি গানে তিনি ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরী, নারী, ভিক্টোরিয়ার কাছে বহুবিবাহারীদের স্ত্রীগণের অনুযোগ অভিযোগ তুলে ধরেছেন :

"রানী গো আমরা নালিশ করি, এত অবিচার সইতে নারি,
পিতা প্রতিবাদী হয়ে রাখলে ঘরে কয়েদ করি,
(মোদের) পতিধনকে লুটে নিলে সতিনীরা চোদ্দবুড়ি।
স্বামী সব আসামী হয়ে মনাগুণে মারে পুড়ি,
(তারা) পালায়ে পালায়ে ফিরে, যুগান্তে ধরিতে নারি।
তোমার কাছে মাগো, ওদের গ্রেপ্তারি প্রার্থনা করি,
(মোদের) উকিল আছেন বিদ্যাসাগর, মোক্তারীতে রাসবিহারী।"

কুলীন মেয়েদের নিয়ে রাসবিহারীর আর একটি দুঃখের গান—যার পটভূমিকায় আছে বিদ্যাসাগরের অসুস্থতা, কর্মশক্তি হ্রাস, এবং বহুবিবাহকে আইনত নিষিদ্ধ করতে অসামর্থ্য—সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সমর্থকদের প্রস্থান।

"(হায়) কি বিপদসাগর, মোদের বিদ্যাসাগর কাতর হল।
হা রে নিদারুণ বিধি, আর বা কী বাকি রল।
লর্ড মেও উৎসাহী ছিল, (তারে) তাকে অকালে কালে হরিল,
কালীকৃষ্ণ কৃষ্ণ পেল, (মোদের) কপালেই সকল হল।…
কোথা হে জগদীশ্বর, (মোদের) ঈশ্বরে আরোগ্য কর।
দুখিনীদের দুঃখ হর, অবলারা মলো মলো॥"[২৯]

যখন কেঁদে ফল নেই তখন হাসতেই হয়, অগত্যা। রাসবিহারীর তেমন এক হাসির গানের বিষয়বস্তু—এক কুলীন বহুবিবাহবীর তাঁর এক শ্বশুরবাড়ির সন্ধান করছেন বিশ বছর পরে একটি গ্রামে এসে। একটি বাড়ি যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। বাড়ির সামনে দাঁড়ানো মহিলাকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন 'মাগো' সম্বোধন করে। এই মহাপুরুষের বার্তা শুনে মহিলাটি বেদনায় শিউরে নতমুখে চলে গেলেন :

"বহুদিন পরে এসেছি, চিনি না শ্বশুরবাড়ি,
কোন্ পথে যাইব মাগো, বিশ্বনাথ বাড়ুড়ীর বাড়ি।
যারা ছিল ছেলেপিলে, তাদের হল ছেলেপিলে,
বিয়ে করে গেলেম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি।
বাড়িঘর তাঁর নাহি চিনি, (কেবল) শ্বশুরের নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আর তো হাসি রাখতে নারি,
তুমি যারে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী॥"[৩০]

উত্তরপাড়ায় গাড়ি উল্টে বিদ্যাসাগর যখন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন, যা তাঁর মৃত্যুকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল—তখনও তাঁকে নিয়ে গান। "বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়িয়া যাওয়াতে সে সময়ে চারিদিকে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়াছিল,

এবং সে সময়ের সুবিখ্যাত গায়ক ধীরাজ এই ঘটনা অবলম্বনে এক গীত রচনা করিয়াছিলেন ('বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর' গানের সুরে)"—

"অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুলেছে তোলাপাড়ি, এবার নাইক ছাড়াছাড়ি,
মিস কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মাদ্রাজ, কি বোম্বাই, সবই দেখেছে,
এখন এসে কলকেতাতে (এবার) বাঙালীদের নে' পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হল পথে,
এটকিন্‌সন্‌, উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ি উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে।"[৩১]

খুবই করুণ ঘটনা। কিন্তু ধীরাজের গান 'রগড়' ছাড়া হয় না, তাই গানের মধ্যে—'বড়ই রগড় হল পথে।' কিন্তু সত্যকার রগুড়ে গান ছিল বিধবাবিয়ে নিয়ে। তবে অশ্লীলতায় ঠাসা। চিংড়ি মাছ যেমন একটু রসা না হলে মৌতাতী স্বাদ আনে না, তেমনি অশ্লীলতায় না রসলে সেকালের গান বা কবিতা জমত না। আর সেকালের রসিক পণ্ডিতরা সেসব উপভোগও করতেন, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সুদ্ধ। নিজের খরচেও তাঁরা হাসতেন। অবস্থাটা কি রকম ছিল, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মুখে শুনে নেওয়া যায় :

"...অত কথায় কাজ কি, স্বভাবকবি ধীরাজ বিধবাবিবাহের আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে-গান রচনা করিয়াছিলেন, সে গানটি এত রুচি-বিগর্হিত ও অশ্লীল যে, তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়িতে ডাকাইয়া বলিতেন, ধীরাজ, একবার সেই গানটি গাও তো—সেই-যে, 'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে।' ধীরাজ অমনি সভার মধ্যে গান ধরিত—

'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে,
পরাশরের··············দিয়েছে।'

"গানের অন্য চরণগুলি এখনকার রুচি হিসাবে অপাঠ্য, অশ্রাব্য। এখন বোধহয় বুঝিতে পারিতেছ যে, সমাজের বায়ু কিরূপ দূষিত ছিল।"[৩২]

বিদ্যাসাগর রাগতেন, আবার হাসতেন। রাগের মতোই তাঁর হাসিও থামে নি। মরুপথে হাঁটতে হাঁটতে মরূদ্যানের জলাধার পেলেই আঁজলা ভরে তৃষ্ণা মেটাতেন। দেশী ভাব রীতি তাঁর দেহে মনে জড়িয়ে ছিল। বিধবাবিবাহ বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদী ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁকে বিদ্যাসাগর খাতির করতেন খাঁটি বাঙালী কবি বলে। তেমনি দাশরথি রায়কেও। আর একজন কবি, যাঁর নাম এখন বিদ্যাসাগরের জীবনীর মধ্যেই আবদ্ধ, রসিকচন্দ্র রায়, বিদ্যাসাগর তাঁকেও 'প্রকৃত বাঙালী কবিশ্রেণীর শেষ কবি' বলে মনে করতেন। এই রসিকচন্দ্রের সঙ্গে

বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এঁর কবিতা তিনি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করেন, নাতি নাতনীদের এঁর কবিতা মুখস্থ করাতেন। কিন্তু কবি রসিকচন্দ্রের লুপ্ত মহিমার উদ্ধার এখানে আমাদের অভিপ্রায় নয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যসম্পর্কের একটি বিশেষ কারণের উল্লেখই উদ্দেশ্য। বিহারীলাল লিখেছেন :

"রসিকচন্দ্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি শতমুখে বিদ্যাসাগরের সহৃদয়তা ও বদান্যতার কীর্তন করিতেন।...অনেকবার রসিকচন্দ্রের মুখে অনেক রস-ভাষা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বার্ধক্যভরা বদনমণ্ডলেও যৌবনসুলভ হাস্যকৌতুকের লহরী দেখিয়াছি।"

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে রসিকচন্দ্র একবার কলকাতায় এসেছিলেন। এবার দেখা গেল, তাঁর মুখে সে হাসি নেই, রসভাষা নেই। "বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বৃদ্ধের দেহযষ্টি ভগ্ন হইয়াছিল। পরম সুহৃদ বিদ্যাসাগরের গুণগরিমা ও বান্ধববাৎসল্য স্মরণ করিয়া তিনি কেবলমাত্র অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। রসিকচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'যখন বিদ্যাসাগর নাই, তখন আমিও আর নাই'।"

দু'বৎসরের মধ্যে ভগ্নদেহে এই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়।[৩৩]

রসের উৎস শুকিয়ে গেলে গাছ বাঁচে না—এই জানা কথাটা কি আবার বলার দরকার আছে ?

মজলিশী পণ্ডিত

॥ ১ ॥

শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও আকাট সত্য—শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী বিদ্যাসাগর দারুণ আড্ডাধারী। বঙ্গ সংস্কৃতির যুগপৎ মহৎ ও অমহৎ লক্ষণ—আড্ডা। বাঙালীর অমহৎ চরিত্র সংশোধনে ব্রতী বিদ্যাসাগর কিন্তু আড্ডা পরিহারের ব্রত গ্রহণ করেন নি। এদেশীয় আড্ডার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের নাম অবশ্যই লেখা থাকবে।

পাঠককে সচেতন করে দেওয়া ভালো, আড্ডা বলতে আমি অতি বিদগ্ধ-জনদের মিষ্ট শিষ্ট বাক্যালাপ বুঝছি না। চণ্ডীমণ্ডপ থেকে রক পর্যন্ত যার বিস্তার—সেই হলো আসল আড্ডা। এর মধ্যে, ঢালাও ফরাসে গা ঢেলে গাল-গল্পকেও টেনে নেওয়া যায়। আড্ডায় একজন কুলপতি থাকতে পারেন, কিন্তু ভক্তবৃন্দের সামনে তিনি একক বাগ্‌বিস্তার করছেন, আর ভক্তরা মৃদুমন্দ শিরঃসঞ্চালন করে সমাদর জানাচ্ছেন—সে বস্তু আড্ডা নয়। সদস্যদের গণতান্ত্রিক সমানাধিকার আড্ডার অবশ্য-লক্ষণ। তাতে হাসি-তামাশা, মজাদারি, এবং নির্দোষ পরচর্চা থাকবে। আড্ডা এমন একটা কাণ্ড, যেখানে 'কী বলব, আর কী না-বলব', সে বিষয়ে জাতিভেদ নেই। আড্ডার কথাবার্তা কখনো জমাট কখনো শিথিল—গোছালো বা এলোমেলো। আলাদা আলাদা ব্যঞ্জন কিংবা পাঁচমিশেলি খিচুড়ি। আড্ডা—কথার হট্টমালা, যার মধ্যে ছড়ানো ছিটানো কিছু সাজানো দোকানপাট।

বিদ্যাসাগরের আড্ডার সঙ্গীদের কিছু নাম পেয়েছি। কিন্তু আড্ডাকালে তাঁদের ভূমিকার বিষয়ে বেশি সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি নি। তাঁরা তখনকার সমাজে বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন। সেজন্য তাঁদের বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা চোগা-চাপকান চাপানো চেহারার উপরই প্রশস্তির ফুলের মালা ঝুলিয়েছেন, তাঁদের গা-খোলা রূপ দেখা অশালীন কাজ মনে করেছিলেন। যাই হোক, তাঁদের একজনের, দ্বারকানাথ মিত্রের, অন্তরঙ্গ চেহারার দু'একটি খণ্ড চিত্রকে নমুনা রূপে তুলে আনব। সেগুলি আছে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রুতিস্মৃতি' বইয়ে।

দ্বারকানাথ আইনজগতে দিকপাল, প্রথমে উকিল হিসাবে, পরে হাইকোর্টের জজ হিসাবে। তাঁর আর এক পরিচয়, তিনি নামকরা পজিটিভিস্ট—ওই আন্দোলনের পাশ্চাত্ত্য প্রবক্তাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। পজিটিভিস্ট হিসাবে তিনি ধর্মকর্মের ধার ধারতেন না। একবার ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি তৈরির জন্য দান সংগ্রহ করতে তাঁর কাছে গেছেন কেশবচন্দ্র সেন, প্রসন্নকুমার সেনকে সঙ্গে নিয়ে। ধর্মমন্দিরের জন্য টাকা দেবেন না, এই কথা দ্বারকানাথ যখন

কেশবচন্দ্রকে বলছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর সেখানে হাজির হলেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে বললেন, "দোয়ারি [অর্থাৎ দ্বারিক] ধর্ম-টর্ম জন্য টাকা দেবে না ; স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বলে চাও, ও টাকা দেবে।" কেশবচন্দ্র সেই মতো চাইলে তৎক্ষণাৎ ২০০০ টাকা পেয়েছিলেন। দ্বারকানাথের কাছে ভবানীচরণ ভট্টাচার্য নামে এক রসিক ব্যক্তির ভাই তাঁর ছেলের উপবীত-অনুষ্ঠানের জন্য অর্থভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ তামাশা করে বললেন, "পৈতে দিয়ে কি হবে ? আজ পৈতে দেবে, কাল কেশব সেন ধরে নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্ম করে দেবে। তাই ও-ব্যাপারে কিছু মিলবে না।" ব্রাহ্মণ সে কথা শুনে, তেলে-বেগুন জ্বলে উঠে, দ্বারকানাথকে "কুলাঙ্গার, ম্লেচ্ছ" ইত্যাদি গাল দিয়ে উঠে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মণ অন্তরালে গেলে দ্বারকানাথ কিছু টাকা পাঠিয়ে ব্রাহ্মণকে খুশি করেন।

[এইখানে রামমোহন রায়ের পৌত্রের কাছে ধর্মমন্দির ব্যাপারে চাঁদা চাওয়া সূত্রে যে কৌতুকজনক ঘটনা ঘটেছিল, সেটি হাজির করা যায়।

"একবার শিবনাথ শাস্ত্রী ও আর কয়টি ব্রাহ্ম ভদ্রলোক হরিমোহন রায়ের নিকট ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী নির্মাণ উপলক্ষে চাঁদা চাহিতে যান। যাইয়া দেখেন, হরিমোহনবাবু বন্ধুবান্ধব-সহ মদ্যপান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'আপনার এরূপ ব্যবহারে আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম।' হরিমোহনবাবু বলিলেন যে, 'আমি দুঃখিত হলাম যে, আপনার ক্ষোভ হয়েছে। কিন্তু ক্ষোভ নিবারণের ইহা অপেক্ষা আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই।' এই বলিয়া তিনি গ্লাসে মদ্য ঢালিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে পান করিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বিরক্ত হইলেন। চাঁদার কথায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'আপনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের পৌত্র, আপনি সাহায্য করিবেন না তো কে করিবেন ?' ইহাতে রায় মহাশয় বলিলেন, 'আমার ঠাকুরদাদা মহাশয় তেত্রিশ কোটি দেবতা উড়িয়ে এক ব্রহ্ম খাড়া করেছিলেন, আমি কিন্তু সেই 'এক'ও উড়িয়ে দিয়ে শূন্য খাড়া করেছি।"[১]]

উদার, স্নেহশীল দ্বারকানাথ মজাবোধ করতে, খুশি হতে চাইতেন। পূর্বোক্ত ভবানীচরণ ছিলেন দ্বারকানাথের বন্ধু দেবেন্দ্র দত্তের বাড়িতে আশ্রিত রসিক পুরুষ—অর্থাৎ গোপাল ভাঁড়। তাঁর আলগা গা, মাথায় মস্ত পাগড়ি, হাতে লাঠি, পেটভরা খিদে এবং মুখে কখনো হুংকার কখনো চোটপাট কথা। নিজের পরিচয় তিনি বড়ো আকারে দিতেন। তাঁরা পাঁচ সহোদর—"বড়, জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র (কায়েত) ; মেজ, যদুলাল মল্লিক (সোনার বেনে) ; সেজ কৃষ্ণদাস পাল (তেলী) ; ন, বহুবাজারের বিশে (জেলে) ; কনিষ্ঠ, ভবানীচরণ ভট্টাচার্য, এম-ডি, সরস্বতীর বরপুত্র।" তাঁর পাঁচ সহোদরা বোন —"প্রথম, যাদী (ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী) ; দ্বিতীয়, যাদীর মা।" তাঁর "সাক্ষাৎ পিসতুতো ভাই, অক্রূরের বাটীর শম্ভু মুখুজ্জে (বামুন), আর কেশব সেন (বদ্যি)। সাক্ষাৎ মাসতুতো ভাই, ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর (বামুন), আর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার (চাষা)। বাপের নাম, হাবড়ার পোল, আর নেড়াগির্জার দোহুত্তুর (দৌহিত্র)।"

ভবানীচরণের এই ঘোষিত উদার রক্তসম্বন্ধ দেখিয়ে দেয়, আড্ডার জগতে কী ধরনের গণতান্ত্রিকতা বজায় ছিল। এখানে পরস্পরকে রেয়াত করার রীতিও ছিল না। রেজিস্ট্রার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, সেকালের বিশিষ্ট মানুষদের রীতিতে, নৈশ রসপানে অভ্যস্ত। তিনি অক্রূর দত্তের বাড়িতে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। তার ফলে বাড়ির সবাই যখন উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত, তখন ভবানীচরণ প্রতাপচন্দ্রকে বলেছিলেন, "মশায়, এ বড় আশ্চর্য বাধালেন। খেলেন খেলেন—দিনের বেলায় খেলেন। আর কিনা কুটুম্বাড়িতে এসে পড়ে গেলেন।"

দ্বারকানাথের আড্ডা জমত বিকালে—তাঁর বাড়ির পুকুরপাড়ে চাতালে। রাত দশটা পর্যন্ত গল্প-গাছা চলত। আড্ডায় নিয়মিত বা মাঝে-মধ্যে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সিনিয়ার), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বসু, ঈশ্বর চক্রবর্তী, অম্বিকাচরণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ (পজিটিভিস্ট), জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ বিশ্বাস। বিদ্যাসাগরও আসতেন, কিন্তু তিনি দ্বারকানাথের বাড়িতে বেশি রাত পর্যন্ত থাকতেন না, ডাঃ রাজেন্দ্র দত্ত ও শ্যাম বিশ্বাসও তাই। "কারণ, রাত্রে ইংরাজি খানা ও মদ্যপান চলিত।" ওঁদের রাতের খানা যাই হোক, দিনের বেলায় বাড়ির সমস্ত ছেলেদের নিয়ে দ্বারকানাথ খেতে বসতেন, এবং তাঁর বাড়িতে এই নিয়ম চালু ছিল, সকলেই এক ধরনের খাবার পাবে, বড় ছোটর ভেদ রাখা যাবে না। নিমন্ত্রণ বাড়িতেও তাঁর একই রীতি।

"অনেক লোকের মধ্যে তাঁকে যে বিশেষ সম্মান করিবে, এটা তিনি সহ্য করিতেন না। একবার সদরআলা কৈলাস বক্সী মহাশয়, দ্বারিকাবাবু ও অন্যান্য ভদ্রলোককে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। দ্বারিকাবাবু ভোজনস্থানে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার জন্য রূপার থালায় অন্নব্যঞ্জন রাখা হইয়াছে ও সম্মুখে কার্পেটের আসন বসিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়কে ইঙ্গিত করিলেন—আশু বিশ্বাস মহাশয় কার্পেট-আসনে বসিয়াই মাছের মুড়ায় কামড় দিলেন। সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। দ্বারিকাবাবু হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'Rightly served, rightly served'। আশুবাবুও সপ্রতিভভাবে কৈলাসবাবুর মৃদু তিরস্কার গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, 'আমাদের কি মহাশয় মাছের মুড়া খাইলে পেটের অসুখ করে'?"

হাসির জগৎ হল 'আনন্দবাজার', সেখানে সব জাতের মানুষই এক পাত্র থেকে রসের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। যজ্ঞেশ্বর নাপিত কেবল নীচু মহলে নয়, উঁচু মহলেও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করত। কেবল ভারতীয় জজ নন, হাইকোর্টের

সাহেব জজরাও তাকে কান দেখাতেন। একবার যজ্ঞেশ্বর যখন স্যার রমেশ মিত্রের বাড়িতে তাঁর কান দেখছে, তখন ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় [স্যার আশুতোষের পিতা] সেখানে এলেন। যজ্ঞেশ্বর স্যার রমেশের কান টেনে অন্দরমহল পরিদর্শন করছে—তা খানিক লক্ষ্য করে গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "এ ব্যাটা দেখছি, কারুর কান মলতে আর বাকি রাখলে না।" যজ্ঞেশ্বর ঝটিতি উত্তর দিল, "আজ্ঞে ওই সুখটুকুই তো কেবল আছে।" এতে সকলের অট্টহাসি —তার মধ্যে স্যার রমেশের বড় ভাই কাশীবাবু এমন জোরে হাসতে হাসতে তাকিয়া পেটালেন যে, তা ফেটে তুলো বের হয়ে পড়ল। এই যজ্ঞেশ্বর একদিন দ্বারকানাথ মিত্রের কোর্ট-ঘরের মধ্যে ঘুরছিল, জজদের কান দেখতে সে হাইকোর্টে ঘুরতই, তখন তাকে দেখে দ্বারকানাথের কান সড়্‌সড়্ করতে লাগল। পরে যজ্ঞেশ্বর দ্বারকানাথের বাড়িতে কান দেখতে গেলে দ্বারকানাথ তাকে হেসে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "ওরে ব্যাটা, তুই আমার আদালতে কিজন্য গিয়েছিলি? তোকে দেখেই আমার কান চুলকে উঠেছিল। মহা মুশকিলে পড়েছিলাম।"

সত্যকার রসিক মানুষ অপরকে নিয়ে কৌতুক করা যেমন উপভোগ করেন, তেমনি কেউ যদি তাঁকে সরস বাক্য ফিরিয়ে দেন, তারও সমাদর করেন অনুরূপ আনন্দে।

দ্বারকানাথ (আশুতোষ বিশ্বাসকে) : ওরে আমার মেয়েকে বিয়ে করবি? তোর কি মত?

আশু বিশ্বাস : আজ্ঞে এ তো বড় সৌভাগ্য, জজের জামাই হব, কিন্তু—

দ্বারকানাথ : আবার কিন্তু কেন?

আশু বিশ্বাস : মানে, আপনার রঙ দেখেই অনুমান করছি—আপনার মেয়ের রঙ কী হবে। শেষে যে ডেঁয়ো পিঁপড়েতে ঘর ছেয়ে যাবে। কি করে রাজি হই বলুন?

দ্বারকানাথ (সন্তোষের সঙ্গে) : I am very glad you have spoken out your mind.[২]

দ্বারকানাথের চেহারাটি কেমন তা নবীনচন্দ্র সেনের চোখে দেখে নিতে পারি। তরুণ নবীনচন্দ্র সেই প্রথম দ্বারকানাথের দর্শনে গেছেন—

"দেবপ্রতিম কেশববাবুর পত্র লইয়া হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ দ্বারিকানাথ মিত্রের কাছে গেলাম। তিনি তখন কাশীপুরে থাকিতেন। কৃষ্ণবর্ণ বীরমূর্তি। উচ্চ ললাটগগন ও তীব্র নয়নযুগল হইতে যেন প্রতিভা ফাটিয়া পড়িতেছে। তাঁহারও [বাবু দিগম্বর মিত্রের মতো] কাছা খোলা, একটি তাকিয়ার উপর পেট রাখিয়া, উপুড় হইয়া বসিয়া, কি একখানা বহি পড়িতেছেন।"[৩]

॥ ২ ॥

এই সুযোগে দ্বারকানাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রথম সাক্ষাতের প্রসঙ্গ আনা যায়। বিদ্যাসাগরের কাছে দ্বারকানাথ মিত্রকে এনেছিলেন দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য।

প্রথম আলাপেই বিদ্যাসাগর খুশি। দ্বারকানাথ মিত্র চলে যাবার পরে তিনি ভট্টাচার্যকে বলেন, "এ কাকে এনেছিলে হে? এ যে চোখে-মুখে কথা কয়! আমাকে থ করে দিলে। আমি তো জানতুম, যেখানে আমি থাকি সেখানে আর কেউ কথা বলতে পারে না। এ যে আমার উপর যায়।"[৪]

বিদ্যাসাগরের আড্ডাধারী বন্ধুদের ভোজন সমিতির কথা আগে বলে এসেছি, তাঁদের খাদ্যোৎসবের মজাদারির কথাও। এসব ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর কোন্ মেজাজে থাকতেন তার একটা ছাঁদ খুঁজে পাবো অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করা একটি ঘটনায়। বিদ্যাসাগরের এককালের পরম বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার; তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে বছর-তিনেকের বড়ো, সেই সুবাদে বিদ্যাসাগর মদনমোহনের স্ত্রীকে বউদি বলেন। মদনমোহনের কলকাতার বাসায় এক দ্বিপ্রহরে হাজির হয়ে বিদ্যাসাগর দেখেন, তাঁর বউদি ভোজনপর্ব সারছেন। বিদ্যাসাগর ক্ষুধার্ত ছিলেন বা হয়ে পড়লেন। "কী খাব বউদি?"—"ঠাকুরপো, বসে যাও।" ঠাকুরপো তৎক্ষণাৎ বসে পড়লেন এবং বউদির থালা থেকে 'হাম্ হাম্' করে ভাত খেতে লাগলেন। এবার অকুস্থলে হাজির মদনমোহন। লুব্ধ ঈর্ষায় বললেন, "আরে কী করো, কী করো? সব মহাপ্রসাদ একলা খেয়ো না।" মদন-গৃহিণী কম যান না। তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে থালাখানি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও, মহাপ্রসাদ খাও।" মদনমোহন পরমানন্দে থালা চেটে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন।[৫]

ব্যাপারটা ঠিক আধুনিক রুচিসম্মত না হলেও সেকালের বিদ্যাসাগর-সম্মত।

দলে বসলে বিদ্যাসাগর কোন্ মেজাজে থাকতেন তার নমুনা ইন্দ্র মিত্রের সংগ্রহ থেকে দেখে নেব। এক বড়লোকের বাড়িতে বিদ্যাসাগর নিমন্ত্রণে গেছেন। সেখানে অনেকের সঙ্গে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও হাজির। পাত পড়তে দেরী হচ্ছে, সকলের খিদে খুব চাগিয়েছে, কেউ কেউ সরে পড়বার তালে আছেন—গৃহকর্তা অগত্যা বিদ্যাসাগরকে কাতর আবেদন জানালেন, "আপনি গল্প বলে এঁদের একটু আটকে রাখুন।" বিদ্যাসাগর বললেন, "ঠিক আছে।" তারপর দীনবন্ধুকে বললেন, "আমি গল্প বলব, তুমিও পাল্লা দিয়ে গল্প বলবে।" বিদ্যাসাগর অন্যমনস্কতার গল্প শুরু করলেন:

বিদ্যাসাগর: এক ব্যক্তি তার অন্যমনস্কতার মস্ত চেহারা হাজির করতে, হাত পা নেড়ে তাঁর বন্ধুকে বলল, "ভাই, সেদিন কি কাণ্ড হয়েছে শোনো। তুমি তো জানো আমি কি-রকম সব কিছু ভুলে থাকি। আমি ভাই, একটা হাজার টাকার নোটকে কাগজ মনে করে ছিঁড়ে ফেলে কান চুলকোতে যাচ্ছি—ঠিক তখনি তা গিন্নীর নজরে পড়ে গেল। ভাগ্যে নজরে পড়েছিল, তাই তার বারণে আমার হাজারটি টাকা বাঁচল।" এক্ষেত্রে তার বন্ধু পিছিয়ে থাকতে পারে না। সেও গল্প ফাঁদল। "কী বললে—অন্যমনস্কতা? আরে ভাই, একই জ্বালায় আমিও জ্বলছি। সেদিন রাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছি। হাতে লাঠিগাছা

আছে। বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়ার কথা একদম ভুলে গেছি। তারপর শুতে গেছি। সেখানেও ভুল। আমি হাতের লাঠিগাছাকে মনে করেছি আমি, আর আমাকে মনে করেছি লাঠি। তাই লাঠিকে বিছানায় শুইয়ে, নিজে দাঁড়িয়ে আছি ঘরের কোণে সারারাত। ভোরবেলায় ব্যাপারটা স্ত্রীর নজরে পড়ল। সে আমাকে বিছানায় শোয়ালো, আর লাঠিকে কোণে দাঁড় করালো। বউয়ের কল্যাণে তবু একটু ভোরে ঘুম হলো, নইলে—"

উদ্দাম হাসির মধ্যে দীনবন্ধু পালটা গল্প শুরু করলেন। তাতেও মাতোয়ারা হাসি। ওধারে ইতিমধ্যে পাত পড়েছে, ডাকাডাকি হচ্ছে, কিন্তু এ-ভোজ ছেড়ে কেউ সে-ভোজে যেতে চাইছে না। গৃহকর্তা এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। বিদ্যাসাগরকে বললেন, "মশাই, এক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে আর এক বিপদে ফেললেন! ওধারে খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। এখন দয়া করে গল্প বন্ধ করুন।"[৬]

উপরে বিদ্যাসাগরের বলা গল্পের নমুনা তবু মিলেছে, কিন্তু দীনবন্ধুর গল্প নেই। অথচ দীনবন্ধু কেবল উঁচুদরের প্রহসন-লেখক ছিলেন না, বঙ্কিম-চন্দ্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী, আরও উঁচুদরের প্রহসন-কথক।

বিদ্যাসাগর বন্ধুমধ্যে থাকলে কোন্ ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটত, সে সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু আনন্দকৃষ্ণ বসু বলেছেন: "বিদ্যাসাগর আমাদের বাড়িতে এলে ৭-৮ ঘণ্টার কমে বাড়ি ফিরতে পারতেন না। তাঁকে ঘিরে বসে আমরা তাঁর মুখে রহস্যমধুর গল্প শুনতাম। কখনো হাসতাম, কখনো কাঁদতাম, কখনো আহ্লাদে তাঁকে আলিঙ্গন করতাম। উপমার তিনি অক্ষয় ভাণ্ডার। নিত্য নূতন গল্প, নিত্য নূতন উপমা। গল্পে আমোদ করতে এমন আর কেউ পারতেন না।"[৭]

বিদ্যাসাগরের রসকথার দিকে পুনশ্চ দৃষ্টি দেওয়া যাক।

বিদ্যাসাগর কাশীতে তাঁর পিতৃদেবকে রাখতে গেছেন। উঠেছেন লোকনাথ-বাবুর বাড়িতে। কাজ শেষে ফিরবেন। তখনো গঙ্গায় সেতু তৈরি হয় নি। তাঁকে ভোরবেলা রাজঘাট স্টেশনে পেঁছে দিতে হবে নৌকা পার করে। "সে কার্যের ভার আমারই উপর পড়িল, [অমৃতলাল বসু বলেছেন], ঘুমাইয়া পড়িলে চলিবে না। যদি ভোর রাত্রে জাগিতে না পারি? স্থির করিলাম, ঘুমাইব না। সতীর্থ বন্ধু মধুসূদন লাহিড়ীর ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগরকে ধরিয়া বসিলাম, 'গল্প বলিতে হইবে।' তিনি বলিলেন, 'গল্প শুনবি? কী রকম গল্প বলব—দু' মিনিটের মতো, না আধ ঘণ্টার মতো?' ছোট-বড়ো বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশিযাপন করিলাম। গভীর নিশীথে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'ওরে চুড়ি কিনতে হবে।' 'এত রাত্রে দোকানদারকে পাওয়া যাবে কেমন করিয়া?' তিনি বলিলেন, 'পেতেই হবে। কাশীতে এসে চুড়ি না নিয়ে ফিরে যাব কি করে?' সেই রাত্রিতে চুড়ি কিনিয়া আনা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার গল্প বলিতে লাগিলেন। সে রাত্রে তাঁহাকে রেল

স্টেশনে পেঁছাইয়া দিলাম। জীবনের শেষ পর্যন্ত সে রাত্রি ভুলিব না।"[৮]

এ সাক্ষ্য স্বয়ং 'রসরাজ' অমৃতলালের। রমেশচন্দ্র দত্ত অন্য ক্ষেত্রে যাই হোন (অন্য ক্ষেত্রে তিনি অনেক বৃহৎ কিছু) হাসি-গল্পের জন্য বিখ্যাত, এমন শুনিনি। সেই তিনিও বিদ্যাসাগরের গল্পজাল এড়াতে পারেন নি। "আমি প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাত-ভ্রমণের সঙ্গী হইতাম, [রমেশ দত্ত লিখেছেন] এবং কখনও-কখনও তাঁহার সহিত তাঁহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিতাম।...তাঁহার কথাবার্তায় তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের অনেক গল্পই শোনা যাইত, এবং তাঁহার সরস রসিকতা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহাতে বর্তমান ছিল।"[৯]

নিজের বাড়ির রকে বসে শিবনাথ শাস্ত্রীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জমিয়ে আড্ডা এবং সেখানে এক খ্রীস্টান মিশনারিকে ঠাট্টা-তামাশায় নাজেহাল করার কথা আগেই বলে এসেছি।

বিদ্যাসাগরের সমকালে সভাসমিতিতে সাহেবিয়ানার আড়ম্বর ছিল আবশ্যিক। না, ঠিকভাবে বলতে গেলে, 'বাধ্যতামূলক।' আর বিদ্যাসাগর ছিলেন ধুতি-চাদর পরা, চটিপায়ে, অনপনেয় বাঙালী; নিজ ভূমিরক্ষায় তেজীয়ান 'নির্লজ্জ'। বাঙালীয়ানার ঝাপটে কিভাবে একবার সাহেবিয়ানার দেওয়াল নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন, তার কথাচিত্র দিয়েছেন শিক্ষাবিৎ ক্ষুদিরাম বসু:

"সে সময়ে 'ক্যালকাটা রিডিং রুম' বলে এক পাঠাগার ছিল। সেখানে নানা সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রাদি থাকত।...সেখানে একদিন এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি **W. C. Bonnerjee** নামে বিশেষ পরিচিত, তিনি সে সভায় ছিলেন।... ইংরাজি ভাষা তাঁর বিশেষ রূপে আয়ত্ত ছিল, তাঁর ভাষার নৈপুণ্যও ছিল। তিনি অনর্গল সাধুভাষায় এমন বক্তৃতা করতে পারতেন যে, অনেক সাহেব তাঁর বক্তৃতার সুখ্যাতি করতেন। শুধু বক্তৃতা কেন, ইংরাজি চলন-বলনও বেশ নিখুঁতভাবে অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মশায় বলেছিলেন, 'ইংরাজি ধরন এমন সম্পূর্ণ-ভাবে নিতে বাঙালীদের মধ্যে আর কেউ পারে নি। রুমালে নাকঝাড়াও দস্তুরমতো ইংরাজি কায়দায় করতেন।'...বাস্তবিক পক্ষে তখন সাহেবিয়ানারই যুগ ছিল। আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা তখন ইংরাজি ছাড়া বাংলা একরকম বলতামই না। কোথাও কিছু বলতে হলে সকলে মুখস্থ করে যেত, অন্য বই থেকে চুরি করে সকলে বলত।...এহেন ইংরাজিয়ানার যুগের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়। আমরা সব ইংরাজিনবিশের দল সেখানে ছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম, বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছ থেকেও ইংরাজি শুনব। কিন্তু তিনি সবাইকে সেখানে হাসাতে লাগলেন। এক-একজনের বক্তৃতা হয়ে যায়, আর তিনি অন্য একজনকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, 'এইবার তুমি একটু বলো বাবা, বলো, তুমি একটু বলো।' তাঁর বলবার এমনই

ভঙ্গিমা যে, প্রতি কথায় হাসির ধুম পড়ে যেতে লাগল। তাঁর জন্য তামাক এল, তিনি মুহুর্মুহু তামাক খেতেন। আমার কিন্তু খুব বিরক্তিকর [বোধ] হয়েছিল। মনে হলো, ইনি পাগল না-কি ? সেই পোশাক, থেলো হুঁকো হাতে, উড়ের মতো মাথা কামানো, আর সেই লোক-হাসাবার ধুম। এমন-কি Mr W. C. Bonnerjee-ও বাঙালী-রকমে হাসতে লাগলেন।"[১০]

সে কালে কান্নাও বিলিতি রকমে হতো :

"হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের বাঙালী মাস্টারদের মধ্যে ব্রজনাথ মিত্র (অ্যাটর্নি), বনমালী বিদ্যাসাগর ও যদুনাথ দে প্রসিদ্ধ।...ব্রজনাথ মিত্র সম্বন্ধে কথিত আছে যে, যখন তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়, তখন শোকে মুহ্যমান হয়ে 'O God, Dear wife' ইত্যাদি বলিয়া শোক করছিলেন। ইহাতে রমেশ-বাবুর জ্যেষ্ঠ কেশববাবু সর্বজ্যেষ্ঠ উমেশবাবুর স্ত্রীকে বলিলেন, 'বউঠাকরুণ, দ্যাখো, শোকটা ইংরেজিতে করছে'।"[১১]

বিদ্যাসাগর হাসতেন, হাসাতেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সে কথা বলেছেন : "বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্তায় হাসি-তামাশার কী একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে সকল রসিকতার কথা মনে করিয়া লিখিতে পারিলে বোধ হয় বেশ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে।"[১২]

"গল্প করিবার ক্ষমতা তাঁহার লোকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ, [দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখেছেন]। বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প করিতে আরম্ভ করিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিত—মজলিশ ভাঙিত না।"[১৩]

আবার গম্ভীরও তিনি, এমন-কি রুদ্র-চণ্ড। সেই কঠিন শিলায় আছড়ে ভাঙত হাসির তরঙ্গ। এই দুই রূপকে ফোটাতে ইচ্ছা করে বিহারীলাল সরকার, সেকালের রীতিতে, যুদ্ধবীর সাহেব চার্লস জর্জ গর্ডন-এর সঙ্গে তুলনা করে বসেছেন (সেকালে সাহেবের সঙ্গে তুলনা না করলে দেশীয় লোকের লীলা পোস্টাই হতো না) : "তিনি [বিদ্যাসাগর] স্বাভাবিক রহস্যপটু ছিলেন। কর্মবীরের গাম্ভীর্যপূর্ণ চরিত্রে স্বাভাবিক রহস্য-রঙ্গের ভাব বড়ই মনোহর। যেন তরুণ অরুণ কিরণোদ্ভাসিত প্রভাতের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। বীরের গাম্ভীর্যে তরলের রসমাধুর্য অনেক সময় বিরল বটে ; কিন্তু যে-চরিত্রে এই দুইয়েরই সমাবেশ তাহা অতি মহান।...কার্যের সময় গর্ডন গাম্ভীর্যে যেন হিমালয় ; কিন্তু কার্যাবসরে বিশ্রম্ভালাপে যেন আলোক-পুলকিত স্ফুটকোরক কদম্ব। তিনি যখন গল্প করিতে বসিতেন তখন তিনি এমনই মিষ্ট করিয়া, উপমা দিয়া, গল্পগুলি সাজাইয়া বলিতেন, সঙ্গে সঙ্গে এমনই রসতরঙ্গ ছুটাইতেন যে, দিন রাত্রি সে গল্প শুনিলেও শ্রোতৃমণ্ডলীর মুহূর্তের জন্য ধৈর্যচ্যুতি হইত না।"[১৪]

চার্লস গর্ডন সম্বন্ধে বিহারীলালের আলঙ্কারিক উচ্ছ্বাসের ভিতর থেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের দুই মেরুর রূপ কিছুটা ফুটেছে। রাজকৃষ্ণ রায় বিদ্যা-সাগরের দেহান্তের পরে শোক কবিতায় ('ঈশ্বর বৈকুণ্ঠে') একই কথা বলেছেন,

"গাম্ভীর্যের মহা মূর্তি, রহস্যের মহা স্ফূর্তি।"[১৫] তাঁর গাম্ভীর্য এখানে আমাদের বিশেষ আলোচ্য নয়, উদ্দেশ্য হাস্য-দর্শন। সে-হাসির উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য : "বিদ্যাসাগরের হাসি একটু বিচিত্র ছিল। তিনি হাসিতে-হাসিতে নাগিয়া পড়িতেন। এক এক সময় মনে হইত, তিনি বুঝি-বা চেয়ার হইতে পড়িয়া যান।" যে ঘটনার সূত্রে হরপ্রসাদ এই 'নাগিয়া নাগিয়া' হাসির কথা বলেছেন, তার থেকে বোঝা যায় বিদ্যাসাগরের রসবোধের চরিত্র। হরপ্রসাদ তাঁকে অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক শুনিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিধবাবিয়ে নিয়ে কিছু রঙ্গও ছিল। কিন্তু রঙ্গ যদি থাকে তাতে বিদ্যাসাগরের 'হাসতে মানা' থাকে না। বিদ্যাসাগরের হাসিতে হরপ্রসাদ অবশ্য কিছুটা সংকোচ বোধ করেছিলেন। "আমি তখন মনে করিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি, তাঁহার সঙ্গে এ-রকম ফাজলামোটা ভালো হয় নাই।" বিদ্যাসাগর কিন্তু কিছু মনে করেননি। বইটি 'বাগবাজারের থিয়েটার পার্টির' একজনের লেখা জেনেও (তখনও তিনি অমৃতলালকে সাক্ষাতে জানতেন না) সেটিকে 'খুব ভালো' বলতে তাঁর আটকায় নি।[১৬]

শরীর যখন একেবারে ভেঙে পড়েছে, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য চন্দননগরে গঙ্গাতীরে বাস করছেন, জীবনের সেই সন্ধ্যাকালেও মজলিশি হাসি অব্যাহত ছিল। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ এই : "তিনি একদিন আমাদের বাটীতে আসিয়া প্রায় তিন-চারি ঘণ্টা বসিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি খুব মজলিশি লোক ছিলেন। নানাপ্রকার গল্প করিয়া খুব হাসাইতে পারিতেন। তাঁহার গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিত, কিন্তু তিনি হাসিতেন না।"

এই সময়ে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিদ্যাসাগর হাসির গল্পের আসরে আর 'নাগিয়া নাগিয়া' হাসছেন না। এই সূত্রে যোগেন্দ্রকুমার তাঁর আর এক আদর্শ পুরুষ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাবভঙ্গির তুলনা করেছেন :

"স্বর্গীয় ভূদেববাবুর সহিত কয়েক বিষয়ে বিদ্যাসাগরের যেমন মিল ছিল, তেমনই আবার অনেক বিষয়ে পার্থক্যও ছিল। উভয়েই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান, হিন্দুর আচার-ব্যবহারে নিষ্ঠাবান, অগাধ পণ্ডিত এবং অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। উভয়েই শিক্ষাবিভাগের উচ্চকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বাহ্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে আকাশপাতাল পার্থক্য ছিল। ভূদেববাবু ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শুভ্র শ্মশ্রু ও গুম্ফধারী, দেখিলে সহসা বৃদ্ধ ইহুদী বলিয়া মনে হইত, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন শ্যামবর্ণ, খর্বাকৃতি, শ্মশ্রু গুম্ফ এবং মস্তকের চারিদিক মুণ্ডিত, সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতোই বেশ-ভূষা ও আকৃতি। ভূদেববাবু ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি এবং স্বল্পভাষী, এক কথায় রাশভারী লোক, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন খুব মজলিশী, আমুদে, সর্বদাই নানাপ্রকার গল্প করিতেন, সকলকেই একেবারে ঘরের ছেলে করিয়া লইতেন।" (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২)

কিন্তু বিদ্যাসাগর হাসতেন কেন ?

হাসতেন নিজের জন্য, এবং পরের জন্য।

জীবনে কত যন্ত্রণা। তা যখন পরিচিত কোনো মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করছে, তখন বিদ্যাসাগর তাঁর হাসির উত্তাপ ছড়িয়ে শুশ্রূষা করতে চাইতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর যৌবনের দিনগুলি নিদারুণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটেছিল। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের সস্নেহ প্রশ্রয় তিনি পেয়েছিলেন। "আমাদের এই সংগ্রাম-ময় জীবনের বেদনাক্লিষ্ট স্পন্দন [শিবনাথ লিখেছেন] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে সর্বদাই প্রতিফলিত হইত। তাই শত কর্মের মধ্যেও তিনি প্রতিদিন বা একদিন অন্তর আসিয়া হাস্যপরিহাসে, নিজের অতীত জীবনের ঘটনা বিবৃত করিয়া ও অন্যান্য কথাবার্তায়, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে দূর করিয়া দিতেন। তারপর নূতন উৎসাহে আগামী দিবসের পাথেয় সঞ্চয় করিয়া আমরা আবার অগ্রসর হইতাম। তাঁহার সেই প্রাণখোলা হাসি আমাদের এই অপাংক্তেয় জীবনের সকল ব্যথা দূর না করিয়া ছাড়িত না।"[২৭]

নিজেকে বাঁচাবার জন্যও বিদ্যাসাগরের পক্ষে হাসির দরকার ছিল।

বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়ারের 'কমেডি অব এররস্'-এর আখ্যানমূলক অনুবাদ করেন ১৮৬৯ সালের শেষের দিকে। এটি হুল্লোড় হাসির প্রহসন। দুই যমজ প্রভু এবং দুই যমজ চাকর—প্রভু দুজন একরকম দেখতে এবং দুই চাকরও তাই। এক প্রভুর সঙ্গে জুড়ে আছে এক চাকর, অন্য প্রভুর সঙ্গে অন্য চাকর। দুজোড়া প্রভু ও চাকরের মধ্যে হাবভাবেও কোনো পার্থক্য নেই। এরা ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন ছিল, তারপর এক জায়গায় হাজির হল। এক প্রভুর ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে। এর ফলে একজনকে অন্যজন মনে ক'রে, যতরকম মজার ঘটনা ঘটা সম্ভব সবই ঘটেছে। উদ্ভট কাণ্ড, তার সঙ্গে আদিরসের মাখামাখি। নাটকের আকুল হাসি বিদ্যাসাগরের পছন্দ হয়েছিল। ইতিমধ্যে তিনি ভালো করে ইংরেজি শিখেছেন, শেক্সপীয়ারের ভক্ত হয়ে উঠেছেন, যদিও বঙ্কিমের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল সেইভাবে কালিদাসকে হঠিয়ে শেক্সপীয়ার তাঁর মনোভূমে সিংহাসন অধিকার করতে পারেন নি, কালিদাসই তাঁর কাছে পৃথিবীর সেরা সাহিত্যিক, তবু শেক্সপীয়ার যে "ইংলন্ডের অদ্বিতীয় কবি", এই বোধ তাঁর ছিল, এবং "শেক্সপীয়ার প্রণীত ভ্রান্তি-প্রহসন পড়িয়া" মনে করেছিলেন, "এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সংকলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে।" তদনুসারে তিনি ওই নাটকের উপাখ্যানভাগ "ভ্রান্তিবিলাস" নামে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

ভ্রান্তিবিলাসের সুলিখিত 'বিজ্ঞাপন'-এ বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়ারের বিশ্ব-খ্যাতির উল্লেখ করেছেন, তাঁর অদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখিয়েছেন, যদিও সেই বিষয়টি যে তর্কসাপেক্ষ তা বলতে দ্বিধা করেননি। শেক্সপীয়ারের আলোচ্য নাটকটিকে উপাখ্যানে রূপান্তরিত করার সময়ে দেশীয় নাম দিয়েছেন, যাতে বাঙালী পাঠকের পক্ষে অধিকতর গ্রাহ্য

হয়। এবং উপাখ্যান যেহেতু ইতিহাস বা জীবনচরিত নয়, সেজন্য এ-রকম রূপান্তর দোষাবহ নয়, তাও বলেছেন সঙ্গত সাহিত্যবুদ্ধির সঙ্গে।

কমেডি হিসাবে 'কমেডি অব এররস্' উচ্চাঙ্গের না হলেও সেটি বিদ্যাসাগরকে খুবই খুশি করেছিল। "ভ্রান্তিপ্রহসন কাব্যাংশে শেক্সপীয়র প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট; কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যারপরনাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে-করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়"—বিদ্যাসাগর লিখেছেন।

আসল কথা এইখানেই আছে। বিদ্যাসাগর জানতেন, বলেছেনও, এই নাটকটি শেক্সপীয়ারের অন্য নাটকের মতো বিদগ্ধদের আনন্দ দেবে না, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এমন হাসি, যা কিছুসময়ের জন্য ভুলিয়ে রাখতে পারবে। তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনে প্রয়োজন ছিল—হাসির সঞ্জীবনী রসায়ন। ১৮৬৯ সালে বইটি লেখার সময়ে তিনি ছিলেন প্রচণ্ডতম ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে। দেশের মনোজগতে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়েছেন। ১৮৫৫-তে বিধবা-বিবাহ বিধির জন্য সরকারের কাছে আবেদন। একই বছরে বহুবিবাহ নিষেধের জন্য আবেদন। প্রয়োজনীয় রচনাদি প্রকাশ। পক্ষে বিপক্ষে দারুণ হৈ-চৈ। ১৮৫৬-তে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ। ১৮৫৭-তে সিপাহী বিদ্রোহ। ১৮৫৮-তে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ এবং স্বাধীন উপার্জনের চেষ্টা। ১৮৫৯-এ প্রথম বিধবা-বিবাহ; ক্রমান্বয়ে আরও অনুরূপ বিবাহ। ১৮৬৬-তে গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আঘাত। ১৮৬৭-তে বাংলা দেশে মন্বন্তর। মধ্যবর্তীকালে নানা ধরনের স্কুল স্থাপন, গ্রন্থ প্রকাশ, সেবাকার্য এবং কী নয়। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের জীবনের ঝড়ো যুগের মধ্যে ১৮৬৯ সালে ভ্রান্তিবিলাসের রচনা। বিদ্যাসাগরের জীবনে হাসির প্রয়োজন তখন সত্যই ছিল। তিনি নাকি ১৫ দিনে, প্রতিদিন আহার করতে যাবার আগে ১৫ মিনিট লিখে, ভ্রান্তিবিলাস শেষ করেন।[১৮]

আহারের আগে ১৫ মিনিটের ককটেল সেবন!

ভ্রান্তিবিলাস সম্বন্ধে চণ্ডীচরণের ভক্তির উচ্ছ্বাস: "ইহার উপন্যাসভাগ এত হাস্যরসোদ্দীপক যে, হাস্যসংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ক্ষণকালের জন্য পাঠ বন্ধ করিয়া, পুস্তকহস্তে হাস্যের শেষ তরঙ্গ সম্ভোগান্তে বিশ্রামলাভ করিয়া, তবে পুনরায় পাঠারম্ভ করিতে হয়।"[১৯] এমন যদি ঘটে থাকে তাহলে তা চণ্ডীচরণের নিজ গুণেই ঘটেছে। নচেৎ মূল নাটকের বড়ো অংশ যেখানে দৃশ্য ব্যাপার, বিশেষ অবস্থা ও পাত্রপাত্রীদের ভাবভঙ্গির উপর যে হাসি নির্ভরশীল, এবং লেখকের দেশের সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে যা জড়িত, তাকে ভিন্ন ভাষায় উপাখ্যানে রূপান্তরিত করলে, এবং এদেশীয় রীতিতে একটানা বর্ণনা করে চললে, যথেষ্ট হাসি আসে না, বরং একই ধরনের ঘটনার পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্তি জন্মে। এক্ষেত্রে তা জন্মেছেও। বিদ্যাসাগর অবশ্য মাঝে মাঝে পুরাতনী সাধুরীতির একঘেয়েমি কাটাবার জন্য পাত্রপাত্রীর কথাবার্তায় চলিত ইডিয়ম প্রয়োগ করেছেন, শেক্সপীয়ারের রচনার ভাষান্তরে অল্পাধিক

কৃতিত্বও তাঁর আছে। যেমন, বাড়ি ফিরতে দেরী করলে গৃহিণীর মেজাজ সম্বন্ধে ভৃত্যের সংবাদ জ্ঞাপন :

"অনেকক্ষণ আহারসামগ্রী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, এবং ক্রমে শীতল হইয়া যাইতেছে। আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কর্ত্রী-ঠাকুরাণী তত উষ্ণ হইতেছেন। আহারসামগ্রী শীতল হইয়াছে কারণ আপনি গৃহে যান নাই ; আপনি গৃহে যান নাই কারণ আপনকার ক্ষুধা নাই ; আপনকার ক্ষুধা নাই কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন ; কিন্তু আপনার অনুপস্থিতির জন্য আমরা অনাহারে মরিতেছি।"

ক্রুদ্ধ প্রভুর কাছে ভৃত্য গর্দভ ; প্রভুর ক্রোধ কেবল বাক্যে নয়, ভৃত্যের অঙ্গেও নিয়মিত বর্ষিত। রাজপুরুষের কাছে ভৃত্য তার ফিরিস্তি দিয়েছে :

"আমি যে গর্দভ, তার সন্দেহ কি ? গর্দভ না হইলে আমার কান লম্বা হইবেক কেন ? এই বলিয়া রাজপুরুষকে সম্বোধন করিয়া কিঙ্কর বলিল. মহাশয়, জন্মাবধি প্রাণপণে ইঁহার পরিচর্যা করিতেছি ; কিন্তু কখনও প্রহার ভিন্ন অন্য পুরস্কার পাই নাই। শীতবোধ হইলে প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন ; গরম বোধ হইলে প্রহার করিয়া শীতল করিয়া দেন ; নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার করিয়া সজাগর করিয়া দেন ; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া উঠাইয়া দেন ; কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন ; কার্য সমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে প্রহার করিয়া আমার সংবর্ধনা করেন ; কথায়-কথায় কান ধরিয়া টানেন ; তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে।"

এ সকলই অনুবাদ। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও কোনও জায়গায় বাড়তি কিছু যোগ করেছেন। সেখানেই ধরা পড়েছে, কোন্ বস্তুর বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের হাসির লড়াই। তেমন অংশ :

"মানবজাতি নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয়। লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত অমূলক গল্পের কল্পনা করে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী শক্তির সম্পাদনের নিমিত্ত কত অলঙ্কার যোজিত করিয়া দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহস্র হেতু থাকে, অধিকাংশ লোকে ভুলিয়াও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না ; কিন্তু কুৎসা করিবার অণুমাত্র সোপান পাইলে মনের আমোদে সেইদিকে ধাবমান হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক ; মনে ভাবেন কখনও কাহারও অপকার করি নাই, সুতরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ বা বিদ্বেষী নাই, সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈষী। কিন্তু আপনকার সে সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আপনি প্রাণপণে যাঁহাদের উপকার করিয়াছেন, এবং যে-সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী।...আপনি অতি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন, এক্ষণে...বিলক্ষণ মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছেন ; এজন্য যে-সকল লোক সচরাচর ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ ঈর্ষারসে নিরতিশয় কলুষিত হইয়া আছে। তাঁহারা আপনকার অনুষ্ঠিত কর্মমাত্রেরই এক-এক অভিসন্ধি বহিষ্কৃত করেন [বার

করে আনেন]।...যাহা কখনও সম্ভব নয়, এরূপ গল্প তুলিয়া আপনকার নির্মল চরিতে কুৎসিত কলঙ্ক যোজিত করিয়া থাকেন।” [রচনাবলী, ৩য়, ৩৭৯-৪৩৯]

এ কি ভ্রান্তিবিলাসের কোনো চরিত্রের উক্তি, নাকি স্বয়ং বিদ্যাসাগরের আত্মকথা ?

কমেডি অব এররস্-এর নামের চমৎকার অনুবাদ বিদ্যাসাগর করেছেন—ভ্রান্তিবিলাস। ভ্রান্তির বিলাসে মগ্ন মূঢ় মানুষগুলি দুর্যোগ আনে সাধারণ মানুষের জীবনে—তাদের বিরুদ্ধে এইকালে বিদ্যাসাগর যুদ্ধ করেছেন। আবার তিনি এও জানেন, অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি-বিলাসে মানুষের জীবনে নানারকম মজাও ঘটে। বজ্জাতদের ভ্রান্তি-বিলাসের কিছুটা ক্ষতিপূরণ কেন করব না অনিচ্ছার ভ্রান্তি-বিলাসের সুখের দ্বারা—বিদ্যাসাগর এও ভাবতে পারেন।

॥ ৪ ॥

গল্প-গাছার আসর থেকে একটু সরে গেছি। আরও একটু সময় নেব, বিদ্যাসাগরের গল্পের ভাষা ও বিষয় সম্বন্ধে কিছু কথা বলার জন্য। বাংলা সাধুরীতির প্রধান লেখক বিদ্যাসাগর—কথাবার্তার সময়ে মোটেই সাধুরীতি চালাতেন না। তাঁর মুখে থাকত গ্রামের ভাষা, এমন-কি তাকে অংশত গ্রাম্যও বলা যায়। কৃষ্ণকমল সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং প্রথম অধ্যায়ে তাঁর কথা তুলেছি। কৃষ্ণকমল আরও এগিয়ে বলেছেন, বিদ্যাসাগরের রচনাও সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষার উপর নির্ভরশীল ছিল না। “সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা কথোপকথনে যে-ভাষা ব্যবহার করিতেন, সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ।”[২০]

বিদ্যাসাগরের ভাষা-চরিত্রের দুই মুখ—লেখার ও মুখের। ওই দুই চরিত্রের আকার দেখা যায় তাঁর দুটি সংগ্রহে। একটি সংগ্রহের নাম ‘শব্দ-মঞ্জরী’, অন্যটি ‘শব্দসংগ্রহ’। প্রথমটি রচিত হয় ১৮৬৪-তে। এটি অসম্পূর্ণ বাংলা অভিধান, কিন্তু এতে তৎসম শব্দ ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। এখানে বিদ্যাসাগর নিপাট ‘সাধু’। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ‘শব্দ-সংগ্রহ’ দেখিয়ে দেয়—সাধু-র বাঁধন ছিঁড়ে কিভাবে তাঁর মন ‘চলিত’-এর দিকে ছুটেছিল। অল্প কিছু নমুনা দিচ্ছি—শুধু ‘ছ’-এর আর ‘ঢ’-এর :

“ছক ছকা ছকান ছটপট ছটপটানি ছটপটিআ ছটাক ছটাকিআ ছড় ছড়া ছড়াছড়ি ছড়ান ছড়ি ছড়িদার ছনছন ছয়লাপ ছয়লাপি ছরাদ ছল ছলছল ছলছলান ছলছলিয়া ছলা ছা ছাই ছাউনি ছাওআ ছাওআল ছাওআলি ছাগল ছাগলিআ ছাড় ছাড়া ছাড়াছাড়ি ছাড়ান ছাড়ানি ছাত ছাতা ছাতি ছাতিম ছাতু ছাদন ছান ছানা ছানান ছানি ছানুতা ছাপ

ছাপর ছাপা ছাপাখানা ছাপাছাপি ছাপান ছাপানি ছাপ ছাবা ছাবাখানা ছাবাছাবি ছাবানি ছার ছারকপালিআ ছারখার ছারপোকা ছাল ছালন ছালা ছাঁক ছাঁকন ছাঁকা ছাঁকান ছাঁচ ছাঁচা ছাঁট ছাঁটন ছাঁটা ছাঁটাছাঁটি ছাঁটান ছাঁদ ছাঁদানি ছাঁদা ছি ছিআ ছিআল ছিট ছিটা ছিটান ছিটাফোঁটা ছিন ছিনছিন ছিনা ছিনান ছিনানি ছিনার ছিনারি ছিনিআ ছিপ ছিপি ছিমড়িয়া ছিল ছিলা ছিলানছিলিম ছিঁচ ছিঁচকা ছিঁচকাঁদনিআ ছিঁচা ছিঁচান ছিঁড় ছিঁড়া ছিঁড়াছিঁড়ি ছিঁড়ান ছিঁদ ছুকরি ছুট ছুটা ছুটাছুটি ছুটান ছুটি ছুত ছুতাছুতার ছুতরানি ছুব ছুবান ছুবানি ছুরি ছুল ছুলা ছুলান ছুলি ছুঁ ছুঁআ ছুঁআচ ছুঁআচিআ ছুঁআছুঁই ছুঁআন ছুঁইছুঁই ছুঁচ ছুঁচাবাজি ছুঁড়িছে ছেছে ছেড় ছেপ ছেঁকা ছেঁচ ছেঁচকি ছেঁচাছেঁচি ছেঁচান ছেঁড়া ছেঁড়ান ছেঁদা ছোআরা ছোকরা ছোকা ছোট ছোটকা ছোটকি ছোটা ছোটান ছোব ছোবা ছোবান ছোবানি ছোরা ছোলা ছোলান ছোঁ ছোআঁচ ছোঁআচিআ।”

“ঢক ঢকি ঢঙ ঢঙঢঙ ঢউঢঙানি ঢনঢন ঢনঢনানি ঢনঢনিআ ঢপ ঢপঢপ ঢপঢপিয়া ঢল ঢলঢল ঢলঢলি ঢলা ঢলাঢলি ঢলান ঢলানি ঢাক ঢাকন ঢাকনা ঢাকনি ঢাকা ঢাকাই ঢাকাঢাকি ঢাকান ঢাকি ঢাল ঢালা ঢালাঢালি ঢালান ঢালি ঢিট ঢিপ ঢিপঢিপ ঢিপনি ঢিল ঢিলন ঢিলা ঢু ঢুক্‌ ঢুকা ঢুকান ঢুপ ঢপঢাপ ঢুপঢুপ ঢপঢুপি ঢুল ঢুলনি ঢুলা ঢুলাই ঢুলান ঢুলি ঢুলঢুল ঢুসান ঢুসানিআ ঢুঁড় ঢুড়া ঢেউ ঢেকফাজিল ঢেকা ঢেকুর ঢেঙা ঢেঙি ঢেপ ঢেপঢেপ ঢেপঢেপিয়া ঢেপসা ঢেমন ঢেমনি ঢেমনিবাজ ঢেমনিবাজি ঢের ঢেরা ঢেরাসই ঢেরি ঢেলা ঢেলান ঢেলামারা ঢেঁকি ঢেঁকিশাল ঢেঁস্‌কাল ঢেঁটা ঢেঁটামি ঢেঁড়রা ঢেঁড়স ঢেঁড়ি ঢোক ঢোকনা ঢোকা ঢোকান ঢোল ঢোলা ঢোলাই ঢোলান ঢোলী ঢোঁক ঢোঁড়া ঢোঁসা ঢোঁসান।”

গল্প বলার সময়ে বিদ্যাসাগর ‘শব্দমঞ্জরীর’ ভাণ্ডার থেকে নয়, ‘শব্দ-সংগ্রহ’-এর চলিত শব্দের বাজার থেকে ব্যবহার্য শব্দ জোগাড় করতেন। তাঁর ঠিক ঠিক মুখের শব্দ তাঁর বলা গল্পের বিবরণে পাই না। সুশীল লেখকেরা অধিকাংশ সময় সাধু ভাষায় তাঁর বলা গল্প নিবেদন করেছেন। বিদ্যাসাগরের শ্রীম ছিলেন না। নচেৎ তাঁর বলা কোনো গল্পে ‘মাগী’ শব্দ দেখতে পাই না কেন? অথচ শব্দটি বিদ্যাসাগরের মুখত্যাগ করেনি। তিন বছরের বালিকা প্রভাবতীর মৃত্যু হলে বিদ্যাসাগর যখন কষ্টে ছটফট করতে করতে কান্নাভরা কয়েক পৃষ্ঠা লিখে রেখেছিলেন, তার মধ্যে একাধিক মাগী শব্দ আছে, সেখানে উদ্দিষ্ট প্রভাবতীই, বিদ্যাসাগর সেকেলে রীতি অনুযায়ী ওই শিশু-কন্যার বৃদ্ধ বর সাজার মজার খেলায় মেতেছিলেন। এই সঙ্গে ছিল বিদ্যাসাগরের ‘তুই’। এমন হৃদয়-ছোঁয়া নৈকট্যের শব্দ আর হয় না। তাঁর মুখের পানের সম্বরার মতোই শব্দটি। বিদ্যাসাগরের ‘তুই’ চোখ এড়িয়ে

যাবার নয়। কৃষ্ণকমল জানিয়েছেন, বিদ্যাসাগর তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিতদের অনেককেই তুই বলতেন, পদমর্যাদায় যখন তাঁরা বেড়ে উঠেছেন, তখনও। তিনি ঈষৎ ক্ষুব্ধ বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, সময়ের বদলে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, যে-বাবা ছেলেকে এতাবৎ তুই বলে এসেছেন, ছেলে রোজগারী হবার পরে তিনি তাকে সাক্ষাতে 'তুমি', অসাক্ষাতে এমন-কি 'আপনি' পর্যন্ত বলতে থাকেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মা-কে তুই বলতেন। বিধবা বিয়ের পক্ষে লড়াই করার সিদ্ধান্ত করে বিদ্যাসাগর মায়ের সম্মুখীন হলেন। সেই সময়ের কথাবার্তা বিদ্যাসাগরের মুখে কৃষ্ণকমল শুনেছেন। "এই অভিপ্রায়ে একদিন তাঁহার [মায়ের] কাছে গিয়া বলিলাম, [বিদ্যাসাগর বলেছিলেন] মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব (আমি চিরকাল মাকে 'তুই' বলিয়া ডাকি ; ছেলেবেলার অভ্যাস কখনও ছাড়িনি), আমি তো বিধবা-বিবাহ চালাব স্থির করেছি, এতে তোর মত কি ? মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'এটা যে শাস্ত্রের যথার্থ মত, তোর কি তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে ?' আমি বলিলাম, হাঁ, আমার তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে। তখন তিনি বলিলেন, 'তবে তুই চালাগে যা, আমার তাতে অমত নেই'।"[২১]

বিদ্যাসাগরের 'তুই' শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেছেন কৃষ্ণকমল (মহাপণ্ডিত), সূর্যকুমার অধিকারী (বিখ্যাত ডাক্তার), নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী)-সহ বহু ব্যক্তি।

এই 'তুই'-এর পুরস্কার অনেককে চমকে নাড়িয়ে দিয়ে খুশি করত, যেমন যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে করেছিল। যুবক যোগেন্দ্রকুমার তাঁর বাবা ইন্দ্র-কুমারের সঙ্গে গেছেন বিদ্যাসাগরের শেষ স্বাস্থ্যনিবাস চন্দননগরের বাড়িতে দেখা করতে। বিদ্যাসাগরের বিশাল কীর্তিকাহিনী তাঁর মনে সভয় সম্ভ্রম ও অপার বিস্ময় সৃষ্টি করে জাগরূক ছিল। তিনি চমকালেন বিদ্যাসাগরের চেহারা দেখে ; "বৈকালে বাবার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ অনাবৃত শরীরে, একটা হুঁকা লইয়া বাগানের ভিতর দিয়া গঙ্গার ধারে যাইতেছেন। বাবা মৃদুস্বরে বলিলেন, উনিই বিদ্যাসাগর।"

বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয় :

"আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম ও পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি সহাস্যে বলিলেন, 'ইন্দ্রকুমার এসেছ ? এটি কে ?' বাবা বলিলেন, 'আমার ছেলে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'তোর নাম কি ?' আমি তাঁহার মুখে তুই সম্বোধন শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আমি তখন কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতায় অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, লোকে আমাকে 'যোগিনবাবু' বলিয়া সম্বোধন করে, আর এই বৃদ্ধ প্রথম দর্শনেই আমাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তখন বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি আমাকে 'তুই' বলিয়া ঘরের ছেলে করিয়া লইয়াছিলেন।" (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২)

এই তুই অনেককে আবার বিরক্তও করেছে। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাচর্চায় কৃষ্ণকমল অপেক্ষা 'অনেক জুনিয়ার'—একদিন কৃষ্ণকমলের কাছে অনুযোগ করলেন : " 'তুই' বলিতে যতক্ষণ, 'তুমি' বলিতেও ততক্ষণ। তবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে তাহাকে তুই বলিয়া বসেন, তুমি বলিতে বড়ই বিমুখ, ইহার মানে বুঝা যায় না।"[২২]

নিজেকে মুরুব্বি ভাবলে উমেশ গুপ্তর মতো কেউ-কেউ বিদ্যাসাগরের তুই-কে তিক্ত কষায় মনে করবেন, কিন্তু তার মধুস্বাদেই অধিকাংশ মানুষ পরিতৃপ্ত ছিল। বিশেষত ছাত্ররা—যারা অন্যায় করলে কঠোর শাসন পেত কিন্তু অন্য সময় ভরপুর থাকত বিদ্যাসাগরের ভালবাসায়। "কলেজের ছুটি হইলে পর অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি সেই সুপ্রসন্ন সহাস্যবদনে সকলকেই যথারীতি সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া নানা প্রসঙ্গে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা কহিতেন। তাঁহার কাছে যাইলেই ছাত্ররা প্রায়ই রসগোল্লা, সন্দেশ খাইতে পাইত।...বালকদিগের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই বান্ধব-ব্যবহার করিতেন, তা কি সংস্কৃত কলেজে, আর কি স্বকৃত বিদ্যালয়ে। ছাত্রবর্গকে সর্বদা মধুর আত্মীয়-সম্ভাষণে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তাঁহার মুখে সেই অমৃতায়মান 'তুই' সম্বোধন শুনিয়া প্রিয় ছাত্রবর্গ আপনাদিগকে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় বিবেচনা করিত। সত্যসত্যই সেই 'তুই-টুকু যেন স্বর্গীয় স্নেহের ক্ষীরভরা। যেন সেই 'তুই'-টুকুরই মধ্যে বিশ্বম্ভরা আত্মীয়তা নিহিত ছিল।"[২৩]

॥ ৫ ॥

বিদ্যাসাগরের গল্প বলা থেকে যখন একটু দূরে আছি তখন সেই অবস্থায় আরও একটি প্রসঙ্গ নাড়াচাড়া করে নিই—অশ্লীলতা। যে-যুগে ১৭-১৮ বছরে অনেক ছোকরাই হামেশা ছেলের বাবা হচ্ছিল, (মেয়েদের কথা বাদই দিচ্ছি) সেই যুগে শ্লীল অশ্লীলের ভেদরেখা থাকা সম্ভব নয়। তবু ছাত্রদের মধ্যে অশ্লীলতা যাতে প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর সতর্ক ছিলেন। নিজের ছাত্রপাঠ্য বইগুলি থেকে অশ্লীল অংশ বাদ দিয়েছিলেন। তার কারণের কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন।

বেতালপঞ্চবিংশতির (১৮৪৭ ; এটি বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় রচনা ; এর আগে কেবল লিখেছেন 'বাসুদেব চরিত', যার পুরো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি) ভূমিকায় বলেছেন : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পড়ার জন্য যে বাংলা হিতোপদেশ আছে, তার "রচনা অতি কদর্য।" তার পরিবর্তে তিনি 'বেতালপঞ্চবিংশতি' লেখেন হিন্দী 'বেতালপচীসী' নামক পুস্তক অবলম্বনে। মূল রচনায় অনেক অশ্লীল অংশ ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণে সেসব বাদ দিলেও 'কিছু অবশেষ' থেকে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে "যে-যে স্থান কোনও অংশে অপরিশুদ্ধ ছিল, পরিশোধিত হইয়াছে, এবং অশ্লীল পদ, বাক্য ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে।"[২৪]

সংস্কৃতের ছাত্রদের জন্য 'ঋজুপাঠ' তৈরি করেছিলেন। তার তৃতীয় ভাগে হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার থেকে অংশ সংকলিত ছিল। 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর হিতোপদেশ রচয়িতার উদ্দেশ্য বিপর্যয় সম্বন্ধে এই কঠোর সমালোচনা করেছেন: "হিতোপদেশ-কর্তা বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ('কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে'—হিতোপদেশ)। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে এক-একটি আদিরসঘটিত অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। অতএব আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রকারে গৃহকর্তার ওইরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সংকলন করিতে প্রবৃত্তি হইল।"[২৫]

ঋতুসংহার প্রসঙ্গে: "ঋতুসংহারে যেমন অনেক অসাধারণ গুণ আছে তেমনই এক অসাধারণ দোষও আছে। ঋতুসংহারের অধিকাংশই আদিরস-ঘটিত। বিশেষত হিম, শিশির, বসন্তবর্ণনা আদিরসে এত পরিপূর্ণ যে, এই তিন সর্গ কোনওক্রমেই বালকদিগের পাঠযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ বর্ণনা-মাত্র এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইল। এই তিন সর্গেরও আদিরসঘটিত শ্লোকসকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।"[২৬]

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের জন্য যখন তিনি রিপোর্ট পেশ করেন (১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০), তখন তার মধ্যে স্পষ্ট লেখেন: "শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয় ও নৈষধচরিতে অনেক অংশ অশ্লীল থাকা প্রযুক্ত সমস্ত পঠিত হইবার পরিবর্তে ইহাদের উদ্ধৃত অংশসমূহ পঠিত হউক।"[২৭]

বিদ্যাসাগরের অনেক উদ্ভট শ্লোক মুখস্থ ছিল। উদ্ভট শব্দটি এখনকার অর্থে শ্লোক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতো না। "যে সকল কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে উহারাই উদ্ভট শব্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।" তবে বিদ্যাসাগর পরে অনেক শ্লোকেরই উৎস খুঁজে পেয়েছেন। যাই হোক, বিদ্যাসাগর পিতার কাছে অনেক শ্লোক শিখেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর শিক্ষক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের তাগিদেও নিয়মিত উদ্ভট শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। সব জড়িয়ে প্রায় তিন শত শ্লোকের সঞ্চয়। ক্রমে দেখা যেতে লাগল, উদ্ভট শ্লোক সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ কমছে, অবস্থা এমন যে, তা লোপ পেয়ে যাবে। বিদ্যাসাগরের দায়িত্ববোধ এক্ষেত্রে তাঁকে সতর্ক ও সচেতন করে তুলল: "আমরা অবিদ্যমান হইলে আমাদের কণ্ঠস্থ উদ্ভট শ্লোকগুলি অবিদ্যমান হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ওই শ্লোকগুলি চিরদিনের নিমিত্ত অদর্শনপ্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে, এজন্য শ্লোক-গুলি ['শ্লোকমঞ্জরী' নামে] মুদ্রিত করিলাম।" শ্লোকমঞ্জরীতে ১৭৩টি শ্লোক ছিল। এই শ্লোকগুলিতে অনেক রসের খেলা ছিল, লোকজ্ঞান, বিষয়বুদ্ধি, বাস্তববোধ ইত্যাদির ভূরি ভূরি নিদর্শন, কিন্তু সেখানে প্রায় ছিলনা সকল রসের আদি যা (বৈষ্ণব মতে, সকল রসের শেষ যাতে)—সেই শৃঙ্গাররস। আবার সংস্কৃত লেখকদের কলমে আদিরস কদাপি শীতল বস্তু নয়, তা সদাই ইন্দ্রিয়তপ্ত এবং অনেক সময় আধিক্যে ফেনায়িত। সোজা বাংলায় গেঁজে যাওয়া

ব্যাপার। সেইসব মুখস্থ বস্তু পত্রস্থ করা উচিত হবে কিনা, তা নিয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বিধা ছিল। কিছু অনধিক তপ্ত আদিরসের শ্লোক তিনি শোকমঞ্জরীতে দিয়েছেন। কিন্তু যখন অধিকে আগ্রহীরা তাঁর কাছে অভিযোগ জানালেন তখন সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছিল।

"আদিরসের আতিশয্যবশত অশ্লীল বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে [বিদ্যাসাগর 'পরিশিষ্টে' লিখেছেন] এই আশঙ্কায় কতকগুলি আদিরসাশ্লিষ্ট শ্লোক শ্লোকমঞ্জরীতে সন্নিবেশিত হয় নাই। অনেকে এ-বিষয়ে অসন্তোষপূর্বক বলিলেন, যখন উদ্ভট শ্লোকের লোপাপত্তিনিবারণ শ্লোকমঞ্জরীর উদ্দেশ্য হইতেছে, তখন আদিরসাশ্লিষ্ট উদ্ভট শ্লোকের লোপাপত্তিনিবারণে বৈমুখ্য-প্রদর্শন কোনও মতে সঙ্গত নহে। বিশেষত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইবেক, এ অভিপ্রায়ে শ্লোকমঞ্জরী প্রচারিত হইতেছে না। এমত স্থলে ইহাতে আদিরসাশ্লিষ্ট শ্লোকের সদ্ভাব কোনও অংশে দোষাবহ হইতে পারে না।... যাহা হউক, তাঁহাদের সবিশেষ অনুরোধে, তদবধি শ্লোকগুলি শ্লোকমঞ্জরীর পরিশিষ্টস্বরূপ মুদ্রিত হইতেছে।"[২৮]

মোদ্দা কথা, অপরের ইচ্ছা, কিংবা নিজের ইচ্ছায় (বিদ্যাসাগর অপরের ইচ্ছাচালিত, এমন দুর্নাম তাঁকে নাই দিলাম!) বিদ্যাসাগর অশ্লীল উদ্ভট শ্লোক স্মৃতিভাণ্ডার থেকে বের করে এনে বইয়ের পাতায় ছেপে দিয়েছিলেন। বিশেষ বিশেষ শ্লোকের পিছনে কোন্ কিংবদন্তী আছে তাও বর্ণনা করেছেন। শ্লোকগুলি এবং পশ্চাদ্‌বর্তী কিংবদন্তী খুবই গরম ব্যাপার। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি শ্লোকের সংস্কৃত-ছাল ছাড়িয়ে বাংলা থালায় উপস্থিত করেছেন[২৯]—এমনই তার ঝাঁঝালো রস ও গন্ধ যে, 'গৃহপাঠ্য' এই বইয়ে সেসব হাজির না করাই ভালো। [তবে কায়স্থ চরিত্র সম্বন্ধে উপভোগ্য শ্লোকটি উপস্থিত না করার মতো বেরসিক হতে এই কায়স্থসন্তান রাজি নয়: "কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্। ন তত্র করুণাহেতু স্তত্র হেতুরদন্ততা॥" গর্ভস্থ কায়স্থ-শিশু মায়ের মাংস খায় না কেন? মায়ের প্রতি করুণাবশত নয়, তার দাঁত থাকে না বলেই মা রক্ষা পায়।]

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ছাত্রপাঠ্য বইয়ে তিনি না-হয় অশ্লীল কিছু দিলেন না, তিনি না-হয় যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের সহপাঠী ভোলানাথ বসুকে নিজের স্কুল থেকে ভাগিয়ে দিলেন, কেননা সে "ঠাকুরবাড়িতে বিদ্যাসুন্দর থিয়েটরে 'বিদ্যা' সেজেছিল, ও 'রত্নাবলী' যাত্রাতে সখী সেজে থাকে",[৩০] এবং বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রসিকতা উপভোগ করলেও কলেজে না-হয় সে-ধরনের জিনিসের উপরে ছেদ টেনে দিয়েছিলেন—কিন্তু—না, তার আগে মদনমোহনী কাহিনীটা সেরে নেই:

সংস্কৃত কলেজের উত্তরদিকের দোতলার একটি ঘরের উত্তরদিকে গৃহস্থ-বাড়ি। সে ঘরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার পড়াতেন। গৃহস্থবাড়ির এক ভদ্রলোক এসে বিদ্যাসাগরকে অভিযোগ জানালেন, আপনাদের ছেলেরা এমনভাবে

সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে যে, বাড়ির মেয়েরা ছাতে উঠতে পারে না। বিদ্যাসাগর মদনমোহনকে বললেন, ওহে, ছেলেদের ওদিকে তাকাতে বারণ করে দিও। মদনমোহন হাসলেন। দেখার জিনিসই তো লোকে দ্যাখে। বললেন, "দ্যাখো, এখন বসন্তকাল; পড়ানো হচ্ছে মেঘদূত; পড়াচ্ছেন স্বয়ং মদন। এ-অবস্থায় কেউ চঞ্চল না হয়ে পারে?" বলা বাহুল্য। বন্ধুর কথায় বিদ্যাসাগরও হেসেছিলেন। কিন্তু মিস্ত্রী ডাকিয়ে খড়খড়িগুলো স্ক্রু লাগিয়ে বন্ধ করেও দিয়েছিলেন।[৩১]

যে-প্রশ্ন স্থগিত রেখেছিলুম—বিদ্যাসাগর অশ্লীল উদ্ভট শ্লোকগুলি কি বৃদ্ধবয়সে শিখেছিলেন, না-কি ছাত্রাবস্থায়? পাঠ্যবই বেতালপঞ্চবিংশতিতে কেন গোড়ার দিকে অশ্লীল উপাখ্যান ছিল? তিনি যে ভারতচন্দ্রের কাব্য ভালবাসতেন, একথা নানা সূত্রেই পাই। অন্নদামঙ্গল কাব্যকে তিনি সাধারণের জন্য ব্যবসায়িকভাবে প্রথম প্রকাশ করেন। বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অংশ। বিদ্যাসুন্দর তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব ছোকরাদের পড়াতেন। বস্তুটি উপভোগ্য না হলে তিনি কদাপি পড়াতে রাজি হতেন না। অবশ্য তার কিছু কিছু উগ্র আদিরসের অংশ ছাত্রদের কাছে বোঝাতে সংকোচবোধ করেছেন। তখন সাহেব-ছোঁড়ারা গুরুমারা বিদ্যে গুরুকে শিখিয়ে দিয়েছিল। "বিদ্যাসুন্দরের খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন [কৃষ্ণকমল বলেছেন]। কিন্তু এক-একজন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি শেক্সপীয়ারের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May—এইসকল বই নাই? আর আমরা কি ওইসকল বহি আদবে পড়ি না, শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?"[৩২]

অর্থাৎ, চালিয়ে যান স্যার। শিক্ষকের চেয়ে ছাত্ররা কম পক্ব নয়। বিদ্যাসাগর তীব্র ইন্দ্রিয়রসের কাব্য অমরুশতক-কে খুব পছন্দ করতেন। তিনি জানতেন, শৃঙ্গাররসের মতো শান্তিরসের দিক থেকেও এ-কাব্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেহপ্রেমের উপর ঈশ্বরপ্রেমের স্ট্যাম্প মারার এই ভণ্ডামী দেখে তিনি হেসেছিলেন। "অমরুশতক আদিরসাশ্রিত কাব্য; [বিদ্যাসাগর লিখেছেন] কিন্তু এক টীকাকার, প্রথমত আদিরস পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, পক্ষান্তরে শান্তিরসাশ্রিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার, অমরুশতকের শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়া কেবল উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, একটি শ্লোকেরও শান্তি পক্ষে সম্যক অর্থসমাবেশ হইয়া ওঠে নাই।"[৩৩] বিদ্যাসাগর ধীরাজের অতিশয় অশ্লীল গান কিভাবে উপভোগ করতেন, সে কথা আগে বলেছি।

বস্তুত, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের দেশের পণ্ডিতদের মনে দেহপ্রসঙ্গে সংকোচ বিশেষ ছিল না। সংস্কৃত কাব্যে তো অবিরাম দেহের মাতামাতি। এই দেশে অধ্যাত্মচর্চার মতো দেহচর্চাও চরমে উঠেছিল। বাৎস্যায়ন হলেন

কামশাস্ত্রের ধন্য ঋষি! বিদ্যাসাগরেরও মুখের কথায়, এমন-কি কোনো কোনো লেখায়, দেহব্যাপারে শুচিবাতিকতা ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্র ঘেঁটে তিনি বই লিখেছেন, বিষয় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ। এইসব আলোচনা—বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা বাদ দিলে—মুখ্যাংশে শরীর-সম্বন্ধীয়। তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক রচনামধ্যে সংকলিত কাহিনী সম্বন্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্র এনেছিলেন, তাও দেখেছি।

সুতরাং স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি, বন্ধুসঙ্গে বিদ্যাসাগর যখন মজলিশে আছেন তখন তাঁর মুখের আড় থাকত না। ভাষাও একেবারে হালকা-চালের চলিত হতো। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বা স্মৃতিলেখকেরা তাঁর গল্পগুলি হাজির করার সময়ে সাধুভাষার ছাঁদ দিয়েছেন—সে ভাষা মোটেই বিদ্যাসাগরের মুখের ভাষা নয়।

॥ ৬ ॥

বিদ্যাসাগর গল্প বলার সময়ে নিজ জীবনের কাহিনীও বলতেন—সেসব গল্পকথার মতোই শোনাত। তাঁর কৈশোর কাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক। অতিশয় সরস কাহিনী।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স ১৪, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র—বিয়ে করতে চলেছেন। পাত্রী ৮ বৎসরের কন্যা দিনময়ী। সেই সময়ের ঘটনা। সেকালের রীতি অনুযায়ী বাসরঘরে ঢোকা-মাত্র নিজের পাত্রী খুঁজে নেওয়ার পরীক্ষা দিতে হতো। ছাঁদনাতলায় কী যে একটি জড়পুঁটুলি দেখা গেছে, তা মনে থাকার কথা নয়—তাকে খুঁজে নিতে হবে রাশি রাশি কামিনী ভামিনীদের মধ্য থেকে!! সে বড়ো কঠিন কাজ। বিদ্যাসাগরকে সেই পরীক্ষায় পড়তে হলো। বাসরঘরে পা দেওয়া মাত্র রব উঠল—"তোমার কনে খুঁজে নাও, তোমার কনে খুঁজে নাও।" বিদ্যাসাগর গোড়ায় একটু ধাঁধায় পড়লেন। ওই মেয়েদের দঙ্গলের মধ্য থেকে কনে খুঁজে বার করবেন কি করে? অর্ধাঙ্গিনীর মুখটিও যে ভালো করে দেখতে পাননি। কিন্তু তিনি দুষ্ট-ধূর্ত, এবং তৎপর বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়। চারিদিকে তাকিয়ে বেশ বড়সড় একটি টুকটুকে ফর্সা মেয়ের হাত বাগিয়ে ধরে বললেন, "এই আমার বউ।" তখন চারদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল! এ ওর ঘাড়ে পড়ে, ও এর ঘাড়ে পড়ে। সবাই হাসাহাসি ক'রে পালাবার পথ পায় না, পাছে বরের তখনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছা হয়। যে-মেয়েটিকে ধরেছিলেন, সে ফাঁপরে পড়ে যতই বলে, "না না, আমি তোমার কনে নই," ঈশ্বরচন্দ্র নাছোড়, "উঁহু, তুমিই আমার বউ।" সে যত বলে, না—ঈশ্বরচন্দ্র তত বলেন, হাঁ। শেষে বললেন, "আমার অন্য কনে চাই না, তোমাকে হলেই বেশ চলে যাবে।" মেয়েটি তখন "বাপ্‌রে মারে গেলুম রে" বলে চীৎকার জুড়ে দিল। চীৎকারে গিন্নী-বান্নী দু'একজন এসে বললেন, "ও তোমার কনে নয়, ওকে ছেড়ে দাও।" ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, "ছাড়ব কেন? খুঁজে নিতে বলেছে, আমি খুঁজে একটা বার করেছি, আর বেশ ভালই বার করেছি। এইটি হলেই

আমার মনের মতো হবে।" তখন মেয়েটি ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে-পায়ে ধরে বলল, "ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার কনে বার করে দিচ্ছি।"৩৪

গল্পটি বিদ্যাসাগর এক বন্ধুর বাড়িতে বিয়ের আসরে বসে বলেছিলেন। মজার গলায় বলেন, "আজকাল বিয়েতে আর তেমন আমোদ নেই; বরকেও তেমন সংকট-পরীক্ষায় পড়তে হয় না।"

বিদ্যাসাগরের জীবন থেকে আরও কিছু সরস কাহিনী উপস্থিত করা যায়। যেমন দুই বিদ্যাসাগরের কাহিনী। এই কাহিনীতে কেবল বিদ্যাসাগরের কৌতুকবোধ নেই, আরও বেশি রয়েছে সহমর্মিতা বা মনের গণতান্ত্রিকতা।

দেবগ্রামের জমিদারবাড়িতে চন্দ্রমোহন বলে এক বামুনের ছেলে রাঁধুনীর কাজ করে। চালাক-চতুর সে। সকলেই তাকে পছন্দ করে। মুহুরীদের ধরাধরি করে চন্দ্রমোহন বাংলা বই জোগাড় করল, পড়ে ফেলল, এবং বাঙালী ছেলের এই স্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ধরা পড়ল—সে গ্রন্থকার হবে। উদ্যোগ আয়োজনও শুরু হলো। কাগজ জোগাড় করে খাতা বাঁধাল। তাতে বড়ো বড়ো অক্ষরে 'অ' 'আ' থেকে শুরু করে পাড়ার খবরাদি লিখে ফেলতে লাগল। খাতার পাতায় পাতায় নিজের মতো করে ছবিও আঁকল। খাতা শেষ হলে বুঝল, বই শেষ হয়েছে। প্রচ্ছদ-চিত্রও চাই। তাও এঁকে ফেলল। এবং নাম লেখার সময়ে শুধু চন্দ্রমোহনে সমাপ্ত না থেকে লিখল—"বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ—চন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগর প্রণীত।" সে খাতা বাড়ির কর্তাদের নজরে এল। নজরে আনাবার ব্যাপারে চন্দ্রমোহনের চেষ্টাও থাকতে পারে। খাতা পড়ে বাড়ির সকলের স্ফূর্তি হলো খুবই। তাঁরা তারিফ করে বললেন, "তুই যে রাতারাতি বিদ্যাসাগর হয়ে পড়লি রে।" এহেন কাণ্ডের পরে চন্দ্রমোহন নামটা বজায় থাকতে পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরচন্দ্র নাম যেমন অনেকটা আড়ালে চলে গেছে, চন্দ্রমোহনের ক্ষেত্রে আরও বেশি হল—চন্দ্রমোহন একেবারে লুপ্ত হয়ে বজায় রইল শুধু বিদ্যাসাগর। সকলে তাকে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কিছু বলে না।—"এই বিদ্যাসাগর, এদিকে আয়; ওরে বিদ্যাসাগর, কথা শুনে যা; ভাই বিদ্যাসাগর, কাজটা তাড়াতাড়ি করে দাও; বিদ্যাসাগরদা, তুমি হাত না-লাগালে কাজটা উঠবে না; মুখপোড়া বিদ্যাসাগরের আজকে কী যে হয়েছে, কাজে মন নেই", ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যিকারের কাণ্ড বাধল যখন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে বাড়িতে নিমন্ত্রণে এলেন। বাড়ির কর্তারা আগে থেকে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন, নিজেরাও সতর্ক—চন্দ্রমোহনকে যেন কোনোমতে বিদ্যাসাগর ডাকা না হয়। কিন্তু অভ্যাস হল দ্বিতীয় স্বভাব—কেবল ইংরাজি মতে নয়, বাংলা মতেও। সুতরাং আসল বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে এপাশে ওপাশে ফিসফিসানি শুনছেন: "ও বিদ্যাসাগর, ডালে নুন হয় নি কেন?—এ্যাই চুপ।—ওহে বিদ্যাসাগর, হাত চালিয়ে নাও।—চুপ চুপ, তোদের বললেও কথা মনে থাকে না।—বিদ্যাসাগরের

মাথায় কিছু নেই, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো।—আচ্ছা তোরা চুপ করবি কিনা, বিদ্যাসাগর বলাটা ছাড়বি কি ?—তা বিদ্যাসাগর, একটু হাত চালিয়ে নাও না, পাত পড়তে যে দেরী হয়ে যাচ্ছে ?—দ্যাখো কাণ্ড, তুমি বারণ করে নিজেই বিদ্যাসাগর বলে বসলে !—ই-স্-স্।"

আসল বিদ্যাসাগরের কানে ফিসফিসানি ঢুকছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি জমিদারকর্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার মশাই ?" জমিদারবাবু লজ্জা পেলেন। তারপর হেসে সব ব্যাপারটি বোঝালেন। শুনে ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের ভারি মজা লাগল। চন্দ্রমোহনকে ডেকে আনালেন। সামনে বসিয়ে তাকে বললেন, "তা বেশ হয়েছে। তুমি বিদ্যাসাগর, আমি বিদ্যাসাগর। আজ থেকে তুমি আমার মিতা।"[৩৫]

এই ধরনের আর একটি ঘটনা মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রুতি ও স্মৃতি' গ্রন্থে আছে। সেখানে বাড়ির কর্তার নাম হেমেন্দ্রনাথ সিংহ। তাঁর পাচক ব্রাহ্মণের নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। এই 'ঈশ্বরচন্দ্র' নাম সূত্রে ব্রাহ্মণের বরাতে বিদ্যাসাগর উপাধি জুটে গিয়েছিল। হেমেন্দ্রনাথ সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে উপরের ঘটনার মতো ঘটনায় বিদ্যাসাগর আসল ব্যাপার জানতে পেরেছিলেন। এবং তিনি কেবল পাচক ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে 'মিতা' পাতান নি, মৈত্রীর প্রমাণ দিতে পরদিন রান্নার কাজ নিজে করে বাড়ির ছেলেদের খাওয়ান। এর পরে তিনি যখনই বোলপুরের রায়পুরে সিংহবাড়িতে যেতেন, সন্ধান করতেন, "আমার মিতা কোথায় ?"[৩৬]

বিদ্যাসাগরের অনেক গল্পে আহার ও ঔষধ দুইই থাকত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কলমের কল্যাণে তেমন গল্প পেয়েছি—পূর্ণচন্দ্র নামক অতিশয় জ্যাঠা ছোকরার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বার্তাচিতের সেই কাহিনীর ঈষৎ উল্লেখ আগে করেছি। হরপ্রসাদ লখনৌ-এ যাচ্ছেন সংস্কৃত প্রফেসারের পদে সাময়িকভাবে কাজ করতে। মধ্যপথে তিনি কর্মাটারে কয়েকদিন কাটাবেন বিদ্যাসাগরের কাছে। সেখানে থাকাকালে কথাবার্তার সময়ে বিদ্যাসাগর আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "তুই লখনৌ-এ পড়াতে যাচ্ছিস, পারবি তো ?" "কেন ?" বিদ্যাসাগর বললেন, "সেখানে পুনো-জ্যাঠার মতো ছাত্র আছে।" বিদ্যাসাগর যখন লখনৌ-এ গিয়েছিলেন, তখন সেই ফোর্থ-ইয়ারের বাঙালী ছোকরাটির সঙ্গে তাঁর মোলাকাত হয় রাজকুমার সর্বাধিকারীর বাড়িতে। বিদ্যাসাগর মহা মান্যগণ্য ব্যক্তি, সবাই খাতির করে কথা বলে—চোটপাট কথাবার্তায় তাঁকে হতবাক করে দেওয়া বিরল ব্যাপার। তেমনটি এখানে ঘটেছিল।—

বিদ্যাসাগর : অনেকে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন ; অনেকে শুধু দেখিতে আসিতেন। একদিন পূর্ণচন্দ্র আসিয়া হাজির। আসিয়াই বলিল—রাজকুমারবাবু, এখানে তো অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর কোন্‌টি ? রাজকুমার আমায় দেখাইয়া দিলে সে বলিল—ওমা, এই বিদ্যাসাগর ! উড়ে-কামানো-কামানো ; পালকির নীচে গেলেই হয়। তাহার

বক্তৃতায় রাজকুমার তো অধোবদন, আমিও কতকটা তাই।

তারপর উভয়ের কিছু আলাপচারি হলো। পুনো-জ্যাঠা মুরুব্বির মতো প্রশ্ন করতে শুরু করল।

পুনো-জ্যাঠা : বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপনি তো কলকাতা ইউনিভার্সিটির সিনিয়ার ফেলো। কিন্তু এটা কেন হয় বলুন দেখি—যে-ছেলেটা সেকেন ক্লাস থেকে বার হয়ে যায়, সেও লেখে I has ; যে এন্ট্রেস পাস করে, সেও লেখে I has ; যে এল-এ পাস করে, সেও লেখে I has ; যে এম-এ পাস করে, সেও লেখে I has। এ জিনিসটা কেন হয় ? এর কি কিছু প্রতিকার নেই।

বিদ্যাসাগর দেখলেন, মহা ফ্যাসাদ। উচ্চশিক্ষার বিস্তার হয়েছে ঠিক কিন্তু তার মান নেমে গেছে। দায়িত্ব অবশ্যই ইউনিভার্সিটির কর্তাদের। সে ইউনিভার্সিটি আবার যে-সে নয়, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, যার এলাকা আগ্রা থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত বিস্তৃত, নাগপুর, সিলোনও তার মধ্যে আছে। বিদ্যাসাগর বুঝলেন, পুনো-র সঙ্গে তর্কবিতর্ক তাঁর কর্ম নয়। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাপদ্ধতি বোঝাবার জন্য গল্প শুরু করলেন। প্রথম গল্পটি তাঁর স্কুল-জীবনের কাহিনী, যখন তিনি হিন্দুস্কুলের বড়মানুষ ছেলেদের দামী মদের নেশার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে ছিটে-র অর্থাৎ গুলির নেশা ধরেছিলেন। অল্পবিস্তর অভ্যস্ত হবার পরে তাঁরা বাগবাজারের আড্ডায় গুলিখোরদের সঙ্গে টক্কর দেবার ইচ্ছায় হাজির হন।

এর পরে গুলির আড্ডার অনবদ্য চিত্ররসাক্ত বর্ণনা।

বিদ্যাসাগর : আট মূর্তি সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলাম। বাগবাজারে গুলির আড্ডায় যাইতে গেলে একটা গলির মধ্য দিয়া যাইতে হয়। গলির সুমুখেই আড্ডার দরজা। আমরা গলির আর এক মুড়ায় ঢুকিতেই আড্ডাধারী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, এতগুলো ফরসা কাপড়ওয়ালা লোক আসিতেছে, আমার বুঝি আজ কপাল ফিরিবে। আমরা কাছে গেলে খুব আদর করিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, একটি খোলায় ছাওয়া হল্, তার কিন্তু ওই একটি দরজা, পাছে গুলিখোররা পয়সা না দিয়া পালায় সেইজন্য ওই একটি দরজা রাখা হইয়াছে, আড্ডাধারী সেখানে থাকেন। আমাদের কিন্তু আড্ডাধারী খুব খাতির করিলেন। আমরা যতক্ষণ ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। দেখিলাম প্রায় দুশো-আড়াইশো গুলিখোর বসিয়া আছে ; সকলেরই সামনে একটি কলসীর কানা, তার উপর একটি থেলো হুঁকো, নলচেটি ছোট, নলটি খুব লম্বা, নলচের উপর একটা কলিকা, কিন্তু উপর ভাগটা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। গুলিখোরেরা সেই ভাঙা কলিকার উপর ছিটা বসাইতেছে, চিমটা করিয়া আঙরার কয়লা তার উপর দিতেছে, নল দিয়া টানিয়া সেই ধোঁয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছে, ও এক-একবার একটু একটু চাট মুখে দিতেছে। এ চাট আর কিছু নয়—সামনের মালসায় একটু গুড়ের জল আছে ও তাহাতে একটুকরা সোলা ফেলা আছে। ধোঁয়া টানিয়াই সেই সোলাখানা চুষিতেছে। আমরা দেখিলাম—হলের পূব

দিকে সবাই মাটিতে বসিয়া গুলি খাইতেছে, উত্তর দিকেও তাই, পশ্চিম দিকেও তাই। কেবল দক্ষিণ দিকে যাহারা গুলি খাইতেছে, তাহারা ইঁটের উপর বসিয়া আছে। আমরা আড্ডাধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা ইঁটের উপর বসিয়া আছে কেন? তিনি বলিলেন—এ আড্ডার নিয়ম এই যে, যে-কেহ একটানে ১০৮টা ছিটে খাইতে পারিবে, তাহাকে একখানা ইঁট দেওয়া হইবে। এই কথাটা শুনিয়াই আমাদের যে-উচ্চ আশা ছিল, তাহা একেবারেই উপিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—ওই যে একজন লোক আটখানা ইঁটের উপর বসিয়া আছে, ও কত ছিটে খাইতে পারে? আড্ডাধারী বলিল—৮৬৪। আমাদের সকলের মুখ পাঙ্গাস বর্ণ হইয়া গেল। মদন আমার কানে কানে বলিল—টক্কর দেওয়া তো হলো না, কিন্তু এইবার এইসব গুলিখোরেরা কী গল্প করে শোনা যাক। তাই আমরা তাহাদের কাছ ঘেঁষিয়া গেলাম। পাছে ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়, সেইজন্য গুলিখোরেরা অতি আস্তে-আস্তে কথা কয়, হাত-পা নাড়িয়াই কথা কওয়ার কাজ সারে। তাই আমরা খুব কাছে গেলাম।

বিদ্যাসাগর কিভাবে মুখের কথায় ছবির পর ছবি এঁকে শ্রোতাকে মোহিত করে রাখতেন, তার এই একটিমাত্র নমুনা আমরা পেয়েছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাগুণে।

এর পরে ওই গুলির আড্ডার দু'একটি গল্প:

বিদ্যাসাগর: শুনিলাম তাহারা কলের গল্প করিতেছে। যে একখানি ইঁটের উপর বসিয়াছিল সে বলিতে লাগিল—চাণক চাণক। গোল করাত—মস্ত গোল—তার উপর বাহাদুরি কাঠ ফেলিয়া দিতেছে—ফর্ ফর্ ফর্ ফর্ করিয়া কাঠ চিরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়ি, কোথাও বরগা, কোথাও দোর, কোথাও জানালা, কোথাও টেবিল, কোথাও কোচ, কোথাও কেদারা—এই সব বাহির হইতেছে।

যে দুখানা ইঁটের উপর বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিল—ও কি কল! কল তো গরফের। একখানা পাথরের বারকোশ, মস্ত, ঘরজোড়া—তার উপর দুখানা মোটা পাথরের চাক আড়ে ঘুরিতেছে। আর সাহেবরা বস্তা বস্তা মসিনা [তিসি] সেখানে ফেলিয়া দিতেছে। কলের দুটো মুখ—একটা দিয়া পিপে পিপে তেল বাহির হইতেছে, আর একটা দিয়া থান থান খোল বাহির হইতেছে।

তিনখানা ইঁটের উপর যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—ও-বা কি কল! আকড়ায় দেখিলাম—[ইঁটের] পাঁজায় পাঁজায় মাঠ ছাইয়া গিয়াছে, কলের ভেতর সেই ইঁট ঢোলাই করিয়া দিতেছে। কলের সামনে এক আকাশ-পাতাল ছাঁকনি। কলের গুঁড়া তার উপর গিয়া পড়িতেছে। কোথাও ১নং, কোথাও ২নং, কোথাও ৩নং সুরকি, কোথাও কুরুই [কাঁকর] পড়িতেছে।

যিনি আট খানা ইঁটের উপর বসিয়াছিলেন, তিনি কথা না কহিয়াই হাত

ঘুরাইয়া বলিয়া দিলেন—ওসব কল কিছু না। আমার বাড়ি ফরাসডাঙ্গা। বাড়ি গিয়া দেখি, কোথাও বাড়ি নাই, ঘর নাই, পুকুর নাই, গাছ নাই, পালা নাই—সব মাঠ হইয়া গিয়াছে। ছিরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্যন্ত সব ধু-ধু করছে মাঠ। ছিরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুড়ঙ্গ আর চুঁচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একটা সুড়ঙ্গ ; একটা দিয়া পালে পালে গরু যাইতেছে, আর একটা দিয়া গাড়ি গাড়ি আক যাইতেছে। মাটির ভিতর কোথায় যায় কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনেক খুঁজিয়া বুঝিলাম—মাটির ভিতরে কল আছে, কলের ১০০টা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়া বাহির হইয়াছে। কোনটা দিয়া রাতাবী, কোনটা দিয়া মনোহরা, কোনটা দিয়া কাঁচাগোল্লা, কোনটা দিয়া রসগোল্লা, কোনটা দিয়া ছানাবড়া, কোনটা দিয়া পানতুয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দ্যাখো, সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরি কিনা !

শুধুই গল্প করার জন্য এখানে বিদ্যাসাগর গল্প ফাঁদেন নি। পুনো-জ্যাঠা যেভাবে শুনলে মজবে এবং মানবে, সেইভাবেই তিনি বলেছিলেন। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলের ছাঁচে তৈরি শিক্ষার চেহারা সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনাও ছিল।

বিদ্যাসাগর : তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যেসব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাংখা ফি নিই, এগজামিনেশন ফি নিই—নিয়ে কলের দোর খুলি—দেখাইয়া দিই, এইখানে মাস্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেনসিল সিলেট, সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এন্ট্রেস হইয়া, কেহ এল-এ হইয়া, কেহ বি-এ হইয়া, কেহ-বা এম-এ হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে, I has। এক পাকের তৈরি কিনা !

এইখানেই শেষ নয়, পুনো-জ্যাঠার খোঁচা দেওয়া আরও প্রশ্ন ছিল।

পুনো-জ্যাঠা : আচ্ছা, আপনারা যে, ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেন, নানারকম ফি নেন—বই, কাগজ, খাতাপত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট-বক্স, রঙের বাক্স, এইসব কেনান—তাদের শেখান কি ? দেন কি ?

বিদ্যাসাগর : পূর্ণবাবু, আপনি কখনও আমাদের দেশে যান নাই। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বন্যা হয় ; ঘর-বাড়ি, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, বাগান-বাগিচা, সব জলে জলময় হইয়া যায়। সেই সময় যারা আমাদের গ্রাম থেকে ঘাটালে যায়, তারা আপনি যা বললেন তার মর্ম জানে। সব তো জলে জলময়—কেবল মনের আট্‌কালে রাস্তাটা কোথা দিয়ে ছিল, তারা তাই আঁচিয়া

লয় এবং সেই রাস্তায় চলিতে থাকে। পায়ের তেলো সর্বত্রই ডুবিয়া যায়। ডাঙ্গাজমি দেখা যায় না। তার উপর কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমরজল; মাঠে এর চেয়ে বেশি জল হয় না। এই জল কাটাতে কাটাতে প্রায় চারক্রোশ গিয়া তারা একটা বাঁশের টঙ দেখিতে পায়—জল ছাড়া প্রায় বিশ হাত উঁচু। টঙে ঘাটমাঝি-মশাই বসিয়া আছেন, একখানা মই তাতে লাগানো। অনেক কষ্টে টঙের কাছে আসিয়া সে মাঝিকে বলিল—মাঝি, আমায় পার করে দাও। সে বলিল—মশাই, আপনি ওপরে আসুন। ওপরে আসিলে সে বলিল—পারের কড়ি রাখুন। অন্য সময় যাহা রাখেন তার আটগুণ রাখিতে হইবে। বেচারা কি করে, তাই রাখিল। তখন ঘাটমাঝি বলিল—ওই দেখিতেছেন নৌকা আছে, নৌকায় বোটে [ছোট দাঁড় বা কেরোয়াল] আছে, দাঁড় আছে, হাল আছে, লগি নাই—বন্যার সময় লগি দিয়া থই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে বাইতে ওই ওপারে চলিয়া যান। ওপারে যে টঙ দেখিতেছেন, উহার কাছে নৌকা রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান।

আমরা সেই ঘাটমাঝির মতো টঙ বাঁধিয়া বসিয়া আছি। ছেলেরা পড়িতে আসিলে তাদের কাছ থেকে নানারকম ফি আদায় করিয়া বলি—ওই স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, মাস্টার আছে, পণ্ডিত আছে—কাগজ কলম বই কিনিয়া পড় গে। মাসে মাসে আমার কাছে এখানে ফি-টি দিয়া যাইও।[৩৭]

একই কলের একদিকে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য দিক দিয়ে ছাত্রকে টেনে বার করে আনার শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনে ছিল গভীর বিতৃষ্ণা। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের আত্মস্বতন্ত্র পুরুষ তিনি, ব্যক্তিত্বনাশক পদ্ধতির গাড়ির চাকায় হাত লাগালেও তারই বিরুদ্ধে নিজের অসন্তোষের কথা জনে জনে বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুনো-জ্যাঠা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের মুখে যে-ধরনের কথা শুনেছেন, তারই মতো কথা অন্য নিকটজনেরাও শুনেছেন, যেমন তাঁর "পরম প্রিয়পাত্র" দ্বারকনাথ ভট্টাচার্য বা ব্রজনাথ দে। ব্রজনাথের কাছে চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের বলা নিম্নের কথাগুলি শুনেছিলেন—তিক্ত বিদ্রূপের হাসি তাতে ছিল।

বিদ্যাসাগর: দেশে শিক্ষাবিস্তার কিছুই হয়নি। কেমন হয়েছে জানো—একবার শুনেছিলাম, বিলেত থেকে একরকম কল আসছে, তার একদিকে একটা বাছুর, আর অন্যদিকে কতকগুলো আখ ঢুকিয়ে দিতে হয়। ক্রমে একদিকের আখ থেকে রস, রস থেকে গুড়, গুড় থেকে চিনি তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে বাছুর বেড়ে গরু, তার দুধ, দুধ থেকে ছানা। তারপর দু'দিক থেকে চিনি ও ছানা এসে মিশে গিয়ে সন্দেশের তাল। কলের মুখে বসে আছে ১০-১৫ জন লোক, তাদের হাতে নানা মাপের ছাঁচ, সেই মতো সন্দেশ তৈরি করছে। কত রকম ছাঁচ—কোনোটা তালশাঁস, কোনোটা আম, কোনোটা আতা, কোনোটা-বা গোলাপ জাম। লোকে সন্দেশের রঙ ও ছাপ দেখে মোহিত। কিন্তু চেখে দ্যাখো, সব সন্দেশেরই একই স্বাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার

ভিয়ানও তেমনই, সবই এক পাকে তৈরি মাল—কোনোটিতে এম-এ, কোনোটিতে বি-এ, কোনোটিতে এল-এ, কোনোটিতে-বা এনট্রান্সের ছাপ ; কিন্তু যখন চাখতে যাই, দেখি, সবই এক পাকের জিনিস।[৩৮]

এই শিক্ষানীতির আর এক সর্বনাশা দিক—এর দ্বারা কায়িক শ্রম সম্বন্ধে ঘৃণা জাগে, শিক্ষিত মানুষেরা নিজেদের স্বতন্ত্র জীব বলে মনে করতে থাকে। কেবল উচ্চবর্ণের নয়, নিম্নবর্ণের মানুষের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটে। ফলে নড়বড়ে হয়ে যায় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো। তা নিয়ে বিদ্যাসাগরের মনস্তাপের সীমা ছিল না। তাই স্যার জর্জ ক্যাম্বেল "উচ্চশিক্ষা-বৃক্ষটির মূলে কুঠারাঘাত" করেছেন, এই অভিযোগ তুলে যখন টাউনহলে প্রতিবাদ-সভার আয়োজন করা হয়, তখন বিদ্যাসাগর যোগদান করার উৎসাহ বোধ করেন নি, কেননা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে এ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কথাবার্তাও হয় :

"অনেক ঠাট্টাতামাশা করিয়া [বিদ্যাসাগর মহাশয়] বলিলেন—এই পোড়া শিক্ষা দেশ হইতে উঠিয়া গেলেই ভালো হয়। আমি আমার গ্রামে একটি স্কুল খুলিয়াছি। আর তাহার ফলে দেশত্যাগী হইয়াছি। চাষাভুষার ছেলেরা পর্যন্ত যেই দু'পাত ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিল, আর তার পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িল। তাহাদের ভালো কাপড় চাহি, জুতা চাহি, মোজা চাহি, মাথায় টেরিটি পর্যন্ত চাহি। এখন আমার বাড়ি যাইবার জো নাহি। গেলেই কেহ বলে—'দাদাঠাকুর, তুমি কি করিলে ? ছেলেটি একবার ক্ষেতের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। আমার আধা জমির চাষ হইল না। খাইব কি ? ইহারও বাবুয়ানার খরচই কোথা হইতে জোগাইব ?' কেহ বলে—'আমার গরুগুলি মারা গেল। ছেলেটি তাহাদের কাছে একবারও যায় না, চরানো দূরে থাকুক। আমার উপায় কি হইবে ?' আমি যেমন পাপ করিয়াছি, আমার তেমন প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। আমি আর পাড়াগাঁয়ে স্কুলের নামমাত্র করিব না। এদেশ তেমন নহে যে, লেখাপড়া শিখিয়া আপন আপন ব্যবসা ভালো করিয়া করিবে। এ লক্ষ্মীছাড়া ছেলেগুলো দু'পাত ইংরাজি পড়িলেই আপনার পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িয়া দেয় ; আপনার পিতামাতাকে পর্যন্ত ঘৃণা করে।"[৩৯]

॥ ৭ ॥

পুনশ্চ বিদ্যাসাগরের গল্প-কথায় ফেরা যাক। রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু বিদ্যাসাগরের বলা একটি গল্প শুনিয়েছেন—সূক্ষ্মরসের সেই গল্পটিতে অজ্ঞানের টনটনে জ্ঞানের কথা আছে। যেকালের এই গল্প তখন সবচেয়ে ছোট মুদ্রা হিসাবে কড়ির চল ছিল। পয়সার হিসেবও এখনকার মতো নয়। তখন ৬৪ পয়সায় এক টাকা হতো। যাই হোক গল্পটা হলো এই :

এক চাষার ছেলে মায়ের কথায় মুদীর দোকানে গেছে এক পয়সার কড়ি কিনতে। মুদী কাজে ব্যস্ত ছিল। তাই সে চাষার ছেলেকে বলল, "ওই কলসীর ভিতর কড়ি আছে। এক পয়সায় কুড়ি গণ্ডা [চারটেয় এক গণ্ডা]

পাবে। এক গণ্ডা করে ভাগা দিয়ে নাও।" ছেলেটি ভাগা দিচ্ছে, মুদী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, পাঁচটা করে ভাগা দিচ্ছে। মুদী বলল, "ব্যাটা, পাঁচটা করে গণ্ডা হয়?" ছেলেটি থতমত খেয়ে বলল, "কটা করে হয় আমি তো জানি না।" মুদী বলল, "জানিস নে? আচ্ছা দ্যাখ।" এই বলে সে তিনটে করে ভাগা দিয়ে বলল, "এইরকম কুড়িটা ভাগা দিয়ে নাও।" ছেলেটি তা না-করে ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মুদী জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি যে।" ছেলেটি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "ও-রকম করলে মা যে বকবে।"[৪০]

এর অন্য পিঠে আছে, বাস্তববোধহীন শব্দসর্বস্ব পণ্ডিতদের মারাত্মক নির্বুদ্ধিতার কাহিনী।

জনৈক বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক নদীতে স্নান করছেন। তীরে দাঁড়িয়ে আছেন বিদ্যাবাগীশ। হঠাৎ তিনি দেখেন, একটা কুমীর ধেয়ে আসছে অধ্যাপককে আক্রমণ করতে। বিদ্যাবাগীশ খুব ভয় পেয়ে অধ্যাপককে সতর্ক ক'রে বললেন, "গুরো! সাবধানো ভব। মহীলতা আয়াতি।" অর্থাৎ গুরুদেব, সাবধান হোন, একটা মহীলতা আসছে। বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক মন্ত্রপাঠে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি জানতেন, মহীলতা মানে কেঁচো। কেঁচো আসছে, তাতে ভয় পাবার কি আছে? তাই কথাটায় গুরুত্ব না দিয়ে স্নানাদি করতে লাগলেন। ওধারে কুমীর পণ্ডিতদের শব্দার্থ-জটিলতার সুযোগ পেয়ে অধ্যাপককে স্বচ্ছন্দে সাবাড় করল।[৪১]

গোপাল ভাঁড়ের নামে চলিত একটি গল্প বিদ্যাসাগর বলেছেন।

বাবু আহারে বসেছেন। তাঁর উমেদাররা তাঁকে ঘিরে আছে। বাবু যা বলেন, উমেদাররা তাতে শুধু হাঁ বলে তাই নয়, কয়েক কাটি চড়িয়েও বলে। নতুন পটল উঠেছে, পটল দিয়ে মাছের ঝোল হয়েছে। বাবু খেতে খেতে বললেন, "পটল অতি জঘন্য তরকারি। ঝোলে পটল দিয়ে ঝোলটাই খারাপ করে দিয়েছে।" তা শুনে উমেদাররা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "হাঁ হাঁ, সত্যই তো, সত্যই তো। কী অন্যায়, আপনার ঝোলে পটল!! পটল তো ভদ্রলোকের খাদ্য নয়।"

বাবু কিন্তু ঝোলের সব কটি পটল বেশ তৃপ্তির সঙ্গে একে একে খেলেন। তারপর বললেন, "দ্যাখো, পটলের তরকারিটা বড় মন্দ নয়।" উমেদাররা তৎক্ষণাৎ বলল, "ঠিক বলেছেন। পটল তরকারির রাজা। পটলকে পোড়ান, ভাজুন, সুক্তোয় দেন, ডালনায় দেন, চচ্চড়িতে দেন, ঝোলে দেন, ছোকায় দেন, দম্ করুন, কালিয়া করুন, সকলেই উপাদেয় হয়। বলতে কি, এমন উৎকৃষ্ট তরকারি আর নেই।"

বাবু তখন খাওয়া থেকে হাত গুটিয়ে উমেদারদের দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা তো বেশ লোক হে! যেই আমি বললাম, পটল ভালো তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটলকে নরকে দিলে। আর যেই আমি বললাম, পটল বড় মন্দ তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটলকে স্বর্গে তুললে!"

উমেদাররা তখন হাত জোড় করে বলল, "মশায়, আপনি অনুচিত কথা বলছেন। আমরা ঝোলেরও উমেদার নই, পটলেরও উমেদার নই—উমেদার আপনার। আপনি যাতে খুশি থাকেন, তাই যথাসাধ্য করাই আমাদের কাজ।"[৪২]

গল্পটা অবশ্য নিছক আমোদ দেবার জন্য বলা হয়নি। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা কেবল পয়সার দাস, তা বোঝাবার জন্য বিদ্যাসাগর এটি লিখেছিলেন। "তাঁহারা শাস্ত্রেরও উমেদার নহেন, ধর্মেরও উমেদার নহেন—তাঁহারা উমেদার পয়সার। পয়সাওয়ালারা যাহাতে খুশি থাকেন, তাহাই তাঁহাদের সর্বপ্রযত্নে কর্তব্য বলিয়া নির্বিবাদে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে।"

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রতাপের দিন শেষ হয়ে গেছে; এখন তাঁদের বড়ো কুণ্ঠিত জীবন। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে কোনো স্থান শূন্য থাকতে পারে না। শূন্যস্থানে ঢুকে পড়েছেন রাজনৈতিকরা—নানা প্রতিশ্রুতির বৃহৎ তালিকা এবং সকল গোষ্ঠীর মনযোগানোর ব্রত নিয়ে। স্বর্ণভস্মের কমে তাঁদের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না।

পণ্ডিতদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে তাঁদের ধূর্তামি, ভণ্ডামি এমন-কি বোকামির চেহারা দেখাতে বিদ্যাসাগর নানা গল্প লিখেছেন। সেইসব গল্প তিনি মজলিশেও বলতেন, ধরে নিতে পারি। যাঁরা শাস্ত্র পড়েছেন, কিন্তু শাস্ত্রের পুরো অর্থ না বুঝে তার ব্যাখ্যা করেন, বা তদনুযায়ী বিধান দেন, তাঁদের সম্বন্ধে এই গল্প:

বিপ্রাভাস নামে এক উত্তম রাজবৈদ্য ছিলেন। তিনি গত হলে তাঁর পুত্র রামকুমারকে রাজা রাজবৈদ্যের পদ দিলেন। রামকুমার ব্যাকরণ, সাহিত্য ইত্যাদিতে কিছু ব্যুৎপন্ন ছিল কিন্তু বৈদ্যশাস্ত্র তাঁর একেবারেই জানা ছিল না। তাই বলে উচ্চ রাজপদ ছাড়াও যায় না। এধারে রাজবৈদ্য বলে তাঁর কাছে রোগীরা আসতে লাগল। একদিন এক নেত্ররোগী এল। চোখের যন্ত্রণায় সে কাতর। সে ওষুধ চাইল, যাতে শীঘ্র জ্বালা যায়। তার কথা শুনেই রামকুমার মস্ত বই খুলে বসলেন। তাতে যেই বিধান-বচনের এই আধখানা চোখে পড়েছে—'নেত্ররোগ সমুৎপন্নে কর্ণৌছিত্ত্বা কটিং দহেৎ'—নেত্ররোগ হলে রোগীর দুই কান কেটে তাঁর কটিতে তপ্ত লোহার ছেঁকা দিবে—অমনি তিনি নেত্ররোগীকে বললেন, "এখনি বাড়ি গিয়ে, এক ধারালো ক্ষুর দিয়ে নিজের দুই কান কেটে ফেলবে, তারপর তোমার দুই পাছাতে জ্বলন্ত লোহার ছেঁকা দেবে, তাতেই চোখের রোগ সেরে যাবে।"

নেত্ররোগীর অসহ্য চোখের কষ্ট। আর, স্বয়ং রাজবৈদ্য বিধান দিয়েছেন। সে অন্য কোনো কিছু না ভেবে বাড়ি গিয়ে নির্দেশমতো কাজ করল। কিন্তু তাতে হলো উল্টো উৎপত্তি। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে বৈদ্যের কাছে ছুটল। বলল, "হে বৈদ্যপুত্র, আমার এ কী হল? আমি চোখের জালায় মরি, আবার কানের ও পাছার জ্বালায় মরি।" বৈদ্যপুত্র বললেন, "আমি কি করব

বলো ? শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়েছি। এখন কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু দুঃখ বিনা সুখলাভ নহে এ জগতে।”

রোগী ও বৈদ্যের কথাবার্তা হচ্ছে, তার মধ্যে সত্যকার ভালো এক বৈদ্য এসে উপস্থিত। তিনি 'যমসহোদর' রামকুমারের বিধানের কথা শুনে বললেন, “ওরে বেল্লিক, এ কী সর্বনাশ করেছিস ? রোগীটাকে খুন করলি ? আধখানা পড়ে বিধান দিলি ? বাকি আধখানায় যে লেখা আছে, ওই চিকিৎসা ঘোড়ার জন্য, মানুষের জন্য নয়।”[৪৩]

সুখের কথা, গল্পটিতে পাচ্ছি, উত্তম বৈদ্যের চিকিৎসায় রোগী সেরেছিল। তবে কাটা কান ফিরে পেয়েছিল কিনা, তার সংবাদ নেই।

আগেই বলেছি, বড়দের মজলিশে কথা বলবার সময়ে বিদ্যাসাগরের মুখের আড় থাকত না। মুখ কতখানি আলগা করতেন, ঠিক বলতে পারব না, তবে তাঁর লেখা গল্প থেকে খানিক আঁচ পাওয়া যায়। অথচ লেখার সময়ে একটু ভব্যসভ্য করে নিতেই হয়।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি আর ন্যায়ের পণ্ডিতদের উপর হাড়ে চটা ছিলেন। স্মৃতির পণ্ডিতরা বিধান দেন—সেই বিধানের পাকে মানুষের গোটা জীবন জড়ানো। বিবেকানন্দের ব্যঙ্গ এখানে মনে পড়বে—“আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে ? ১৪ বার হাতে-মাটি না-করলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ ?” আর ন্যায়ের পণ্ডিতরা কেবল চুলচেরা বুদ্ধির তর্ক করে খাচ্ছেন, তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল—যার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই।

স্মৃতি ও ন্যায়ের পণ্ডিতদের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের একটি গল্পে দংশন অপেক্ষা কৌতুকেরই প্রাধান্য। চমৎকার গল্পটি।

এক গ্রামে দুই বিদ্যাবাগীশ ছিলেন। দুজনে সহোদর। জ্যেষ্ঠ স্মার্ত আর কনিষ্ঠ নৈয়ায়িক। একদিন স্মৃতির পণ্ডিত বড়ভাই কি-একটা কাজে বাড়ির বাইরে গেছেন। এমন সময়ে গ্রামের এক সাধারণ মানুষ কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির। সে বড় পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে এসেছে বিধান নিতে। ছোটভাই ন্যায়ের পণ্ডিত, বাড়িতে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার রে ? কাঁদছিস কেন ?” সে বলল, “আমার তিন বছরের দৌহিত্র মরেছে। আমি জানতে এসেছি, তাকে পুঁতব, না পোড়াব ?” নৈয়ায়িক যুক্তিতর্ক বোঝে, বিধান দেওয়া তার কাজ নয়। অথচ লোকটিকে ফেরানও যায় না। অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, “তাকে পুঁতে ফেল।” বিধান শুনে লোকটি ফিরছে—পথের মধ্যে স্মৃতির পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা। তিনি লোকটির ওই শোকগ্রস্ত অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হয়েছে রে ? কোথায় গিয়েছিলি ?” সে বলল, “আপনার কাছেই গিয়েছিলুম।” কেন গিয়েছিল, তা শোনার পরে স্মৃতির পণ্ডিত বললেন, “তা ছোটকর্তা কী করতে বলেছে ?”—“উনি পোড়াতে বলেছেন।” বড়ভাই শুনে অবাক। “পোড়াতে বলেছে ? ঠিক

শুনেছিস তো ?”—“হাঁ কর্তা, তাই করতে বলেছেন।” বড়ভাই বললেন, “আরে ও বোধহয় ঠাট্টা করেছে। পোড়াতে হবে না, তুই পুঁতে ফেল গিয়ে।” বাড়ি ফিরে ছোটর উপর বড় ঝেঁঝে পড়লেন, “মূর্খ, তুই বংশের নাম ডোবাবি। পণ্ডিত বংশের ছেলে হয়ে কি করে বললি, তিন বৎসরের ছেলেকে পুঁততে হয় ?” ন্যায়ের পণ্ডিত ছোটভাই মিষ্ট হেসে বললেন, “দাদা রাগো কেন ? ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দ্যাখো। আমি তো সত্যি জানি না, কি করতে হয়—পুঁততে, না পোড়াতে ? এখন বিধান একটা না দিলে কি বংশের মানরক্ষা হবে ? তাই অনেক ভেবেচিন্তে মনে মনে যুক্তিতর্ক করে, পুঁততে বললাম। কারণ ঠিক বিধান যদি পোড়ানো হয় তাহলে পোঁতা থেকে তুলে পোড়াতে পারবে। কিন্তু যদি বিধান হয় পুঁতে ফেলা, তাহলে পোড়ানো হয়ে গেলে কোথায় পোঁতবার জিনিস পাবে বলো ?”[৪৪]

বিদ্যাসাগর অন্য এক নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশ পরিবারের গল্প বলেছেন, যার চার ভাই কিন্তু উপরের বিদ্যাবাগীশ নৈয়ায়িকের মতো সরস বুদ্ধিমান নন। এঁরা সকলেই ‘বিদ্‌কুটে নৈয়ায়িক’। জ্যেষ্ঠের নিজ গ্রামেই চতুষ্পাঠী ছিল। অন্য তিন ভাইয়ের কাছাকাছি তিন গ্রামে চতুষ্পাঠী।

জ্যেষ্ঠের বাড়ির কাছাকাছি একটি ফৌজদারী আদালত। তার সেরেস্তাদার গ্রামেই বাসা বেঁধেছিল। একদিন জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক যখন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছেন তখন দেখেন, ধরাচূড়া পরে কে যেন যাচ্ছে। লোকটি আর কেউ নয়, সেই সেরেস্তাদার, উপযোগী পোশাক পরে আদালতে যাচ্ছে। জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ কিছু সন্দিগ্ধ হলেন—এহেন পোশাক পরা লোকটি কে ? আপরাহ্ণে তিনি পুনশ্চ যখন বাড়ির সামনে ধূমপান করছেন, সেরেস্তাদারকে ফিরতে দেখলেন। দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

এইভাবে তিনদিন সেরেস্তাদারকে বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে দেখে তাঁর মনে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হলো। নানা কূট সন্দেহ কামড়াতে লাগল। “অঙ্গবস্ত্র অঙ্গে, উষ্ণীষ মস্তকে, চর্মপাদুকা চরণে, ঈদৃশ বেশভূষা-বিশিষ্ট ব্যক্তির অস্মদ্ ভবনের সম্মুখ দিয়া প্রত্যহ যাতায়াত, ইহার অভিসন্ধি কি ?” এখন নৈয়ায়িকের উদর তর্কশক্তিতে পরিপূর্ণ। তর্কশক্তিবলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, “ঈদৃশ মনোহর বেশে প্রত্যহ গতায়াত করিবার অভিসন্ধি—লাম্পট্য।” তারপর চিন্তা করতে লাগলেন, লাম্পট্যের স্থান কোথায় ? তা নির্ণয় করতেও বিলম্ব হলো না, কারণ তাঁর আছে “অপ্রতিহত তর্কশক্তি”। সিদ্ধান্ত করলেন—তাঁর বাড়িই লাম্পট্যের স্থল। শেষ প্রশ্ন, লাম্পট্যের লক্ষ্য কে ? এখানেও সিদ্ধান্ত করতে বিলম্ব হয়নি, কারণ—ওই অপ্রতিহত তর্কশক্তি।

চার বিদ্যাবাগীশের চার পত্নী। বিদ্যাবাগীশ চিন্তা করতে লাগলেন, জ্যেষ্ঠা বধূ বৃদ্ধা হয়েছেন, তিনি কখনও ওহেন বেশভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য হতে পারেন না। মধ্যমা তথৈবচ। তাঁকে বাদ দেওয়া যায়।

মূখের কথায় ওকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারব না।"

"তখন জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ যে অদ্ভুত তর্কপরম্পরা দ্বারা, স্বীয় কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সহিত সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হাকিমের গোচর করিলেন।"

হাকিম সেকথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "অন্য কোনো প্রমাণ থাকে তো বলুন, নইলে ওই প্রমাণে লাম্পট্য সিদ্ধ হতে পারে না।"

জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ (ক্রোধে কম্পিতকলেবর): এতেও যদি লাম্পট্য সিদ্ধ না হয় তাহলে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত পুস্তক জলে ফেলে দেওয়া উচিত। ওইসব পুস্তকের আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা চললাম।

তাঁরা চলে গেলেন, পিছনে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন হাকিম-সহ আদালতের বাকি সকল লোক।[৪৫]

আবার আমরা স্মার্ত ও নৈয়ায়িক—এই দুই ভাইয়ের কাহিনীতে প্রবেশ করব। জ্যেষ্ঠ কেনারাম স্মৃতির পণ্ডিত, কনিষ্ঠ কেবলরাম ন্যায়ের পণ্ডিত। এঁরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নবদ্বীপের অধিবাসী।

কোনো কারণে কনিষ্ঠ কেবলরাম জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের উপর ভয়ানক রেগেছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, আমার জ্যেষ্ঠ আমার উপর সর্বপ্রকারে অত্যাচার করছেন। আপনি তাঁকে ডাকিয়ে এনে একটা কিছু বিহিত করুন, নচেৎ আমাকে বাড়িছাড়া হতে হবে। নিতান্ত অসহ্য না হলে আমি মহারাজকে বিরক্ত করতাম না।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সব শুনে বললেন, "ঠিক আছে। আপনি আজ রাজবাটীতে থাকুন। কাল সকালে আপনার জ্যেষ্ঠকে আনবার জন্য আপনার সঙ্গে এক পদাতিককে পাঠাব। আপনি দেখিয়ে দিলে পদাতিক তাঁকে নিয়ে আসবে। ওই সঙ্গে আপনিও আসবেন। যদি আপনার কথা ঠিক হয় তাহলে আপনার জ্যেষ্ঠের সমুচিত শাস্তিবিধান আমি করব।"

পরদিন প্রাতে পদাতিক নিয়ে কেবলরাম নবদ্বীপ অভিমুখে চললেন। পথিমধ্যে পদাতিকের প্রস্রাব পেল। সে একজায়গায় কার্যসমাধা করতে বসে পড়ল। কিন্তু সে যেখানে বসেছে, সেখান থেকে পিছন দিকটা নীচু। কেবলরাম তার দিকে কড়া নজর রেখে চলেছেন। দেখলেন, প্রস্রাব গড়িয়ে পদাতিকের কাছা ভিজিয়ে দিল। নৈয়ায়িক কেবলরাম তাই দেখে চটে অস্থির।

কেবলরাম: অহে পদাতিক, তুমি জলের নিম্নগতির তত্ত্ব জানো না? তুমি মূর্খের শিরোমণি। তোমার দ্বারা আমার কাজ সম্পাদিত হবে না। তুমি কি করে পদাতিকের কাজ করো বুঝতে পারি না। আমি তোমাকে নিয়ে যাব না।

কেবলরাম রাজদ্বারে ফিরে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, আপনি অন্য পদাতিক দিন। এর কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি, কি তর্কশক্তি নেই। এ অতি অকর্মণ্য। আমার কাজ এর দ্বারা হবে না।"

মহারাজ কেবলরামের মুখে পদাতিকের প্রস্রাবপ্রকরণ শুনে নিয়ে মনে মনে

তৃতীয়া রূপলাবণ্যশালিনী বটে, তবে দুটি কন্যা ও একটি পুত্র প্রসব করে এখন গলিতযৌবনা। বাকি রইলেন কনিষ্ঠা। হাঁ, তিনি পূর্ণযৌবনা, এবং বিলক্ষণ রূপলাবণ্যশালিনী। অতএব তিনিই ওই ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য—অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

সর্বনাশ। বিদ্যাবাগীশের বাড়িতে কেউ একজন লাম্পট্য করে যাবে! বিদ্যাবাগীশ তৎক্ষণাৎ তিন ভাইকে জরুরী পত্র পাঠালেন। ঘোর বিপদ উপস্থিত ; তোমরা পত্রপাঠ চলে আসবে ; কোনোমতে অন্যথা করবে না। তিন ভাই এসে গেলেন। তখন চার নৈয়ায়িকের কমিটি বসল। বড় বিদ্যাবাগীশ আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বিবৃত করলেন, এবং ঘটনাধারা বিশ্লেষণ করে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাও জানালেন। বাকি তিন ভাইয়ের ন্যায়বুদ্ধি জ্যেষ্ঠের সিদ্ধান্তকে অকাট্য মানল। জ্যেষ্ঠ প্রশ্ন করলেন, "এমত অবস্থায় কর্তব্য কি ?" "কনিষ্ঠ, কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া, [যার পত্নী ন্যায়মতে বেহাত হবার সম্ভাবনা] রোষরক্ত নয়নে, উদ্ধত বচনে কহিলেন—"এক্ষণকার কর্তব্য, প্রহার।" জ্যেষ্ঠরা তাতে সম্পূর্ণ সহমত। হাঁ—প্রহার, প্রহার।

একদিন চার ভাই বদ্ধপরিকর হয়ে, লাঠিহাতে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, সেরেস্তাদার এলেই উত্তমমধ্যম। কথামতো কাজ। সেরেস্তাদার সেখানে আসা-মাত্র তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন—"ওরে দুরাত্মা, তোর যেমন আচরণ তেমনই ফলভোগ কর।" চার ভাই লোকটিকে অবিশ্রান্ত লাঠি দিয়ে ঠেঙাতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে সেইস্থানে কিছু ভদ্রলোক এসে পড়াতে সেরেস্তাদার প্রাণে বাঁচল।

সেরেস্তাদার স্বতঃই হাকিমের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। তার মুখে সবকিছু শুনে হাকিম বিদ্যাবাগীশদের আদালতে হাজির করবার জন্য দারোগা পাঠালেন। তাঁরা এলেন।

হাকিম : বিদ্যাবাগীশ মহাশয়গণ, আপনারা আমার সেরেস্তাদারকে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছেন কেন ?

জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ : লোকটি আমার বাড়িতে লাম্পট্য করেছে।

হাকিম (সন্দিগ্ধভাবে) : লাম্পট্য করেছে আপনার বাড়িতে ? সেরেস্তাদার, তোমার কি বলার আছে বলো।

সেরেস্তাদার (জোড়হাত করে) : ধর্মাবতার, আমি ধর্মপ্রমাণ বলছি, আমি কস্মিন্‌কালেও ওঁদের বাড়িতে প্রবেশ করিনি। গ্রামের যেসব লোক আদালতে উপস্থিত আছেন, তাঁদের আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমি কী চরিত্রের লোক।

হাকিম তখন গ্রামের লোকদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে তাঁরা একবাক্যে বললেন, "বিদ্যাবাগীশ মহাশয়রা যেকথা বলছেন, তা কখনই সম্ভব নয়। সেরেস্তাদারকে আমরা সবিশেষ জানি। উনি সে চরিত্রের লোকই নন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়রা কেন যে ওর উপর দোষারোপ করছেন বুঝতে পারছি না।"

তাদের কথা শুনে হাকিম বিদ্যাবাগীশদের বললেন, "আপনাদের দায় এখন প্রমাণ করা, কিভাবে লোকটি আপনাদের বাড়িতে লাম্পট্য করেছে। শুধু

হাসলেন। তারপর আর এক পদাতিককে নিযুক্ত করে তাকে আড়ালে বলে দিলেন, "যদি প্রস্রাব করতেই হয়, এমন জায়গায় করবে যাতে বিদ্যাবাগীশের চোখে না পড়ে।"

কেবলরাম যখন সেই পদাতিককে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছেছেন তখন জ্যেষ্ঠ কেনারাম স্নান শেষে আহ্নিকে বসেছেন। কেবলরাম পদাতিককে বললেন, "ভোঃ অয়ম।" পদাতিক সংস্কৃতব্যবসায়ী নয়, সুতরাং কেবলরাম কি বলছেন ধরতেই পারল না। কেবলরাম বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমি কেমন পণ্ডিত হে, শব্দপ্রয়োগ করলেও কোন্ ব্যক্তি তা বুঝতে পারো না?" পদাতিক কিছু পরে বুঝতে পারল, যিনি আহ্নিক করছেন তিনি আসামী। পদাতিকের 'ন্যায়'-জ্ঞান নেই, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান ছিল। সে বলল, "উনি আহ্নিক সারুন, তারপর হুকুমজারি করব।" কেবলরাম দারুণ চটে গিয়ে বললেন, "তুমি অতি অকর্মণ্য, তোমার দ্বারাও আমার কাজ হবে না।"

কেবলরাম রাজদ্বারে গিয়ে নিবেদন করলেন, "মহারাজ, এইসব অপদার্থদের দিয়ে আমার কাজ হবে না। আপনি যবন পদাতিক দিন।" মহারাজ ঘটনা শুনে, পণ্ডিতদের পাগলামির ব্যাপার বুঝে, যবন পদাতিক দিতে স্বীকৃত হলেন।

পরদিন সকালে যবন পদাতিকসহ কেবলরাম বাড়িতে পৌঁছে দেখেন, পূর্বদিনের মতোই কেনারাম স্নানান্তে আহ্নিক করছেন। কেবলরাম তাঁর দিকে আঙুল দেখালে পদাতিক কেনারামকে বলল, "ও ঠাকুর, নেমে এসো, এখনই তোমাকে রাজবাড়ি যেতে হবে।" সেকথা গ্রাহ্য না করে কেনারাম আহ্নিক করে যেতে লাগলেন। তা দেখে যবন পদাতিক মুখ ছোটাল। নানা চোস্ত গালাগালির মধ্যে বলল, "ও অমুকের ভাই, ভাল চাস তো নেমে আয়।" সেই সঙ্গে নিজের অভ্যস্ত রীতিতে কেনারামের ভগিনীর সঙ্গে সম্পর্কসূচক অশ্লীল কথাও বলল।

যেই সেকথা কানে গেছে, কেনারাম পণ্ডিত আহ্নিক ছেড়ে উঠে পদাতিককে ঠেঙাতে শুরু করলেন। তা দেখে কেবলরাম মহাব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "কি করো কি করো, রাজার পদাতিককে মারো কেন?"—"মারবো না, বর্বরটা কি বলেছে শুনেছিস?"

কেবলরাম তখন চিন্তা করতে শুরু করলেন। পদাতিকের মুখনিঃসৃত শব্দগুলি মনে আনলেন, এবং "নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের প্রকৃতিসিদ্ধ অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে" শব্দগুলির অন্বয়যোজনা ও অর্থবোধ করলেন। আর তখনই অগ্নিশর্মা। তাঁদের বাড়িতে আছেন শুদ্ধশীলা বিধবা ভগিনী ব্রজেশ্বরী। "অরে দুরাত্মন্, নিরপরাধা ব্রজেশ্বরীর উপর তোর এই আক্রমণ?" কেবলরামও দাদার সঙ্গে পদাতিককে পেটানো শুরু করলেন।

পদাতিক নিরুপায় হয়ে, আরও অশ্লীলবাক্য বর্ষণসহ বিদ্যাবাগীশদের মুখে থুতু ছিটোতে লাগল। স্মার্ত বড়ভাই যবন-থুতুর স্পর্শে জাত যাবে

বলে সরে গেলেন। নৈয়ায়িক কেবলরামও প্রহারকর্মে বিরত হলেন। আর পদাতিক দুই ভাইয়ের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে প্রস্থান করল।

দুই ভাই তখন কুণ্ঠিত লজ্জিত মুখে ব্রজেশ্বরীর কাছে উপস্থিত হলেন। ব্রজেশ্বরী অন্নপাক করছিলেন।

কেবলরাম: ভগিনি, যবনান্ত হইয়াছে। আপাতত স্নান ও বস্ত্রত্যাগ করো। পরে দাদা যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই, তোমার পাপমোচন হইবেক। এ বলাৎকার তোমার ইচ্ছাকৃত পাপ নহে।[৪৬]

বিদ্যাসাগরের আর একটি গল্প বলেই অধ্যায় শেষ করব। খুবই রসালো গল্প, অন্তরঙ্গ মজলিশে কথ্য। গল্পটি শোনবার পরে অনেকেই "শিমুল গাছ তেল হয়ে গেছে," এই প্রচলিত প্রবাদটি ব্যবহার করবার সময়ে মুখ টিপে হাসবেন।

গল্পটি সরলীকৃত করার দায় নেব না। বিদ্যাসাগরের নিজের ভাষাতেই উপস্থিত করব। বিদ্রূপে কৌতুকে মেশানো চমৎকার তাঁর বর্ণনা।

"কিছুকাল পূর্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে, কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে এক সুপণ্ডিত, অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী প্রত্যহ তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি অবাধে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় গিয়া তদীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে-ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে ওই বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

"একদিন শিরোমণি মহাশয় ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রী-জাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষকীর্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া তাহাকে অনন্তকাল যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলী বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ অতি তীক্ষ্মাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা ব্যভিচারিণীকে সেই ভয়ংকর শাল্মলী বৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া বলে, তুমি জীবদ্দশায় প্রাণাধিকপ্রিয় উপপতিকে নিরতিশয় প্রেমভরে যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করিতে, এক্ষণে এই শাল্মলী বৃক্ষকে উপপতি ভাবিয়া সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করো। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া, বলপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করায়। তাহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে। সে যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতি করুণস্বরে বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া কোনও স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখের অভিলাষে পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে', ইত্যাদি।

"ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শ্রবণে কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই। অতঃপর আর আমি প্রাণান্তেও পরপুরুষে উপগতা হইব না।'

"সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি পূর্ববৎ শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন, কিন্তু অন্যান্য দিবসের মতো তাঁহার চরণসেবার জন্য যথাসময়ে তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

"শিরোমণি মহাশয় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। অবশেষে বিলম্ব দর্শনে অধৈর্য হইয়া, তাঁহার নামগ্রহণপূর্বক বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রুলোচনে, শোকাকুলবচনে কহিলেন, 'প্রভো! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। শিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি। আপনকার চরণসেবা করিতে আর আমার কোনওমতে প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।'

"সেবাদাসীর কথা শুনিয়া পণ্ডিত চূড়ামণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্যমুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি, তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না? আমরা পূর্বাপর যেরূপ বলিয়া আসিয়াছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। শিমুল গাছ পূর্বে ওইরূপ ভয়ঙ্কর ছিল যথার্থ বটে। কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে লৌহময় কণ্টকসকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, শিমুলগাছ তেল হইয়া গিয়াছে। এখন আলিঙ্গন করিলে সর্বশরীর শীতল ও পুলকিত হয়।

"এই বলিয়া অভয়প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে পূর্ববৎ চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।"[৪৭]

কথা-সরিৎ-সাগর

॥ ১ ॥

'উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধেরা' কোথায় গেলেন?—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাস। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, তাই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলার অধিকার আমাদের কারো চেয়ে কম নয়। কোথায় গেলেন একালের সেই বিশাল কথা-সরিৎ-সাগর, যিনি অবিরাম কথা ও কাহিনী শোনাতেন বালক ও বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র, বিখ্যাত ও অখ্যাত—সকলকে। তা শোনাতেন রাজকীয় আসরে, ধনীর বেঠকখানায়, রাস্তার ধারে রকে টুলে বা বেঞ্চিতে বসে, এমন-কি পথ চলতে চলতেও।

তিনি কোথা থেকে ওইসব গল্পকথা সংগ্রহ করতেন?

তাঁর ভাণ্ডার একেবারে ভরা, দ্রৌপদীর অন্নথালের মতোই নিঃশেষিত হবার নয়। তিনি গল্প করতেন নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে, যার বিশাল সঞ্চয় তাঁর ছিল, বাস্তব জগতের মধ্যে সদা বিচরণশীল বলে তার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ত। বিপুল ছিল তাঁর পড়াশোনা; দেশী বিদেশী শাস্ত্র ও সাহিত্য অধিগত করেছেন। অসামান্য তাঁর স্মৃতিশক্তি, সবই মনে রেখেছেন। আর চেয়েছেন, সে-সকলই উজাড় করে দান করতে। তিনি কেবল আমাদের বস্তুদান করেন নি, অকৃপণভাবে বাক্যদানও করেছেন।

তিনি কথা-সরিৎ-সাগর। তিনি বিদ্যা-সাগর।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা ওল্টালে তাঁর কথাকোবিদ চরিত্রের রূপ খানিক ধরা দেবে।

তাঁর একেবারে প্রথম বইয়ের নাম (প্রথম প্রকাশিত বই বলাই ঠিক) বেতাল-পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)। এ বই ২৫টি উপাখ্যানের সমষ্টি। বেতাল ও বিক্রমাদিত্যের ওই কাহিনীগুলি ভারতের সর্বত্র প্রচারিত। এর মূল সোমদেব ভট্টের সুবিশাল কাব্য, কথাসরিৎসাগর। সারা ভারতের নানা ভাষায় এর রূপান্তর হয়েছে। বিদ্যাসাগর যে, কাহিনীগুলির সাহিত্যগুণে মোহিত ছিলেন, এমন নয়। তিনি এর যে-হিন্দী সংস্করণ প্রকাশ করেন ('বেতালপচীসী'), তার ইংরাজি ভূমিকায় বলেছেন: মূল সংস্কৃত রচনায় কোনো শিল্পগুণ নেই, জটপাকানো উদ্ভট সব কাণ্ড, এক-এক সময় ছেলেমানুষি ব্যাপার মনে হয়, ওসব অন্ধকারযুগের সৃষ্টি—তবু অসম্ভব জনপ্রিয়। বাংলা সংস্করণ তৈরি করার সময়ে তিনি হিন্দী রূপের উপরই নির্ভর করেন, কারণ রীতিদুরস্ত সে রচনা, বাগবৈদগ্ধ্যযুক্ত।

বিদ্যাসাগর যতখানি কড়া ভাষায় বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, ততখানি কঠিন কি তাঁর মনোভাব ছিল? অন্তত, রীতিমতো আকর্ষণ না থাকলে তিনি বইটির বাংলা রূপান্তরে হাত দিতেন না। তিনি বুঝেছিলেন,

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছোকরা সাহেব ছাত্ররা ভারতীয় উপাখ্যানের অন্তর্গত বুদ্ধির চতুরালি উপভোগ করবে।

আর, বিদ্যাসাগর কি অন্যত্র এইসব গল্প শোনাতেন না—বিশেষত যখন ছোটদের মহলে থাকতেন?

বেতালপঞ্চবিংশতির উপক্রমণিকার একটি লাইন রীতিমতো উপভোগ্য।—ভোগবতী নগরের প্রতাপশালী রাজা চন্দ্রভানু শিকার করবার জন্য বনে প্রবেশ করে দেখেন, "এক তপস্বী অধঃশিরাঃ, ও বৃক্ষে লম্ববান হইয়া ধূমপান করিতেছেন।" আনন্দদায়ক চিত্র। ধূমপায়ীদের নোবেল পুরস্কার ওই তপস্বীই পাবেন—হেঁটমুণ্ডে ঝুলতে-ঝুলতে ধূমপান—কম কথা নয়।

এই বইয়ের সকল গল্প সরল ভাষায় হাজির করার ইচ্ছা নেই। সংক্ষেপে দুটি তিনটি মজার কাহিনী শোনানো যেতে পারে। চতুর্দশ উপাখ্যানে পাই:

কুসুমাবতী নগরীর রাজার নাম সুবিচার, তাঁর অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা চন্দ্রপ্রভা। চন্দ্রপ্রভার উপবনবিহারের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁর পিতা লোকজন ডাকিয়ে উপবনকে বাসোপযোগী করার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওই উপবনে মনস্বী নামে বিদেশী ব্রাহ্মণকুমার ক্লান্ত হয়ে এক নিকুঞ্জমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাজ-পরিচারকরা তাঁকে দেখতে পায়নি। রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা সখীসঙ্গে উপবনে উপস্থিত হয়ে যেই ব্রাহ্মণকুমারের কাছে গেছেন, অমনি তাঁদের পায়ের শব্দে মনস্বীর ঘুম ভেঙে গেল। রাজকুমারী চোখ খুলেই ছিলেন, ব্রাহ্মণকুমারও চোখ খুললেন—ফলে আহা, চারিচক্ষে মিলন। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ মোহিত ও মূর্ছিত। রাজকুমারীও সাত্ত্বিক ভাবের প্রকোপে কম্পমানা, বিকলিতচিত্তা। ঝঞ্ঝাট দেখে সখীরা পালকি ডাকিয়ে রাজকুমারীকে তাতে তুলে ফিরে গেলেন প্রাসাদে। মনস্বী সেখানেই পড়ে রইলেন—লম্বমান, হতজ্ঞান।

শশী ও ভূদেব নামে দুই ব্রাহ্মণ কামরূপে বিদ্যাশিক্ষা করে (হাঁ অন্য কোথাও নয়—কামরূপে!) ফিরছিলেন। তাঁরা অকুস্থলে হাজির হয়ে অচেতন মনস্বীকে দেখতে পেলেন। শশী, মনস্বীর রোগ ঠিক ধরতে পেরেছিলেন—নির্ঘাত কোনো নায়িকার কটাক্ষশরে কাত হয়েছে। ভূদেব ব্যাপারটা ভালোভাবে জানবার জন্য অনেক চেষ্টা করে মনস্বীর জ্ঞান ফেরালেন। তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। মনস্বী বললেন, মিছিমিছি আমার দুঃখকথা গাইবার দরকার নেই; যিনি দুঃখ দূর করতে পারবেন তাঁকেই বলতে পারি। ভূদেব তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যেভাবে পারি তোমার দুঃখ দূর করব। সেকথা শুনে মনস্বী সব কথা খুলে বললেন। এও জানালেন, রাজ-কুমারীকে না পেলে তাঁর প্রাণত্যাগ অবধারিত।

ভূদেব তখন মনস্বীকে এমন একাক্ষর মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন যার বলে মনস্বী ইচ্ছামতো ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যার রূপ ধরতে পারবেন—আবার পূর্বরূপেও ফিরতে পারবেন। মনস্বীকে ষোল বছরের একটি মনোহারী বধূ সাজিয়ে, ভূদেব নিজে সাজলেন আশী বছরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তারপর উপস্থিত হলেন রাজদ্বারে।

রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যথাবিহিত খাতির করলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও অনেকক্ষণ সময় নিয়ে, অভিধান, ইতিহাস ও মহাকাব্য মন্থন করে, রাজপ্রশস্তি করলেন (গ্রন্থাবলীতে স্মল পাইকায় ২০ লাইন)। তারপর নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গিনী তাঁর পুত্রবধূ। এতদিন বধূ পিত্রালয়ে ছিলেন। তাঁকে আনতে ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন, ভয়ানক কাণ্ড, বাড়ি ফাঁকা, গৃহিণী ও পুত্র মহামারীর ভয়ে পালিয়েছেন। এই অবস্থায় শোকদুঃখে কাতর ব্রাহ্মণ—গৃহিণী ও পুত্রের খোঁজে বেরুবেন, কিন্তু পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে তা করা সম্ভব নয়। একে কোথাও রেখে যাওয়া দরকার। আর রাজভবনের চেয়ে বিশ্বস্ত আশ্রয় কোথায় মিলবে?

রাজা পড়লেন ফাঁপরে। পরের বউ রাখার হ্যাপা অনেক। কিন্তু উপায়ও নেই। স্থির করলেন, মেয়েটিকে রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভার কাছে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। উত্তম প্রস্তাব। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে করতে প্রস্থান করলেন।

রাজকন্যা ব্রাহ্মণবধূকে পেয়ে খুব খুশি। তাকে সহোদরার মতো যত্ন ও স্নেহ করতে লাগলেন। "সর্বদা একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন-আদি দ্বারা পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল। মনস্বী, ক্রমে-ক্রমে রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিল।" এই অবস্থায় সুযোগ বুঝে মনস্বী একদিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রিয় সখি, তুমি রাতদিন কি ভাবো বল তো? কিজন্য তুমি ভেবে ভেবে এত দুর্বল হয়ে পড়ছ?" বধূরূপী মনস্বী এখন রাজকন্যার এমন প্রিয় হয়ে উঠেছেন যে, তাঁর কাছে সকল কথা খুলে বলতে রাজকন্যার বাধল না। প্রাণের কথা বলে ফেলে তিনি একটু স্বস্তি পেলেন। এতদিন বুকের কথা বুকেই চেপে রাখতে হচ্ছিল।

শুনে মনস্বী তো আহ্লাদসাগরে উথালপাথাল। সতৃষ্ণভাবে বললেন, "যদি তোমার প্রার্থিত পুরুষকে হাজির করতে পারি, কী পুরস্কার দেবে বলো?" রাজকুমারী বললেন, "কি আর বলব তোমাকে, তাহলে তোমার শ্রীচরণের চিরদাসী হয়ে যাব।"

এর পর আর বধূ-রূপ রাখা যায় না। জোরালো একাক্ষর মন্ত্র কণ্ঠে আছে। তার তেজে শ্রীযুক্ত মনস্বী আসল রূপ ধরলেন। তারপর উভয়ের যতরকম ভাবের খেলা হওয়া সম্ভব সবই হলো। রাজকুমারী সব ঘটনাই জানলেন। গান্ধর্বমতে বিয়েও হলো। রাজকুমারী যথানিয়মে গর্ভবতী হলেন।

কাহিনীর সুতোয় অতঃপর নতুন পাক। রাজমন্ত্রী রাজাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ জানালেন। রাজকুমারীর মনস্বী-স্বামী পুনশ্চ ব্রাহ্মণবধূরূপ ধরে রাজকুমারীর সঙ্গে মন্ত্রী-বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলেন। সেখানে মন্ত্রী-পুত্র বিস্ফারিত চোখে ব্রাহ্মণ-বধূর রূপলাবণ্য দেখলেন। দেখেই যথানিয়মে প্রাণ যায়-যায়। সেকালে প্রেমব্যাধির বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তেমন গড়ে ওঠেনি। যাইহোক, মন্ত্রী-পুত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর বন্ধু মন্ত্রীকে ব্যাপারটা জানালেন। পুত্রের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মন্ত্রী লজ্জায় মাথা খেয়ে পরের বউটিকে নিজের

বেতালী কাণ্ড এখানেই শেষ হতে পারে না। ভূদেব বাড়ি ফিরলে রাজকুমারীর আদি স্বামী মনস্বী তার দাবি ঘোষণা করল। তার ফলে মনস্বী ও শশীর মধ্যে মহা ঝটাপটি। মনস্বী বললেন, "আমি আগেই রাজকন্যাকে বিয়ে করেছি, আমার দ্বারা তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়েছে।" শশী বললেন, "রাজা সর্বসমক্ষে আমাকে কন্যাদান করেছেন।"

মহাসমস্যা—রাজকন্যা কার ঘরে যাবেন? রাজা বিক্রমাদিত্য মনস্বীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। ফলে, রাজকন্যা ছোট মাপের দ্রৌপদী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

মজার গল্প সন্দেহ নেই। কেবল একটা প্রশ্ন আমাদের মনে থেকে গেছে। বেতালপঞ্চবিংশতিকার মন্ত্রী-পুত্রকে অন্যতম দাবিদার হিসাবে হাজির করলেন না কেন? তাহলে তো আরও জমত। তার দাবির ভিত্তি আছে। রাজা দেশের মালিক। তিনি তো বধূ-মনস্বীকে তার হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছিলেন। রাজ-ইচ্ছা পালিত হলে মনস্বী দ্বৈবত ভূমিকায় সেরা অভিনয় করতেন। পুরুষরূপে রাজকন্যার স্বামী, নারীরূপে মন্ত্রী-পুত্রের স্ত্রী। মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতেরা এখানে একেবারে হুমড়ে পড়তেন।

একবিংশ উপাখ্যানটির দিকে নজর দেওয়া যায়।

জয়স্থল নগরের ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামী। ধর্মাত্মা হলে কি হবে, তিনি চারটি কুপুত্রের জনক। জ্যেষ্ঠ দ্যূতাসক্ত; মধ্যম লম্পট; তৃতীয় নির্লজ্জ; চতুর্থ নাস্তিক। এই চারটি রত্নকে একদিন একত্র করে ব্রাহ্মণ কড়া ভাষায় তিরস্কার করলেন। দ্যূতাসক্ত সম্বন্ধে বললেন: "পাশার নেশায় যে পড়েছে, লক্ষ্মী ভুলেও তার দিকে তাকান না; ধর্মশাস্ত্রে তার সম্বন্ধে লেখা আছে, এমন ব্যক্তির নাক কেটে, গাধার পিঠে চড়িয়ে, দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। দ্যূতাসক্ত কতখানি হিতাহিত বিবেচনারহিত ও ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির, যিনি সাম্রাজ্য এবং ভার্যা হারিয়ে, শেষ পর্যন্ত বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।" লম্পট সম্বন্ধে বললেন: "তেমন মানুষ সুখ ভেবে দুঃখকে আলিঙ্গন করে; ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টায় সর্বস্বান্ত হয়; শেষে চোর-ছ্যাঁচড় হয়ে দাঁড়ায়; তার আচার, বিচার, নিয়ম, ধর্ম, সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়।" নির্লজ্জ সম্বন্ধে বললেন: "তাকে ভর্ৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া বৃথা; তার লোকনিন্দার ভয় নেই, গর্হিত কাজ করেও নির্বিকার থাকে।" নাস্তিক সম্বন্ধে বললেন: "তার পরকালের ভয় নেই; দেবতা ও গুরুজনে ভক্তিশ্রদ্ধা নেই; বেদাদি শাস্ত্রে আস্থা নেই; অতি পাষণ্ড সে, তার সঙ্গে কথা বললেও ধর্মহানি হয়।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতি যন্ত্রণার সঙ্গে বললেন, "লোকে পুত্রের মঙ্গলকামনায় জপ তপ দান ধ্যান ব্রত উপবাস করে, কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে নিয়ত তোমাদের মৃত্যুকামনা করছি।"

অবশেষে ছেলেগুলির চৈতন্য হল, নিজেদের প্রতি ঘৃণা জন্মাল। তারা

ছেলের জন্য রাজার কাছে চেয়ে বসলেন। রাজা উচিত-মতো রাগারাগি করলেন : ছি ছি, এ কী প্রার্থনা ! স্ত্রী, স্বামীর ধন, তাকে স্বামীর অনুমতি ভিন্ন অন্যের হাতে দেওয়া যায় না ; ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করে আমাকে তার পুত্রবধূর ভার দিয়ে গেছে ; বিশ্বাস নষ্ট করা মহাপাপ ;" ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং হে মন্ত্রী, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত শুনতে হল, কারণ বিরহের চোটে মন্ত্রী-পুত্র মরবেই, তার শোকে মন্ত্রী মরবেই, আর অমন দক্ষ মন্ত্রীর মরণে রাজ্য বেহাল হয়ে পড়বে। অন্য রাজপুরুষরা এসব কথা রাজাকে গুছিয়ে বোঝালেন। তাঁরা ভালো করেই যুক্তি খাড়া করেছিলেন : অনেক দিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দেখা নেই, ফিরে আসবেন বলে মনে হচ্ছে না ; যদি ফিরে আসেনও টাকাকড়ি দিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করা যাবে, ব্রাহ্মণেরা বড়ই অর্থলোভী হন ; আর তাঁর ছেলে যদি বেশি হৈ-চৈ করে, তাহলে তার জন্য অন্য একটা মেয়ে জুটিয়ে দিলেই হবে। রাজা বুঝলেন যে, এই অসৎ পরাদর্শ মেনে না নিয়ে তাঁর উপায় নেই। তিনি বধূ-রূপী মনস্বীকে মন্ত্রী-পুত্রের গলায় ঝুলে পড়বার জন্য অনুরোধ জানালেন। উত্তরে এক দীর্ঘ লেকচার শুনলেন।—"ছি ছি, কি বলছেন আপনি ? রাজাজ্ঞা সর্বথা পালনীয় জানি, কিন্তু বুঝে দেখুন, আমি বিবাহিত নারী, বিবাহিত নারীর পক্ষে পরপুরুষের ভজনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, লোকাচারবিরুদ্ধ, আপনি রাজা হয়ে এমন আজ্ঞা কিভাবে করছেন জানি না ; আমি প্রাণান্তেও পরপুরুষের মুখ দেখব না।" তার সতীত্বের তেজালো বক্তৃতা শুনে রাজা হতভম্ব, প্রায় জড়ীভূত।

মনস্বী দেখলেন, গণ্ডগোল খুব পাকিয়েছে, এখন সরে পড়াই ভালো। পুরুষ-রূপে ফিরে গিয়ে তিনি কৌশলে পলায়ন করলেন। রাজা পড়লেন উভয় সংকটে। একদিকে ব্রাহ্মণ যদি ফিরে আসেন তাহলে তাঁর গচ্ছিত পুত্রবধূ নেই, কি কৈফিয়ত দেবেন তার ? অন্যদিকে ওই পুত্রবধূকে তিনি অন্য এক অতিগর্হিত অনুরোধ জানিয়েছেন, তাও আবার রক্ষিত হয় নি। অন্যায় প্রার্থনা করলাম রাজা হয়ে, তার গ্লানি, অপরপক্ষে সে প্রার্থনা রক্ষিত হলো না, তার লজ্জা।

মনস্বী, ফিরে গিয়ে ভূদেবকে সব কথা বললেন। ভূদেব তা শুনে খুবই বাহবা দিলেন। তারপর নিজের সংগী শশীকে নিজের পুত্র সাজিয়ে রাজার কাছে হাজির হয়ে বললেন, "মহারাজ, আমি ছেলেকে পেয়েছি, এবার পুত্রবধূকে আপনার হেফাজত থেকে ফেরত দিন, দুজনকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই।" রাজার শোচনীয় অবস্থা। ভয়ে লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে ব্রাহ্মণকে বললেন, "বধূ নেই। না-জানি কোথায় পালিয়েছে।" এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের তূণে যে সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রটি আছে, তা হলো ব্রহ্মশাপ। ভূদেব সেটি উঁচিয়ে ধরলেন, আর রাজা যতপ্রকার স্তুতি ও মিনতি করা সম্ভব, সবই করলেন। শেষে বললেন, "এক্ষেত্রে অপকারের প্রতিবিধানে আপনি যা চান, তাই করব।" ভূদেব বললেন, "আমি একমাত্র ক্ষমা করতে পারি যদি আপনি আমার পুত্রের সংগে আপনার কন্যার বিয়ে দেন।" ভয়ের চোটে রাজা তাতে রাজি হয়ে গেলেন। শশীর সংগে রাজকন্যার বিয়ে হয়েও গেল। ভূদেব তাদের নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে, নানা দেশ ঘুরে, নানা বিদ্যা অর্জন করল। বাড়ি ফেরার সময়ে দেখল, এক চর্মকার, মৃত ব্যাঘ্রের মাংস ও চর্ম নিয়ে চলে গেল, পড়ে রইল হাড়গুলো।

ছেলেগুলি নিজেদের বিদ্যা ফলাতে এগিয়ে এল। একজন শিখেছিল অস্থিযোজনা বিদ্যা—সে হাড়গুলি জুড়ে বাঘের কঙ্কাল তৈরি করে দিল। দ্বিতীয়জন মাংসযোজনা বিদ্যার দ্বারা কঙ্কালে মাংস দিল। তৃতীয়, চর্মযোজনা বিদ্যার দ্বারা মাংস ঢাকল চামড়ার দ্বারা। এবার দেখা গেল, দিব্যি বাঘের চেহারা। চতুর্থজনের আয়ত্তে ছিল চরম বিদ্যাটি—প্রাণযোজনা। বিদ্যাদানে সে কৃপণ হতে পারে না। বাঘের প্রাণ অবিলম্বে ফিরিয়ে দিল। জ্যান্ত বাঘটি তার কর্তব্যমতো চারটি ভাইকে সাবাড় করল।

এই চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ কে, তা বলতে বিক্রমাদিত্যকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। চতুর্থ ব্যক্তিই সেই গৌরবের অধিকারী।

তৃতীয় যে-উপাখ্যানটিকে নির্বাচন করেছি সেটি বিশুদ্ধ কৌতুকরসের। এটি ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান।

ধর্মপুরের গোবিন্দ নামক ব্রাহ্মণের দুই পুত্র। দুই জনে দুটি বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রতিভাধর। একজন ভোজনবিলাসী, দ্বিতীয়জন শয্যাবিলাসী। ভোজনবিলাসী, অন্নে বা ব্যঞ্জনে সামান্যতম দোষ থাকলে, ব্যাপারটা আপাতত যত দুর্জ্ঞেয়ই হোক, ধরতে পারত। তেমনি শয্যাবিলাসীও শয্যায় দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ধরতে সমর্থ ছিল।

দেশের রাজার কানে দুই ভাইয়ের গুণপনার কথা পোঁছলে, ব্যাপারটার সত্য মিথ্যা পরীক্ষার জন্য তিনি দুইজনকে ডাকিয়ে আনলেন। তারপর ভোজনবিলাসীর জন্য সুদক্ষ পাচকের দ্বারা চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়—সর্বপ্রকার আহার্য তৈরি করালেন। রান্না তৈরি করতে পাচক যত্নের ত্রুটি করে নি। ভোজনবিলাসীকে আহারে ডাক দেওয়া হলো। আসনে বসেই সে উঠে পড়ল। তারপর হাজির হলো রাজার কাছে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, তৃপ্তি করে খাওয়া হয়েছে তো?" ভোজনবিলাসী বলল, "না মহারাজ, খাওয়া হয়নি।" রাজা অবাক হয়ে বললেন, "সেকি, কেন?" সে বলল, "মহারাজ অন্নে মড়ার গন্ধ; বোধ হয় শ্মশানসন্নিহিত কোনো ক্ষেতের চাল রাঁধা হয়েছে।" রাজা ভাবলেন, লোকটার মাথা খারাপ, প্রলাপ বকছে। তবু তিনি গোপনে অনুসন্ধান করবার জন্য ভাণ্ডারীকে আদেশ দিলেন। ভাণ্ডারী অনুসন্ধান করে বলল, "ভোজনবিলাসীর কথা সত্য।" রাজা তখন তারিফ করে বললেন, "তুমি যথার্থই ভোজনবিলাসী।"

এর পর শয্যাবিলাসীর পালা। রাজা, সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়ে, তাকে সেখানে শুতে পাঠালেন। শয্যাবিলাসী খানিক শুয়েই উঠে পড়ল। রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, বিছানায় শুয়ে আমার গা টনটন করছে; বিছানার সাত তলার নীচে একটি ছোট চুল

আছে, সেজন্য ওতে শোয়া সম্ভব নয়।" রাজা একথা শুনে আর বোধহয় চমৎকৃত হলেন না, কবার চমৎকৃত হবেন ? অনুসন্ধানে দেখলেন, শয্যাবিলাসীর কথা সত্য। তখন ভোজনবিলাসী ও শয্যাবিলাসী, দুজনকেই যথোচিত পুরস্কার দিলেন।

বিক্রমাদিত্যের বিচারে, বিলাস-প্রতিযোগিতায় শয্যাবিলাসীই জয়ী। কেন ? তার যুক্তি বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতিতে নেই। আমরাও তা অনুমান করতে সমর্থ নই। আমরা যুগ্ম-বিজয়ী হলেই খুশি হতাম।

॥ ২ ॥

বিদ্যাসাগর তিন খণ্ডে আখ্যানমঞ্জরী রচনা করেন। বিদ্যাসাগর রচনাবলী অনুযায়ী প্রথম খণ্ডে আখ্যানের সংখ্যা ২৩ ; দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৫ ; তৃতীয় খণ্ডে ২১। সর্বমোট ৭৯। এগুলি বেতালপঞ্চবিংশতির মতো কল্পনাশ্রয়ী 'উপাখ্যান' নয়, বাস্তব ঘটনাশ্রয়ী 'আখ্যান'—এবং বিদেশীয় সূত্র থেকে সংকলিত। আখ্যান-গুলিতে মানবচরিত্রের ভালো ও মন্দ দিক দেখানো আছে। উদ্দেশ্য—ছাত্রগণকে উন্নত জীবনে প্রণোদিত করা।

আখ্যানমঞ্জরীর আখ্যানগুলিকে বিদ্যাসাগর আসরে বসে গল্প করার সময়ে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। অধিকাংশই চিত্তাকর্ষক। আমি কয়েকটিকে সংক্ষেপে হাজির করব।

বিদ্যাসাগর ভারতের বৃটিশ শাসনকে তখনকার মতো অন্তত স্থায়ী ব্যবস্থা মেনে নিয়ে, জনস্বার্থে সেই শাসনকে প্রয়োগ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, একথা আমরা জানি। কিন্তু তিনি সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের কুকীর্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, এমন নয়। আখ্যানমঞ্জরীর দুটি কাহিনীতে তার প্রমাণ আছে। একটির নাম, 'বর্বরজাতির সৌজন্য'।

আখ্যানটিতে দেখা যায়, একবার আমেরিকার এক আদিম অধিবাসী শিকারের চেষ্টায় সারাদিন বনে ঘুরে, সন্ধ্যাবেলায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, এক য়ুরোপীয়ের বাসস্থানে হাজির হন। য়ুরোপীয়টির কাছে তিনি কিছু আহার দিয়ে প্রাণরক্ষা করার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। য়ুরোপীয় লোকটি তাঁকে কোনো আহার্য তো নয়ই, সামান্য জল পর্যন্ত দেয়নি, উপরন্তু যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে বিতাড়িত করে। এই ঘটনার ৬ মাস পরে উক্ত 'য়ুরোপীয় মহাপুরুষ' সঙ্গীদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে, গভীর বনে প্রবেশ করে, দলছাড়া হয়ে যায়, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ যায়-যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় বন থেকে বেরুবার পথ খুঁজে না পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চীৎকার করতে করতে দ্রুত চলতে থাকে। ভাগ্যক্রমে সে এক আদিমনিবাসীর পর্ণশালা দেখতে পায়। গৃহকর্তা তাকে সে রাত্রিতে বন থেকে বেরুতে দেন নি, রাত্রির আহার ও আশ্রয়ের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছিলেন। পরদিন সকালে তিনি য়ুরোপীয় লোকটিকে নিরাপদে পোঁছবার পথ দেখিয়ে দিলেন। বিদায় নেবার সময়ে বলেন, আপনি আমাকে

চিনতে পারছেন কি ? য়ুরোপীয় লোকটি চক্ষুষ্মান হয়ে, চিনতে পেরে, অগত্যা অধোবদন হলো।

"তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি ; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্‌ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে আপনকার প্রতি আমার বক্তব্য এই, যে-অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া আপনকার আলয়ে উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ; তাহা না করিয়া তেমন অবস্থায় অবমাননাপূর্বক তাড়াইয়া দিবেন না। এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া, সে প্রস্থান করিল।"

এই জাতীয় দ্বিতীয় আখ্যানের নাম, 'চাতুরীর প্রতিফল'। চাতুরী য়ুরোপীয় বণিকদের, প্রতিফলও পেয়েছিল তারাই।

আমেরিকার মিশৌরী নদীর তীরে আগে য়ুরোপীয়দের বিশেষ যাতায়াত ছিল না। একবার এক য়ুরোপীয় বণিক সেখানে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে অনেক বন্দুক ও বারুদ ছিল। সেগুলির ব্যবহার সে আদিম অধিবাসীদের শিখিয়ে দেয়, এবং তারাও বন্দুকের দ্বারা শিকারের সুবিধা দেখে সেগুলি কিনে নেয়। বণিকটি অনেক মুনাফা করে দেশে ফেরে।

কিছুদিন পরে অন্য এক ফরাসি বণিক বারুদের ব্যবসা করতে একই জায়গায় পৌঁছয়। কিন্তু আদিম অধিবাসীরা আগে-কেনা বারুদ ফুরোয়নি বলে আর কিনতে রাজি হয়নি। ফরাসি বণিক তখন ধাপ্পা দিয়ে বারুদ বেচল। সে বলেছিল, বারুদ হলো একপ্রকার শস্য, তা মাটিতে পুঁতলে খুব ভালো ফসল হবে। সেও অনেক মুনাফা করে দেশে ফিরল।

আদিম অধিবাসীরা বলা বাহুল্য সেই বারুদ মাটিতে পুঁতে কোনো ফসল পায়নি। তারা বুঝেছিল, তাদের পুরো ঠকানো হয়েছে। ওধারে ফরাসী বণিকটির লোভ কমেনি। সে নিজে ওই জায়গায় যেতে সাহস না করে, নিজের অংশীদারকে পাঠাল নানা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে। তবে বিশেষভাবে সাবধান করে দিল, আদিমরা যেন কদাপি বুঝতে না পারে যে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু যেভাবেই হোক, তারা বুঝতে পেরেছিল, এবং তা যে পেরেছে তারা তা এই বণিকটিকে বুঝতে দেয়নি। গ্রামের মাঝখানে একটি জায়গায় তারা বণিকের মালপত্র নামানোর ব্যবস্থা করল। তারপর যারা এর আগে ঠকেছিল তারা এসে সমস্ত মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। রুষ্ট ফরাসি বণিক আদিমদের অধিপতির কাছে অভিযোগ জানিয়ে প্রতিবিধান চাইল।

"এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া অধিপতি গভীরভাবে এই উত্তর প্রদান করিলেন, আমি অবশ্যই যথার্থ বিচার করিব, এবং তোমাকে তোমার প্রাপ্য দেওয়াইব ; কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। একজন ফরাসি বণিক আমার প্রজাদিগকে পরামর্শ দিয়া বারুদ বপন করাইয়াছে। শস্য জন্মিলেই ওই

বারুদ লইয়া তাহারা মৃগয়া করিতে আরম্ভ করিবে। মৃগয়ালব্ধ যাবতীয় পশুচর্ম তোমাকে তোমার দ্রব্যের বিনিময়ে দেওয়াইব।”

এই ফরাসি বণিকটি অনেক বাকচাতুরী করেও ফল পায়নি। তাকে শাসিয়ে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল। “ফরাসি বণিক বিষণ্ণ হইয়া এই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন, সেবার চাতুরীতে যত লাভ হইয়াছিল, এবার অন্তত তাহার চতুর্গুণ ক্ষতি হইল, এবং চিরকালের জন্য এরূপ লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক আমরা অসভ্য জাতির নিকট বিলক্ষণ নীতিশিক্ষা পাইলাম।”

বহুদিন আমরা ভুগেছি য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী বণিকদের হাতে। হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর তারা। তাদের উপযুক্ত উত্তর আমরা দিতে পারিনি। বিদ্যাসাগরের আখ্যানের কল্যাণে আমরা উক্ত “বর্বরজাতির মানুষ” এবং “আদিম অধিবাসীদের” সঙ্গে একাত্মবোধ করবার সুযোগ পেয়ে, এবং তাদের হাতে “সুসভ্য” শব্দের দাবিদার অতি অসভ্য য়ুরোপীয়দের নাজেহাল হতে দেখে, আমোদ পেয়েছি—হোকগে সে আমোদ অক্ষমের অলস বিলাস।

বিদ্যাসাগর, মানুষের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের আখ্যানও বলেছেন।

ইটালির পেড়ুয়া নগরে থাকতেন সাইরিলো। মানুষটি সুশীল, সচ্চরিত্র, সরল ও ধর্মপরায়ণ। কিন্তু রাত্রে সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে নানা বিপরীত আচরণ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে একবার তাঁর অধ্যাপক মহাশয় কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা করা অসম্ভব বিবেচনা করে সাইরিলো বিষণ্ণ মনে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন সকালে উঠে দেখেন, অদ্ভুত কাণ্ড, সব কটি প্রশ্নের চমৎকার উত্তর লেখা হয়ে তাঁর টেবিলের উপর পড়ে আছে—এবং সবই তাঁর হাতের লেখায়।

এই বিচিত্র ঘটনার কথা সাইরিলো তাঁর অধ্যাপকের কাছে খুলে বলেন। তিনি পরীক্ষা করবার জন্য আরও কঠিন-কঠিন প্রশ্নের উত্তর করতে দিলেন, এবং রাত্রে সাইরিলোর ঘরের আশে-পাশে ঘাপটি মেরে রইলেন। দেখলেন যে, নিদ্রাবস্থাতেই বিছানা থেকে উঠে, প্রদীপ জেবলে লেখাপড়ায় বসে গেছেন—এবং উত্তরগুলি করে ফেলছেন। ব্যাপার দেখে তিনি চমৎকৃত।

নিজের দুই স্বভাবের টানাপোড়েনে অস্থির ও বিষণ্ণ হয়ে, সাইরিলো ধর্মাশ্রমে আশ্রয় নিলেন। সেখানে তাঁর সাধুচরিত্র এবং ধর্মোপদেশ সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করল। কিন্তু সে শ্রদ্ধা শুধু দিনের জন্য। রাত্রের স্বপ্নসঞ্চরণ এবং তারই মধ্যে জঘন্য আচরণ, অশ্লীল কর্কশ বাক্যবর্ষণ, চলতে লাগল। ধর্মাশ্রমের অন্য অধিবাসীরা ফাঁপরে পড়লেন। এক্ষেত্রে উপায়, রাত্রে সাই-রিলোকে দরজা বন্ধ করে আটকে রাখা। কিন্তু তা যে আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ!

সুতরাং দিনের ধর্মাত্মা সাইরিলো রাতের পাপাত্মা হয়েই চললেন। আশ্রম-বাসীরা অন্তরাল থেকে লুকিয়ে সেসব দেখে কখনো কৌতুক, কখনো ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা বোধ করতে লাগলেন। সাইরিলো স্বপ্নাবস্থায় নানা ঘরে ঘুরে নানা

অশালীন আচরণ করতেন, চুরি করে জিনিসপত্র আনতেন, উপাসনাগৃহের জিনিস চুরিও বাদ যায় নি, সেগুলো এনে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখতেন, পরদিন সকালে অন্য আশ্রমবাসীদের ডেকে এনে সেসব দেখাতেন—এবং যখন শুনতেন, তা তাঁরই কীর্তি, তখন অনুতাপের অবধি থাকত না।

চূড়ান্ত ঘটল এক ধর্মপরায়ণা নারীর মৃত্যুর পরে। এই ধনী মহিলার ইচ্ছানুসারে তাঁর সকল মহার্ঘ পরিচ্ছদ ও গহনাদি-সহ তাঁকে ধর্মস্থানে সমাহিত করা হয়েছিল। সমাধিকালে মহিলার জন্য সকলেই শোক করছিলেন—সাইরিলো সর্বাধিক। পরদিন দেখা গেল অদ্ভুত কাণ্ড। মহিলার কবর ও কফিন খোলা, তাঁর দেহ লণ্ডভণ্ড, পোশাক ও অলঙ্কার অপহৃত। মহাপাপের ঘটনা। এমনটি কখনো ওই ধর্মস্থানে হয়নি। সাইরিলো-সহ সকলেই ওই অপকর্মের জন্য দায়ী পাপীকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। কিন্তু ঘরে ফিরে সাইরিলো দেখলেন, অপকর্মের নায়ক অন্য কেউ নন, স্বয়ং তিনি—অপহৃত জিনিসগুলি তাঁর ঘরেই রয়েছে। সাইরিলোর মধ্যে ধার্মিক মানুষটি সকলকে ডেকে এনে, সাইরিলোর মধ্যে পাপী মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখালেন। তাঁর আত্মগ্লানির সীমা রইল না। সকলের বেদনাশ্রুর মধ্যে তিনি ওই ধর্মাশ্রম ত্যাগ করলেন—এবং এমন এক আশ্রমে প্রবেশ করলেন যেখানে রাত্রে দরজা বন্ধ করে রাখা যায়।

বিদ্যাসাগর যে-কাহিনী এখানে বলেছেন, তেমন ব্যাপারের অনেক দৃষ্টান্ত অন্যত্র পাওয়া যায়। জেকিল ও হাইড ব্যাপার তো সুপরিচিত। গল্পটি পড়তে ভালো, তবে সমাপ্তিতে অসন্তোষ থেকে যায়। মানুষের মধ্যে দেবতা ও শয়তানের মারামারি চলছেই, একজন থাকেন আলোকে, অন্যজন অন্ধকারে। কিন্তু অন্ধকারের জীবটিকে কি কেবল দরজা বন্ধ করে আটকে রাখাই ধর্মরক্ষার একমাত্র উপায়? কালোকে শাদা করার কোনো উপায় কি নীতিশাস্ত্রে, ধর্মশাস্ত্রে নেই? মানুষের চরিত্র কি এমন কালো কয়লা, যার মলিনতা যত ধোয়াই যাক, দূর হবে না? বিদ্যাসাগরের গল্পে তার কোনো উত্তর নেই। তাঁর অভিজ্ঞতায় কি কোনো উত্তর ছিল না? কিংবা ওইসব গুরুতর প্রশ্নে তিনি ছাত্রপাঠ্য আখ্যানটিকে ভারগ্রস্ত করতে চান নি? কি জানি!

বিদ্যাসাগর মিথ্যা জুজুর ভয় থেকে বাঁচাবার জন্য আখ্যান পরিবেশনও করেছেন। সেটির নাম, 'অকুতোভয়তা'।

ফরাসি দেশের নামী নারী-কবি দেশুলিয়র, গিয়েছিলেন লুনিবেলের কাউন্ট-ভবনে। কাউন্ট ও তাঁর পত্নী—অতিথির বিশেষ আদরযত্নের পরে বলেন, "আপনি এই ভবনে কোন্ ঘরে থাকবেন, তা ইচ্ছামতো বেছে নিন, কেবল একটি ঘরে নয়, কেননা তাতে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব। যাঁরাই সে ঘরে থেকেছেন, তাঁরাই বিকট শব্দ ও গোলযোগে ভয় পেয়েছেন। ওই ঘরে রাত্রিবাস বাঞ্ছনীয় নয়।"

নারী-কবিটি কিন্তু ভিন্ন ধাতুর। তিনি ওই ঘরেই রাত্রিবাস করতে চাইলেন।

বাড়ির মালিক তাঁকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন। ও-ঘরে থাকলে প্রাণসংশয় পর্যন্ত হতে পারে, এমনও বললেন। কিন্তু মহিলাটি বড়ই 'একগুঁইয়া', তিনি ওই ঘরে থাকতে বদ্ধপরিকর। তাঁর ধারণা, লোকে যেসব ভূতের গল্প বা উপদ্রবের কথা বলে, সে সকল ভ্রান্তিমূলক কুসংস্কারের সৃষ্টি, দুর্বলচিত্ত মানুষেরাই তাতে বিশ্বাস করে। ফলত তাঁকে সিদ্ধান্ত থেকে টলানো গেল না।

নির্দিষ্ট ঘরে রাত্রে পরিচারিকার সঙ্গে প্রবেশ করে তিনি নির্দেশ দিলেন, "দরজা ভালো করে বন্ধ করো, পালঙ্কের শিয়রে একটা বড় বাতি জ্বালিয়ে রাখো।" সেসব কাজ করে পরিচারিকা ত্রস্ত হয়ে প্রস্থান করল। মহিলা বিছানায় শুয়ে, খানিক বই পড়ার পরে, ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিছু পরেই বিকট শব্দ, অবিলম্বে দ্বার উদ্‌ঘাটিত, শোনা গেল পদধ্বনি। দেশুলিয়র ভাবলেন, বাড়ির লোকে যাকে ভূতের কাণ্ড বলে, এ হল তাই। তিনি দৃঢ় গলায় বললেন, "তুমি যেই হও তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি, আমি কিছুতে ভয় পাব না। এই বাড়ির সকলের মনে যেসব অমূলক ভয় ও সংস্কার আছে সেগুলি দূর করার প্রতিজ্ঞা করেছি, তার থেকে আমি সরে যাব না ; ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন শেষ পর্যন্ত দেখব।"

মহিলা তাঁর কথার কোনো মৌখিক উত্তর না পেলেও কার্যে যথেষ্টই পেলেন। মাথার কাছে যে-কাঠের পর্দাটি ছিল তা উল্টে তাঁর মশারির উপর পড়ল, তাতে দারুণ শব্দ হলো। এই অবস্থায় অন্য যে-কারো "বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্যধ্বংস" হতো, কিন্তু ইনি অবিচলিত কণ্ঠে পুনশ্চ বললেন, "তুমি কে, কিজন্য এসেছ বলো ? যাই করো, আমাকে সন্ত্রস্ত করতে পারবে না।" তাঁর ধারণা হয়েছিল, বাড়ির কোনো ভৃত্য এইসব কাণ্ড করছে। ঘরের মধ্যে যে প্রবেশ করেছিল, সে কোনো উত্তর না দিয়ে, জ্বলন্ত বাতির কাছে গিয়ে, বৃহৎ আধার-সুদ্ধ বাতিটিকে উল্টে দিল। ভয়ানক শব্দসহ গোটা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মহিলা তখনও নির্ভয়। তারপর সেই রাত্রিচর হাজির হলো পালঙ্কের কাছে। মহিলা অকম্পিত গলায় বললেন, "ভালো, তুমি কি পদার্থ তা এখনি নির্ণয় করতে পারব।" এই বলে তিনি বিছানার তলার দিক হাতড়াতে লাগলেন। মখমলের মতো দুই কোমল কানে তাঁর হাত লাগল। তিনি জোরসে কানদুটি পাকড়ালেন। কার কান বুঝতে না পেরে স্থির করলেন, সকাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি কান দুটি ছাড়বেন না।

আলো ফুটলে দেখলেন, তিনি একটি মস্ত কুকুরের কান ধরে আছেন। ব্যাপার বুঝে হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর নিশ্চিন্তে বিছানায় শুলেন, অবশিষ্ট সময় ঘুমোবার জন্য।

ওধারে মহিলা-কবির গোঁয়ার্তুমির পাল্লায় পড়ে কাউন্ট ও কাউন্ট-গৃহিণীর সারারাত ঘুম হয়নি। মহিলাটি যখন রাত্রিবেলায় ভয়ের চোটে চেঁচামেচি করে বেরিয়ে আসেন নি, তাহলে নির্ঘাত আতঙ্কে মারা গেছেন। সর্বনাশ হয়েছে। সকালে কি করে ভূতের ঘরে তাঁরা ঢুকবেন, কোন্ ভয়াবহ দৃশ্য দেখবেন, এই

দুশ্চিন্তাকে ঠেলে ফেলে অবশেষে তাঁরা ঘরে প্রবেশ করলেন—আর দেশুলিয়র সহাস্যে বেরিয়ে এলেন মশারি সরিয়ে। যাই হোক, মহিলা বেঁচে আছেন, এই স্বস্তিবোধ করে তাঁর রাত্রির ঘটনা শুনতে চাইলেন। বর্ণনার গোড়ার দিক শুনে তাঁদের হৃৎকম্প হতে লাগল। শেষে আসল ব্যাপার শুনে একেবারে চমৎকৃত। মহিলার মুখে কিছু মিষ্টমধুর কথাও তাঁদের শুনতে হলো: “আপনাদের মতো মানুষের কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; লোকে অনেক ব্যাপারের কারণ নির্ণয় করতে না পেরে সে-সবকে অলৌকিক ব্যাপার মনে করে; এইভাবেই যত ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হয়।” তারপর তিনি সন্ধান করে দেখালেন: দরজা চাবিবন্ধ আছে মনে হলেও তার চাবি এত আলগা যে ধাক্কা মারলেই খুলে যায়; কুকুরটি এইভাবে দরজা খুলে, খানিক ঘোরাফেরার পরে, খাটে শুয়ে পড়ে। গতরাত্রেও তাই করতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু কান পাকড়ে তাকে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য দেশুলিয়রের “সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা” সবিশেষ অভিনন্দিত হয়েছিল। এবং দুর্বলা নারীজাতির পক্ষে তিনি এই গৌরবময় প্রশস্তিবাক্য লাভ করেছিলেন:

“ফলত তিনি, স্ত্রীলোক হইয়া, সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষজাতির মধ্যেও সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।”

যে-বিদেশীয় সূত্র থেকে বিদ্যাসাগর এই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন, তার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় বলতে পারব না, উপরে উদ্ধৃত বাক্যটি মূলে ছিল, নাকি বিদ্যাসাগরের যোজনা? ওটি বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা মনে করেই আপাতত খুশি থাকতে চাইছি।

আখ্যানমঞ্জরীর শেষ যে-কাহিনীটি উপস্থিত করছি তার নাম “শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল”। অন্যায়ের প্রতিফল পাওয়ার উপভোগ্য আখ্যান।

এক দরিদ্র কৃষক টস্কানির অধীশ্বর আলেকজান্ডারের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ জানাল।

কৃষক: মহারাজা, আমি একদিন একটি মোহরের থলি পেয়েছিলাম। খুলে দেখি, ৬০টি মোহর আছে। লোকমুখে শুনলাম, থলিটি ফ্রিউলি নামক এক সওদাগরের। তিনি প্রচার করেছেন, যে-ব্যক্তি হারানো থলি নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হবে, তাকে ১০টি মোহর উপহার দেবেন। আমি থলি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি পুরস্কার তো দিলেন না, উপরন্তু আমাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মহারাজা, আপনি এর প্রতিকার করুন।

আলেকজান্ডার ফ্রিউলিকে অবিলম্বে ডাকিয়ে আনালেন।

আলেকজান্ডার (অসন্তুষ্ট স্বরে): তুমি পুরস্কার দেবে বলেছিলে, এখন তা দিতে অস্বীকার করছ কেন?

সওদাগর: মহারাজ, আমি পুরস্কার দেব বলেছিলাম, একথা ঠিক, পুরস্কার দিতে গররাজি নই। কিন্তু এই কৃষককে তা দেওয়া যায় না।

আলেকজান্ডার : কৃষকের অপরাধ ?

সওদাগর : কৃষক নিজেই নিজেকে পুরস্কৃত করেছে।

আলেকজান্ডার : তার অর্থ ?

সওদাগর : মহারাজ, আমি যখন ঘোষণা করি, থলিতে ৬০টি মোহর আছে, তখন বস্তুত তাতে ৭০টি মোহর দিল। কৃষকটি ১০টি মোহর আত্মসাৎ করেছে।

আলেকজান্ডার ব্যাপারটি বুঝলেন।

আলেকজান্ডার : হাঁ, তুমি ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু আমি বুঝেছি, কৃষকটি মিথ্যে বলে নি। আসলে কৃষক যে-থলি পেয়েছে তাতে ৬০টি মোহরই ছিল, আর তোমার থলিতে ছিল ৭০টি। তোমার থলি কৃষক পায় নি।

আলেকজান্ডার সওদাগরের হাত থেকে মোহরের থলি নিয়ে কৃষকের হাতে দিয়ে বললেন, "এ থলি তোমার। তুমি স্বচ্ছন্দে এর ভোগ করো। আর যদি কেউ এই থলি তোমার কাছে দাবি করে, বা এর জন্য তোমার উপর হামলা করে, আমাকে জানিও, আমি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব।"

॥ ৩ ॥

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আমার আদিপর্বের ভালবাসার অন্যতম উৎস যে, 'কথামালা', সেকথা পাঠক একেবারে গোড়াতেই জেনেছেন। এদেশে বিদ্যাসাগর-ভক্ত বিজ্ঞজনেরা আছেন। তাঁরা বিদ্যাসাগরের গুরুতর সামাজিক কাজকর্ম এবং খাড়া ব্যক্তিত্ব কেবল নয়, উৎকৃষ্ট বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-কর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন; উদাহরণ হিসাবে শকুন্তলা ও সীতার বনবাস-এর ছন্দস্পন্দিত গদ্যের উল্লেখ করেন। তাঁদের কথায় আমি একশোবার হাঁ দিয়ে রাখছি। তবে ভালবাসা বড়ো বিষম পদার্থ। তারই প্রকোপে গুরু-জনদের সামনে আমার মুখ ফুটেছে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলছি—আমি সবচেয়ে পছন্দ করি কথামালার গদ্যকে। এমন ছোট-ছোট শব্দে গাঁথা, অর্থবহ, সংহত অথচ স্বচ্ছন্দ গদ্য কদাচিৎ মেলে। সাধু ক্রিয়ার কাঠামোকে নাড়িয়ে চলিত ভাষার প্রাণ ছটফট করে সেখানে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছে। ঈশপীয় গল্পের প্রজ্ঞাগর্ভ রূপ—যার মধ্যে বহু যুগের মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত—বিদ্যাসাগরের কলম ধরে তা বাঙালীর ঘরে উপস্থিত। কঠিন আজ্ঞাকারীর চেনা ভূমিকা ছেড়ে তিনি নেমে পড়েছেন অন্তরঙ্গ উপদেষ্টার হৃদ্য কর্মে। গল্পগুলিতে জ্ঞানের সঙ্গে হাসি আছে। সে বিষয়ে সচেতন থেকে বিদ্যাসাগর কথামালার প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ (১৮৫৬) লিখেছিলেন : "গল্পগুলি অতি মনোহর ; পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে ; এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়।" লক্ষ্য করার বিষয়, স্বয়ং বিদ্যাসাগর 'সদুপদেশ'-কে কথামালার আঙ্গিক না বলে 'আনুষঙ্গিক' বলেছেন।

আমাদের চোখের উপর দিয়ে একাধিক যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, তাদের মৃত্যু-বাহিনীকে নিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে গেছে। যুদ্ধের সকল পক্ষই

স্বর্গের ঈশ্বরকে কনস্‌ক্রিপসন করে এনে নিজেদের বাহিনীতে ঢোকাতে ব্যস্ত—এই অবস্থায় বিধাতার পরিহাসের কথামালা-গল্পটি ভালোই লাগবে। গল্পটির নাম 'সিংহ ও মহিষ'।

"একদা এক সিংহ ও এক মহিষ পিপাসায় কাতর হইয়া এক সময়ে, এক খালে, জলপান করিতে গিয়াছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে, কে আগে জলপান করিবেক, এই বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি বিপক্ষকে অগ্রে জলপান করিতে দিব না। সুতরাং উভয়ের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

"এই সময়ে তাহারা ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মস্তকের উপর উড়িতেছে। দেখিয়া বুঝিতে পারিল, যুদ্ধে যাহার প্রাণত্যাগ হইবেক, তাহার মাংস খাইবেক বলিয়া উহারা উড়িয়া বেড়াইতেছে।

"তখন তাহাদের বুদ্ধির উদয় হইল। এবং পরস্পরে কহিতে লাগিল, আইস ভাই, ক্ষান্ত হই, আর বিবাদে কাজ নাই। অনর্থক বিবাদ করিয়া কাক ও শকুনির আহার হওয়া অপেক্ষা, সুহৃদ্‌ভাবে জলপান করিয়া চলিয়া যাওয়া ভালো।"

দেখা গেল, শেষ সময়ে সুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে ট্রাজেডি রূপান্তরিত হয়েছিল কমেডিতে। কথামালা অনুযায়ী, পশুজগতে এমন ব্যাপার ঘটেছে। ইতিহাস অনুযায়ী, মানবজগতে তা সাধারণত ঘটে না। জগতের সাহিত্যে কমেডি অপেক্ষা ট্রাজেডির আদর বেশি, যেহেতু মানুষ পশুর অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান।

মানুষের উপদেশ মানুষ শোনে না—এক্ষেত্রে যদি সে জন্তুর উপদেশ শোনে, এই ভরসায় বোধহয় ঈশপ-মহাশয় জন্তুদের মধ্যে মানুষের কাজকর্ম ও জ্ঞানগম্যি কিছুটা ঠেসে দিয়ে নানা কাজ করিয়েছেন এবং তাদের দিয়ে কথা বলিয়েছেন। কথামালায় মানুষের সংখ্যা কম। কিন্তু সেই নির্বোধ রাখাল ছেলেটিকে আমরা চিনি, ('রাখাল ও ব্যাঘ্র'), বড়ই কৌতুকপ্রবণ সেই বালক, বড়ো মাপের কৌতুকের লেজ ধরতে গিয়েছিল, প্রায়ই লোকজনকে ডাকত, "তোমরা সকলে ছুটে এসো, আমার পালে বাঘ পড়েছে।" সবাই হাজির হয়ে, বাঘের বদলে তার খিলখিল হাসি উপহার পেত। কিন্তু কাঁহাতক মানুষ কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে এসে এক রাখাল ছোঁড়ার হাসির প্রসাদ নিয়ে ফিরবে? তাই যেদিন সত্যই পালে বাঘ পড়েছিল, সেদিন তারা আসে নি, এবং বাঘের খাবার চোটে রসিক রাখাল ছেলেটির খিলখিল হাসি চিরদিনের জন্য থেমে গিয়েছিল।

কথামালার এমন অনেক গল্পই বাঙালীর জনসংস্কৃতির অংশ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগেও গল্পগুলি মুখে মুখে ফিরত। এখন আর তেমন হচ্ছে

না, যেহেতু জ্ঞানগম্যি, কাণ্ডজ্ঞানের দিক থেকে বাঙালী মুখ ফিরিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতাপূর্বে যাদের জন্ম, তাদের রসসংস্কৃতির মধ্যে কথামালার সমূহ উপাদান ছিল।

একদিন বাঙালী ছাত্ররা পড়ত—"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" ('বাঘ ও বক')—এবং পাঠশেষে সরল উপকারী বকটিকে তারা করুণা করত, যে নির্বোধ বক বাঘের কষ্ট দেখে তার গলার হাড় বার করে দিয়ে পুরস্কার চেয়েছিল। বাঘের এইটুকু মহানুভবতা, সে সুস্থ হয়ে বকের হাড় চিবোয় নি। "পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিবামাত্র, সে [বাঘ] দাঁড় কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, অরে নির্বোধ, তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলি। তুই যে নির্বিঘ্নে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিস, তাহাই ভাগ্য করিয়া না মানিয়া আবার পুরস্কার চাহিতেছিস ? যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা।"

ময়ূরপুচ্ছ পরে কাকের ময়ূর সাজার সাধ দেখে একদা ছাত্ররা যেমন বিতৃষ্ণা বোধ করত, তেমনি খুশি হতো যখন পড়ত—ময়ূরেরা কাকটিকে চিনতে পেরে, ঠুকরে ঠুকরে পুচ্ছগুলি তুলে নিয়ে, দূর করে দিয়েছিল। ('দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ')। অর্থাৎ নিজের অবস্থা বুঝে চলহে বাপু, খালিপকেটে বড়লোকের কাছে ঘেঁষতে গেলে ওই অবস্থাই হবে।

আনন্দদায়ক কাহিনীর পর কাহিনী।

সিংহচর্মাবৃত গর্দভও ভেবেছিল, তার এই নবরূপে সে অন্য সকল জন্তুকে ভয় খাওয়াতে পারবে। কিন্তু নিজ অঙ্গ সিংহের চামড়ায় ঢাকলে কি হবে, তার গলায় যে গাধার ডাক। সে চালাকি ধরে ফেলতে শৃগালের দেরী হয় নি। ('সিংহচর্মাবৃত গর্দভ')।

ঈগল হতে গিয়ে এক দাঁড়কাকের আরও দুর্দশা। ('ঈগল ও দাঁড়কাক')। ঈগল ছোঁ মেরে ভেড়া তুলে নিয়ে যায়। দাঁড়কাক ভাবল, আমিই বা কম কিসে ? সেও ছোঁ মারল, এবং ভেড়ার লোমে আটকে গেল। মেষপালকটি ছিল রসিক। সে প্রথমত দাঁড়কাকের পাখা কেটে দিল, তারপর সন্ধ্যার সময় তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ির শিশুরা যখন প্রশ্ন করল, "বাবা, আমাদের জন্য কোন্ পাখি আনলে ?" তখন মেষপালক এই রসপক্ব উত্তরটি দিয়েছিল, "যদি তোমরা উহাকে জিজ্ঞাসা করো, ও বলিবেক, আমি ঈগলপক্ষী ; কিন্তু আমি উহাকে দাঁড়কাক বলিয়া আনিয়াছি।"

বিপদে পড়ে, তার থেকে উদ্ধারের পথ না পেয়ে, বিমূঢ়তার এক ইঁদুরী কাহিনী :

বিড়াল ইঁদুর ধরে খেয়ে খেয়ে ইঁদুরবংশ সাবাড় করে। পরিত্রাণের উপায় চিন্তায় ইঁদুর-সভা বসেছিল। অনেকে অনেক সাজেশন দিল। তার মধ্যে সবচেয়ে কাজের কথা মনে হলো এক বুদ্ধিমান ছোকরা ইঁদুরের পরামর্শ—বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া যাক ; তাহলে বিড়াল কাছাকাছি এলে

ঘণ্টার শব্দে তার আগমন বোঝা যাবে, আর তখনি সরে পড়াও যাবে। বাহবা বাহবা। সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল। কিন্তু বুড়োগুলোর বদ অভ্যাস—খুঁত কাটা। ওই অসাধারণ বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে ফাঁসিয়ে দেবার জন্য এক বুড়ো ইঁদুর প্রশ্ন করেছিল (বুড়োগুলো যৌবনের আপদ), "ভালোই তো পরামর্শ, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাবে কে ?" ('ইঁদুরের পরামর্শ')।

ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের কাহিনী সুপরিচিত। যার সারকথা—আমার দরকার তোকে সাবাড় করা, সেজন্য একগাদা যুক্তিতর্কের দরকার কি ? যদি নেহাতই চাস, যুক্তি একটা দিতে পারব।

সুতরাং পর্বতের উপরে জলপান করার সময়ে বাঘ যখন নীচে একটি মেষশাবককে জলপান করতে দেখল, তখন তাকে মারার অজুহাত হিসাবে এই সুযুক্তি প্রয়োগ করেছিল, "কী আস্পর্ধা তোর, আমি বাঘ, জল খাচ্ছি, আর তুই কিনা সেই জল ঘোলা করছিস ?" মেষশাবক ভেবেছিল, বাঘের বিচারে ভুল আছে, তা দেখিয়ে দিলেই সে পার পেয়ে যাবে। সে তাই সবিনয়ে বলেছিল, "আপনি তো উপরে জলপান করছিলেন, আমি আছি নীচে, আমি কী করে আপনার জল ঘোলা করলাম ?" বাঘ অত্যন্ত বিরক্ত হলো। এই না-হলে ভেড়াচ্ছেলে। ব্যাটা আমার আসল কথাটাই বুঝতে পারছে না। আমি তোকে মেরে খাব, এইটেই তো সবচেয়ে বড় যুক্তি। তবু যেহেতু সে পলিটিশিয়ানের ভূমিকা নিয়ে ফেলেছে, তাই বলল, "হুঁ, তুই ব্যাটা না একবছর আগে আমার নিন্দা করেছিলি ?" মেষশাবক হতবাক। "সে কি মশাই, একবছর আগে যে আমার জন্মই হয় নি।" বাঘের পিত্তি চটে গেল। এই পুঁচকে ভেড়াটা যেন আদালতে আর্গুমেন্ট করছে। একে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বাঘ কড়া গলায় বলল, "তোর যদি জন্ম না হয়, তোর বাপের জন্ম তো হয়েছিল। সেই আমার নিন্দা করেছিল। তার দোষে তুই মর।" ('ব্যাঘ্র ও মেষশাবক')।

কথামালায় শৃগালের ধূর্তামির অনেক কাহিনী আছে, এবং বাঘ ও সিংহের হিংস্র প্রতাপের। গাধার বোকামি, এবং অন্য অনেক প্রাণীর অবোধ অসহায় রূপ দেখা যায়। এই সব প্রাণী সম্বন্ধে সচরাচর প্রচলিত মানবিক ধারণারই প্রতিফলন হয়েছে ওইসব জন্তুর চরিত্রে। জন্তুরা বহুলাংশে মানুষের বিকল্প। বোকা গাধাটির কথাই ধরা যাক।

এক কুক্কুটের সঙ্গে একটি গাধা একজায়গায় থাকত। গাধাটি মোটাসোটা। তাকে দেখে এক সিংহের লোভ জন্মাল। সিংহ আক্রমণে উদ্যত হলে গাধা ভয়ে থরহরি। এমন সময়ে কুক্কুট ডেকে উঠল—কোঁকর-কো। মুরগির ডাক শুনলে সিংহের বিরক্তির সীমা থাকে না। এক্ষেত্রে এত বিরক্ত হলো যে, মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে লাগল। তাই না দেখে গাধা ভাবল, উঃ, আমার কি তেজ, সিংহ আমাকে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে ; যাই ওটাকে গিয়ে ঠেঙাই। সে ছুটল সিংহের পিছনে।

সিংহ আর কতক্ষণ গাধামি সহ্য করে ! এক চাপড়ে গাধাকে নিকেশ করে দিল। ('গদর্ভ, কুক্কুট ও সিংহ')।

বোকামিতে মানুষও কম যায় না। তবে 'সিংহ ও কৃষক' কাহিনীতে মানুষের পরিণতি উপরের গল্পের গাধার পরিণতির মতো শোচনীয় হয় নি।

এক সিংহ কোনো কৃষকের গোলাবাড়িতে প্রবেশ করেছিল। কৃষকটি সিংহকে ধরবার জন্য গোলাবাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। বেরুবার পথ নেই দেখে সিংহ রুদ্র মূর্তি ধরে ভয়ংকর গর্জন করতে লাগল, তৎসহ গো-সংহার। অবস্থা গুরুতর দেখে, কৃষক নিজের অতিবুদ্ধি এবার একটু কমিয়ে, গোলাবাড়ির দরজা খুলে দিল, সিংহও প্রস্থান করল। সিংহের গর্জনাদি শুনে কৃষকের স্ত্রী হাজির হয়েছিল। মহিলার মধুবচনে তার স্বামীর বুদ্ধির চেহারাটা খুলে গেল : "আমি তোমার মতো পাগল কখনও দেখি নাই। যে জন্তুকে দূরে দেখিলে লোকে ভয়ে পলায়ন করে, তুমি সেই দুরন্ত জন্তুকে ধরিবার বাসনা করিয়াছিলে !"

বাংলায় আমরা বাঘকেই ভয়ংকর মনে করি, সিংহকে ততটা নয়, কারণ বাংলা সিংহের দেশ নয়। ঈশপস্ ফেবলস্-এ কিন্তু সিংহই ভয়াবহ অত্যাচারী। ইংরাজি প্রবাদের বাংলা করে 'সিংহ ভাগ' কথাটা আমরা এখন প্রায়ই ব্যবহার করি। এর পিছনের গল্পটি হলো : 'সিংহ, গর্দভ ও শৃগালের শিকার'।

"এক সিংহ, এক গর্দভ, এক শৃগাল—এই তিন মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। শিকার সমাপ্ত হইলে পর, তাহারা যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইয়া ইচ্ছামতো আহার করিবার মানস করিল। সিংহ গর্দভকে ভাগ করিয়া দিতে আজ্ঞা করিল। তদনুসারে গর্দভ তিন ভাগ সমান করিয়া, স্বীয় সহচরদিগকে এক এক ভাগ লইতে বলিল। সিংহ অতিশয় কুপিত হইয়া, নখর প্রহার দ্বারা গর্দভকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

"পরে সিংহ শৃগালকে ভাগ করিতে বলিল। শৃগাল অতি ধূর্ত, গর্দভের ন্যায় নির্বোধ নহে। সে সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সিংহের ভাগে সমুদয় রাখিয়া, আপন ভাগে কিঞ্চিৎমাত্র রাখিল। তখন সিংহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, সখে ! কে তোমায় এরূপ ন্যায্য ভাগ করিতে শিখাইল ? শৃগাল কহিল, যখন গর্দভের দশা স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন আর অপর শিক্ষার কী প্রয়োজন ?"

'সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার' গল্পে জিনিস ভাগ করার দায়িত্ব সিংহ নিজেই নিয়েছিল। সকলে মিলে বড়ো মাপের হরিণ মেরেছিল। সিংহ বলল, "ভাগ করার জন্য তোমাদের খাটতে হবে না, আমিই সে কাজটা করে দিচ্ছি।" এই বলে, সমান অংশে তিনটি ভাগ করল। তারপর বলল, "দ্যাখো, আমি প্রথম ভাগটি নিচ্ছি, কারণ আমি পশুর রাজা ; দ্বিতীয় ভাগটি নিচ্ছি, শিকারে আমার পরিশ্রমের প্রাপ্য রূপে ; আর এই রইল তৃতীয় ভাগ—যদি কারো ক্ষমতা থাকে সে নিক।"

সিংহ যখন বৃদ্ধ তখনো তার ক্ষুধামান্দ্য হয়নি, কেবল ছোটাছুটি করে

শিকারের ক্ষমতা গিয়েছিল। ('পীড়িত সিংহ')। তাই তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ নিতে যেসব জন্তু যেত, তাদের খুব কাছে ডেকে নিয়ে, আপ্যায়ন হিসাবে তাদের স্বাস্থ্য ও শরীর পানাহার করে নিত। একদিন এক শৃগালও সংবাদ নিতে গিয়েছিল। সিংহ নানা মধুঢালা কথায় তাকে কাছে আসতে অনুরোধ জানাল। শৃগাল সেই প্রেমের মরণ-যমুনায় ঝাঁপ দিতে রাজি হয় নি। সে দেখেছিল, সিংহের গুহার দিকে যাওয়ার অনেক পায়ের ছাপ, কিন্তু ফেরার পায়ের ছাপ নেই।

সিংহ যে চাপা ব্যঙ্গ করতে পারে, তার নমুনা আছে 'সিংহ ও নেকড়ে' বাঘ গল্পে।

"একদিন এক নেকড়ে বাঘ খোঁয়াড় হইতে একটি মেষশাবক লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, সিংহ বলপূর্বক ওই মেষশাবক কাড়িয়া লইল। নেকড়ে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে কহিল, এ অতি অবিচার; তুমি অন্যায় করিয়া আমার বস্তু কাড়িয়া লইলে। সিংহ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, তুমি যেরূপ কথা কহিতেছ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি এই মেষশাবক অন্যায় করিয়া আনো নাই— মেষপালক তোমাকে উপহার দিয়াছিল।"

এখানে নেকড়ে বাঘের বিষণ্ণ হাসির কাহিনীটিও শুনে নেওয়া যায়। "এক মেষপালক একটি মেষ কাটিয়া, পাক করিয়া, আত্মীয়দিগের সহিত আহার ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে। এমন সময়ে এক নেকড়ে বাঘ নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সে মেষপালককে মেষের মাংসভক্ষণে আমোদ করিতে দেখিয়া কহিল, 'ভাই হে, যদি আমায় ওই মেষের মাংস খাইতে দেখিতে, তাহা হইলে তুমি কতই হাঙ্গাম করিতে'।" ('মেষপালক ও নেকড়ে বাঘ')।

ব্যাঘ্র অবশ্যই হিংস্র। কিন্তু তাকে সদ্‌গুণে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। তার কণ্ঠে স্বাধীনতার হালুম হুলুম শোনা গেছে। তেমন একটি বাঘ নিয়মিত খাবার জোগাড় করতে না পেরে বড় শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় তার সঙ্গে এক পালিত সুপুষ্ট কুকুরের দেখা হয়। স্বতঃই বাঘটি কুকুরকে তার স্বাস্থ্যসম্পদের হেতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। কুকুর বলেছিল, "এমন স্বাস্থ্যলাভ কোনো ব্যাপারই নয়। আমার কাজ কেবল রাত্রে প্রভুর বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করা। আর তা হলেই ভালোমতো খাবার জুটে যায়। তুমিও চলো না, তোমার জন্য একই ব্যবস্থা করে দেব।" এমন সুযোগ কে ছাড়ে? বাঘ কুকুরের সঙ্গে চলল। কিন্তু কুকুরের ঘাড়ে একটা দাগ। "ও দাগ কিসের ভাই?" কুকুর তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "ও কিছু নয়, গলবন্ধের দাগ।" "গলবন্ধ? গলবন্ধ কেন?" কুকুর জানাল, তার প্রভু দিনের বেলায় তাকে গলায় শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেন, রাত্রে ছেড়ে দেন। বাঘ চমকে বলল, "তার মানে তোমাকে বেঁধে রাখে? তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো না?" কুকুর একটু থতমত খেয়ে বলল, "তা কেন, রাত্রে তো ইচ্ছামতো ঘুরতে পারি।

তাছাড়া দিনের বেলায় কত ভালো খাবার-দাবার ! প্রভুর ভৃত্যরা কেবল নয়, প্রভুও মাঝে মাঝে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। আমি কত সুখে থাকি।"

"বাঘ কহিল, ভাই হে ! তোমার সুখ তোমারই থাকুক, আমার অমন সুখে কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হইয়া, রাজভোগে থাকা অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভালো। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।" ('ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর')।

শৃগাল ও তার ধূর্ততার কথা ইতিমধ্যে অনেকবার এসেছে। এই জীবটি ছাড়া শিশুকাহিনী জমে না। বয়স্করাও জীবটির সঙ্গে অনেক সময় সহমর্মিতা বোধ করেন। তা সত্ত্বেও শৃগাল সম্বন্ধে সহানুভূতির অভাব সাধারণের মধ্যে আছে। তার দুর্দশায় আমোদ হয়।

'কুকুর কুক্কুট ও শৃগাল' গল্পে শৃগালের বজ্জাতির শোচনীয় পরিণাম দেখা যায়। কুকুরের সঙ্গে কুক্কুটের খুব ভাব। একদিন বনের মধ্যে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় কুক্কুট গাছের উপর আশ্রয় নিল, তলায় রইল কুকুরটি। ভোর হতেই কুক্কুট নিজের স্বভাবমতো 'কোঁকর কোঁ' ডাক ছাড়তে লাগল। তা শুনে এক শৃগাল ভাবল, বোকা মুরগীটিকে যদি কবলে আনতে পারি, তাহলে প্রাতরাশ ভালোই হবে। এই ভেবে, যত মিষ্ট তোষামোদ করা সম্ভব তাই করে সে কুক্কুটকে নীচে আসতে বলল : নীচে তারা দুজনে মিলে খুব আমোদ আহ্লাদ করবে। কুক্কুট শৃগালীপ্রেমের রূপ বুঝতে পেরেছিল। সে বলল, "ঠিক আছে ভাই, তুমি একেবারে গাছের তলায় এসে দাঁড়াও, আমি এখনি নামছি।" শৃগাল লোভে পড়ে সেখানে আসতেই ঘাপটি-মেরে-থাকা কুকুরটি তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল।

তাই বলে ধূর্ততার বিষয়ে আমরা সর্বদা বিদ্বিষ্ট থাকতে পারি না, বিশেষত যখন বোকামি পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়। 'শৃগাল ও ছাগল' গল্পের শৃগাল গর্তে পড়েছিল, অনেক চেষ্টাতেও সেখান থেকে উঠতে পারছিল না। এমন সময়ে এক পিপাসার্ত ছাগল গর্তে উঁকি দিয়ে শৃগালকে দেখতে পেয়ে, গর্তের জল সুপেয় সুস্বাদু কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল। শৃগাল যে, গর্তের জল সম্বন্ধে মহাজলায়ন-কাব্য উচ্চারণ করেছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মোহিত ছাগল তার সুবিখ্যাত ছাগবুদ্ধিতে চালিত হয়ে গর্তে ঝাঁপ দিল এবং তার পিঠে ভর করে গর্ত থেকে উঠে পড়বার সময়ে শৃগাল যে-কথা বলেছিল তার জন্য তাকে স্বার্থ-পরতার দোষ দিতে মোটেই ইচ্ছা হয় না।

"শৃগাল···হাসিতে হাসিতে ছাগলকে বলিল, অরে নির্বোধ, তোর দাড়ির পরিমাণ যেরূপ, যদি সেই পরিমাণে তোর বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুই কখনই আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া গর্তে পড়িতিস না।"

শৃগালের আর একটি বুদ্ধির কাহিনী, 'কাক ও শৃগাল !'

একবার একটি কাক মাংসখণ্ড জোগাড় করতে পেরেছিল। গাছের ডালে বসে সেটি খাবার উদ্যোগ করছে—সেই সময়ে গাছের তলা দিয়ে শৃগাল যাচ্ছিল। মাংসখণ্ড দেখে সে ভাবল, ওটি আমারই আহার্য হওয়া উচিত ; এখন বোকা

কাকের কাছ থেকে ওটি আদায় করার ফিকির করা যাক। এই ভেবে নিয়ে সে কাকের গুণগান করতে শুরু করল : "ভাই কাক, তোমার মতো সর্বাঙ্গসুন্দর পাখি আমি জন্মে দেখি নি। আহা, কি তোমার রূপ! আহা, কেমন পাখা! কেমন চোখ! কেমন ঘাড়! কেমন বুক! কেমন নখ! মরি মরি! কেবল দুঃখ এই, তুমি বোবা।" কাক ভাবল, বাহারে বাহা, শৃগালটা তো ঠিকই বলেছে—সত্যি আমার রূপের সীমা নেই। তবে ও ভুল করে ভেবেছে, আমি বোবা। এখন যদি গলা খেলাই তাহলে ও একেবারে মোহিত হয়ে যাবে। ওকে একটু কাক-গলায় গান শোনাই। এই বলে যেমনি সে মুখ ফাঁক করে গলা খেলাতে শুরু করল, অমনি মাংসখণ্ডটি মুখ থেকে খসে নীচে পড়ে গেল। বলাবহুল্য, শৃগাল মাংস-খণ্ড পাবার পরে আর কাকোয়াতি শোনার জন্য অপেক্ষা করে নি।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৃগালের অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি পড়লেই আমরা খুশি হই। পরের খরচে হাসবার সময়ে সকলেই ভুলে যায়, তার খরচেও অপরে হাসতে পারে!

শৃগাল নিমন্ত্রণ করেছিল সারসকে। মজা করবার জন্য থালায় ঝোল ঢেলে খেতে দিয়েছিল। সারসের সরু ঠোঁট। সেজন্য সেই ঝোল খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। শৃগাল দিব্যি চেটেপুটে খেল। এখন, প্রতিনিমন্ত্রণ ভদ্রতা-সম্মত। সারস শৃগালকে নিমন্ত্রণ জানাল। শৃগাল মহা আহ্লাদে হাজির হলে সারস একটা গলা-সরু পাত্রে তাকে খেতে দিল। সারস যখন তার মধ্যে ঠোট ঢুকিয়ে দিব্যি খাচ্ছে, তখন শৃগালকে পেটের জ্বালায় পাত্রটির গা চেটেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। ('শৃগাল ও সারস')।

কিছুতেই মচকাবো না—শৃগালের এই জীবনদর্শন যেসব কাহিনীতে আছে তা আমাদের মনকে ব্যঙ্গরসে ভরিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে দুটি গল্প বিখ্যাত—তার প্রথমটি, 'লাঙ্গুলহীন শৃগাল'।

এক শৃগাল ফাঁদে ধরা পড়লে ব্যাধ তার লেজ কেটে ছেড়ে দিয়েছিল। বেচারার মরণাধিক অপমান। লেজ হল মর্যাদার প্রতীক। আত্মহত্যা করতে যায়-যায়, এমন সময় তার মাথায় মতলব খেলল—বাকি শৃগালদের কথায় ভুলিয়ে যদি লেজ কাটিয়ে ফেলতে পারি তাহলে লাঙ্গুলহীন শৃগালজাতির সৃষ্টি হবে, সেক্ষেত্রে অপমান বোধ করার অবকাশই থাকবে না। এই ভেবে সে সকল শৃগালকে ডেকে বোঝাতে লাগল, "দ্যাখো ভাই, আমার নতুন রূপ, দ্যাখো! আগে আমার লেজ ছিল, কী ভারী! তা কেটে ফেলে কত স্বচ্ছন্দ শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লেজ থাকলে কী কদর্য দেখায়, পদে পদে অসুবিধা হয়। আমি তোমাদের উপকারের জন্য নিজের লেজ কেটে আদর্শ স্থাপন করেছি। তোমরা আমার মতো লেজ কেটে ফেলে সৌন্দর্য বাড়াও, যৎপরোনাস্তি আরামও বাড়াও।" সর্বরক্ষে এই, শৃগালজাতির মধ্যে বুদ্ধির চর্চা ছিল। এক বৃদ্ধ শৃগাল বলেছিল, "বৎস, তোমার লেজ ফিরে পাবার উপায় থাকলে তুমি কদাচ আমাদের ওই উপদেশ দিতে না।"

দ্বিতীয় গল্পটির ('শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল') বিষয়ে বেশি বলার দরকার নেই, এমনই তা সর্বজনের পরিচিত কাহিনী। অনেক উঁচুতে ঝুলে-থাকা সুপক্ব দ্রাক্ষাফল দেখে শৃগালের লোভ হয়েছিল। বহু লম্ফ-ঝম্পের পরেও সে যখন সেখানে পোঁছতে পারল না, তখন নিজের ব্যর্থতার সাফাই গেয়েছিল এই বলে, "দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।" ব্যর্থ লোভীর এই বিষণ্ণ বৈরাগ্যবচনটি পৃথিবীখ্যাত।

শৃগাল তাই বলে সর্বদা সহানুভূতিহীন নয়। তৎপর বাক্যে তার দক্ষতা মাঝে মাঝে সুখদায়ক। যেমন, 'শৃগাল ও কৃষক' গল্পে দেখি : ব্যাধ ও কুকুরের তাড়ায় পালাতে পালাতে এক শৃগাল এক কৃষকের কাছে আশ্রয় চাইল। কৃষক তাকে অভয় দিয়ে তার কুটীরের ভিতরে থাকতে বলেছিল। শৃগাল তাই করল। তারপর ব্যাধরা সেখানে এসে যখন শৃগালটি কোথায় গেছে জিজ্ঞাসা করল, কৃষক নিজের কুটীরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। শৃগালের সৌভাগ্যবশত ব্যাধরা আঙুলের ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে অন্যদিকে চলে গেল। শৃগাল তারপর কুটীর থেকে বেরিয়ে চুপচাপ চলে যাচ্ছে—কৃষক তাকে তিরস্কার করে বলল :

"ভালো হে ভালো, আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচালাম, আর তুমি আমাকে বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়ে চলে যাচ্ছ, আচ্ছা অভদ্র তো।"

"শৃগাল কহিল, ভাই হে! তুমি কথায় যেমন ভদ্রতা করিয়াছিলে, যদি অঙ্গুলিতেও সেইরূপ ভদ্রতা করিতে, তাহা হইলে আমিও তোমার নিকট বিদায় না লইয়া কদাচ কুটীর হইতে চলিয়া যাইতাম না।"

অতি বুদ্ধির বলদীয় কাহিনী আছে।

এক লবণ ব্যবসায়ী সস্তায় মাল পেয়ে তার পালিত ভারবাহী বলদের ঘাড়ে অতিরিক্ত লবণের বস্তা চাপিয়েছিল। বেচারা বলদ খুবই কষ্টে পড়ল। কি ক'রে ভার কমানো যায় সে বিষয়ে মতলব ভেঁজে, সাঁকোর উপর দিয়ে যাবার সময়ে ইচ্ছা করে নালার জলে পড়ে গেল। তাতে লবণ গলে গিয়ে তার ভার খানিক লাঘব হলো। পরে আরও একদিন মালিক বলদের উপরে বেশি মাল চাপালে সেদিনও সে একই কৌশলে জলে পড়ে ভার কমাল। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল মালিক। বলদের চেয়ে কখনো কখনো মানুষের বুদ্ধি একটু বেশি হয়! মালিক বলদের পিঠে চাপাল তুলোর বস্তা। বলদ পূর্ব বুদ্ধিমতো নালায় ঝাঁপাল। অন্যান্য বার মালিক লবণ গলে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলদকে জল থেকে তুলত। এবার যথেষ্ট দেরী করল, যাতে তুলো ভালোভাবে ভিজে দারুণ-রকম ভারী হয়ে ওঠে। সেই দ্বিগুণ ভারী বস্তা টেনে চলবার সময়ে বলদটি নিজের অতিবুদ্ধির খেসারত দিতে লাগল। ('লবণবাহী বলদ')।

বলদের বিপাকে হাসতে গিয়েও কিন্তু হঠাৎ থেমে যেতে হয়। যে-ব্যবসায়ী অতিরিক্ত ভার বলদের উপর চাপিয়েছিল, সে কেন তারিফ পাবে !!

জ্ঞানে ও হাসিতে কথামালার গল্পগুলি এমনই মাখামাখি যে, কোনটা রাখব

কোনটা বাদ দেব, ঠিক করা শক্ত। যেমন, ধরা যাক, এক কুকুরে-কামড়ানো লোকের কাহিনী। লোকটি ভয় পেয়ে যাকেই দ্যাখে তাকেই নিরাময়ের ওষুধ বাতলাতে বলে। শেষে একজন সুনিশ্চিত বিধান দিল—এক টুকরো রুটি নিয়ে সেটি কুকুর-ক্ষত জায়গার রক্তে ডুবিয়ে যে-কুকুর কামড়েছে তাকে খেতে দিলেই সব সেরে যাবে। এই শুনে, কামড়ানোর জ্বালা সত্ত্বেও লোকটি হেসে ফেলেছিল। সে বলেছিল, "বেশ ভালো বলেছ ভাই। আমি তোমার কথামতো কাজ করি, আর রক্তমাখা রুটির লোভে এই নগরের যত কুকুর আছে সকলে আমাকে কামড়াতে থাকুক!" ('কুকুরদষ্ট মানব')।

'ঘোটকের ছায়া' নিয়ে দুজনের লড়াই ব্যাপারটি মজার। এক ঘোড়া-ব্যবসায়ী পথশ্রান্ত এক ব্যক্তিকে ঘোড়া ভাড়া দিয়েছিল। যে লোকটা ভাড়া করেছে, সে দুপুরে ঘোড়ার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছে, তখন মালিক আপত্তি তুলল, আমি তোমাকে শুধু ঘোড়া ভাড়া দিয়েছি, ঘোড়ার ছায়া নয়। এই নিয়ে দুজনে তুমুল তর্ক-বিতর্ক, শেষে মারামারি। সেই সুযোগে ঘোড়ার মুক্তি—সে ছুটে পালিয়ে গেল।

'জলমগ্ন বালক' গল্পের বিষয়বস্তু নানা আকারে এদেশে প্রচলিত। একটি ছেলে পা হড়কে জলে পড়ে গিয়েছিল। পুকুরপাড় দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, তাকে দেখে বালকটি কাতরস্বরে জল থেকে তুলবার জন্য প্রার্থনা জানাল। লোকটি সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে, উপদেশ দিতে এবং তিরস্কার করতে মুখ ছোটাল। এই তাৎক্ষণিক সংস্কারককে ছেলেটি বলেছিল, "আগে আমাকে উঠিয়ে, পরে ভর্ৎসনা করলে ভালো হয়। নচেৎ আপনার ভর্ৎসনার মধ্যেই আমার প্রাণ যাবে।"

অপরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন, সুবিবেচক মশাটির কথাও আমরা জানি, যে এক ষাঁড়ের শিঙের উপর বসে ভেবেছিল, হয়ত আমার ভারে ষাঁড়ের কষ্ট হচ্ছে। মশা বলেছিল, "ভাই হে, যদি মনে করো তোমার কষ্ট হচ্ছে, তাহলে আমি এখনই উড়ে যাচ্ছি, আমি তোমায় কষ্ট দিতে চাই না।" ষাঁড়ের পক্ষে যতখানি হাসা সম্ভব হেসে সে বলেছিল, "ও হো, তুমি বুঝি আমার শিঙে বসেছ, তা বুঝতেই পারি নি; তোমার থাকা না-থাকা, দুইই আমার পক্ষে সমান।" ('বৃষ ও মশক')।

এর উল্টোদিকে আছে শক্তিমানের খেলা-নামক নিষ্ঠুরতার গল্প। কতকগুলি ছেলে পুকুরে ব্যাঙ ভাসতে দেখে তাদের দিকে ঢিলি ছোঁড়ার খেলা শুরু করেছিল, তাতে কয়েকটি ব্যাঙ মরেও যায়। একটি ব্যাঙ ছেলেদের বলেছিল, ঢেলা ছোঁড়া তোমাদের পক্ষে খেলা, কিন্তু তা আমাদের পক্ষে মরণ-খেলা। ('বালকগণ ও ভেকসমূহ')।

খেতে না দেওয়া নিষ্ঠুরতা, আবার স্বার্থলোভে বেশি খেতে দেওয়াও নিজের পক্ষে ক্ষতিকর—এই নিয়ে দুটি গল্প আছে। ভালোরকম দানাপানি দিয়ে, ঘোড়ার শরীর ঘর্ষণ-মর্দন করলে তার শক্তি বাড়ে, শরীর সুন্দর সুচিক্কণ হয়। এক অশ্বপাল ভেবেছিল, ভালো খেতে দিলে খরচ বেশি, কিন্তু ঘর্ষণে-মর্দনে

খরচ নেই। শেষের কাজটি করলেই ঘোড়া তাজা ঝকঝকে হয়ে যাবে। এই ভেবে সে একদিকে ঘোড়ার খাবার কমাল, অন্যদিকে ঘর্ষণ-মর্দনের পরিমাণ বাড়াল। পেটে খাবার নেই, তার উপর অতিরিক্ত ডলাই-মলাই—ঘোড়া চিঁহি-চিঁহি স্বরে কাতরাতে কাতরাতে বলেছিল, "মহাশয়, যদি সত্যি আমাকে সুশ্রী সবল করতে চান, তাহলে আগে রীতিমতো দানাপানি দিন, তারপর ডলাই-মলাই করুন। শুধু মর্দনে শরীরে জলুষ আসবে না।" ('অশ্ব ও অশ্বপাল')।

এর উল্টোদিকে আছে 'বিধবা ও কুক্কুটী' কাহিনী। এক দরিদ্র মুসলমান বিধবা মুরগী পুষে কায়ক্লেশে দিন কাটাত। তার অন্য মুরগীরা যেখানে মাঝে-মাঝে ডিম দিত, সেখানে একটি মুরগী রোজ ডিম পাড়ত। বুড়ি ভাবল, যদি এর খাওয়ার ধান বাড়িয়ে দিই, তাহলে এ নিশ্চয় রোজ একটার বেশি ডিম দেবে। বুড়ি মুরগীটির খাওয়া বাড়ালো, খেয়ে-দেয়ে তার মেদবৃদ্ধি হতে লাগল, আর তার ডিম পাড়ার সংখ্যা কমতে লাগল—প্রথমে দু'একদিন অন্তর, তারপর একদম বন্ধ। হৃষ্টপুষ্ট মুরগীটির দিকে তাকিয়ে বুড়ির কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করার রইল না।

কৃপণ লোকটিও মাথা চাপড়েছিল। তার কিছু সম্পত্তি ছিল, সেজন্য সর্বদা ভয়ে ভাবনায় থাকত। সে মতলব ঠাওরালো—যদি সবকিছু বেচে সেই টাকায় সোনার তাল তৈরি করে সেটা লুকিয়ে রাখি, তাহলে আর হারাবার ভয় থাকবে না। অভিপ্রায়মতো কাজও করল। তবে ওই সোনার তালটি তার বুকের পাঁজরা—দিনে কয়েকবার গোপন জায়গায় গিয়ে সেটি দেখে না এলে মনে শান্তি থাকত না। তার ওই চুপি চুপি যাওয়া—তার আগে এধার-ওধার চেয়ে নেওয়া—চাকরের চোখে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝে ফেলে, সে সুযোগমতো সোনার তালটি হাতিয়ে সরে পড়ল। কৃপণ যখন তার এই সর্বনাশের কথা জানতে পারল, "তখন সে মাথা কুড়িয়া, চুল ছিঁড়িয়া, হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।" এর পরে অনবদ্য কিছু সরস ব্যঙ্গোক্তি :

"এক প্রতিবেশী তাহাকে শোকে অভিভূত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং সবিশেষ অবগত হইয়া কহিল, 'ভাই, তুমি অকারণে রোদন করিতেছ কেন ? একখণ্ড প্রস্তর ওই স্থানে রাখিয়া দাও। মনে করো, তোমার সোনার তাল পূর্বের মতো পোঁতা আছে। কারণ যখন স্থির করিয়াছিলে ভোগ করিবে না, তখন একতাল সোনা পোঁতা থাকিলেও যে ফল, আর একখান পাথর পোঁতা থাকিলেও সেই ফল।" ('কৃপণ')।

বিখ্যাত গল্প, 'উদর ও অন্য অন্য অবয়ব।' হাত, পা প্রভৃতি অবয়ব কেবল খেটে মরে, সেখানে পেট শুধু বসে-বসে খায়। কী অন্যায়। হাত পায়ের দল একদিন ধর্মঘট করে বসল—না, পেটের জন্য আর আমরা খাদ্যসংগ্রহ করব না। সুতরাং "পা আর আহারস্থানে যায় না ; হাত আর মুখে আহার তুলিয়া দেয় না ; মুখ আর আহার গ্রহণ করে না ; দন্ত আর ভক্ষ্যবস্তুর চর্বণ করে না।" ফল হলো—শরীর ক্রমে শুষ্ক, অবয়বগুলি নিস্তেজ। শেষে তাদের এই জ্ঞানোদয়

হলো, "যদি সুস্থ থাকা আবশ্যক হয়, সকল অবয়বকেই স্ব-স্ব নিয়মিত কর্ম করিতে হইবেক, নতুবা কাহারও ভদ্রস্থতা নাই।"

চমৎকার নাটকীয় কাহিনী—'বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক।' বুদ্ধিমতী বৃদ্ধার কাছে অসৎ চিকিৎসকের পরাজয়ের বিবরণ এতে আছে।

বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি কমে আসছিল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, তিনি কিছুই দেখতে পান না। এক প্রসিদ্ধ কবিরাজের কাছে গিয়ে বললেন, "দেখুন, আমার এমন চোখের দোষ হয়েছে যে, কিছুই দেখতে পাই না। আমার চোখ যদি আপনি ভালো করে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দেব। কিন্তু চোখ ভালো না হলে কিছুই পাবেন না।"

কবিরাজ এই শর্তে রাজি হয়ে পরদিন সকালে বৃদ্ধার বাড়ি গেলেন। গিয়ে দেখেন, বৃদ্ধা খুবই সম্পন্ন, তাঁর ঘর নানা মূল্যবান জিনিসে ভর্তি। কবিরাজ ভাবলেন, ভালো সুযোগ পেলাম ; বৃদ্ধার ঘরভরা জিনিস, সে কিছুই দেখতে পায় না, রোগটাকে যদি ঝুলিয়ে রাখি তাহলে একে একে জিনিসগুলি সরাতে পারব। তাই, ঠিকঠাক ওষুধ না দিয়ে, বৃদ্ধার দৃষ্টিহীনতা বজায় রেখে, কবিরাজ প্রতিদিন জিনিস সরাতে লাগলেন। সবকিছু ফাঁক করার পরে তিনি ভালোমতো চিকিৎসা শুরু করলেন, এবং বৃদ্ধা ক্রমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বৃদ্ধা এখন দেখলেন, ঘর ফাঁকা। খোঁজ নিয়ে জানলেন, তাঁর ঘরের জিনিসে কবিরাজের ঘর ভরেছে।

কবিরাজ চোখ সারানোর জন্য এবার পুরস্কার দাবি করলেন। বৃদ্ধা সে কথায় কানই দিলেন না। বারবার বলা সত্ত্বেও যখন কিছু মিলল না, তখন কবিরাজ হাজির হলেন বিচারালয়ে, বৃদ্ধার বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ দায়ের করলেন। বৃদ্ধাকে সমন দিলেন বিচারপতি। বৃদ্ধা হাজির হলে বিচারপতি অভিযোগের উত্তর দিতে বললেন। বৃদ্ধা উত্তর দিলেন বটে—অতি বুদ্ধিদীপ্ত রসময় সেই উত্তর।

বৃদ্ধা : ধর্মাবতার! কবিরাজ মহাশয় যা বলেছেন তা সত্য। আমি অবশ্যই বলেছিলাম, আমার চোখ যদি পূর্ববৎ হয়, কোনো দোষ না থাকে, তাহলে আমি ওঁকে পুরস্কার দেব। উনি বলছেন, আমার চোখ নির্দোষ হয়েছে, কিন্তু তা হয়নি।

কবিরাজ : ধর্মাবতার, বৃদ্ধা অসত্য বলছেন, ওঁর চোখে আর কোনও দোষ নেই।

বিচারপতি (বৃদ্ধাকে) : আপনি ঠিক করে বলুন, কবিরাজ যে-কথা বলছেন তা সত্য কিনা ?

বৃদ্ধা : না ধর্মাবতার, সত্য নয়। যথার্থই আমার চোখ নির্দোষ হয় নি। কারণ, যখন আমার চোখের দোষ হয় নি, তখন দেখতাম আমার ঘর নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। পরে চোখের দোষ জন্মালে সেসব জিনিস আর দেখতে পাইনি। ওঁর চিকিৎসার পরেও সেসব দেখতে পাচ্ছি না। কি করে বলব বলুন, ওঁর

চিকিৎসায় আমার চোখ পূর্বাবস্থায় ফিরেছে ?

বিচারপতি বৃদ্ধার বর্তমান চোখের দোষ মেনে নিয়ে, অন্যায় অভিযোগ করার জন্য কবিরাজকে কড়া ধমক দিয়ে, ভাগিয়ে দিয়েছিলেন।

"গেয়ে নাও, নেচে নাও, ওরে প্রাণ, যতদিন পারো"—এমন করলে পরের গানের কলি হবে—"মনে করো, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।"

তৃণকীটের দৃষ্টিতে পিপীলিকা বোকা পরিশ্রমী—সে সারা শরৎকাল পরিশ্রম করে শস্যসঞ্চয় করে। শীতকালে পিপীলিকা সেই সঞ্চিত শস্য খায়। মাঝে-মাঝে সেই শস্য শীতের রোদে শুকোয়। তৃণকীটের কিন্তু কোনো সঞ্চয়ই নেই। ফলে শীতকালে খিদের জ্বালায় অস্থির।

তৃণকীট : ভাই পিপীলিকা ! খেতে না পেয়ে আমি মরছি। তোমার সঞ্চয় থেকে তুমি যদি আমাকে কিছু দাও, আমার প্রাণ বাঁচে।

পিপীলিকা : তুমি সমস্ত শরৎকাল ধরে কী করেছিলে ?

তৃণকীট : সত্যি বলছি, আমি ভাই শরৎকালে আলস্যে কাটাই নি।

পিপীলিকা : তুমি কোন্ পরিশ্রম করেছিলে ?

তৃণকীট : আমি শরৎকালে অবিশ্রান্ত গান গেয়েছিলাম।

পিপীলিকা : বেশ বেশ। শরৎকালে তুমি গান গেয়ে কাটিয়েছ ; শীতকালটা নেচে কাটিয়ে দাও। ('পিপীলিকা ও তৃণকীট')।

গল্পটি শিল্পীদের কাছে উপাদেয় ঠেকবে না। তবে তাঁরা এটিকে উপেক্ষাও করতে পারেন। ও-গল্প অন্ধকার যুগের। এই আলোকিত যুগে গানে পয়সা আছে।

'বড়র পিরীতি' এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ—তারই কাহিনী 'মৃন্ময় ও কাংস্যময় পাত্র'।

"এক মৃন্ময়পাত্র ও এক কাংস্যময় পাত্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। কাংস্যপাত্র মৃন্ময়পাত্রকে বলিল, 'অহে মৃন্ময়পাত্র ! তুমি আমার নিকট থাকো, তাহা হইলে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব।' তখন মৃন্ময়পাত্র কহিল, 'তুমি যে এরূপ প্রস্তাব করিলে তাহাতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম। কিন্তু আমি যে-আশঙ্কায় তোমার তফাতে থাকিতেছি, তোমার নিকটে গেলে আমার তাহাই ঘটিবেক। তুমি অনুগ্রহ করিয়া তফাতে থাকিলেই আমার মঙ্গল। কারণ আমরা উভয়ে একত্র হইলে আমারই সর্বনাশ। তোমার আঘাত লাগিলে আমি ভাঙিয়া যাইব।"

'জ্যোতির্বেত্তা' গল্পটি বিদ্যাসাগরের খুবই মনঃপূত। এই ধরনের কথা তিনি বাস্তব জীবনের সমস্যার সম্বন্ধে উদাসীন ধর্মপ্রচারকদের শোনাতেন, তা আমরা এই বইয়ের গোড়ার দিকে দেখিয়েছি। গল্পটি বিদ্যাসাগরের ভাষাতে এই :

"এক জ্যোতির্বেত্তা প্রতিদিন রাত্রিতে নক্ষত্র দর্শন করিতেন। একদিন তিনি আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া নিবিষ্টমনে নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে, পথে চলিয়া যাইতেছিলেন। সম্মুখে এক কূপ ছিল, দেখিতে না পাইয়া তাহাতে পড়িয়া গেলেন। তিনি কূপে পতিত হইয়া, নিতান্ত কাতর স্বরে এই বলিয়া লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, ভাই রে! কে কোথায় আছো, সত্বর আসিয়া, কূপ হইতে উঠাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা করো।

"এক ব্যক্তি নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পড়িয়া যাইবার সমস্ত কারণ জিজ্ঞাসিয়া, সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য! তুমি যে-পথে চলিয়া যাও, সেই পথের কোথায় কি আছে তাহা জানিতে পারো না; কিন্তু আকাশের কোথায় কি আছে তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে!"

'দুঃখী বৃদ্ধ ও যম' গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে গুনগুনিয়ে ওঠে —'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

এক অতি দুঃখী বৃদ্ধ বনে কাঠ কেটে, সেই কাঠ বেচে, জীবিকানির্বাহ করত। তার বড়ো কষ্টের জীবন। একদিন গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলায় সে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বন থেকে ফিরছিল। খিদেয় তার পেট জ্বলছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে, প্রখর রোদে পুড়ছে সারা শরীর, গলগলিয়ে ঘামছে। পথের ধুলো বালি রোদে আগুন। তার উপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। এক সময়ে আর হাঁটতে না পেরে, মাথার বোঝা ফেলে, সে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বসল। গামছা নাড়িয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বলতে লাগল, "আর তো পারি না। এমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই ভালো। আমার মতো হতভাগার কেন যে মরণ হয় না জানি না।" মনের দুঃখে আক্ষেপ করতে করতে সে যমকে ডেকে বলতে লাগল, "যম, তুমি আমাকে ভুলে আছো কেন? শীঘ্র এসে আমাকে নিয়ে যাও। তা হলেই আমার নিষ্কৃতি হয়। এ কষ্ট সহ্য হয় না। যম, এত ডাকছি, তুমি আসছ না কেন?"

যম এলেন। বিকট ভয়ঙ্কর চেহারা। তা দেখে বৃদ্ধ আঁতকে উঠল—"কে, কে তুমি? আমার কাছে কি জন্য এসেছ? কি চাও?"

যম আত্মপরিচয় দিলেন—"আমি স্বয়ং যম। তুমি ডাকছিলে, তাই এসেছি। এখন বলো, কিজন্য ডাকছিলে?"

বৃদ্ধ বলল, "ও, হাঁ, ডাকছিলাম বটে। তা মহাশয়, যদি এসেছেন, একটা উপকার করুন। দয়া করে আমার মাথায় বোঝাটা তুলে দিন। বড্ড ভারি বোঝা ওটা।"

বিদ্যাসাগরের গল্পের শেষ নেই। কথা-সরিৎ-সাগরের ঢেউয়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু আমার এই বই তো আকারে নিরবধি হতে পারে না। তাই একটি ক্ষুদ্র কাহিনী দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করব। কাহিনীটি আমার খুবই প্রিয়।

সেরা রসিকতা হয় আত্মপরিহাসে—তা এখানে আছে। ছদ্ম দুঃখের সঙ্গে কৌতুকের ছটা মিশিয়ে এটি মনোরম।

কাহিনীর নাম, 'টাক ও পরচুলা'।

"এক ব্যক্তির মস্তকের সমুদয় চুল উঠিয়া গিয়াছিল। সকলকার কাছে সেরূপ মাথা দেখাইতে বড় লজ্জা হইত। এজন্য সে সর্বদা পরচুলা পরিয়া থাকিত। একদিন সে তিন চারি জন বন্ধুর সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। ঘোড়া বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, ওই ব্যক্তির পরচুলা বাতাসে উড়িয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেল। সুতরাং তাহার টাক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সহচরেরা এই ব্যাপার দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না। সে ব্যক্তিও তাহাদের সঙ্গে হাস্য করিতে লাগিল, এবং কহিল, যখন আমার নিজের চুল মাথায় রহিল না, তখন পরের চুল আটকাইয়া রাখিতে পারিব, এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়।"

কিংবদন্তীর মৃত্যু—কিংবদন্তী অমর

॥ ১ ॥

বলাবাহুল্য শিরোনামটি—"রাজা-মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে—রাজা মহাশয় দীর্ঘজীবী হউন"—এরই প্রতিধ্বনি।

সন্দেহ না রেখে বলা যায়, সকল বাঙালীর মধ্যে বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় লিজেন্ড বা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে।

কেন ?

কারণ অনেক।

বিদ্যাসাগর নানা কারণে সেকালে এদেশে সবচেয়ে পরিচিত চরিত্র। তাঁর পরিচয় শুধু শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রসারিত ছিল সর্ব-শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। সেকালের বিদেশীয়রাও তাঁকে জানতেন। এই ব্যাপক পরিচিতির কারণ যথেষ্ট। যথা—

তাঁর রচিত বহু রকমের পাঠ্যপুস্তক—বর্ণপরিচয় থেকে বোধোদয়। উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী ও ঋজুপাঠ। বেতালপঞ্চবিংশতি, কথামালা থেকে শকুন্তলা, সীতার বনবাস। আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, বাঙ্গালার ইতিহাস। বাঙালী ছাত্রের পক্ষে বিদ্যাসাগরের 'পাঠ'শালার পড়ুয়া না হয়ে উপায় দিল না।

তিনি সবচেয়ে আলোড়নকারী সমাজসংস্কারে হাত দিয়েছিলেন—বিধবা-বিবাহ। এর দ্বারা নাড়া খেয়েছিল ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালী-সমাজ, যার মধ্যে সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীল দুই শ্রেণীই আছে, এবং পণ্ডিত সমাজ—এবং আপামর জনসাধারণ। অন্তঃপুর পর্যন্ত চঞ্চল হয়েছিল। একদিকে সংস্কার কাজের জন্য তাঁর সম্বন্ধে নারীদের বিরূপতা, অন্যদিকে বঞ্চিত নারীসমাজে জন্য তিনি একক লড়াই করে যাচ্ছেন, সেজন্য তীব্র আকর্ষণ এবং গূঢ় সহমর্মিতা।

বড়ো দুঃখী এই দেশ, অর্থনৈতিক দুর্গতির সীমা নেই। এখানে প্রসারিত ছিল তাঁর উদার সাহায্য ও সেবার হস্ত। দানের মহিমা এদেশীয় ঐতিহ্যে সদাস্বীকৃত।

অন্যায়ে, অবিচারে পূর্ণ দেশে যদি কেউ ও-সকলকে সরাসরি আঘাত করার সাহস ও শক্তি রাখেন, তিনি পৌরাণিক মহাবীরের তুল্য গরিমা পাবেনই। সে গরিমায় সেকালে তাঁর অবিসংবাদিত অধিকার। তাঁর সত্যকথন ও মাতৃভক্তি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাবে।

বিদেশী ম্লেচ্ছ শাসক সম্বন্ধে দেশে একদিকে বিতৃষ্ণা ও ভীতি, তৎসহ হীনমন্যতা ; অন্যদিকে সবিস্ময় সম্ভ্রম। সাহেবদের সামান্য অনুগ্রহে সমাজের মান্যগণ্য অথচ লোভী মানুষগুলি দোদুলকলেবর। এই অবস্থায় সাহেবমহলে তাঁর দারুণ খাতির, সাহেবদের সঙ্গে ব্যবহারে আত্মমর্যাদার ঘোষণা—ফলে তাঁকে ঘিরে জ্যোতির্বলয়।

তাঁর দারুণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। "বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত জগতে।" প্রায়শই নানা চমকপ্রদ, নাটকীয় ঘটনার নায়ক তিনি—জ্যান্ত, জ্বলন্ত, সচল মানুষের যা লক্ষণ।

এমন মানুষকে নিয়ে সত্য-মিথ্যা জড়ানো কাহিনীমালার সৃষ্টি না হয়ে পারে না। এইসব কাহিনী হলো তাঁর বিষয়ে সমষ্টি-সিদ্ধান্ত। 'যা হয়েছে,' তার সঙ্গে 'যা হওয়া উচিত', তারই অভিব্যক্তি।

সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ব্যাপারটির চমৎকার রূপনির্ণয় করেছেন এক রচনায়। তার কিছুটা অনুবাদে এই :

"বিদ্যাসাগরের জীবনকালে তাঁর সম্বন্ধে শত-শত গল্প বাতাসে ভাসত।… এই ধরনের গল্প যে, অপর মানুষ সম্বন্ধে বলা হয়নি বা বানানো হয়নি, এই ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এমন সমস্ত কথা বলবেন বা এমন সমস্ত কাজ করবেন বলে মনে করা হতো, যা অন্য কেউ বলছেন বা করছেন, ভাবাই যেত না। এইসব ভাসমান, সঞ্চরমান কথা-কাহিনীর অতি অল্প অংশই তাঁর জীবনীতে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনীগুলি এমনই সজীব, প্রাণপূর্ণ, গভীর রসময় কিংবা বেদনানিষিক্ত যে, তাদের দ্বারা অনন্য শক্তিধর, অপ্রতিরোধ্য ও চিত্তাকর্ষক এক ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট আকার দর্শন করা যায়।"[১]

রামকৃষ্ণ-জীবনী লিখতে গিয়ে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-বিষয়ে লিজেন্ড সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছেন। তার কিছু কিছু তাঁর বিখ্যাত The Face of Silence ('মৌনের মুখ') বইয়ে পরিবেশনও করেছেন। রামকৃষ্ণ-জীবনীতে সত্য ও কল্পনার যথেচ্ছ মিশ্রণের জন্য তাঁর বইটির বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় কঠোরতম সমালোচনা করা হয়। (A Biographical Fiction: The Face of Silence, PB January 1927)। রামকৃষ্ণ-জীবনের সত্যকাহিনীর পাশে ধনগোপাল-প্রদত্ত কল্পকাহিনীগুলি তুলে ধরে প্রবুদ্ধ ভারত বলেন—ধনগোপালের বই পাঠকের সঙ্গে প্রতারণা, ওকে জীবনী বলা গর্হিত কাজ। 'তথ্যের সত্য চিত্তোন্নতিকর নয়'—ধনগোপালের এই বক্তব্যকে তাঁরা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কল্পনার ধোঁয়া-ভরা সত্যকে কিভাবে খাঁটি সত্যের তীব্র আলো দগ্ধ ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা আমার কাজ নয়, কেবল জানাতে পারি, ধনগোপালের বই পড়েই রোমা রোলাঁ প্রথম রামকৃষ্ণ-জীবনে আগ্রহী হন, এবং তাঁর রচিত দুই চিরায়ত জীবনী 'রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' প্রকাশিত হবার পরে সেগুলি পড়ে ধনগোপাল সোচ্ছ্বাসে রোলাঁকে লিখে পাঠান, "আমি ধন্য—কেননা প্রোমিথিউসকে দিয়েছি অগ্নির সন্ধান।"

লিজেন্ড প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ধনগোপাল তাঁর বইয়ে শ্রীম-কে 'পণ্ডিত' হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁর সঙ্গে ওই প্রসঙ্গে কিছু কথাবার্তার উল্লেখ করেছেন।

এখানেও প্রামাণিকতার কথা তুলব না। উক্ত পণ্ডিত তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ও আশ-পাশের গ্রামে সুপ্রাচীন বৃদ্ধদের কাছে গিয়ে, ছড়িয়ে-থাকা রামকৃষ্ণ-কিংবদন্তী সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। তার আগে উভয়ের সংলাপ :

পণ্ডিত : রামকৃষ্ণ-বিষয়ে তুমি কী জানতে চাও—রামকৃষ্ণের ইতিহাস, নাকি রামকৃষ্ণ-কিংবদন্তী ?

লেখক : আমি সেইটুকু তথ্য জানতে চাই যা আমাকে সকল সম্ভাব্য কিংবদন্তী সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে।

পণ্ডিত (সহর্ষে) : বাঃ বাঃ, বেশ! রামকৃষ্ণ-কিংবদন্তীগুলি সংগ্রহ করে একত্র করা হয় নি। রামকৃষ্ণ-বিষয়ে আমি যেসব প্রামাণ্য ঘটনা লিখেছি তাদের অপেক্ষা কিংবদন্তীগুলির মধ্যে অনেক বেশি সত্য আছে। তথ্য এমনই নিরেট ও নীরস যে, তাদের দ্বারা কেউই উর্ধ্বোত্থিত হয়না।

লেখক (সোচ্চারে) : কিন্তু ইতিহাসের তো খুবই প্রয়োজন, তারাই তো বিশ্বাসযোগ্য!

পণ্ডিত : হাঁ, তারা প্রয়োজনীয়, ঠিকই। কারণ ইতিহাসকে নিয়েই এবং ইতিহাসকে ঘিরেই কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। কিংবদন্তী সৃষ্টিতে কাঁচা মাল হিসাবে ইতিহাসের চেয়ে পরিষ্কার জিনিস আর কিছু নেই। সেই কারণেই আমি রামকৃষ্ণ-ইতিহাস লিখেছি। পাঁচশো বছর পরে আমার এই কাজ কোনো মহাকবির সৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করবে, যিনি স্বয়ং প্রভু রামকৃষ্ণ যেমন অমর সেইভাবে রামকৃষ্ণ-কিংবদন্তীকে অমর করে তুলবেন।[২]

॥ ২ ॥

বিদ্যাসাগরের কথা উঠলে সাধারণ মানুষের মনে কয়েকটি ঘটনা তৎক্ষণাৎ জেগে ওঠে।

কলকাতায় আসার পথে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মাইল স্টোন দর্শন ও ইংরাজি সংখ্যাপ্রণালী অনুধাবন।
বিধবাবিবাহের পক্ষে পরাশর-বচন প্রাপ্তিতে উল্লাস।
সন্ধ্যাবন্দনা-মন্ত্র বিস্মরণ।
মত্ত দামোদর সন্তরণ করে যথাকালে জননীর কাছে উপস্থিতি।
সাহেবের মুখের সামনে চটি-নর্তন।
পথিপার্শ্বে পতিত কলেরা রোগীকে বক্ষে ধারণ ও শুশ্রূষা।
চাকুরি ত্যাগকালে প্রয়োজনে আলু পটল বিক্রি ব্যবসায়ের সংকল্প ঘোষণা।
ধুতি-চাদর-সহ লাটদর্শন।
অভিনয়মঞ্চের দিকে তাঁর ছোঁড়া ক্রুদ্ধ চটিকে অভিনেতার শিরোধার্য করা।

এইরকম আরও কিছু ঘটনা। এইসব নিয়েই বিদ্যাসাগর। এদের বাদ দিলে বিদ্যাসাগর-ইমেজের অঙ্গহানি করা হয়।

কিন্তু তথ্য বড় নিষ্ঠুর। তা বিদ্যাসাগরায়ণের 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'-র

বুকে ছুরি মারতে দ্বিধা করে না।

এ বিষয়ে কিছু নাড়াচাড়া করা যাক।

মাইল স্টোনের ঘটনাটি নিয়ে তথ্য ও সত্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ঘটনাটি বিদ্যাসাগর তাঁর 'স্ব-রচিত জীবনচরিতে' নিজেই বর্ণনা করেছেন।

কার সাহেবের মুখের সামনে পা নাচানো, বা রাস্তা থেকে কলেরা রোগী তুলে এনে সেবা করার ঘটনার সত্যতা নিয়ে তর্ক ওঠেনি। কিন্তু আগেই দেখেছি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বিচার না করে ছাত্রদের খাওয়ার সময়ে সেখানে মাঝে মাঝে বসে যেতেন, এবং একই থালা থেকে হাম্ হাম্ করে ভাত খেতেন—এই হৃদ্য ছবিটিকে শম্ভুচন্দ্র অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তেমনি অগ্রাহ্য করেছেন চণ্ডীচরণের লেখা দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত একটি ঘটনাকে।

চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের দুর্ভিক্ষ-সেবার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগরের গ্রামের বাড়িতে কয়েকশো লোকের খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু দিনের পর দিন খিচুড়ি খেয়ে অরুচি হয়ে গেলে, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অনুরোধে সাদা ভাতের আয়োজন হয়। তারপর:

"এই ভাতের ব্যবস্থার প্রথম দিনই একটি নিতান্ত হৃদয়বিদারণ ঘটনা ঘটে—অন্নব্যঞ্জনের আয়োজনে এক ব্যক্তি হৃষ্টমনে ভাত খাইতে গিয়া তরকারির জন্য অপেক্ষা অসহ্য হওয়াতে সেই শুষ্ক অন্ন মুখে দিয়া দম আটকাইয়া মরিয়া যায়। এই দুর্ঘটনায়, আনন্দকর ব্যবস্থা সহসা নিরানন্দে পরিণত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মৃত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে লইয়া অনেকক্ষণ রোদন করেন। তাহার ভাত খাওয়া হইল না, অনাহারে মৃত্যুর দিন আহার করিতে গিয়া বেচারা মরিয়া গেল, এই দুঃখ চিরদিন শক্তিশেলের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ ছিল।"[৩]

কী স্বাভাবিক ঘটনা—বিদ্যাসাগরের জীবনের পক্ষে! অথচ এমন জীবন-রসের কাহিনীটিকে নষ্ট করার জন্য বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন:

"চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল।...বীরসিংহায় অন্নছত্রের সম্পূর্ণ ভার আমার হস্তেই ছিল।...ভোজন করিতে করিতে দুই-চারিজন মরিয়াছিল সত্য, আশপাশের লোকের যদি ঘৃণা জন্মে, এইজন্য সেই পংক্তি হইতে উঠাইয়া অপর স্থানে মৃত ব্যক্তিকে সরাইয়া রাখা হইত। দাদা যে-সময়ে দেশে অন্নছত্র পর্যবেক্ষণ করেন তৎকালে ভোজন করিতে করিতে কেহ মরে নাই।"[৪]

ভাগ্যে শম্ভুচন্দ্র দুর্ভিক্ষপীড়িত অস্পৃশ্য নারীদের মাথায় বিদ্যাসাগর-কর্তৃক স্বহস্তে সযত্নে তেল মাখিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি অগ্রাহ্য করেন নি! করা শক্ত ছিল, কারণ সে ঘটনা তিনিই লিখেছেন।[৫]

বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত মা হবার জন্য ভগবতী দেবীকে অনেক কিছু করতে হয়েছিল। ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন পুত্রের মাতা-রূপে তাই তিনি, ব্রাহ্ম চণ্ডীচরণের

লিখেছেন, তা স্বীকার করা যায়, সন্ধ্যাবন্দনাদিতে তাঁর উৎসাহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মতো শ্রুতিধর মানুষ বন্দনামন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন—এটা কেমন যেন! একটা খুব সহজ মীমাংসা আছে, আগ্রহ ছিলনা বলে তিনি সন্ধ্যামন্ত্র মনের মধ্যে নেন নি। সেখানে ভুলে যাওয়ার কথাটা অবান্তর। তবে বিদ্যাসাগর লিজেন্ডের পক্ষে ওই 'ভুলে গেছেন' সংবাদটা খুবই প্রয়োজনীয়!

॥ ৩ ॥

যে-কোনো মহাজীবনের গঠনে মহানাটকের অবস্থান অপরিহার্য। বিরাট কিছু হঠাৎ এসে গেলে 'পাইয়াছি পাইয়াছি' ধ্বনি তোলেন তাঁরা। বহু পূর্বকালে আর্কিমিডিসের আবিষ্কারসূত্রে সেই উচ্চৈঃস্বর শোনা গেছে—বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বাল্যকাল থেকেই বালবিধবাদের দুঃখে কাতর। তাঁর এক বাল্যসখীকে বাল্যেই বিধবা দেখে তাঁর মনে কষ্টের শেষ ছিল না। তাঁর মাও বালবিধবাদের দুঃখ সইতে পারতেন না। তাঁর পিতাও নন।

বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে বাড়ির চন্ডীমন্ডপে বসে পিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময়ে কাঁদতে কাঁদতে জননী ভগবতীদেবীর প্রবেশ। এক বালিকার বৈধব্যদুঃখ তাঁকে অতিশয় বিচলিত করেছে।

ভগবতীদেবী : তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়লি, তাতে বিধবাদের কোনো উপায় আছে কি?

ঠাকুরদাস : ঈশ্বর! ধর্মশাস্ত্রে বিধবাদের প্রতি শাস্ত্রকারেরা কী ব্যবস্থা করেছেন?

ঈশ্বরচন্দ্র : শাস্ত্রে বিধবাদের প্রথমত ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্যে অপারগ হলে সহমরণ বা বিবাহ।

ঠাকুরদাস : রাজা রামমোহন রায়, কালীনারায়ণ চৌধুরী, ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির জোগাড়ে ও পরামর্শে, গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিংক সহমরণ-প্রথা নিবারণ করেছেন। আর কলিতে ব্রহ্মচর্য সম্ভব নয়। সুতরাং বিধবাদের পক্ষে বিবাহই একমাত্র উপায়।

ঈশ্বরচন্দ্র : বেদ, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ করে অনেকদিন থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ। আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই যে, তা সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কিন্তু এ-বিষয়ে পুস্তক করলে অনেকে নানাপ্রকার কুৎসা ও কটুকাটব্য করবে। তাতে আপনারা পাছে দুঃখ পান, সেজন্য নিবৃত্ত আছি।

ঠাকুরদাস ও ভগবতী (একত্রে) : আমরা দুজনে একবাক্যে বলছি, এ-বিষয়ে যা-কিছু সহ্য করতে হয় করব; আর আমাদের যখন যা করতে হবে, তাতে ত্রুটি হবে না। তবে তুমি পুস্তক প্রচার করবার আগে আর একবার ধর্মশাস্ত্র ভালো করে দেখে নাও, কিন্তু একবার কাজে নামলে পিছিয়ে আসতে পারবে না। এমন-কি, আমরা তোমার পিতামাতা—আমরা বারণ করলেও ক্ষান্ত হবে না।[১০]

আনন্দবিধান করে, "মূর্তিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না।" এই তো রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'মাতার পুত্র'-এর উল্টোপিঠে 'পুত্রের মাতা'!

এখানেও শম্ভুচন্দ্র বাগড়া দিয়েছেন। আগেই জেনেছি, ভগবতী দেবী গ্রাম্য-দেবতার পূজা দিতেন, বিদেশস্থ ছেলেদের কল্যাণে শুভচনীর পূজা মানসিক করতেন, তাঁর আগ্রহে বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা হতো, তার আয়োজন তিনি ভক্তির সঙ্গে করতেন, পুষ্পাঞ্জলি দিতেন, এবং কালীঘাটে দেবীদর্শনে যেতেন।[৬]

চণ্ডীচরণ পরিবেশিত একটি কাহিনী তাঁর মতো ক'রে আমাদেরও 'বিস্ময়বিহ্বল' করেছে, এবং ব্যাপারটিকে কল্পকথা বলেই মনে হয়েছে।

চণ্ডীচরণ লিখেছেন :

"সংস্কৃত শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার যে প্রবল স্রোত এদেশে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও পরবর্তী ব্যাকরণগুলি বহুল পরিমাণে কার্য করিয়াছে। আবার যখন জানা গেল যে, সেই পাণ্ডুলিপি এক রজনীর কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে রচিত হইয়াছিল, তখন বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তাঁহার বিচিত্র শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।"[৭]

বিদ্যাসাগর ওহেন অসাধ্যসাধন করতেই পারেন, তবে সেজন্য তাঁর বাংলা শর্টহ্যাণ্ড জানা প্রয়োজন। তা তিনি জানতেন না, অবশ্য এমন কথা এখনো কেউ বলেন নি।

জীবনী-লেখকদের বড়ো প্রিয়—বিদ্যাসাগরের সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্র ভুলে যাওয়া।

ভ্রাতঃ শম্ভুচন্দ্রের এই রচনা :

"...লোকে জানিত, অগ্রজ মহাশয়ের সন্ধ্যাভ্যাস আছে; কিন্তু সন্ধ্যা সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সন্দেহপ্রযুক্ত একদিবস কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃব্যমহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, 'আমরা সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছি; বিশেষত আমরা বিষয়ী লোক; তুমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার শুদ্ধ হইবে, অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আবৃত্তি করো, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।' তিনি সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। পিতৃব্য পিতৃদেবকে বলিলেন যে, 'ঈশ্বর, সন্ধ্যা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে; মিথ্যা কেবল হাত নাড়াদি কার্য করিয়া থাকে।' পিতৃদেব তাহা শুনিয়া বিলক্ষণ প্রহার করেন। সন্ধ্যা শিক্ষা না হইলে জল খাইতে দিব না বলায়, অগ্রজ মহাশয় সন্ধ্যায় পুঁথি দেখিয়া পুনর্বার সন্ধ্যা মুখস্থ করেন।"[৮]

চণ্ডীচরণও শম্ভুচন্দ্রের অনুরূপভাবে এই ঘটনার বর্ণনা করেছেন।[৯]

বিহারীলালও লিখেছেন, সন্ধ্যাবন্দনাদিতে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ছিল না।

জীবনীকারেরা ব্যাপারটি নিয়ে বেশি এগোন নি। কিন্তু পরবর্তী আলোচকরা এত বড় একটা তাস খেলবেন না, হতে পারে না। বিদ্যাসাগরের ধর্ম-উদাসীনতার কী দারুণ প্রমাণ! বলাবাহুল্য। এবং বিহারীলাল যে-কথা

ঠাকুরদাস ও ভগবতীর আর এক পুত্র, বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র এই কাহিনী লিখেছেন। এই কথাবার্তার সময়ে ওইকালে শম্ভুচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন কিনা, সেকথা পরিষ্কার করে বলেন নি। অন্য জীবনীকারেরা কিন্তু এই যুগান্তকারী সংলাপ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখান নি।

বিদ্যাসাগরের বই বেরুবার আগেই বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য ইতস্তত চেষ্টা চলছিল। শাস্ত্র ঘেঁটে তার পক্ষে প্রমাণাদিও বেরিয়েছিল। কিন্তু সেসব প্রমাণ বিদ্যাসাগরের কাছে চূড়ান্ত প্রতীয়মান হলে, 'পাইয়াছি' ঘটে না। ওই ঘটনাকে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন, এবং বিহারীলাল তাঁর গ্রন্থে তা উদ্ধৃতও করেছেন।[১১] কিন্তু তা বড়ো সাদামাঠা ব্যাপার। চণ্ডীচরণ ছাড়া এক্ষেত্রে আর কে ভাবের তুফান তুলতে সমর্থ?

চণ্ডীচরণ লিখেছেন:

"তাঁহার [বিদ্যাসাগরের] সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বালিকা বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত বোধ হইলেও, তিনি যতদিন শাস্ত্রের প্রমাণ পান নাই, ততদিন সাধননিরত হইয়া কেবল শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে, শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিতেই, নিযুক্ত ছিলেন।...বহু পুরাতন কীটদষ্ট অপরিচ্ছন্ন হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে শাস্ত্রার্থ উদ্ধার করা বোধ হয় রাবণের প্রহরী-বেষ্টিত অশোককাননবাসিনী সীতার উদ্ধারসাধন অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার। কিরূপ ধীরপ্রকৃতি হইলে, কি পরিমাণ সহিষ্ণুতা থাকিলে, একজন দিবারাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া [?] এইরূপ মহাসাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে পারেন, আমরা তাহা ধারণাই করিতে পারি না।

"শুনিয়াছি, এক সময়ে দ্বিপ্রহর সময়ে কেবল একবার রাজকৃষ্ণবাবুর গৃহে আহার করিতে যাইতেন। [তাহলে পুরো আহার ত্যাগ করেন নি।]। কলেজের কার্য শেষ করিয়া অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে পুস্তকরাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন, এবং গ্রন্থকীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ করিতেন। সন্ধ্যার পর কালেজের নিকটস্থ তাঁহার পরম বন্ধু শ্যামবাবুর বাটী হইতে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবার আসিত, কোনও দিন-বা ক্ষণকালের জন্য নিজে গিয়া শ্যামবাবুর বাটীতে জলযোগ করিয়া আসিতেন। [জলখাবারও খেতেন!]। এইরূপে বহুদিন কাটিয়াছে। শাস্ত্রালোচনায় এইরূপে নিয়ত নিযুক্ত থাকার সময়ে একদিন রাত্রিশেষে একটি বিষয়ে শাস্ত্রার্থের সংগতি নির্ণয় করিতে না-পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে বাসায় যাইতেছিলেন, পথে সহসা প্রজ্ঞাদেবীর কৃপা হইল, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ওই শ্লোকের অর্থ কিরূপ হইবে। তৎক্ষণাৎ তাড়িত-প্রবাহের ন্যায় সেই পরিশ্রান্ত শরীরে ও ক্লিষ্ট মনে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল। তিনি গৃহে না গিয়া সংস্কৃত কলেজে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত শ্লোকের অর্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে শাস্ত্রচর্চা করিতে-করিতে রজনী শেষ হইল। [একই রজনী দুবার শেষ হল!]। প্রভাত-সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া যখন তাঁহার অংগস্পর্শ করিল, প্রাতঃসূর্যের

কোমল কিরণরেখা সকল যখন গোপন পথে তাঁহার পাঠাগারে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। এতাদৃশী ঐকান্তিকতা না থাকিলে, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', এইরূপ প্রতিজ্ঞা সহকারে জীবন উৎসর্গ না-করিলে কি কেহ কখনও কোনও কার্যে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাজীবনের অবসাদ সন্দর্শনে মর্মাহত হইয়া তাঁহাদের কল্যাণার্থে শরীর ও মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-উৎসর্গের অমৃতময় ফল ত্বরায় ফলিল—তিনি শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিতে করিতে পরাশরসংহিতায় :

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে ব পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যোহর্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥

এই শ্লোক তিনটি দেখিতে পাইলেন। এই শ্লোক দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ও মনে এক বিচিত্র উল্লাস প্রকাশ পাইল। আনন্দে দিশাহারা হইলেন, গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'পাইয়াছি পাইয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার বন্ধুদের কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি পাইয়াছ? বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ মুখভঙ্গিমায় উত্তর দিলেন—যাহার জন্য এতদিন এত ক্লেশ করিতেছিলাম, আজ তাহা পাইয়াছি পাইয়াছি।…আজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর আনন্দ ধরে না। আজ আনন্দে ডগমগ। আজ তাঁহার সে বিশাল হৃদয়-বারিধি-বক্ষে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে—সে লহরীলীলায় আজ তিনি নিজে মাতোয়ারা।"[১২]

বাল্মীকির কবিত্বলাভসুলভ ঘটনা—অবশ্যই। এর মধ্যে স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে কোন্ পাষণ্ড? না, পাষণ্ড নন, এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, তাঁর 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' বইয়ে লিখে বসেছেন—বিদ্যাসাগর মহাশয় যে-পরাশর বচনের উপরে নিজ সিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়েছেন, সেই বচনের সাহায্যে অনেক আগেই রাজা শ্রীচন্দ্র বসু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—এবং তিনি বিদ্যাসাগরকে প্রথম সাক্ষাতেই শ্লোকটি শুনিয়েছিলেন।

রসভঙ্গকারী অত্যন্ত অনুচিত কথা। ইন্দ্র মিত্র কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের উক্তির উল্লেখ করে বলেছেন, দেওয়ানজীর কথা গ্রাহ্য নয়; তাঁর কথা সত্য হলে শাস্ত্রবচন উদ্ধারের জন্য বিদ্যাসাগরের বিপুল পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন থাকত না।[১৩]

আমরা বেঁচেছি। বিদ্যাসাগর বিষয়ে ইন্দ্র মিত্রকে আমরা অথরিটি বলে মান্য করি।

তবু সত্যের খাতিরে ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর বক্তব্যও শুনে নেওয়া উচিত। তিনি লিখেছেন—বিদ্যাসাগর স্কুল পরিদর্শনে কৃষ্ণনগরে যান ; সেখানকার রাজবাটীতে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে কথা ওঠে ; সেখানে তিনি পরাশর-বচন শুনতে পান।—এই তথ্য জ্ঞাপনের পরে অমূল্যচরণ বলেছেন, তিনি কিন্তু ওই কথা স্বয়ং বিদ্যাসাগরের মুখে কিংবা অন্য সূত্রে শুনেছিলেন, তা স্মরণ করতে পারেন না, সেজন্য তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে অসমর্থ। বিহারীলাল সরকার অমূল্যচরণের বক্তব্য পেশ করার পরে, তাঁর কুণ্ঠায় সায় দিয়ে বলেছেন, "এরূপ অবস্থায় রাজকৃষ্ণবাবুর [ওই 'পাইয়াছি' বিষয়ক] কথাই প্রমাণ।"[১৪]

সুতরাং কিছু টালমাটাল হলেও শেষ পর্যন্ত 'পাইয়াছি'-র নৌকাডুবি হলো না। সেকালের বিহারীলাল, এবং একালের ইন্দ্র মিত্র নৌকা সামলেছেন।

॥ ৪ ॥

তথাপি—মাঝে মাঝে করুণাময় রামচন্দ্রও সংহারক। তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনাও আছে।

বিদ্যাসাগর মাতৃভক্ত, বিদ্যাসাগর সত্যনিষ্ঠ, বিদ্যাসাগর দুঃসাহসী, এবং বিদ্যাসাগর চাকরির পরোয়া করেন না—এই সবকটি পরিচয়-ঠাসা একটি ঘটনা হলো তাঁর সুবিখ্যাত দামোদর সন্তরণ। এটি বিদ্যাসাগর কাহিনীর শিরোমণি কোহিনুর। কে না কাহিনীটি উদ্দীপনার সঙ্গে বলেছেন? বিহারীলাল বলেছেন, চণ্ডীচরণ বলেছেন, মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম) বলেছেন। এমন-কি বক্র সত্যের কারবারী কৃষ্ণকমল পর্যন্ত বলেছেন, "বিদ্যাসাগরের দামোদর নদীবক্ষে সন্তরণের কথায় বিস্ময়ের কিছু আছে কি?" এই মন্তব্যের আগে অবশ্য তিনি বিপুল বন্যার সময়ে কূলকিনারাহীন নদী-লঙ্ঘনে নিজের সন্তরণ-সাফল্যের উল্লেখ করেছিলেন।[১৫]

চণ্ডীচরণের বর্ণনাগুলি আমার বেশ পছন্দ। মানুষটি হৃদয়বান। ভাবাবেগে ঢালাও বিবরণ দেন। তাঁর তুলনায় বিহারীলাল বড়ই সংযত। যেখানে দশপাতা লেখা উচিত সেখানে দশ লাইনে সারেন। ভালো নয়। তবে বিদ্যাসাগরের দামোদর সন্তরণ ঘটনার ঢেউয়ে তাঁর কলমের কুল ও কূল, দুইই ভেঙেছিল। সে বর্ণনা এই :

"ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য করিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতার বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল।। বীরসিংহ গ্রাম হইতে জননী পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—'তুমি অতি অবশ্য আসিবে।' মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন মার্সেল সাহেবের নিকট ছুটির জন্য প্রার্থনা করিলেন। ছুটি কিন্তু পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন—'আমাকে না দেখিয়া মা মরিবেন। অত্যন্ত কৃতঘ্ন আমি, মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না। হা ধিক! শত ধিক!' সকলেই বাড়ি গিয়াছেন ; বিদ্যাসাগর মহাশয় শূন্য প্রাণে ও উদাস মনে সারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি

প্রতিজ্ঞা করিলেন 'ছুটি না পাই, কর্ম পরিত্যাগ করিব, অদ্য কিন্তু বাড়ি নিশ্চিতই যাইব।' তিনি মার্সেল সাহেবকে গিয়া বলিলেন—'ছুটি না দেন, কর্ম পরিত্যাগ করিলাম—মঞ্জুর করুন; চাকুরির জন্য জননীর অশ্রুজল সহ্য করিতে পারিব না।' সাহেব স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিলেন—'কি এ অদ্ভুত মাতৃভক্তি।' তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রসন্নচিত্তে তখনই ছুটি মঞ্জুর করিলেন। ছুটি পাইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসায় আসিলেন, এবং বেলা তিনটার সময় ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। আষাঢ় মাস—আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন—মুহুর্মুহু কড়কড় বজ্রধ্বনি—চকিতে বিদ্যুৎ চমকানি—অবিরাম বাত্যা প্রবাহিণী—মুষলধারে বৃষ্টি—পথঘাট কর্দমাক্ত। বিদ্যাসাগর কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, মাতৃউদ্দেশে ঊর্ধ্বশ্বাসে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় ভৃত্য শ্রীরামের অনুরোধে তাঁহাকে সে-রাত্রি কৃষ্ণরামপুরের এক দোকানে অবস্থিতি করিতে হয়। তখনও ১২-১৩ ক্রোশ পথ অবশিষ্ট। পরদিন প্রত্যূষে তিনি আবার চলিতে লাগিলেন। শ্রীরাম ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বাড়ি নিকটস্থ কোনো গ্রামে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বাড়ি যাইতে বলিলেন। শ্রীরাম কিন্তু প্রভুর বিপদাশঙ্কায় সঙ্গ ছাড়িল না। সে ধীরে ধীরে প্রভুর পদানুসরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত শ্রীরামকে একটি দোকানে ফলারে বসাইয়া বলিলেন—'শ্রীরাম, এই পয়সা লও—বাড়ি যাও।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তীরবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাম সঙ্গ লইতে পারিল না। ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় দামোদর নদের তীরে উপস্থিত হইলেন। বিষম বর্ষায় দামোদরে খরতর একটানা স্রোত—'দুকূল-ভরা'—'কানে কান জল'।

"গ্রীষ্মকালে দামোদরে সামান্য-মাত্র জল থাকে; এমন-কি হাঁটিয়াও পার হওয়া যায়। বর্ষাকালে কিন্তু ইহা প্রলয়ঙ্করী সংহারমূর্তি ধারণ করে। আজ সেই দামোদর বাত্যা-বিক্ষোভিত বারিধিবৎ ভীষণ সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন—পারাপারের অন্য নৌকা অন্য পারে। তাঁহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, যুবতী বনিতা—সবই আছে। আজ কিন্তু বিদ্যাসাগর ভাবিতেছেন—'তাঁহার কেহই নাই—আছেন কেবল জননী।' বিদ্যাসাগর বাহ্যজ্ঞানশূন্য—অন্তরে বাহিরে কেবল সেই অন্নপূর্ণা মাতৃমূর্তি। অনন্ত বিশ্ব-ব্যোম-ব্যাপিনী মাতৃমূর্তি। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নৌকার অপেক্ষা না করিয়া, তিনি উচ্চকণ্ঠে 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া দামোদরের জলে ঝাঁপ দিলেন।

"দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর সাঁতার দিয়া দামোদর পার হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর কি নিজ-বলে সে দুর্জয়, দামোদর পার হইলেন? মানুষের শক্তিতে কি তাহা কুলায়? এ-ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, মাতৃভক্তের কাতর ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, স্বয়ং মাতৃরূপিণী মহামায়া বিদ্যাসাগরকে বুকের ভিতর করিয়া লইয়া, সেই দুরন্ত দামোদর পার করিয়া দিয়াছিলেন।

"পার হইয়া বিদ্যাসাগর আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে তাঁহাকে দ্বারকেশ্বর নদ সাঁতরাইয়া পার হইতে হয়। মাঠের মাঝে 'কুড়ান খালের'

নিকট সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। এইখানে ভয়ানক দস্যুর ভয় ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অকুতোভয়ে মাতৃপদ স্মরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। রাত্রি ৯টার সময়ে তিনি বাড়িতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, বর বিবাহ করিতে গিয়াছে ; মা কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া অনাহারে পড়িয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—'মা ! মা ! আমি এসেছি।' বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া মা ঘরের বাহিরে আসিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মাও কাঁদেন, পুত্রও কাঁদেন।"[১৬]

এমন একটা ব্যাপারে চণ্ডীচরণকে একেবারে স্মরণ না করা গর্হিত। তাই দামোদরে বিদ্যাসাগরের ঝাঁপ দেবার কথা বলার আগে তিনি যা লিখেছেন, সেইটুকু অংশ উদ্ধার করব :

"মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কি করিলেন, পাঠক ! শুনিতে চাও ? ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া ওঠে, ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে প্রবেশ করে।"[১৭]

এমন একটি মহাঘটনার সম্বন্ধে এই গ্রন্থের হে মহাশয় পাঠকগণ ! আপনারা কি শুনিতে চান, বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র কী বলিয়াছেন ? শম্ভুচন্দ্র চণ্ডীচরণকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। চণ্ডীচরণের অপরাধ—বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র তাঁহাকে অনেক উপাদান সাপ্লাই করিয়াছেন, যাহার মধ্যে শম্ভু-চন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছু কুকথা আছে। তাই শম্ভুচন্দ্র চণ্ডীচরণকে পারিলে হাতে কাটেন। সেই সুযোগ না থাকায়, তিনি চণ্ডীচরণের লেখার ভালো ভালো অংশগুলিকে কলমে কাটিয়াছেন। চণ্ডীচরণ-কৃত বিদ্যাসাগরের দামোদর সন্তরণ বিবরণ উদ্ধৃত করার পরে শম্ভুচন্দ্র অতিশয় নীরসভাবে লিখিয়াছেন :

"চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে ভরা দামোদর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার কথা যে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ করি, চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে রাজবল-হাট গ্রামের সন্নিকটে দামোদর নদের অতি ভীষণমূর্তি স্বচক্ষে দেখেন নাই ; তজ্জন্যই এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়াছেন। এরূপ মিথ্যা ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার আবশ্যক কি ? বন্যার সময় দামোদরের এত জল বৃদ্ধি হয় যে, ওই নদের পশ্চিমে প্রায় চারি ক্রোশ পর্যন্ত মাঠ জলমগ্ন থাকে।"[১৮]

বিদ্যাসাগরের যাত্রাপথ সম্বন্ধেও চণ্ডীচরণের (বিহারীলালেরও) বিবরণের ভ্রান্তি শম্ভুচন্দ্র খুলে বলেছেন।

সুদূর-প্রস্থিত শম্ভুচন্দ্রের ছুরিকাঘাতের কথা যদি ছেড়েও দিই, আমাদের নিকটবর্তী এক প্রিয়জনের নিষ্ঠুরতায় যে, খুবই আঘাত পেয়েছি, তা কাতর-ভাবে বলতেই হচ্ছে। তিনি আর কেউ নন, "করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের লেখক ইন্দ্র মিত্র। অকরুণভাবে তথ্যের পর তথ্য যোজনা করে তিনি শম্ভুচন্দ্রের বক্তব্যই সমর্থন করেছেন :

"সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, অন্তত আলোচ্য বিষয়ে, চণ্ডীচরণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এ-অবস্থায় শম্ভুচন্দ্রের উক্তিই অবশ্যমান্য। শম্ভুচন্দ্রের বিবাহের দিন

বিদ্যাসাগর ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হন নি। ওকথা চণ্ডীচরণের [সুতরাং অন্য লেখকদেরও] রটনা।"[১৯]

ব্রুটাস—তুমিও!

ইন্দ্র মিত্রের লিজেন্ড-হন্তারক কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত আরও আছে। তিনি যে, অর্ধেন্দুশেখরের উপর বিদ্যাসাগরের চটিবর্ষণের ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন, তার ইঙ্গিত আগেই করেছি।

তিনি লিখেছেন:

"কিন্তু এটি নিছক গল্প। সত্য নয়, কিংবদন্তী। ঘটনা নয়, রটনা। এই রটনার মূলে বিন্দুমাত্র সত্য নেই।"[২০]

পাষাণ! পাষাণ! উনি তথ্যের খাঁড়া দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে কাটলেন আমাদের স্বপ্ন ও আনন্দের কাহিনীগুলিকে! উনি কেড়ে নিলেন অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখরের সর্বোচ্চ পুরস্কারকে!

এখানেই তাঁর নিষ্ঠুরতার শেষ নয়। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বলা একটি কাহিনীকেও তিনি নিকেশ করেছেন।

কাহিনীটি এই:

"বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার অনেকগুলি ক্লাস একেবারে ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দেন। সেইসব ছাত্রের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ও একজন। পরে প্রত্যেক ছাত্রকে জরিমানা দিয়া পুনরায় ভর্তি হইবার আদেশ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রবাবুর পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'কি হে কার্ত্তিক, কি মনে করে?' কার্ত্তিকবাবু সব খুলিয়া বলিলেন; শেষে বলিলেন, 'এ জরিমানাটা ছেলেকে, না ছেলের বাপ্‌কে?' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'ছেলের বাপ্‌কে—এসব ছেলে জন্ম দেয় কেন?' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'তা যদি ঠিক, তবে তুমি নিজে শাস্তি না নিয়ে, তোমার ছেলে নারাণকে শাস্তি দিলে কেন?' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'থাক, বারেন্দ্র-বামুন এসে সব গুলিয়ে দিলে।' দ্বিজেন্দ্রলালকে জরিমানা না নিয়ে ভর্তি করা হলো, এবং যাহারা জরিমানা দিয়াছিল, তাহাদের জরিমানার টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইল।"[২১]

কী সুন্দর কাহিনীটি! বিদ্যাসাগরকেও মুখের মতো জবাব দেবার মতো লোক ছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর তা উপভোগ করতেও পারতেন। অথচ এই কাহিনীর বিষয়ে ইন্দ্র মিত্রের ছুরিকাঘাত লক্ষ্য করুন:

"কিন্তু এটি নিছক গল্প। কেননা দ্বিজেন্দ্রলাল কস্মিন্‌কালেও মেট্রোপলিটনে পড়েন নি।"[২২]

হালকা চাল ছেড়ে গম্ভীর হওয়া যাক।

বিদ্যাসাগরের পুরো চেহারা পেতে হলে লিজেন্ডগুলি অপরিহার্য। এই পৃথিবীতে তথ্যই শেষ কথা বলে না। তথ্যে অনেক ছিদ্র থাকে, সেগুলি ভরাট করে দেয় মানুষের কল্পনা। বস্তুসত্যের মতোই ভাবসত্য রিয়ালিটির অন্তর্গত। গণমনে আবির্ভূত বিদ্যাসাগর-কাহিনীগুলি ভাবসত্যবাহী—বিদ্যাসাগরায়ণ মহাকাব্যের পক্ষে সে সকল আদর্শ উপাদান।

বিদ্যাসাগরী কুঠারের ঝলসানি ও ঝিকিমিকি

এ কুঠার স্বর্ণময় নয়—লৌহময় এবং শাণিত। এর দ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সব বস্তুই ছেদন করা হয়েছে। কুঠারটি বাঙ্ময়।

কুঠারের দ্বারা সূক্ষ্ম কর্তন সম্ভব কিনা, এই প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন। খুব আপত্তি করলে বলব—ঠিক আছে, কুঠারটি তৈরি করার সময়ে উদ্বৃত্ত লোহায় ছোট একটি ধারালো ছুরিও তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তার দ্বারাই জটিল কাটাকুটির কাজ করতেন।

কথায় কেটে ফাঁক করার কাজটা উকিলদের বিশেষাধিকারের মধ্যে পড়ে। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার জেমস কলবিন তাঁকে ওকালতি পাস করে আইন ব্যবসা গ্রহণ করতে বলেন। ওই ব্যবসায়ে তাঁর সাফল্য অবধারিত। ইচ্ছা না থাকলেও, সাহেবের উপরোধে পড়ে বিদ্যাসাগর ওকালতি বৃত্তির চেহারা দেখার জন্য সে-সময়কার প্রধান উকিল দ্বারকানাথ মিত্রের বাড়িতে সকাল সন্ধ্যা হাজিরা দিতে লাগলেন। "যাইয়া দেখিলেন যে, হিন্দুস্থানী মোক্তারদের সহিত টাকার জন্য অনেক হুড়াহুড়ি করিতে হয়। তাহা দেখিয়া শুনিয়া ওকালতি-কর্মে ঘৃণা জন্মিল, এবং কলবিন সাহেবের বাটী যাইয়া বলিলেন, 'অধিক টাকা পাইব বলিয়া এরূপ বিসদৃশ ঘৃণিত কর্মে প্রবৃত্ত হইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না'।"[১]

দ্বারকানাথ মিত্রের মতো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন উকিল টাকার জন্য মোক্তারদের সঙ্গে হুড়াহুড়ি করবেন, এই কথাটা বিহারীলালের পছন্দ হয়নি, তাই তিনি বিদ্যাসাগরের গ্রামবাসী ও স্নেহভাজন শশিভূষণ সিংহের ব্যাখ্যাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন—বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন, ওকালতি ব্যবসা এমনই সময়গ্রাসী যে, পড়াশোনা মাথায় ওঠে। অথচ বিদ্যাসাগর বিদ্যা থেকে দূরে থাকবেন, এমন হতে পারে না।[২]

যে-কোনো কারণেই হোক, বিদ্যাসাগর ওকালতি পাস করতে এগোন নি—এবং সেই ব্যবসা গ্রহণ না করে ধারালো কথার আদালতী রণক্ষেত্র থেকে দূরেই ছিলেন।

তবু কি থাকতে পেরেছিলেন? ন্যায়রক্ষার প্রয়োজনে তাঁকে কি বারবার আদালতে দাঁড়াতে হয়নি? তারও বড়ো কথা, তিনি কি সেকালে রাষ্ট্রীয় আদালতের পরিবর্তে সামাজিক আদালতে ন্যায়ের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো উকিলের ভূমিকায় কয়েক যুগ ধরে অবতীর্ণ ছিলেন না? শব্দকেই তখন তিনি অস্ত্র করেছিলেন—তাঁর শব্দ হয়ে উঠেছিল শব্দবজ্র—যার বিদারণ ও বিস্ফোরণে সারা দেশ কাঁপছিল। বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক রচনাগুলির কথা পাঠক স্মরণ করুন। এই সামাজিক আদালতে যখন তিনি ফরিয়াদী, তখনো উকিল; যখন

আসামী, তখনো উকিল।

এবং তিনি নিজের কলেজে আইনের ক্লাস খুলেছিলেনও। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইনের ক্লাস উঠে গেলে তিনি ৩ টাকা মাইনেতে আইনের ক্লাস খোলেন। "তখন অন্নদাবাবু বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগর, করলে কি? সস্তায় লাইসেন্সি পেয়ে [উকিলরা] দেশের লোককে উদ্ব্যস্ত করে দিবে। আমরা যে-কটা গাঁটকাটা আছি তাতেই দেশের লোক অস্থির'।"৩

কথায় কথায় দূরে সরে যাচ্ছি। বিদ্যাসাগরের বাক্‌পটুত্বের আরও কিছু নমুনা উপস্থিত করব। এই ক্ষমতাটি তাঁর জন্মগত—তাঁর নেতৃত্বশক্তির সঙ্গে এর অবশ্য-সংযোগ। তৎপর সরস কথার চালাচালিতে তিনি কতদূর দক্ষ ছিলেন, তার সেরা নমুনা ইতিমধ্যে পেয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপের সূত্রে। এবার কেবল সরস সহাস কথা নয়, ঝাঁঝালো ধারালো কথারও নমুনা দেব।

ছোট বয়সে লেখাপড়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে কঠিন কণ্টস্বীকার করতে হয়েছে—তার মধ্যে কঠিনতম অংশ বোধ হয় বাবার ঠেঙানি। ঠাকুরদাসকে বুকের রক্ত জল করে রোজগার করতে হতো, সেজন্য শিশুদের বালভগবান করে সেবা-পূজা করার মনোভাব ওই সময়ে তাঁর ছিল না। নিজের দুঃখকণ্ট পুত্রের উপর প্রহারের ভাষায় প্রায়ই উচ্চারিত হতো।

ঠাকুরদাসের ঠেঙানির কথা সব জীবনীতেই আছে। বিহারীলালের লেখা থেকে তা হাজির করা যাক :

"ঠাকুরদাস কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। যেদিন তিনি দেখিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, সেদিন তাঁহাকে নিদারুণ প্রহার করিতেন। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র পিতার কাছে মার খাইয়া কলেজের তদানীন্তন কেরানী রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে পলায়ন করিয়াছিলেন।...সময়ে সময়ে পিতার নিকট মার খাইয়া ঈশ্বরচন্দ্র এমনই আর্তনাদ করিতেন যে, তাহাতে সিংহ পরিবার উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতেন, এবং ঠাকুরদাসকে বলিতেন, 'এরূপ প্রহারে, হয়তো বালক কোন্‌দিন মারা যাইবে ; অতএব যদি এরূপ প্রহার করো, তাহা হইলে এখান হইতে তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।...ঈশ্বরচন্দ্রও অনেকটা সাবধান হইয়া চলিতেন। পাছে নিদ্রা আসে বলিয়া তিনি আপনার চোখে সরিষা-তেল দিতেন। তেলের জ্বালায় নিদ্রা পলায়ন করিত।"৪

কালক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রের গায়ের ব্যথা দূর হয়েছিল, কিন্তু ব্যথার স্মৃতি দূর হয়নি। তিনি কেবল নারী-ত্রাতা ছিলেন না, ছাত্র-ত্রাতাও ছিলেন। যখন স্কুল তৈরি করলেন, তখন সেখানে সার্কুলার জারি করে শারীরিক শাস্তি একেবারে নিষিদ্ধ করে দিলেন।৫ কিন্তু শিক্ষকদের জীবনে তখন অন্য সুখ ছিলনা বলে তাঁরা হাতের সুখ থেকে বঞ্চিত হতে মোটেই রাজি ছিলেন না। ফলে বিদ্যাসাগর একজন শিক্ষকের চাকরি পর্যন্ত খেয়েছেন।৬

নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) বাল্যকালের একটি ঘটনা স্মরণ করা

যায়। তাঁর মেজভাই মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"বীরেশ্বর একটু বড় হইলে স্কুলে গেল। তখন বিদ্যাসাগর-স্কুল সুকিয়া স্ট্রীটে ছিল।...তখনকার দিনে বিদ্যাসাগর-স্কুলের খুব নাম ছিল। সেইজন্য বাড়ির সকল ছেলে বিদ্যাসাগর-স্কুলে পড়িত। স্কুলে [দাদার] নাম লেখান হইল নরেন্দ্রনাথ।...শিশু নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত স্কুলে যায়। একদিন ক্লাসের এক মাস্টার এত জোরে কান ধরিয়া টানিয়াছিলেন যে, শিশুর কান ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, এবং রক্তে চাপকান ইজের ভিজিয়া গিয়াছিল। তখন কাপড় পরিয়া স্কুলে যাওয়ার প্রথা ছিল না।...নরেন্দ্রনাথ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে খুব-একটা হৈ-চৈ পড়িল। বিশ্বনাথ দত্ত ও তারকনাথ দত্ত মাস্টারকে উকিলের চিঠি দিয়া আদালতে আনিয়া শাস্তি দিবেন, ও স্কুলে আর ছেলেদের পড়িতে পাঠাইবেন না, এইরূপ স্থির করিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজে মধ্যস্থ হইয়া নালিশ-মকদ্দমা রহিত করিল এবং পরদিবস যথাসময়ে স্কুলে যাইল। এই শাস্তির কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে যাইলে তিনি ছেলেদের মারিবার প্রথা উঠাইয়া দিলেন। কোনও শিক্ষক আর ছেলেদের মারিতে পারিতেন না। কিন্তু কয়েক বৎসর পর একদিন অপর একজন নূতন শিক্ষক আমার মাথার সহিত অপর একটি ছেলের মাথা ঠুকিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমি কোনও দোষ করি নাই বা দোষের কারণ জানিতাম না। বাড়িতে আসিয়া এই বিষয়ে বলায়, নরেন্দ্রনাথ সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীব্রজনাথ দে মহাশয়কে শিক্ষকের বিরুদ্ধে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন। ফলে নূতন শিক্ষকটির চাকরি গিয়াছিল।"[৭]

স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ এই ঘটনার যে-বিবরণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের বিবরণের মোটামুটি ঐক্য আছে। কেবল সেখানে বিশ্বনাথ বা তারকনাথ কর্তৃক শিক্ষককে আদালতে টেনে নিয়ে যাবার ইচ্ছার কথা নেই, যা কিন্তু বিখ্যাত আইনজীবীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ইচ্ছা, এবং ঘরের ছেলে মহেন্দ্রনাথ তা জানতেন। অপরপক্ষে গম্ভীরানন্দ নরেন্দ্রকে শিক্ষকের শাস্তি দেওয়ার কারণ জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে এ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপের কথাও। উভয় লেখকই বলেছেন, এই ঘটনার পরেই বিদ্যাসাগর তাঁর স্কুলে দৈহিক শাস্তি উঠিয়ে দেন। বিদ্যাসাগর-বিষয়ক লেখকদের পক্ষে কথাটি প্রণিধানযোগ্য।

গম্ভীরানন্দের বিবরণ এই :

"বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বড় ক্রোধপরায়ণ ছিলেন।...একদিন ওই শিক্ষক যখন একটি বালককে তাহার কিম্ভূতকিমাকার ব্যবহারের জন্য প্রহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এই অকারণ উন্মত্ততা, বিকট মুখভঙ্গি ইত্যাদি দেখিয়া নরেন্দ্র হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহার ফলে শিক্ষকের সমস্ত ক্রোধ নরেনের উপর গিয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'বল্, আর কখনও আমার দিকে হাসবি না।' নরেন এইরূপ বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, শিক্ষক প্রহারের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন, এবং দুই

হাতে কান মলিতে লাগিলেন ; এমন-কি কান ধরিয়া, উঁচু করিয়া তাঁহাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন। ইহাতে একটি কানের চামড়া ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। তখনও নরেন ওইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অসম্মত হইলেন, বরং ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, 'আমার কান মলবেন না ! আমাকে মারবার আপনি কে ? আমার গায়ে হাত দেবেন না,' ইত্যাদি। এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে আসিয়া পড়িলেন। নরেন ফোঁপাইতে-ফোঁপাইতে সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, এবং পুস্তকগুলি হাতে তুলিয়া বলিলেন, তিনি বরাবরের মতো সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া বহু সান্ত্বনা দিলেন। পরে এই প্রকার শাস্তি-বিধান সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের পর এই আদেশ প্রচারিত হইল—বিদ্যালয়ে ওইরূপ শাস্তি দেওয়া চলিবে না।"[৮]

প্রমথনাথ বসুর বিবেকানন্দ-জীবনীতে একই ঘটনা আছে, গম্ভীরানন্দ বহুলাংশে সেখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। সেখানে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এই বাড়তি কথা আছে, তিনি ব্যাপার দেখে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে উক্ত শিক্ষককে বলেছিলেন, "আমি জানতাম, তুমি একজন মানুষ, এখন দেখছি তুমি একটা পশু।"[৯]

কেবল নিজের স্কুলে নয়, সংস্কৃত কলেজেও বিদ্যাসাগর দৈহিক শাস্তি রহিত করেন—সেই সঙ্গে শিক্ষকদেরও কর্তব্যকর্মে দুরস্ত করে তোলেন। অধ্যাপকরা নির্দিষ্ট সময়ে আসতেন না। তাঁদের অনেকেই আবার বিদ্যাসাগরের আচার্য। তাঁদের তো মুখে শাসন করা যায় না। তাই নির্ধারিত সময় এসে গেলেই তিনি গেটের সামনে পায়চারি করতেন—তাঁর সামনে দিয়েই বিলম্বে আগত অধ্যাপককে ঢুকতে হতো। "পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্মার্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি তাহা লক্ষ্য করিয়া অপরাপর অধ্যাপকদিগকে কহিলেন, 'ওগো, আর আমাদের বিলম্বে আসা চলিবে না ; বিদ্যাসাগর অগ্রে আসিয়া কৌশলে আমাদের তাহা জানাইয়াছেন'।"[১০]

বিদ্যাসাগর একেবারে কিছু বলতেন না, এমনও নয়। 'মিছরির ছুরি' বলে একটা কথা আছে, তা বিদ্যাসাগরের না জানার নয়। কাউকে কাউকে বলতেন, "এই এলেন নাকি ?" এই বলাতে কাজ হতো—আরও বেশি হতো কিছু না-বলাতে। বিদ্যাসাগর তাঁর অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে সংকোচে কিছু বলতে পারতেন না—উনি আবার সবচেয়ে দেরী করে আসতেন। তাঁর জন্য ছিল ওই পূর্ব-কথিত নীরব পর্যবেক্ষণের দণ্ড-বিধি। "ক্রমাগত এইরূপ করায়, বৃদ্ধ শিক্ষক একদিন মার্তণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া ছাত্র-অধ্যক্ষকে বলিলেন, 'তুমি যে কিছু বলো না, এতেই সর্বনাশ করিলে। কথা কহিলে একটা জবাব দিতে পারিতাম, কিজন্য দেরি তাহাও বলিতে পারিতাম। এমন করে জব্দ করিলে আর উপায় কি ? আচ্ছা, মরি বাঁচি, কাল হইতে ঠিক সময়ে আসিব।"[১১]

নিষ্ঠুর বিদ্যাসাগর অনেক অধ্যাপকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পরে সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ সাহিত্যশ্রেণীতে 'প্রতিনিধি'-শিক্ষকের কাজ করছিলেন। "ন্যায়বাগীশ মহাশয় পূর্বের ন্যায় প্রত্যহ

বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে বসিয়া নিদ্রা যাইতেন, অনবরত নস্য লইতেন, তথাপি নিদ্রা উঁহাকে পরিত্যাগ করিত না। এই কারণে ছাত্ররা এই কবিতাটি পাঠ করিতেন, 'সর্বানন্দন্যায়বাগীশো ভায়া নিত্যং নিদ্রাং যাতি কলেজমধ্যে। ধীরো নাম্না ধ্যাপনা নাস্তি তস্য চত্বারিংশন্মুদ্রিকাণাং গতেঽপি'।"[১২]

এঁর চাকরি থাকে নি, বিদ্যাসাগরের কৌশলে।

আমরা এও জেনেছি, সংস্কৃত বিদ্যালয়ের কোনো-কোনো শিক্ষক যখন চেয়ারে নিদ্রাগত থাকতেন, তখন "ছাত্রগণের কেহ কেহ পাখা লইয়া অধ্যাপককে বাতাস করিত।" এমন পরম গুরুকুলী প্রথা বিদ্যাসাগরের মোটে সহ্য হয়নি—এটিকে 'কুপ্রথা' বিবেচনা করে উঠিয়ে দেন।[১৩]

দৈহিক শাস্তি নিবারণের জন্য অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গোক্তির নমুনা দিয়েছেন বিহারীলাল।

বিদ্যাসাগর দেখলেন, অধ্যাপকের টেবিলে বেত পড়ে আছে।

বিদ্যাসাগর : বেত কেন হে?

অধ্যাপক : আজ্ঞে, মানচিত্র দেখানোর সুবিধা হয়।

বিদ্যাসাগর : রথ দেখা ও কলা বেচা, দুইরকমই হয়। মানচিত্র দেখানোও হয়, আবার ছাত্রদের পিঠেও পড়তে পারে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর কি পুরো দৈহিক শাস্তি উঠিয়ে দিয়েছিলেন ? না, তিনি স্বয়ং তার গৌরবময় ব্যতিক্রম—যদিও তার চেহারা মারাত্মক কিছু ছিল না।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে পাই :

"কলেজে আমরা তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতাম, এবং দূরে-দূরে থাকিতাম। ছেলেরা দুষ্টামি করিলে তিনি নিজের ঘরে লইয়া যাইতেন, কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন, এবং বইয়ের পাতা-কাটা স্লাইসের দ্বারা তাহাদের পেটে মারিতেন। আমার যেন মনে হয়, আমার কোনো দুষ্টামির জন্য আমাকে ধরিয়া লইয়া আমার ভুঁড়িতে মারিয়াছিলেন, ও আমাকে কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন।"[১৪]

তাহলে—বিদ্যাসাগর অল্পস্বল্প মারতেন, এবং কোণেও দাঁড় করিয়ে রাখতেন !! মনে হয়, ও-কাজটা অপর শিক্ষকদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। সেইজন্য তাঁর জীবনীকারেরা আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে পেরেছেন—একবার এক শিক্ষকের ক্লাসে গিয়ে যখন দেখেন যে, একটি ছেলেকে তিনি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, তখন বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, "কি হে, তুমি যাত্রার দল খুলেছ নাকি ? তাই ছোকরাদের তালিম দিচ্ছ ? তুমি বুঝি দূতী সাজবে ?"[১৫]

প্রসঙ্গত জানাই, বিদ্যাসাগর গ্রীষ্মের ছুটির প্রবর্তক। "কলিকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্মের অসহনীয় উত্তাপে লোক ছটফট করে। এরূপ প্রখর তাপদগ্ধ মধ্যাহ্ন-সময়ে অত্যধিক পরিশ্রমে বালকগণের শরীর ও মন নিস্তেজ ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-সমাজকে অনুরোধ করিয়া দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ মঞ্জুর করিলেন।"[১৬]

ইদানীং শিক্ষাবিভাগের অনেক কর্তব্যপরায়ণ কর্তার চক্ষুশূল হয়ে উঠছে এই গ্রীষ্মের ছুটি—এতে নাকি পড়ার পাহাড় ঠিকভাবে নাড়ানো যাচ্ছে না। তাই ক্রমেই গ্রীষ্মের ছুটির অঙ্গহানি করা হচ্ছে। এমন করার হেতু, কলকাতায় গাছপালা অদৃশ্য হয়ে সেই জায়গায় কংক্রীটের জঙ্গল তৈরি হবার ফলে তাপমাত্রা কমেছে; লোড-শেডিং নামক সুব্যবস্থার দ্বারা গ্রীষ্ম-দুপুরে পাখা ঘোরে না, তাই স্কুল-কলেজের ছাত্ররা গরমে তাজা থাকে, কারণ বিদ্যুতের তাপ তখন থাকে না; এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে গ্রীষ্মকালে প্রায়ই বন্‌ধ ঘটে বলে ঘোষিত ছুটির দরকারও হয় না। এক্ষেত্রে গ্রীষ্মের ছুটির প্রবর্তক বিদ্যাসাগর অবশ্যই আলস্যবিধায়ক প্রতিক্রিয়াশীল !!

ছাত্রদের সম্বন্ধে সহানুভূতি মানে নয় তাদের অসভ্যতাকে সেলাম করা। ক্ষমায় সদা প্রস্তুত বিদ্যাসাগর 'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা', সেখানে আঘাতে কঠিন।

কালীচরণ ঘোষের বয়স অল্প হলেও বিদ্যাবুদ্ধি অল্প নয়, একথা বুঝে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের একটি শ্রেণীতে তাঁকে ইংরাজি পড়াতে দেন। ক্লাসে যথেষ্টই পাকা ছেলে ছিল। তারা ছোকরা শিক্ষককে পাত্তা দেবে কেন? নানা-ভাবে নাজেহাল করতে লাগল। বিদ্যাসাগরের কানে সেকথা গেল। তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন—কারা এই অপকর্ম করছে? এখানে যথারীতি দেখা গেল, অন্যায়ে ছাত্র-ঐক্য। কেউই কারো নাম ভাঙল না। ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগর গোটা ক্লাসটিকে তাড়িয়ে দিলেন। ছেলেরা ক্ষিপ্ত। ছাত্রবীর্য বলে কথা। তারা যৌথভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল। কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন গ্রহণ করে, বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর বক্তব্য কী, জানতে চাইলেন। ফলে ছেলেদের স্ফূর্তির শেষ নেই। "বালকেরা···আনন্দে দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'এবার চাকরি তো যায়—উপায় কি হবে? দাঁড়ি-পাল্লা ধরতে হবে যে'।" কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের উত্তরে ওধারে বিদ্যাসাগর জানালেন, কলেজের আভ্যন্তরিক ছোট ছোট ব্যাপারে অধ্যক্ষের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা দরকার; ছাত্ররা যদি কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাবার প্রশ্রয় পায় তাহলে তাদের শাসনে রাখা যাবে না। কর্তৃপক্ষ তাঁর কথা স্বীকার করে, সমস্ত কাগজপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, এবং ছাত্রদের জানালেন, এক্ষেত্রে কলেজের অধ্যক্ষই ব্যবস্থা নেবার অধিকারী। ফলে ছাত্রদের মাথায় বজ্রাঘাত, চোখে অন্ধকার। অভিভাবকদের কাছে তাদের কীর্তির খবর পৌঁছে গেছে—তাঁরা রাগে অস্থির। বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে তাদের মাপ চাইতে বললেন। কিন্তু সেখানে যাবার সাহস এই বীরগণের নেই। অগত্যা অভিভাবকরাই বিদ্যাসাগরের দ্বারস্থ হলেন। তিনি বললেন, এ-বিষয়ে ক্ষমা করার মালিক কালীচরণবাবু। তাঁর কাছেই ছাত্রদের যেতে হবে। ছাত্ররা অগত্যা সেই ছোকরা শিক্ষকের কাছেই আছড়ে পড়ল। তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছাত্রদের নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর কালীচরণকে প্রশ্ন করলেন,

"এরা তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে তো?" কালীচরণ তা স্বীকার করলেন। বিদ্যাসাগর বললেন, "তুমি এদের মাপ করতে বললে করব, নচেৎ নয়।" কালীচরণ বললেন, "এরা আমার কাছে যে-পরিমাণে অপরাধী, তার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধী আপনার কাছে, আপনি যা ইচ্ছা করুন, দয়া করে আমার উপর ভার দেবেন না।" সামনে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছাত্ররা। দলের দু'একজন পাণ্ডাকে বিদ্যাসাগর বললেন, "কি রে, দাঁড়ি-পাল্লা ধরবে কে, তোরা না আমি?"

এর পর ছাত্রগণ কর্তৃক বিদ্যাসাগরের পদধারণ এবং বিদ্যাসাগরের ক্ষমা, ইত্যাদি।[১৭]

বিদ্যাসাগরকে যেসব ছাত্ররা দাঁড়িপাল্লা ধরাচ্ছিল, তাদের মধ্যে অন্তত বঙ্গজাতির তেজ ছিল, তাই তারা বিদ্যাসাগরের ক্রোধ এবং পরবর্তী ক্ষমা পেয়েছিল। কিন্তু বিতৃষ্ণা পেয়েছিল মেয়েলি ছোকরাটি। পুরুষের মেয়েলিপনা, ন্যাকামো, ঢঙ, বিদ্যাসাগর দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের কাছে এক চাকুরিপ্রার্থী যুবকের কথা বলেছেন, যে এম-এ পাস, এবং থিয়জফিস্ট —থিয়জফিস্ট হওয়ার কারণে তার মাথায় লম্বা চুল। বিদ্যাসাগর তাকে ভালো করে দেখলেন। মুখ বাঁকালেন।

বিদ্যাসাগর: আরে তোকে মাস্টারি কর্ম দেবো কি? তুই মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ, আগে বিবেচনা করে বুঝি।[১৮]

বিদ্যাসাগরের কুঠার প্রায়শই উদ্যত—দেখে ভয়ে পাই। আবার খুব স্ফূর্তি হয়, যদি দেখি যে, সেই কুঠারটি তাঁর হাত থেকে কেউ কেড়ে নিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে উঁচিয়ে ধরেছে। খুবই সুখের কথা, এখানে আমাদের স্ফূর্তির ভাগীদার স্বয়ং বিদ্যাসাগরও! সংলাপপ্রধান অনবদ্য একটি নাটকের উপাদান আছে নিম্নের কাহিনীতে।

কাহিনী এই:

চকদিঘির সিংহরায় পরিবার বিদ্যাসাগরের অনুগত, বিশেষত সারদাপ্রসাদ সিংহরায় ও ছক্কনলাল সিংহরায়। তাঁরা বিদ্যাসাগরের ইচ্ছায় চকদিঘিতে স্থাপন করেছেন একটি ইংরাজি-সংস্কৃত উচ্চবিদ্যালয় ও একটি হাসপাতাল। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছক্কনলালের এমনই প্রীতির সম্বন্ধ যে, ছক্কনলাল তাঁকে 'খুড়ো-মহাশয়' বলতেন। বিদ্যাসাগরও উল্টোদিকে ছক্কনলালকে বলতেন, 'খুড়ো', এবং তাঁর স্ত্রীকে 'খুড়ি'। ছক্কনলালের মেজছেলে মণিলাল। তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দেওয়া-নেওয়ারই কাহিনী।

চন্দননগরে হাওয়াবদল করতে যাবেন স্থির করে বিদ্যাসাগর গঙ্গার ধারে ঘোষবাবুদের বাগানবাড়ি, যার নাম 'মেজরের কুঠি', দেখতে গেছেন। তার খুব কাছেই গঙ্গার ধারে একটা বাড়িতে তখন ছক্কনলাল সপরিবারে আছেন। সেকথা জেনে বিদ্যাসাগর সেখানে গেলেন। বিদ্যাসাগর এসেছেন শুনে মণিলাল তাঁকে দেখতে এল। তার বয়স বাইশ, খুবই সপ্রতিভ। সে তখনো পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে

দেখেনি। বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলো নিয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। বিদ্যাসাগর হাসলেন।

বিদ্যাসাগর : অমন করে কী দেখা হচ্ছে ?

মণিলাল : যাঁর কথা এতদিন কত-না শুনেছি, আজ নিজের চোখে তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য হলো, তাই দেখছি।

কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর তিন দৌহিত্র, সুরেশ, যতীশ ও লাট-কে সঙ্গে নিয়ে চন্দননগরে বাস করতে এলেন। দুই পরিবারের মধ্যে খুব মেলামেশা হতে লাগল! বিদ্যাসাগর ছক্কনলালের বাড়িতে যান, ছক্কনলাল আসেন বিদ্যাসাগরের কুঠিতে। সকাল সন্ধ্যায় দেখাশোনা, একসঙ্গে বেড়ানো, কথাবার্তা, আলোচনা।

বিদ্যাসাগর সুরেশকে কুমারসম্ভব পড়াচ্ছিলেন। মন দিয়ে শুনছিল মণিলাল। তা দেখে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন তাকে, 'তুই সংস্কৃত জানিস ?'

মণিলাল : দাদামশায়, আমি ফার্স্টক্লাসে পড়ি, কেমন করে বলি যে, সংস্কৃত জানি। তবে আপনি আমাদের ওখানে যে স্কুল করিয়েছেন তাতে সংস্কৃত ভালোভাবে পড়ানো হয়, আমি তা সাধ্যমতো শেখার চেষ্টা করি, এইটুকু বলতে পারি।

বিদ্যাসাগর শুনে খুশি হলেন। মণিলালকে ছাত্র করে নেবেন বললেন। মণিলাল সানন্দে রাজি।

বিদ্যাসাগর : তোকে তো পড়াব, আমায় কী মাইনে দিবি বল্ ?

মণিলাল : আমিই তো আপনার।

বিদ্যাসাগর : ওসব ফাঁকা কথায় কাজ হবে না।

মণিলাল : কিসে হবে তা বলুন ? তা যদি আমার সাধ্যে না থাকে, তাহলে বুঝব, কেবল আমিই আপনার দয়া থেকে বঞ্চিত।

বিদ্যাসাগর : ঠিক আছে, তোদের বাগানের একটি করে বেল একদিন অন্তর আমাকে দিবি—তোকে পড়ানোর পারিশ্রমিক তাই ধার্য করলুম। সেদিন খুড়িকে আশীর্বাদ জানাতে গিয়ে দেখেছি, তোদের গাছভরা অজস্র বড়ো বড়ো বেল।

মণিলাল তৎক্ষণাৎ রাজি। সে বিদ্যাসাগরের কাছে কুমারসম্ভব পড়ছে এবং বেল সরবরাহও করছে। কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ মালী এসে মণিলালকে বলল, বিদ্যাসাগর মহাশয় বেল ফেরত দিয়েছেন, আর না-বলা পর্যন্ত বেল পাঠাতে বারণ করেছেন।

বইপত্র নিয়ে মণিলাল যথারীতি বিদ্যাসাগরের কাছে গেছে, কিন্তু বই খোলেনি।

বিদ্যাসাগর : কি হলো, বই খুলছিস না যে ?

মণিলাল : বিনা মাইনেতে পড়ব কি করে ?

বিদ্যাসাগর হাসলেন।

বিদ্যাসাগর : আর শোন্! পরশু খুড়োর সঙ্গে ঠাকুরবাবুদের চাঁপদানীর

বাগানে গিয়েছিলুম। সেখানে একগাছ সুন্দর বেল আছে দেখে খুব ভালো লাগল। সেকথা তোর বাপকে বললে সে একঝুড়ি বেল সেখান থেকে জোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই মালীকে এখন বেল দিতে বারণ করেছি।

মণিলাল : বেশ, তাহলে খুড়োকেই পড়াবেন।

কি বিচ্ছু ছেলেরে বাবা! বিদ্যাসাগর অগত্যা বাবা-ছক্কনলালের ঝুড়িভরা বেল ফেরত পাঠিয়ে, ছেলে-মণিলালকে আবার বেল পাঠাতে বললেন।

বেলের ঝুড়ি ফেরত আসতে দেখে ছক্কনলাল অবাক।

ছক্কনলাল : খুড়োমশায়, বেল ফেরত পাঠিয়েছেন কেন?

বিদ্যাসাগর : আর বলো কেন, তোমার মধ্যম পাণ্ডব খাপ্পা। বলে কিনা, যাঁর কাছ থেকে বেল নিয়েছেন, তাঁকে পড়ান গে। তাই তোমার বেল ফেরত পাঠিয়েছি।

পড়িয়ে মাইনে চাইবার ঠেলা বিদ্যাসাগর খুব বুঝেছিলেন।

বিদ্যাসাগর-মণিলাল সংবাদ এইখানেই শেষ নয়।

বিদ্যাসাগর চন্দননগরে গঙ্গার ধারে রাস্তায় ভোরে দ্রুত হাঁটতেন। ফেরার সময়ে মণিলালের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত। একদিন ওই সময়ে এক ভদ্রলোক এসে মণিলালকে বিদ্যাসাগরের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। মণিলাল বলল, তিনি চন্দননগরে নেই, কলকাতায় ফিরে গেছেন। ভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগর ঠিক সেইসময়ে সেখানে এসে গেলেন। তিনি মণিলালের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। অবস্থা সামলাবার জন্য বললেন, "ও জানে না ; আমি কাল রাত্রে ফিরেছি।"

পরে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মণিলালের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

বিদ্যাসাগর : তুই মিথ্যে বলে ভদ্রলোকটিকে ভাগিয়ে দিচ্ছিলি কেন?

মণিলাল : আপনি যে কেবল নাকে কাঁদেন—আর পারি না, লোকের জ্বালায় যাই কোথায়?

বিদ্যাসাগর : না, অমন করে আর লোক ভাগাস নি।

মণিলাল : ভালো, এবার থেকে লোক ডেকে এনে দেব।

বিদ্যাসাগর (বিচলিত স্বরে) : ভাই রে, যতদিন বেঁচে থাকি, যথাসাধ্য পরের জন্য যা-পারি করবার চেষ্টা করব।[১৯]

এই মনোহারী কাহিনীটি সংগ্রহ করে পরিবেশন করবার জন্য আমরা ইন্দ্র মিত্রের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রার্থী বা সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ফেরাবেন না বলে বিদ্যাসাগর বাড়িতে দারোয়ান রাখেন নি। পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে বসে থাকার সময়ে একদিন দেখেছিলেন, দারোয়ান এক ভিখারীকে তাড়িয়ে দিল। দেখে খুব কষ্ট পেলেন। এর পরে কেউ তাঁকে বাড়িতে দারোয়ান রাখতে বললে তিনি ওই ঘটনার উল্লেখ করে বলতেন, "দারোয়ান রাখলে তো আমার বাড়িতে ভিখারী এক মুঠো ভিক্ষা পাবে না ; সাক্ষাৎপ্রার্থী ফিরে যাবে আমার দেখা না পেয়ে। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।" দৌহিত্রদের কঠিনভাবে জানিয়েছিলেন, "যদি শুনতে পাই যে, বাড়ির

কেউ আমার বাড়িতে কোনো লোকের আসায় বাধা দিয়েছে, তাহলে তাকে তখনি বাড়ি থেকে দূর করে দেব।"[২০]

এবং কথা ও কাজে তফাত রাখেন নি।

হরকালী ২৫ বছর ধরে বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাড়ির পাচক। বর্ধমানের বাসাতেও রান্নার কাজ করত। দীর্ঘদিন বিদ্যাসাগরের কাছে কাজ করার জন্য প্রভুর প্রতি তার মমত্ববোধ জেগেছিল। তার সেই মমতা একবার সীমা লঙ্ঘন করে বিপত্তি ঘটাল। বর্ধমানে অনাথ নারীরা আসত নানা প্রার্থনা নিয়ে। বিদ্যাসাগর তাদের টাকাকড়ি, কাপড় ইত্যাদি দিতেন। কেউ কেউ ঠকিয়ে একাধিকবার সাহায্য নিয়ে গেছে, এমনও হয়েছে। বিদ্যাসাগরের কাছে ধরা না পড়লেও তা হরকালীর নজর এড়ায় নি। সে একদিন এক স্ত্রীলোককে আচ্ছা করে ধমক দিয়ে বলল, "মাগী, বিদ্যাসাগরকে কি তোরা লেদা আমগাছ পেয়েছিস ?" সেকথা কানে যেতে বিদ্যাসাগর রেগে আগুন। হরকালীকে বললেন, "তুমি বহুকাল এ-বাড়িতে আছো ; তোমার বেতন কত বাকি আছে বলো, ফেলে দিই, তুমি এখনি বাড়ি থেকে দূর হয়ে যাও।" আরও চড়ে বললেন, "গরীব লোককে আমি দান করব, তা তোমার বাবার কি ?" হরকালী আত্ম-সমর্থনে বলেছিল, "ওই বুড়ি এক সপ্তাহও পেরোয় নি, আপনার কাছ থেকে টাকা ও কাপড় নিয়ে গেছে। আপনার তা স্মরণ নেই, তাই ওকে ও-কথা বলেছি।" বিদ্যাসাগর কিন্তু বিতাড়নের আদেশ রদ করেন নি ; তবে হরকালীর জন্য দু'টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[২১]

অর্থাৎ বিদ্যাসাগর সেই মনুষ্য যিনি পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করে নিজেকে বিপন্ন করবেন, কিন্তু স্বভাব ছাড়বেন না।

বিদ্যাসাগরের জীবনব্রতে যারা বাধা দেবে, তাদের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কথায় ক্ষোভ বা ক্রোধ থাকত, কিন্তু হাসির চিহ্ন ছিল না। এই অধ্যায়ে কিন্তু আমরা তাঁর বাঁকা হাসির সন্ধানী।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা—সাধারণ হাসির ব্যাপার। তা বিদ্যাসাগরের কাছে কৌতুক, কারুণ্য এবং বিতৃষ্ণার বিষয়।

বিদ্যাসাগরের এক আত্মীয়-বন্ধু বেশি বয়সে দ্বিতীয় পক্ষ করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, সঙ্গে আছেন কৃষ্ণকমল। বিদ্যাসাগর এসেছেন জেনে বন্ধুবর বাইরে এলেন, কিন্তু কথাবার্তায় খুবই অন্যমনস্ক। কিছুক্ষণ তাঁর ভাবগতিক লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর বুঝলেন, কানটা ধরা আছে ভিতরে, তাই ছটফটানি। বন্ধুটি অবসর পেলেই শ্বশুরবাড়িতে ছোটেন ; আর তাঁর এক ছোট ভাই তো প্রায় শ্বশুরবাড়িবাসী। দুজনকে একত্র দেখলে বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করতেন—"হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহাদধৌ।" এইদিন যখন দেখলেন, কামিনীতে ধরা আছে যে-মন, সে মন তাঁর পাবার সম্ভাবনা নেই, তখন বন্ধুকে অব্যাহতি দেবার জন্য বললেন, "যাও, আর উস্‌খুস্‌ করতে হবে না, বাড়ির ভেতরেই যাও।"[২২]

বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ।

আরও একটি বুড়ো শালিখ—তিনি সাব জজ্। অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দেখা। মধ্যবর্তীকালে ভদ্রলোকের প্রথমা পত্নী গত হয়েছেন, এবং গৃহ ও হৃদয় শূন্য রাখতে নেই, এই ন্যায়বোধে বিচারক মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যা ঘরে এনেছেন। এতে তাঁর যা লাভ হয়েছে, তার পরিমাণ বিদ্যাসাগর বাড়িয়ে দিলেন।

বিদ্যাসাগর : তবে তো তোমার স্বর্গের দ্বার খোলা হে!

সাব জজ্ যদিও তখনি স্বর্গে যাবার জন্য ব্যস্ত নন, তবু কোন্ শুভ কর্মের জন্য অমন পাস্ পাচ্ছেন তা জানতে উৎসুক হলেন।

বিদ্যাসাগর গুছিয়ে ব্যাখ্যা করলেন।

বিদ্যাসাগর : তবে শোনো! মরণের পরে মানুষমাত্রেই স্বর্গে প্রবেশের জন্য স্বর্গের দ্বারে হুড়াহুড়ি করে। দ্বারপাল একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি পৃথিবীতে কী কাজ করেছ? যারা বলে পুণ্যকাজ করে এসেছি, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হলে তাদের স্বর্গে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, বাকিদের পাঠানো হয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নরকে। স্বর্গে প্রবেশ করতে চায় এমন একজনকে যখন তার কাজের হিসাব চাওয়া হলো, সে বিশেষ কিছু পুণ্য বা পাপের কথা বলতে পারল না। কথায় কথায় কিন্তু বলে ফেলল, সে বৃদ্ধবয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে। শুনেই দ্বারপাল উৎফুল্ল।—আসুন আসুন, এখনি স্বর্গে প্রবেশ করুন। পৃথিবীতে আপনার নরকভোগ হয়ে গেছে।[২৩]

তবে ন্যায্য ব্যাকুলতা কদাপি বিদ্যাসাগরের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি। রসময় কাহিনীটি এই :

"বর্ষার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডায়েবিটিস প্রকোপ বাড়িত। নীচের ঘরে তাঁর দৌহিত্ররা ও আর কেহ-কেহ ছিল। তিনি প্রস্রাব করিতে যাইবার সময় দৌহিত্রদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ দেখি শালারা, এখন কী ভালো লাগে?' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। প্রস্রাবের পর ফিরিবার পথে মদনমোহন তর্কালঙ্কার-বংশীয় বিনোদবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ দেখি, এখন কী ভালো লাগে?' বিনোদ বড় রসিক ছিল। উত্তর দিল, 'ঠাকুরদাদা, যা ভালো লাগে তা তো তোমার নাই, আমারও এখানে নাই। যা ভালো লাগে তা পাবার উপায় নাই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ১০টা টাকা দিয়া বলিলেন, 'যা শালা, এখুনি শ্বশুরবাড়ি যা, তোর বিরহ লেগেছে। এখুনি যা, নইলে ট্রেন পাবি না'।"[২৪]

বিদ্যাসাগর মেঘদূত কাব্যের খুবই অনুরাগী ছিলেন।

লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের জ্ঞান ছিলনা, একথা বললে মার খেতে হবে। গভীর স্তরে তার রূপ কী ছিল, তা নিয়ে আমরা পরে নাড়াচাড়া করব। এখন উপর স্তরের দু'একটি কাহিনী শুনে নেওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণকমল,

বিদ্যাসাগরের "সাংসারিক লোকজ্ঞতা এবং সাধারণ বিষয়বুদ্ধির" দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

শ্রীহট্টের একটি লোক চাকরিপ্রার্থনায় বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছে। "সরাসরি যদি চাকরি না দেন, অন্তত সুপারিশ করুন, তাতেই হয়ে যাবে।" বিদ্যাসাগর তখন আর সংস্কৃত কলেজে বড় চাকরি করছেন না। এই অবস্থায় নিছক সুপারিশে বিশেষ কাজ হবে বলে তাঁর মনে হয়নি। লোকটি কিন্তু নাছোড়—না, ওতেই হবে। বিদ্যাসাগর সুপারিশপত্র লিখে দিলেন। লোকটি একটি উৎকৃষ্ট সিলেটি পাটি এনেছিল। সেটি বিদ্যাসাগরকে নিতে হবে। বিদ্যাসাগর গররাজি, লোকটিও ছাড়বার পাত্র নয়। অগত্যা নিতে হলো।

কৃষ্ণকমলকে বিদ্যাসাগর ঘটনাটির গল্প করছিলেন:

বিদ্যাসাগর: আমি বেশ বুঝলুম, চাকরি না হলে উমেদার পাটির দাম চাইবে। এই ভেবে সেটি ব্যবহার না করে তুলে রাখলুম। সে অনেক হাঁটাহাঁটি করেও চাকরি জোটাতে পারলে না। তখন বিদায় নেবার সময়ে আমার কাছে এসে বললে, 'মশাই, পাটির দামটা পেলে ভালো হয়।' আমি বললুম, বাপু, তোমার পাটি একদিনের জন্যও ব্যবহার করিনি। ওই দ্যাখো, তোলা রয়েছে। তুমি ফেরত নিয়ে যাও। সে শুনে ভ্যাবাচাকা। পাটিটা অবশ্য নিয়ে গেল।[২৫]

বাস্তব বুদ্ধি ও বাকপটুত্ব কখনো কখনো জীবনদায়ী হয়। তেমন একটি বিদ্যাসাগরী ঘটনা এই:

বিদ্যাসাগর তখন বেথুন (বা বীটন) কলেজের সেক্রেটারি। অনেক উচ্চপদস্থ সাহেব কমিটির মেম্বার। এক ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক প্রধান শিক্ষিকা। কোনো কারণে তিনি স্কুলের এক পণ্ডিতের উপর চটেছেন। তাঁকে তাড়াবেনই। পুরুষের ক্রোধ নয়, নারীর ক্রোধ, ধিকি ধিকি জ্বলে। কমিটির কাছে তিনি তাগিদ দিলেন পণ্ডিতকে কর্মচ্যুত করার জন্য। বিদ্যাসাগর যেহেতু সেক্রেটারি, তাই তদন্তের ভার তাঁর উপরই দিতে হলো। অনুসন্ধান করে তিনি দেখলেন, পণ্ডিতের কোনও দোষ নেই। সেকথা তিনি কমিটির সামনে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু নিরপরাধ হলেই কি ছাড় পাওয়া যায়? কমিটির অধিকাংশ সদস্য সাহেব। তাঁরা ফিরিঙ্গী শিক্ষিকার প্রেসটিজ ব্যাপারটি উড়িয়ে দেবেন কি করে? সুতরাং তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, "অন্তত দু'এক মাসের জন্য পণ্ডিতকে সাসপেণ্ড করা যাক, তুমি কী বলো বিদ্যাসাগর?" বিদ্যাসাগর বলবার আগে সবই বুঝেছেন। পণ্ডিতকে পুরো জবাই থেকে বাঁচাতে হলে, ল্যাজের চুল ছাঁটতে দিতে রাজি হতেই হবে। হাসির সঙ্গে তাঁর অনবদ্য সমাধানী উত্তরটি বেরিয়ে এল:

"Yes, do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her.'

"আচ্ছা, তবে তাই করো, যদি তোমরা মনে করো যে, কিছু বলিদান না দিলে দেবী সন্তুষ্ট হবেন না।"

ফিরিঙ্গী-নারী-প্রেমী সাহেবদের রসবোধ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল সার্টিফিকেট দিয়েছেন :

"ইংরাজেরা আর যাহাই হোক, প্রকৃত রসিকতা (wit) পাইলে গুণগ্রহণ করিতে পারে। বিদ্যাসাগরের appease শুনিয়া সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বাঁচিয়া গেলেন।"[২৬]

ইংরেজ-চরিত্রের এই সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে আমরাও বাঁচলুম। নচেৎ স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়ে তো উল্টো ধারণাই হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যদেশে তিনি তো কেবল ফরাসিদের জাত রসিক দেখেছিলেন, সেখানে জার্মানরা দিঙ্‌নাগ, আমেরিকনরা স্থূল, এবং "ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ।" মনে হয়, গরম ভারতে এসে ইংরেজদের হাসির উন্নতি হয়েছিল!

ভারতীয়দের অন্ধ পাশ্চাত্ত্য নকলনবিশী দেখেও বিদ্যাসাগরের হাসি।

একবার বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, সরকারের কাছে লম্বা দরখাস্ত হাজির ক'রে (যেটা তার প্রধান কাজ) বিশেষ কিছু সুরাহা করতে পারে নি, বরং বরাতে অপমান জুটেছিল। বিদ্যাসাগর সেখানে গিয়ে সকলকে বিমর্ষ দেখলেন। ফিরে এসে তিনি বৃটিশ ইন্ডিয়ান সভার দাড়িনাড়া মুরুব্বিয়ানার স্বর নকল করে বললেন, "আজকে political world-এ বড়ই gloom" দেখে এলুম। এমন মুখভঙ্গি করে gloom শব্দটি বললেন যে, "তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল।"[২৭]

'গ্লুম্' কাটিয়া গেল !!

বিদ্যাসাগর 'অমঙ্গলে' রসিকতাও করতেন।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ দ্বিতীয় পক্ষে বিধবাবিবাহ করবেন। মহা উৎসাহে বিদ্যাসাগর তাতে সাহায্য করছেন। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল যেন কন্যাদায় তাঁরই। সেই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের এক বন্ধু তাঁর ৯ বছর বয়সের কন্যা নিয়ে উপস্থিত হন। কন্যাটি যখন বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করল, তখন তিনি মারাত্মক আশীর্বাদটি করলেন।

বিদ্যাসাগর : মা, আয়ুষ্মতী হও। রাজার মতো স্বামী হোক। তারপর বিধবা হয়ে আমার কাজ এগোবার ক্ষেত্রটি তৈয়ারী করো, আমি যেন তখন আবার বিধবাবিবাহ দেবার সুযোগ পাই।

শিবনাথ শাস্ত্রীর বিবেচনায়, এটি বিদ্যাসাগরের "সূক্ষ্ম রসবোধের" দৃষ্টান্ত। হাঁ, প্রাণঘাতী সূক্ষ্মতা এতে আছে বটে! উক্ত কন্যার বেচারা সম্ভাব্য 'রাজার মতো স্বামীটি'কে, আহা, বিদ্যাসাগরের সংস্কারকর্মের বেদীমূলে প্রাণদান করতে হবে!! শিবনাথ লিখেছেন, "তাঁহার এইরূপ কৌতুকপূর্ণ আশীর্বাদ শ্রবণে উপস্থিত সকলে উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল।" অগত্যা। বাইরে হেসে, অনেকে নির্ঘাত মনে মনে বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাত ক'রে, 'জীবন জীবন' বলেছিলেন। কিন্তু সংস্কারক বিদ্যাসাগর, লোকসংস্কারের

ধার ধারতেন না বলে, "বালকসুলভ সরল হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'বন্ধুদের কন্যারা যদি বিধবা না হয়, তাহলে আমার আদর্শ বাস্তবে পরিপূর্ণ হবে কিরূপে, বলো তো ? সমস্ত সমাজ যেরূপ বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে তাহাতে এরূপ ঘটনা ছাড়া আমার কর্মসূচী কার্যে পরিণত হওয়া তো সম্ভব নয়।"[২৮]

বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষেত্রটিতে বিদ্যাসাগরের অনুসরণ করেছেন। তিনি স্থির করেছিলেন, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিধবাবিবাহের (তৎসহ বহুবিবাহের) ঝঞ্চাট দেখাবেন। অথচ বিধবাটিকে মনের দিকে প্রথম স্বামী সম্বন্ধে এমন ধোয়া-মোছা অবস্থায় রাখতে হবে যাতে সে দ্বিতীয় বিয়ের দিব্যি যুগ্যি হয়ে ওঠে। তাই কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বামী তারাচরণকে পুরো ভূত-বাঁদর সাজিয়ে, অল্পদিনের মধ্যে মেরে ফেলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্ঘাত বিদ্যাসাগরের মতো কুন্দকে আশীর্বাদ করেছিলেন, বাছা, তুমি বিধবা হয়ে আমার উপন্যাসের কাহিনীর সুবিধা করে দাও।

নাতনির সঙ্গে দাদুর পুরনো কালের রসিকতাও বিদ্যাসাগর করতেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা—১৬ বৎসর বয়সেও অবিবাহিত, যা সেকালের রীতিতে অনুচিত। হেমলতার বিদ্যাসাগরকে দেখার বড়ো ইচ্ছা, কিন্তু মনে সংকোচ—"পণ্ডিতমশাই তো গোঁড়া হিন্দু," তিনি বিধবাবিয়ের ব্যবস্থা করলেও বেশি বয়স পর্যন্ত কোনো মেয়ের কুমারী থাকা কি পছন্দ করবেন ? কন্যাকে আশ্বস্ত করে শিবনাথ তাঁকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি হাজির হলেন। বিদ্যাসাগর হেমলতাকে পরম স্নেহে গ্রহণ করলেন। তারপর কথাবার্তার মধ্যে শিবনাথ যখন তাঁর মেয়ের আশঙ্কার কথা বললেন তখন বিদ্যাসাগর উচ্চকণ্ঠে হাসলেন।

বিদ্যাসাগর : কি গো মেয়ে, তুমি বুঝি ভাবছ বেশি বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেবার ব্যাপারে তোমার বাবাই শুধু বড়ো সংস্কারক, বাহাদুর লোক ? তুমি বুঝি জানো না, আমি আমার মেয়েদেরও বেশি বয়সে বিয়ে দিয়েছি। তাদের বিয়ের বয়স তোমার চেয়েও বেশি হয়েছিল।

তারপর বিদ্যাসাগর মিষ্টি রসিকতাটি করলেন।

বিদ্যাসাগর : তাছাড়া তোমার চিন্তা কি ? তোমার বাবা যদি তোমার বিয়ে ঠিক করতে না পারেন—উপযুক্ত পাত্র তো কাছেই হাজির—এই-যে আমি। যেদিন তুমি বলবে, সেদিনই তোমাকে গিন্নী করে আমার বাড়িতে নিয়ে আসব।

সকৌতুকে হেমলতার চিবুক ধরে বললেন—"কি গো, বুড়ো বর তোমার পছন্দ হয় ?"[২৯]

বিদ্যাসাগরের চাপা রসিকতার একটি নমুনা এরপর দেওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের যৌবনবন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার অনধিক বয়সে লোকান্তরিত হন। তিনি যথেষ্ট টাকা রেখে গিয়েছিলেন। তবু তাঁর বৃদ্ধা জননীকে অন্নবস্ত্রের জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষা করতে হতো। এই সময়ে রোগ

শোক ও আহার-কষ্টে তাঁর দেহ জীর্ণশীর্ণ, তার উপর চোখে ভালো দেখেন না। বিদ্যাসাগরকে তিনি কাতরভাবে বললেন, কাশীতে থাকার জন্য তাঁর মাসে পাঁচটি টাকা হলেই চলে যেত, কিন্তু চোখে ঠিক দেখতে পান না বলে একজন ব্রাহ্মণ পরিচারিকা না থাকলে চলবে না। সেজন্য মাসে দশটি টাকা দরকার। করুণকণ্ঠে আরও বললেন, "বাবা, আমার যে শরীরের অবস্থা তাতে বেশিদিন বাঁচব না, বেশিদিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না।" বিচলিত বিদ্যাসাগর প্রতি মাসে তাঁকে দশ টাকা পাঠাতে লাগলেন।

কিন্তু কাশীর জলবাতাস মৃতসঞ্জীবনী সুধাভরা। এক বছর পরে কাশীতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বৃদ্ধাকে চিনতেই পারেন নি, কারণ "তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট,...চক্ষুর দোষ এককালে অন্তর্হিত।" বিদ্যাসাগরের নিজের তেমন কোনো স্বাস্থ্যোন্নতি হয়নি, তাই তাঁকে চিনতে বৃদ্ধার অসুবিধাও হয়নি। তিনি বললেন, "বাবা, তুমি আমাকে চিনতে পারলে না? আমি যে মদনের মা গো।" বিদ্যাসাগর তখন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে তবে তাঁকে চিনতে পারলেন। কাশী-মাহাত্ম্যে বোধ হয় তাঁর হৃৎকম্প হলো।

বিদ্যাসাগর: আপনি জুয়াচুরি করে আমাকে বিলক্ষণ ঠকিয়েছেন।

বৃদ্ধা (শঙ্কিত): বাবা, আমি কী জুয়াচুরি আবার করলাম?

বিদ্যাসাগর: শুকনো হাড় আর কানা চোখ দেখিয়ে আপনি বলেছিলেন, আমার যে অবস্থা ঘটেছে তাতে বেশিদিন বাঁচব না, আমার ভার তাই তোমাকে বেশিদিন বইতে হবে না। কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে অন্তত আরও বিশ বছর বাঁচবেন। তখন যদি তা বুঝতে পারতুম তাহলে কি আপনাকে মাস মাস দশ টাকা দিতে রাজি হতুম?

বৃদ্ধা বুঝলেন, বিদ্যাসাগর রহস্য করছেন। তখন তাঁর মুখে হাসি ফুটল।

এর পরে বিদ্যাসাগর যা লিখেছেন তাতে হাসি যদি থাকে তবে তা করুণ হাসি:

"আঠার বৎসর হইল, তাঁহার সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। এদেশে থাকিলে, এত দিন জীবিত থাকিতেন, কোনওরূমে এরূপ প্রতীতি হয় না।"৩০

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' বইয়ে উপরের কথাগুলি লিখেছিলেন। এর তিন বৎসর পরে তাঁর দেহান্ত হয়। ১৮৭৫ সালের ৩১মে তারিখে যে উইল করেন তাতে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাকে মাসিক ৮ টাকা দিয়ে যেতে হবে, এমন শর্ত আছে। (মৃত্যুর পরে মাত্র ২ টাকা মাসিক ভাতা হ্রাসের ব্যবস্থা!!)। আমরা জানি না, কিন্তু জানতে কৌতূহল হয়, বৃদ্ধা বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন কিনা?

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে হেলেন তার পিতা সেলুকসকে বলেছিল, বেশি বই পড়া ভালো নয়, তাতে মৌলিকতা নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরও একটি ছাত্রকে প্রশ্নের উত্তরে কী "উপায়ে নির্ভুল লেখা যায়," তা বাতলে দিয়েছিলেন:

"খুব সোজা উপায় আছে—কখনো লিখো না।"[৩১]

এর উল্টোদিকে পাই মার্কসবাদী নেতা নামবুদ্রিপাদের উক্তি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি সব সময়ে তোতলা? "না না, মোটেই নয়—শুধু যখন কথা বলি তখন তোতলা।"

বিদ্যাসাগর নিজের 'উঠবার' ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা জানতেন।

এক পণ্ডিত (পাণ্ডিত্যের গর্বে স্ফীত): আমি মস্ত পণ্ডিত। কলকাতার লোকেরা তাই খাতির করে আমাকে ঠাকুরদাদা বলে ডাকে।

বিদ্যাসাগর (সবিনয়ে): আমি কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের উপরে উঠতে পারব না।[৩২]

কথায় ক্ষুরের ধার—বিদ্যাসাগরের। বাঙালী জাতিকে নেড়ে-চেড়ে তাঁর বিতৃষ্ণার শেষ ছিল না। একবার চারজন পণ্ডিতকে নিয়ে তিনি লাট-দরবারে গেছেন। পণ্ডিতরা দেখলেন, সকলেরই মাথায় উষ্ণীষ, কেবল বাঙালীদের মাথায় নেই। তাঁরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্ন শুনে বিদ্যাসাগরের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি:

বিদ্যাসাগর: বাঙালী মাতৃভূমির আর কোনো কাজ করতে পারেনি। তবে মাথার উষ্ণীষ ত্যাগ করে মাতৃভূমির ভার কমিয়েছে বটে।[৩৩]

বিবেকানন্দ কুয়োর ব্যাঙের কথা প্রায়ই বলতেন—নিজের ক্ষুদ্র জগৎ নিয়ে অভিমানী লোকগুলি সম্বন্ধে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই ধরনের কুয়োর পণ্ডিতদের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হত। তিনি গ্রামের একটা স্কুলে গেছেন পরিদর্শনের জন্য। ওই স্কুলের ছেলেরা বাংলা ও অঙ্ক ভালোভাবে শিখলেও ভূগোল ব্যাপারটার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন—"পৃথিবীর কত রকম গতি? কোন্ গতির জন্য কত সময় লাগে?" ছেলেরা ঝটপট জানালো, "পৃথিবীর কোনো গতিই নেই; গতি আছে সূর্যের; সূর্য পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে।" বিদ্যাসাগর পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেরা এসব কী বলছে? পৃথিবী কি সূর্যের চারধারে ঘোরে না?" শুনে পণ্ডিত অবাক: "সে কি? সত্যি সত্যি পৃথিবী ঘোরে নাকি? আমি তো ভাবতাম পৃথিবী এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।" বিদ্যাসাগর তখন পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি-তত্ত্ব বুঝিয়ে বললেন, "পৃথিবী সত্যি-সত্যি ঘোরে।" তাতে পণ্ডিতের উদার উত্তর: "ঘোরে ঘুরুক তাহলে পৃথিবী। চিরকাল ঘুরুক। পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে কে মাথা ঘামায়?"[৩৪]

এইখানে নবীন সেনের রচনাংশ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, যার মধ্যে সংস্কারপন্থী ও না-সংস্কারপন্থীর শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘর্ষণ।

নড়াইলে এক "সরলপ্রকৃতি নিরক্ষর লাঠিয়াল" জমিদার নিজের ছেলের জন্য গৃহশিক্ষক রেখেছেন। নিয়োগ করার সময়ে শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন,

"আমার পোলারে তিনটা কথা শিখাইতে পারিবে না—১. আমাদের দেবদেবী-মূর্তিগুলি মাটি ও খড়ের পুতুল ; ২. আমি মরিয়া গেলে 'মরা গরু আর ঘাস খায় না' বলিয়া আমার শ্রাদ্ধ না করা ; ৩. আর আমার পূর্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছে—পৃথিবী তিনকুণে, তুমি গোল বলিয়া শিক্ষা দিবে না।"

শিক্ষক মহাশয় শর্তমতো দায়িত্ব নিলেন। তারপর পিতা পুত্রের প্রশ্নোত্তর :

পিতা : কহ দিনি, আমাদের দেবদেবীগুলিন কি ?

পুত্র : দেব দেবী মাটি খড় নহে।

পিতা : মরা গরু ঘাস খায় কিনা ?

পুত্র : খায়।

পিতা : পৃথিবী কিরূপ ?

পুত্র : পৃথিবী তিনকুণে।[৩৫]

ব্রাহ্মণ থাকলেই ব্রহ্মতেজ থাকে। এই ব্রহ্মতেজের জোরেই ব্রাহ্মণরা বহু যুগ ধরে আদায়পত্তর করে আসছেন। কিন্তু এই কলিযুগে কী যে হয়েছে, ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ভয়ডর গেছে কমে, এখন আর বড়মানুষেরা ঢালাও-হাতে বৃত্তি ইত্যাদি দান করেন না, উল্টে তাঁরা প্রার্থী ব্রাহ্মণকে দেখলে চটে যান।

ভাটপাড়ার কিছু পণ্ডিত কলকাতায় এসেছেন। তাঁদের একজন এসেছেন এক বড়লোকের কাছে বার্ষিক বৃত্তি আদায়ের জন্য। সেখানে ব্যবহারটা বোধ করি ভালো পান নি। পণ্ডিতরা তারপর বিদ্যাসাগরের কাছে দেখা করতে গেছেন। কথায় কথায় একজন বললেন, "আজকাল ব্রাহ্মণদের আর সে ব্রহ্মতেজ নেই।" শুনেই বিদ্যাসাগর বললেন, "কী বলছেন ? ব্রহ্মতেজ নেই ? না না, সে তেজ বরং অনেক বেড়ে গেছে। আগেকার কালে আপনারা কারও কাছাকাছি গেলে তবে তিনি তেজ টের পেতেন ; আর এখন আপনারা কোনো বড়মানুষের দরজা পেরোলেই তিনি গরম হয়ে ওঠেন—আপনাদের এমন তেজের জোর।"[৩৬]

শব্দশ্লেষ ও অর্থশ্লেষের এক সেরা দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর সৃষ্টি করেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন কয়েকটি শব্দে কতখানি সকৌতুক ব্যঙ্গ করা যায়।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের কাছে গেছেন কিছু পাবার প্রত্যাশায়। প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—"আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আমার বড়ো দুরাবস্থা।"

বিদ্যাসাগর বললেন, "আ-কার দেখেই তা বুঝেছি।" তারপর বললেন, "আ-কার বদলে এসো, সাহায্য পাবে।"

ব্রাহ্মণ ভাবলেন, ময়লা ধুতি-চাদর দেখে বুঝি বিদ্যাসাগর ও-কথা বলছেন। সুতরাং তিনি যথাসাধ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে পুনশ্চ নিজের 'দুরাবস্থা'-র কথা বললেন। পুনশ্চ বিদ্যাসাগরের মুখে একই কথা শুনলেন। এ-রকম কয়েকবার ঘটার পরে বিপন্ন ব্রাহ্মণকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন রামসর্বস্ব পণ্ডিত। 'দুরাবস্থা' অশুদ্ধ শব্দ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরিচয় দিয়ে কথাটা বলা চলেনা, বলতে হবে, 'দুরবস্থা'। পরের বার ব্রাহ্মণ আ-কার বর্জন করে প্রার্থনা জানালেন। বিদ্যাসাগর বললেন, "তুমি আ-কার বদলেছ, এবার

তোমার কথা শুনবো।"[৩৭]

যিনি ওই ব্রাহ্মণকে সুশিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই রামসর্বস্ব পণ্ডিত রসিক মানুষ। তিনিও বিদ্যাসাগরের বাড়িতে কিছু প্রত্যাশা করেই প্রথম হাজির হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে দ্বারে দেখলেন।

কে ?

জীর্ণাতরী।

ওখানে কেন ?

আজ্ঞে, সাগরে পাছে ডুবে যাই, এই ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছি।

এত খানি ? এদিকে এসো, এদিকে এসো। তুমি তো ভেসেছ, ডুববে কেন ? তা লেখাপড়া কতদূর ?

আজ্ঞে বর্ণপরিচয়।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, তোমার যে বর্ণপরিচয় আছে, সেটুকু বুঝতে পেরেছি।[৩৮]

যিনি স্বয়ং পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, তিনি স্বতঃই অপরের পাণ্ডিত্যের বৃথা অহঙ্কার সহ্য করতে পারতেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লখনৌ-এ সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে 'একটিনি' করবার জন্য যাবার আগে বিদ্যাসাগরের কাছে কর্মাটাঁড়ে গিয়েছিলেন, একথা আগেই বলেছি। তাঁকে সেখানে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' পুরো পড়াতে হবে। তা শুনে বিদ্যাসাগর চিন্তিত হলেন। বললেন, "বইটা বড়ো কঠিন।" বিদ্যাসাগর বইটির আট ফর্মা ছাপিয়েছিলেন, তা পরে কলকাতায় গিয়ে, হরপ্রসাদকে দিয়ে বললেন, "কিন্তু বাকিটা বড় গোল।" হরপ্রসাদ বললেন, "রাজকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় বলেন, ও-বইটার সংস্কৃত বড়ো কাঁচা।" রাজকুমার সর্বাধিকারীর কথাগুলো বিদ্যাসাগরের কাছে পাকামি বলেই মনে হলো। তীক্ষ্ন কণ্ঠে বললেন, "তাই তো, রাজকুমার এতবড় পণ্ডিত হয়েছে যে কাঁচা-পাকা সংস্কৃত চিনতে পারে ?"[৩৯]

বিদ্যাসাগরের বিচারে, হর্ষচরিত বাণভট্টের অপর কাব্য কাদম্বরীর তুল্য নয়, এতে অর্থবোধে অনেক জায়গায় অসুবিধা ঘটে, তবু এটি 'প্রশংসনীয় গ্রন্থ।'[৪০]

সংস্কৃত-জ্ঞান সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যাভিমানীদের গর্ব নিয়ে বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করতেনই। কৃষ্ণকমল সাক্ষ্য দিয়েছেন :

"আজকাল একটু-আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ-কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দীতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে-কহিতে aside আমাকে বলিলেন, 'এদিকে কথায়-কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হচ্ছে, তবু হিন্দী বলা যাবে না'!"[৪১]

সঙ্গদোষের মতো সঙ্গগুণও হয়। বিদ্যাসাগরের সংসর্গে চণ্ডীচরণের

রসবোধ কিছু বেড়েছিল। তাই শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিদের শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য জাহির করা ব্যাপারটার হাস্যকর চেহারা দেখাতে তাঁর বিদ্যাসাগর জীবনীতে একটি গল্প বলেছেন—রসময় গল্পটি।

এক পথিক পথে যেতে যেতে দেখল, এক ব্যক্তি রাস্তার ধারে বসে বুক চাপড়ে কাঁদছে। পথিক জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই এমন করে কাঁদছ কেন?' লোকটি বলল, 'আমার বেচারা হোসেন মরেছে।' তাই না শুনে পথিকও হায়-হায় করে উঠল—যেন তারও বড়ো আপনার জন মরেছে। সে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ির দিকে চলল। পথে আর একজনকে সে বেচারা হোসেনের মৃত্যুসংবাদ দিল। সেও কাঁদতে শুরু করল। এমনি করে বহু লোক জুটে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। এক বুদ্ধিমান লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। এই গণ-কান্না দেখে সে ধীরভাবে একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, যার শোকে তুমি এমনভাবে কাঁদছ, সে তোমার কে হয়?' শোকার্ত লোকটি বলল, 'আমার কেউ হয় না।' তখন প্রশ্নকারী বলল, 'তাহলে সে কার কে হয়?' সে লোকটি বলল, 'তা তো জানি না।' 'তাহলে কাঁদছ কেন?' এবার এ লোকটি কান্না থামিয়ে, খুব ভাবিত হয়ে বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন। কাঁদবার আগে আমার জানা উচিত ছিল, কে মরেছে, কার জন্য কাঁদছি। ঠিক আছে, আমি এখনই জেনে আসছি।' সে একের পর এক জিজ্ঞাসা ক'রে, তাদের মুখে একই উত্তর শুনতে শুনতে এগিয়ে গিয়ে, সবশেষে একেবারে প্রথম কান্নার লোকটিকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে মরেছে ভাই, হোসেন তোমার কে হয়?' সে চোখ মুছে বলল, 'ওগো সে যে আমাদের বড়ো আপনার জন, একেবারে বাড়ির লোকের মতো, আমাদের আদরের পোষা ষাঁড় হোসেন গো।' বলেই লোকটি দ্বিগুণ জোরে মাথা চাপড়াতে লাগল।[৪২]

বিদ্যাসাগরের অপর বিখ্যাত জীবনীকার বিহারীলালও মজার গল্প শুনিয়েছেন, তবে উল্টো কথা প্রমাণ করতে।

গল্পটি এই:

একদিন গঙ্গাতীরে স্নান করতে-করতে স্মার্ত রঘুনন্দনের কাছা খুলে গিয়েছিল। তাই না দেখে, অন্য ব্রাহ্মণরা ভাবলেন, গঙ্গায় স্নান করার সময়ে কাছা খোলা বুঝি রঘুনন্দনের নববিধান। তাঁরাও অবিলম্বে নিজেদের কাছা খুলে ফেললেন। রঘুনন্দন স্নানান্তে দেখেন, সকলেরই কাছা খোলা। এইরকম সমবেত মুক্তকচ্ছতা দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি ব্যাপারটা কী, জানতে চাইলেন—এবং জানলেন।

গল্পটি বিহারীলালের উপস্থিত করার কারণ, গ্রান্টসাহেব বলেছিলেন, তিন-চারশো বছর আগে পণ্ডিত রঘুনন্দন নিজের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের উদ্যোগ করেছিলেন। গল্পটি শুনিয়ে বিহারীলাল বলেছেন, রঘুনন্দন ও-ধরনের চেষ্টা করেছেন, এটা একেবারেই বাজে কথা। যাঁর কাছা খুললেই সব ব্রাহ্মণের কাছা খসে পড়ে, সমাজের উপর যাঁর এমনই বিপুল প্রভাব, তিনি ইচ্ছা করলে কি বিধবাবিবাহ চালু করতে পারতেন না?[৪৩]

এতক্ষণ বিদ্যাসাগরী কুঠারের কিছুটা ঝলসানি, অধিকতর ঝিকিমিকিই দেখছিলুম। কুঠারের কোপ, কোথায় ? পরের পরিচ্ছেদে তার চেহারা দেখব। তার আগে বিদ্যাসাগরের পিতার পরিহাসটুকু দেখে নেওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ ব্যবস্থা পুস্তক প্রকাশ হবার পরে সারা দেশ জুড়ে হৈ-চৈ। এর বড়ো অংশে নিন্দা, কুৎসা—এবং বাপান্ত। ঠাকুরদাস বউবাজার পঞ্চাননতলার বাসায় আছেন। সেখানে একদিন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র ও ডাঃ নবীনচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তার মধ্যে হেসে বললেন :

"ঈশ্বর, আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করতে হবে না, অন্যেরা তোমার হয়ে করে ফেলেছে।"[৪৪]

পিতা রসিকতা কম করতেন। কিন্তু যখন করতেন সে মোক্ষম।

কুঠারের কোপ

॥ ১ ॥

'তরবারি অপেক্ষা কলম অধিক শক্তিধর'—কথাটা এখন ছেঁদো-কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাতের পিছনে দার্শনিকদের কলমের স্ফুলিঙ্গ কাজ করেছিল, এবং সে-ব্যাপারে ভলটেয়ারের ভূমিকা ছিল—এ-কথাও সহজেই মেনে নেওয়া হয়। 'অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক-রাজা' বলে কথিত ভলটেয়ারের শাণিত কলমের ছুরিতে অনেক ভণ্ডামী, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের মর্মচ্ছেদ হয়েছে। বহুমুখী প্রতিভাধর এবং সাহিত্যের নানা শাখায় স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল ভলটেয়ার, 'বুদ্ধির মুক্তিদাতা' রূপে স্বীকৃত ও বন্দিত। শক্তিশালী অত্যাচারীরা ভলটেয়ারের বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য। সেজন্য তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে এবং দেশত্যাগ করতে হয়েছে। কেবল ক্ষমতাবানদের নয়, প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদেরও তিনি ছিন্নভিন্ন করেছেন। আর তাঁর বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ভণ্ড পাদরীসমাজ। তাদের ছড়ানো মোহজাল থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে তিনি প্রয়াসী। অথচ তিনি নাস্তিক নন, যদিও খ্রীস্টান-ঈশ্বর বা হিব্রু-ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। একথাও বলতে হবে, রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ অবিচারকে আক্রমণ করলেও তিনি রাজতন্ত্রকে বরবাদ করে দেন নি—হৃদয়ধর্মী রাজতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল। সব জড়িয়ে ভলটেয়ার হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপের চিন্তাজগতে এক প্রধান শক্তি।

এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, ভলটেয়ার যা-কিছু করেছেন, স্ফূর্তিতে করেছেন। হেসে, হাসিয়ে, অপরের সর্বনাশ করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। ভলটেয়ারী উইট পৃথিবী-বিখ্যাত। প্রাণঘাতী শর নিক্ষেপ করবার সময়েও তিনি তার ডগায় হাসির বিষ লাগিয়ে দিতেন।

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এতখানি ভলটেয়ার-কথা বলবার হেতু বিজ্ঞ পাঠকেরা অবশ্যই ধরে ফেলেছেন। উপরের কথাগুলি অল্পস্বল্প বদলে দিব্যি বিদ্যাসাগরের নামে চালিয়ে দেওয়া যায়। সে-কাজ করলে কিন্তু, খুবই দুঃখের বিষয়, মৌলিকতার গৌরব পাবো না, কারণ অন্য কেউ নন, বিদ্যাচূড়ামণি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আগেই বিদ্যাসাগরকে একাংশে ভলটেয়ারতুল্য বলেছেন—বিশেষত বিদ্রূপাত্মক রচনার ক্ষেত্রে। পূর্বে ভলটেয়ার সম্বন্ধে অল্প যে-সংবাদ দিয়েছি, তাতে উভয়ের তুলনার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা যায়, যার অবসর এখানে নেই। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইংরেজ ডঃ জনসনের তুলনা রাজনারায়ণ বসু, রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার প্রমুখ অনেকেই করেছেন, তাও দেখেছি।

বিদ্যাসাগরের গুণগান করবার সময়ে কৃষ্ণকমল কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতিভার সমাদরে বিরত ছিলেন না। তারানাথ তর্কবাচস্পতি, 'বাচস্পত্যভিধান'

(১ম-২২শ খণ্ড ; ১৮৭৬-৮৪) রচনা করে যথার্থ এনসাইক্লোপিডিয়া রচনার গুণগৌরব পাবার যোগ্য, একথা স্বীকার করার পরে, কৃষ্ণকমল জানিয়েছেন—তারানাথ বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়ে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করলেও বহুবিবাহ রদ প্রসঙ্গে যখন প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন, তখন—

"বিদ্যাসাগরের সমস্ত বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল। আমরা তখন ফরাসি বিপ্লব-সাহিত্যে মশগুল ; বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপাত্মক রচনা পাঠ করিয়া ভল্‌টেয়ারকে মনে পড়িত।"[১]

বিদ্যাসাগর স্বনামে বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্বন্ধে যে-সব লেখা লিখেছেন, তাদের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছোঁয়া ছিলনা তা নয়—বিশেষত বহুবিবাহ সংক্রান্ত লেখায় তিনি প্রতিবাদীদের সমালোচনা করবার সময়ে ধৈর্য হারিয়ে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, এমন অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। সে বিষয়ে আলোচনা আগে হয়েছে। বিদ্যাসাগর দেখলেন, তিনি যা বলতে চান, নিজ মর্যাদা অনুযায়ী, স্বনামে সেকথা বলা চলেনা। অথচ কথাগুলি বলা দরকার। যত চড়া ঠাট্টা-তামাশা গালমন্দই দেওয়া যাক, ওই স্বার্থপর লোকগুলির অপকর্মের হিসাব করলে তা বাড়াবাড়ি হবে না। রাস্তার মাঝখানে বজ্জাতদের টিকি টেনে, কাছা খুলে, থাপ্পড় কষিয়ে, বাপান্ত করতে হলে, সে কাজ 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়' করতে পারবেন না ; কিন্তু ছদ্মবেশে চ্যাংড়া ভাইপোর ভূমিকা নিয়ে তা করা যায়—

বিদ্যাসাগরের 'ভাইপোস্য' সিরিজ অতএব শুরু হয়ে গেল : 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) ; 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) ; 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪) ; 'বিনয় পত্রিকা' (১৮৮৪) ; 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬)।

বইগুলিতে ছদ্মনামে বিদ্যাসাগর 'যা-ইচ্ছে-তাই' লিখে গেছেন। বিদ্যাসাগরের সকল সামাজিক মত মানতে অপারগ, অথচ তাঁর সম্বন্ধে অপারসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বিহারীলাল সরকারের মতো মানুষের কাছে ওইসব লেখা 'যাচ্ছেতাই' বলেই মনে হয়েছিল :

"যশোহর হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা ও কলিকাতা ধর্মসভা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়-কৃত বিধবাবিবাহ প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছিল। যশোহর হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভার চতুর্থ সাংবাৎসরিক অধিবেশনের সময় নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় আহূত হন। সকলেই বিধবাবিবাহ আশাস্ত্রীয় ও অকর্তব্য বলিয়া বক্তৃতা করেন। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া উপযুক্ত ভাইপো-প্রণীত 'ব্রজবিলাস' এবং উপযুক্ত ভাইপো-সহচর-প্রণীত 'রত্নপরীক্ষা' নামক দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি পুস্তকের প্রকৃত গ্রন্থকারের নাম নাই। রাষ্ট্র এইরূপ, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রণেতা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণবাবু আমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত সমুদায় পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'রত্নপরীক্ষা' প্রাপ্ত হইয়াছি। 'ব্রজবিলাস' ও 'রত্নপরীক্ষা'য় পণ্ডিতগণের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে। ইহাদের ভাষা-ভাব বদরসিকতায় পূর্ণ। যদিও রাষ্ট্র, ইহা

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ, গম্ভীর-চরিত্র লোক এরূপ চপলতা করিবেন, ইহা প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

"যশোহর ধর্মরক্ষিণী সভায় বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করিয়া যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহারই প্রতিবাদ করিয়া 'বিনয় পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের নাম নাই। রাষ্ট্র, ইহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত। ইহাতে নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে। ইহার ভাষা ও ভাব আলোচনা করিলে, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহাও চপলতা দোষে সম্পূর্ণ কলঙ্কিত। তবে নারায়ণবাবুর নিকট হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বলিয়া যে-সকল পুস্তক উপহার পাইয়াছি, তাহার মধ্যে এ-পুস্তকও ছিল।"[২]

শেষ পর্যন্ত বিহারীলালকে প্রায় নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হয়েছে, উপরের লেখাগুলি বিদ্যাসাগরেরই। এবং তিনি নির্দ্বিধায় এ কথাও বলেছেন, "তাহা হইলে [রচনাগুলি] তাঁহার কলঙ্কের কথা, বলিতে হইবে।"[৩]

কলঙ্কের শেষ সেখানেই নয়। বহুবিবাহ প্রসঙ্গেও 'উপযুক্ত ভাইপোর' আবির্ভাব হয়েছিল। এবার আক্রমণের লক্ষ্য তারানাথ বাচস্পতি।

"তারানাথের উপর ভাইপোর তীব্র আক্রমণ। ভাষাভঙ্গি ভীষণ ভ্রূকুটিময়ী। তাহা সভ্য সাহিত্যের সম্মানাস্পদ নহে। [গ্রন্থভুক্ত অসভ্য ছড়ার একটু নমুনা দেবার পরে]···পরে আরও গালিগালাজ গদ্যে।···এ ভাষার ভাবভঙ্গি বিদ্যাসাগরের চরিত্রোচিত নহে।"[৪]

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে 'প্রেরিত তেঁতুল' নামে ২৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকা বেরিয়েছিল, এ ছাড়া নানা গান ও ছড়াও। বিহারীলাল তাদের উল্লেখ করে স্বীকার করেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় বিচারে ভাষাভিজ্ঞতা, তর্কনিপুণতা, মীমাংসাপটুতা, অনুসন্ধিৎসা এবং বিদ্যাবুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন বটে," কিন্তু, "বাচস্পতি মহাশয়কে আক্রমণ করিতে গিয়া ধৈর্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন।"[৫]

অথচ বিহারীলাল বিদ্যাসাগর-পূজারী। বহুবিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের রূঢ় রচনার কঠোর সমালোচনা করতে তাই ছাড়েন নি :

"আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ-সম্বন্ধে যে-তর্কপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন, বাংলায় এ-পর্যন্ত তেমন অল্প লোকেই পারিয়াছে। কোনও-কোনও আত্মস্পর্ধী দাম্ভিক লেখক [বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র] তাঁহাকে সময়ে-সময়ে 'নিজস্ব'হীন বলিয়া তাঁহার গৌরবহানির চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং সময়ে-সময়ে তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থনিচয় সেইসব দাম্ভিক পুরুষের রহস্যবিষয়ীভূত হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না' পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর যাঁহাদের এরূপ স্পর্ধা দেখিয়াছি, তাঁহাদিগকে আমরা কৃপার পাত্র মনে করিয়া রাখিয়াছি। কেননা, সেরূপ স্পর্ধা ব্যাধিবিশেষ।"[৬]

সকলেই বিহারীলাল নন। সবকিছু জিনিসকে সর্বদা বিমর্ষ গম্ভীরভাবে দেখতে হবে—হাসির জিনিস পেলে হাসব না—এমন মাথার দিব্যি সারাক্ষণ মাথায় চাড়িয়ে বসে থাকতে অনেকে রাজি হতে না পারেন। এঁদের মধ্যে দুজন বিখ্যাত মানুষকে পাই, যাঁরা আবার ব্যাপকার্থে পণ্ডিত। অন্যতম হলেন, সুপরিচিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের চক্ষুষ্মান ভক্ত। উচিত কথা, তা যদি তাঁর 'গুরু' বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধেও যায়, বলতে পেছপাও নন, আগেই জেনেছি। শাস্ত্রীয় বিচারে বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষদের মধ্যে অগ্রগণ্য তারানাথ তর্ক-বাচস্পতির বিপুল পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যাত্মক রচনাসমূহের গুরুত্বের বিষয়ে মুক্তকণ্ঠে স্তুতি জানিয়েছেন। তারানাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা আমরা জেনেছি। কৃষ্ণকমল একথাও স্বীকার করেছেন, যা তারানাথও স্বীকার করতেন, একই শাস্ত্রবচনের ব্যাখ্যা নানাভাবে করা যায়। বিদ্যাসাগর নিজের মতো করে যে-ধরনের ব্যাখ্যা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে করেছেন, তা তারানাথকে খুশি করেছিল, আদর করে বলেছিলেন, "আমাদের টিপ্‌লে না হলে এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কে বার করতে পারে?" বহুবিদ্যাবিশারদ কৃষ্ণকমল জানতেন, নানা শাস্ত্রে কারও অধিকার থাকলে তাঁর পক্ষে কোনো একদিকে পুরো সায় দেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ তিনি বিপরীত যুক্তি কতদূর এগোতে পারে, সে বিষয়ে সচেতন। "তারানাথের যে-প্রকার সর্বসংগ্রাহী শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহাতে কোনও একটি সিদ্ধান্তে স্থায়ীভাবে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছু অসাধ্য ছিল। তিনি প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিসকল সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেন। সকল দেশের শাস্ত্রেই প্রায় প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি বিদ্যমান থাকে। ..তারানাথ যদিও প্রথমে বহুবিবাহের অবৈধতার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমার বোধ হয়, কোনও ব্যক্তির অনুরোধে তদ্‌বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে, যদিও তিনি বিধবাবিবাহে মত দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বেশ জানিতেন যে, সে মতের বিপরীতে বিস্তর কথা বলা যাইতে পারে।"[৭]

বিদ্যাসাগরের অবস্থানভূমি ছিল ভিন্ন। তিনি পণ্ডিত, কিন্তু মূলে প্রেমিক সংস্কারক। নিজ পাণ্ডিত্যকে তিনি সংস্কারের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সচেষ্ট। তদনুযায়ী যে-সিদ্ধান্ত তিনি শাস্ত্র থেকে নিষ্কাশন করবেন, তাকে দুর্গ করে, বিরোধী আক্রমণকে প্রতিহত করতেই তাঁর সংগ্রাম। এক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্বহীন বুদ্ধিজীবীর মতো তিনি স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষকে সম-মর্যাদা দান করতে অসমর্থ।

এর উপরে ছিল তাঁর নিজ চরিত্রের অটল নৈতিকতা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা যদি বুদ্ধিধর্ম অনুযায়ী দুই মেরু-প্রান্তীয় সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা স্বীকার করতেন, তাহলে হয়ত তা সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু বুদ্ধিকে অর্থদাস করে যদি তাঁরা সুবিধাজনক সিদ্ধান্ত নিয়ে পেন্ডুলামের মতো এপাশে

ওপাশে দুলে বেড়ান, তাহলে অসহ্য সে কাণ্ড। কৃষ্ণকমলের চমৎকার লেখার আরও কিছু এই সূত্রে উৎকলন করা যাক :

"সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের প্রতি শেষাশেষি, বিশেষ বিধবাবিবাহ ব্যাপারের পর, বিদ্যাসাগরের বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছিল। আমি বড়ো-বড়ো দিগ্‌গজ অধ্যাপকদিগের বিষয় বলিতেছি না; তাঁহাদিগকে তিনি যাবজ্জীবন পূজনীয় জ্ঞান করিতেন, যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, এবং অকাতরে অর্থদানও করিতেন। কিন্তু যাঁহারা দু'দশ পাতা সংস্কৃত পড়িয়া ডেঁপোমি করিয়া বেড়ান, এবং বিদায়ের লোভে চারিদিকে হাঁটাহাঁটি করেন, তাঁহাদিগকে তিনি ইদানীং 'ল্যাজকাটা' বা 'টিকিদাস', এ ছাড়া অন্য নাম দিতেন না। চাণক্যের একটি শ্লোক আছে—'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং'। এই শ্লোকটির প্রকৃত ব্যাখ্যা উল্টাইয়া দিয়া একটি পরিহাসের ব্যাখ্যা লালমোহন নামক এক ব্যক্তি বাহির করিয়াছিলেন।···অর্থটা হইল এই, 'পণ্ডিতের সবই গুণ, দোষের মধ্যে খালি মূর্খ।' বিদ্যাসাগর এই পরিহাসের ব্যাখ্যাটি লইয়া সর্বদাই আমোদ করিতেন, এবং বলিতেন যে, লালমোহন শ্লোকের অর্থটা ঠিকই করিয়াছে। বিধবাবিবাহ ব্যাপারের পর অশ্রদ্ধা হইবার আরও কারণ এই যে, প্রথমে অনেকে তাঁহার পক্ষে সায় দিয়া, শেষে অর্থলোভে স্বচ্ছন্দে বিপক্ষের দলে মিশিয়া গেল। ইহাতে তিনি ওই পণ্ডিত-জাতির উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন।"[৮]

'ভাইপোস্য' রচনাদির পরিহাসপটুতা, ততোধিক খরশান ব্যঙ্গ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল সর্বোচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথার রিপোর্ট সরাসরি আবার তুলছি :

"একটি নূতন কাণ্ড দেখা গেল। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের বয়স অনেক কম ছিল; কিন্তু তখন কুত্রাপি তিনি পরিহাস-রসিকতা প্রদর্শন করেন নাই। বহুবিবাহের সময়ে প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা', 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য'—এই সকল গ্রন্থে যে-সকল হাসিতামাশার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সেকালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের মতো গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে। ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য; এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য [যদি অবশ্য পিতা রীতিমতো মুক্তমন এবং পুত্র পিতাকে ফ্রেন্ড-জ্ঞান করেন !!]। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাংলা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশি নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক, তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা বড়ো একটা বুঝেন না; সুতরাং তাঁহারা বিদ্যাসাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না। আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বিদায়-আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় আমোদ করিবার সময়ই তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং এ-দেশে এইসকল গ্রন্থ রচনা করা বিদ্যাসাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তা ছড়ানো হইয়াছে। যদি য়ুরোপে হইত, তাহা হইলে এ-প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যাসাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাবত্তার জন্য যে-প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক বিদ্যাসাগর এদিকে দৃষ্টিপাত না-করিয়া এই সমস্ত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি বাংলা ভাষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; কেহ পড়ুক আর না-পড়ুক, আনন্দ করুক আর না-করুক, বাংলা লিখিতে তাঁহার নিজের এত আমোদ বোধ হইত যে, সেই আনন্দে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।"[৯]

কৃষ্ণকমল যতখানি বলেছেন তার বেশি আর বলা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের ছদ্মনামা রচনাগুলিতে উনি যে-পরিমাণে গ্রাম্যতা-নির্মুক্ত হাস্যরস পেয়েছেন, সত্যই সেই পরিমাণে আছে কিনা, হাস্যরসের গবেষণাগারের অধিকর্তারা ঠিক করবেন। কেবল এই কথাটা বলে নেওয়া যায়, হাস্যরস সম্বন্ধে সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মনোভাব আর আধুনিক সাহিত্যরসিকদের মনোভাব এক নয়। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা চণ্ডীমণ্ডপী রসিকতাকে পুরো ছাড়তে পারেন না। এই পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতো কৃষ্ণকমলও ছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ছিলেন। তিনি লিখেছেন:

"বহুবিবাহ লইয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতি-খুড়োর সঙ্গে তাঁহার খুব বিচার চলে—সেই সময়ে 'ভাইপোস্য' বাহির হয়। তখন কলিকাতার লোক এই বই দুখানি পড়িয়া হাসিয়া অস্থির হইত। [তাহলে কৃষ্ণকমল যে অভিযোগ করেছেন—বিদ্যাসাগরের এইসব লেখার উপযুক্ত সমাদর হয়নি—সেকথা পুরো ঠিক নয়! বইগুলি প্রকাশমাত্রে নিঃশেষিত হয়ে যায়, একথাও স্মরণ রাখতে হবে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর 'অতি অল্প হইল'-এর পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন, দ্রুত নিঃশেষিত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ অধিক সংখ্যায় ছাপতে হয়েছিল, কারণ 'সর্ববিধ লোকের নিকট ইহার আদরের সীমা ছিল না']। খুড়োও ছাড়েন নাই, তিনিও জবাব দিতেন। একটা জবাবের নাম—'লাঠি থাকিলে পড়ে না।' কিন্তু হার খুড়োরই হইল; খুড়ো লিখিতেন সংস্কৃতে, বিদ্যাসাগর লিখিতেন বাংলায়; খুড়োর বই কেউ বুঝিতে পারিত না, বিদ্যাসাগরের বই সবাই পড়িত।"[১০] [এখানেও কৃষ্ণকমলের কথা ভ্রান্ত দেখা যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর নিছক বাংলাভাষাপ্রেমে ওইসব বই লেখেন নি। তাঁর বাংলাপ্রেম সন্দেহাতীত, কিন্তু তিনি সাধারণের কাছে খুড়োকে নাজেহাল করার জন্যই বুদ্ধিমানের মতো চলিত ঢঙের ভাষায় রঙ-তামাশা করেছিলেন।]

॥ ২ ॥

অন্য কথায় আসার আগে বলে নিই, বেনামা রচনাগুলিতে একটি গুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিদ্যাসাগরের প্রচণ্ড প্রাণশক্তি। এর মধ্যে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য'-রচিত 'অতি অল্প হইল' (মে ১৮৭৩) এবং

'আবার অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর ১৮৭৩) পুস্তিকা দুটির প্রকাশকালে বিদ্যাসাগরের বয়স ৫৩। আর 'ব্রজবিলাস' (নভেম্বর ১৮৮৪) এবং 'বিনয়-পত্রিকা'-র (ঐ) সময়ে তাঁর বয়স ৬৪। 'রত্নপরীক্ষা'-র (অগস্ট ১৮৮৬) সময়ে তা ৬৬। ভাবতেও চমক লাগে। সেকালের বিরাট পুরুষ তিনি ; পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসংস্কারক হিসাবে দেশে সর্বাধিক সম্মানিত ; হৃদয়বান পুরুষ হিসাবে দেবতাজ্ঞানে পূজিত ; আত্মমর্যাদা ও অটল বীর্যের জন্য সর্বোচ্চ রাজপুরুষগণের কাছে সম্ভ্রমের পাত্র—সেই তিনি ফুলের মালা ঠেলে সরিয়ে রীতিমতো ফাজলামি করছেন লেখায় !! এতে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর কখনো পুরোপুরি মনে বুড়ো হন নি। তাঁর শক্ত লোহার বর্মের মধ্যে সর্বদাই একটি 'চেঙনিয়া' নাচা-গানা করত। মর্যাদা যাঁর অঙ্গাঙ্গি, তাঁর মর্যাদা হারাবার ভয় থাকে না।

বিদ্যাসাগর খুবই জানতেন, ছদ্মনামা লেখাগুলির লেখক যে তিনি, তা অচিরে সকলে বুঝে যাবে। বইগুলি ছাপা হয়েছে তাঁর 'সংস্কৃত যন্ত্র' থেকে, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় বইগুলির স্বত্বাধিকারী তিনিই[১১]—তদুপরি বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যে-ধরনের ইয়ার্কি এগুলিতে করা হয়েছে, অন্য কারও পক্ষে তা করা সম্ভব ছিলনা। তেমন করলে বিদ্যাসাগরের ভক্তরা রে রে করে তেড়ে যেতেন। তাঁরা বঙ্কিমকে পর্যন্ত রেয়াত করেন নি।

বইগুলিতে ছদ্মনামা ভাইপো বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কত মজাই করেছেন ! (নিজেকে নিয়ে তামাশা করা রসবোধের বড়ো লক্ষণ)। আমি কিছু কিছু নমুনা দেব।

'আবার অতি অল্প হইল'-র মধ্যে :

"উপযুক্ত ভাইপোর পুস্তক পড়িয়া অনেকে বেয়াড়া খুশি হইয়াছেন, এবং উপযুক্ত ভাইপো লোকটা কে, ইহা জানিবার জন্য অনেকের অতিশয় ঔৎসুক্য ও কৌতূহল জন্মিয়াছে।...কেহ কেহ এত বড় সুবোধ যে, বিদ্যাসাগরকে উপযুক্ত ভাইপোর স্থানে বসাইয়াছেন। যে-সকল বক্কেশ্বর এরূপ অনুমান করেন, তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেই আমার সর্বদা সাক্ষাৎ ও এ-বিষয়ে কথোপ-কথন হয়। খুড়োও অনেক সময় সেখানে উপস্থিত থাকেন, এবং সময় সময় নানা বিষয়ে আমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন।"

সকলের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি, যাঁর পরামর্শ সবাই চান—তিনি বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কে হবেন ?[১২]

আরও পরিষ্কার ইঙ্গিত :

"লোকে জানে আমার চালাকি ও ফচ্‌কিয়ামি আইসে না। কিন্তু আমার পুস্তকে ওই দুয়ের ভাগই অধিক। সুতরাং আমি ঐ অপূর্ব গ্রন্থের রচয়িতা, লোকের সহসা এইরূপ সংস্কার হওয়া সম্ভব নহে।"

এই 'আমিটি' কে ? এই আমির মধ্যে বিদ্যাসাগরের স্পষ্ট উঁকিঝুঁকি :

"বস্তুত আমি চালাক ও ফচকিয়া নই। কিন্তু মা-সরস্বতীর আমার উপর এমনই দয়া যে, লিখিতে বসিলে অস্মদীয় অতি দুর্দান্ত মহাবল পরাক্রান্ত

কলম-বাহাদুরের প্রফুল্ল মুখপদ্ম হইতে ফচ্‌কিয়ামি মধু ভিন্ন অন্য কোনও রস বড় একটা নির্গত হয় না।”১৩

ভাইপো যাতে ‘খুড়োর মতো ডেঁপো ও অহঙ্করিয়া’ হয়ে না পড়েন সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি ‘অহঙ্কারে ফুলিয়া’ ওঠা সামলাতে পারলেন না, যেহেতু তাঁর লেখাকে অনেকেই বিদ্যাসাগরের লেখা মনে করেছেন :

“অহঙ্কারে মাটিতে আমার পা পড়িতেছে না। সকলে বলে, বিদ্যাসাগর বড় লেখক। বস্তুত এ-বিষয়ে তাঁর একাধিপত্য হইয়া পড়িয়াছে। যখন আমার লেখা দেখিয়া, তাঁর লেখা বলিয়া লোকের সন্দেহ হইতেছে, তখন আমিও বড় লেখক হইয়া পড়িয়াছি, এই ভাবিয়া মনে বিলক্ষণ গরমি হইতেছে।… এবার বিদ্যাসাগরের লেখার অনুকরণে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না।”১৪

ব্রজবিলাসের ‘বিজ্ঞাপনে’ লেখক-প্রশ্ন আবার উঠল :

“শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের পছন্দসই জিনিস হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিল চালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগরের রচিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি, তাহা এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।

“এক গণ্ডা মাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর বাবুজি অতি বিদ্‌কুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই। এ অবস্থায় তিনি এই মজাদার মহাকাব্য লিখিয়াছেন, একথা যিনি রটাইবেন, অথবা একথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত, তাহা সকলে স্ব-স্ব প্রতিভাবলে উপলব্ধি করিতে পারেন। [পুনশ্চ দেখা গেল, কি শারীরিক, কি মানসিক, যন্ত্রণা নিংড়ে বিদ্যাসাগর হাসি নিষ্কাশন করতে পারতো]।

“আমার প্রথম বংশধর ‘অতি অল্প হইল’ ভূমিষ্ঠ হইলে কেহ-কেহ সন্দেহ করিয়া কোনও মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই পুস্তকখানি কি আপনকার লিখিত ? তিনি কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তাহাতে অনেকে মনে করিতেন, তবে ইহা ইঁহারই লিখিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেরূপ চালাকি খেলেন কিনা, ইহা জানিবার জন্য, এবার আমি, চতুর চালাক, বিশ্বস্ত বন্ধুবিশেষ দ্বারা, তাঁহার নিকট ওইরূপ জিজ্ঞাসা করাইব। দেখি তিনি পূর্বোক্ত মহোদয়ের মতো ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, অথবা আমার লিখিত নয় বলিয়া স্পষ্টবাক্যে উত্তর দেন ? যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে তিনি ‘না বিইয়া কানাইর মা’ হইতে চাহিবেন, সে ধরনের জন্তু নহেন।”১৫

ভাইপো বলেছেন, লেখাগুলি বিদ্যাসাগরের কিনা জিজ্ঞাসা করাবেন। করিয়েছিলেন কি ? না, তা করান নি। সেইখানেই ব্যাপারটা ধরা পড়েছে।

অন্য চরিত্রের মুখে বিদ্যাসাগরের কিছু আত্মকথা রচনাগুলিতে আছে :

“আমি পূর্বে কখনও বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই। একদিন ইচ্ছা হইল,

সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে অতএব ইনি কিরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আসিব। তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলাম। অবারিত দ্বার, কেহ বারণ করিল না। একেবারে উঠিয়া তাঁহার ঘরে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম, লোকে লোকারণ্য। এক টেবিলের চারিদিকে সাত আটজন বসিয়া আছেন। আর একদিকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, ওইটি বিদ্যাসাগর, ওইটি ভাটপাড়ার আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, ওইটি নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। শ্রবণমাত্র, এক উদ্যোগে দুই মনস্কামনা পূর্ণ হইল, এই ভাবিয়া আহ্লাদে গদগদ হইলাম। বিদ্যারত্ন ও বিদ্যাসাগর, উভয় জানোয়ারকেই কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড়ো উকিলের মতো বক্তৃতা করিতেছেন, বিদ্যাসাগর-বাবাজি জজের মতো তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিতেছেন। উপবিষ্ট বিষয়ী লোকগুলি বিদ্যারত্নকে লইয়া আসিয়াছেন।"[১৬]

অন্যত্র :

"ইহা যথার্থ বটে, বিদ্যাসাগর তাঁহার [ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের] মতো বেহুদা পণ্ডিত নহেন ; তাঁহাদের মতো বেয়াড়া ধর্মনিষ্ঠ নহেন ; তাঁহাদের মতো সাধুসমাজের সাধুসমাজের অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী নহেন ; তাঁহাদের মতো সাধুসমাজের অভিমত নির্মল সনাতন ধর্মের রক্ষাবিষয়ে তৎপর ও অগ্রসর নহেন। এমন-কি পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় বহুদর্শী বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়রা তাঁকে খৃস্টান পর্যন্ত বলিয়া থাকেন।···কিন্তু ইহাও দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর লিখিতে পড়িতে একরকম বেশ মজবুত ; যখন যাহা লিখেন, তাহা সহসা কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যাঁহাদিগকে সকলে বাস্তবিক ভালো লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাদৃশ পণ্ডিতগণের মুখে শত-সহস্রবার শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে-পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দোষারোপ করিবার পথ নাই।"[১৭]

পুনশ্চ :

"এতদ্দেশীয় পূজনীয় সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় চাঁই-মহোদয়বর্গের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে, বিনয়নম্রবচনে, আমার নিবেদন এই, আমার এই ভাঁড়ামি, বা পাগলামি, অথবা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ দেখিয়া আপনারা যেন আমায় বিদ্যাসাগরের গোঁড়া, অথবা দলের লোক না ভাবেন। ইহা যথার্থ বটে, কোনো কোনো কারণে বিদ্যাসাগরের উপর আমার একটু আন্তরিক টান আছে। যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাই, লোকটা অমায়িক নিরহংকার পরোপকারী। যাঁহারা নিকটে যান, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আইসেন। কিন্তু এই খাতিরে আমি তাঁহার গোঁড়া বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইতে সম্মত নহি। তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, হদ্দমুদ্দ এই পর্যন্ত বলিতে রাজি আছি, লোকটা বড়ো মন্দ নহে।"[১৮]

এর পরে ব্যাজস্তুতির প্রবাহ—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি :

"এ ভিন্ন আর সকল বিষয়েই, আমি তাঁহার উপর মর্মান্তিক চটা। না চটিয়া কেমন করিয়া চলে বলুন? তিনি পবিত্র সাধুসমাজের অনুবর্তী হইয়া চলিতে রাজি নহেন; নিজে যাহা ভালো বুঝিবেন তাই বলিবেন, তাই করিবেন; সাধুসমাজের দিগ্‌গজ চাঁইদিগের খাতির রাখিবেন না, ও তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিবেন না। এমন লোককে কেমন করিয়া মানুষ বলিয়া গণ্য করি বলুন। পূর্বাপর যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে হতভাগা বেটার বিষয়বুদ্ধি বড়ো কম। এমন-কি নাই বলিলেও বোধ হয় অন্যায় বলা হয়না। বিষয়বুদ্ধি থাকিলে তিনি কখনই বিধবার বিবাহকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিধবার বিবাহে হাত দিয়া, পবিত্র সাধুসমাজের হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছেন, সকল লোকের গালাগালি খাইতেছেন, এবং শুনিতে পাই, ওই উপলক্ষে দেনাগ্রস্তও হইয়াছেন। ইহারই নাম, আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা। এমন বাঁদরামি, এমন পাগলামি, এমন মাতলামি, কেহ কখনও দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, অথবা বলিবেন কেন, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, তিনি নাম কিনিবার জন্য দেশের সর্বনাশের পথ করিয়াছেন!"[১৯]

এই সঙ্গে ছিল চূড়ান্ত ব্যঙ্গ—বিধবাবিবাহ-বিপক্ষীয় শাস্ত্রধ্বজীদের সম্বন্ধে। এ ব্যঙ্গ বক্তব্যে অমার্জিত, ব্যঙ্গ প্রায়শই তা হয়, কিন্তু সুপ্রযুক্ত, আয়নার মতো তুলে ধরা আছে প্রতিপক্ষের সামনে, তাঁদের চেহারা দেখবার জন্য।—বিধবাবিবাহ-প্রবর্তক বিদ্যাসাগর দেশের মহা সর্বনাশ করছেন—কেন?—

"দেখুন, বাটীতে বিধবা থাকিলে গৃহস্থের কত-মত উপকার হয়। প্রথমত, মিনি মাইনায় রাঁধুনি, চাকরানি, মেথরানি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, সময়ে সময়ে বাটীর পুরুষদিগের প্রকারান্তরে অনেক উপকার দর্শে। তৃতীয়ত, বাটীর চাকরেরা বিলক্ষণ বশীভূত থাকে, তাড়াইয়া দিলেও হতভাগার বেটারা নড়িতে চায় না। চতুর্থত, প্রতিবাসীরা অসময়ে বাটীতে আসেন। এটি সামান্য কথা নহে, কারণ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অসময়ে কেহ কাহারও দিক মাড়ায় না।"[২০]

বিদ্যাসাগরের লম্বা-চওড়া দাবি, বিধবাবিবাহ চলিত হলে দেশে ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যাদি পাপ অনেকাংশে দূর হবে। ব্যভিচারাদিকে পাপ বলায় ভাইপোর ঘোর আপত্তি। "ব্যভিচার যদি দোষ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে এই পবিত্র দেশের অতিপবিত্র সাধুসমাজে কদাচ এরূপ প্রবলভাবে প্রচলিত থাকিত না।" এদেশে কেবল পুরুষদের ব্যভিচার নির্দোষ নয়, ভাইপো তথ্যযুক্তি সহকারে জানিয়েছেন, স্ত্রীলোকের ব্যভিচারেও দোষ নেই। "ব্যভিচার সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগণিত। সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য, যাহার বিনাশ নাই, যাহা সর্বকালে বিরাজমান থাকে।...অতএব বিদ্যাসাগর বাবাজি, সাধুসমাজে চিরপ্রচলিত সেই প্রশংসনীয় সনাতন ধর্মকে দোষ বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার নিবারণার্থে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত বলিয়া যে-পাণ্ডিত্যপ্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য করা কদাপি উচিত নয়।" ভাইপো বুঝতে অসমর্থ, "নির্বোধ নির্বিবেক শাস্ত্রকারেরা" ব্যভিচার-পুষ্প ভ্রূণ-হত্যাকে "কি মতলবে পাপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।" "স্ত্রীলোক গুরুজনদের খাতির এড়াইতে না পারিয়া, কিংবা প্রিয়জনদের নাছোড় পীড়াপীড়িতে পড়িয়া, সনাতন ব্যভিচারদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতিদেবীর অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারে গর্ভসঞ্চার অধিকাংশস্থলে অপরিহার্য ; এবং পবিত্র সাধুসমাজের অবলম্বিত ও অনুমোদিত প্রথা অনুসারে তথাবিধ স্থলে ভ্রূণহত্যাও অপরিহার্য।" ভাইপো শাস্ত্রসন্ধান করে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন, "অপরিহার্য বিষয়ের অনুষ্ঠান বা অনুমোদন কোনও অংশে দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নহে।" "ভ্রূণহত্যাকে পাপজনক বা কোনও অংশ নিন্দনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কই, এমন বেটাছেলে তো এ-পর্যন্ত আমাদের দিব্য চক্ষে ঠেকে নাই। পেট ফাঁপিলে ও পেটে মল জমিলে ডাক্তারেরা জোলাপ দিয়া পেট পরিষ্কার করিয়া দেন। ভ্রূণহত্যাও···তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। সাধুসমাজের অভিমত অভিধান গ্রন্থে ভ্রূণহত্যা শব্দের যে-বিশুদ্ধ ও বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। যথা—ভ্রূণহত্যা : সৎ প্রীতিপ্রদ প্রয়োগ-বিশেষের দ্বারা পেটে ফাঁপবিশেষ জন্মিলে ও মলবিশেষ জমিলে, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা পেটের ওই ফাঁপবিশেষের নিবারণ ও পেট হইতে ওই মলবিশেষের নিষ্কাশন।"[২১]

॥ ৩ ॥

'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল'—পুস্তিকা দুটিতে তারানাথ তর্কবাচস্পতির উপর বিদ্যাসাগরী মুষল প্রহার। বিদ্যাসাগরের বহু-বিবাহ বিরোধী রচনা ('বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' ১৮৭৩) বেরুবার পরে তার খণ্ডন করে তারানাথ সংস্কৃতে ('বহু-বিবাহবাদ') বই লেখেন। ভাইপো তাঁর পুস্তিকাদুটিতে সেই সূত্রেই তারা-নাথকে আক্রমণ করেছেন। তারানাথের অসার পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব, অর্থলোলুপতা—এই সকল বিষয় নির্মমভাবে ভাইপো উদ্ঘাটন করেছেন। এই বাগ্‌যুদ্ধে ভাইপো যুদ্ধনিয়মানুযায়ী ভদ্রতারক্ষা করেন নি। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—খোলাখুলি গালিগালাজে পেঁছেছে ; নরুণের টান থেকে কুড়ুলের কোপ পর্যন্ত। সব সময়ে কুড়ুলের ফলায় ধার পর্যন্ত থাকেনি—তখন ভোঁতা অংশ দিয়েই থেঁতলে ছিঁচে দেওয়ার চেষ্টা। স্বীকার্য, বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গ-রচনায় গুণ ও দোষ, দুইই আছে। রচনার যে-সংযম ব্যঙ্গবচনকে ইঙ্গিতময় সাহিত্যধর্মী করে, তা যেমন বিদ্যাসাগরের লেখায় আছে, তেমনি অবিশ্রান্ত বেপরোয়া গালমন্দও মেলে। বিদ্যাসাগর তাঁর আক্রমণলক্ষ্য পণ্ডিতদের সম্বন্ধে এইটুকু বুঝেছিলেন, লোভে স্বার্থে ওঁদের চামড়া এমন পুরু হয়ে উঠেছে যে, সূক্ষ্ম কিছু ভিতরে ঢুকবে না—তাই বেনামা রচনায় দমাদ্দম মার। সূক্ষ্ম অংশটুকু ছিল রসিক সামাজিকদের জন্য।

তারানাথ নিঃসন্দেহে মহাপণ্ডিত। কিন্তু অপরপক্ষে একদিকে তিনি যেমন ঈর্ষাকাতর, অন্যদিকে তেমনি নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী—বিদ্যাসাগর তা খুলে দেখিয়ে, নিজের আপাত অভদ্র কথাগুলির সাফাই গেয়েছেন।

তারানাথের দুষ্কৃতির একটি ঘটনা এই :

পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে এক জাঁকের শ্রাদ্ধে তারানাথ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায়দানের ব্যাপারে অধ্যক্ষ। সেই কাজ করতে গিয়ে "তিনি কাঁসারীর মতো কতকগুলি ঘড়া বিক্রয় করিলেন।" এই অর্থলোভের অঙ্গাঙ্গি তাঁর নীচতা। এক ব্যক্তি বুঝি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরিচয় দিয়ে একসরা সন্দেশ নিয়েছিল। তা ধরতে পেরে তারানাথ "পরের বাড়িতে, বৈশাখ মাসে, কর্মের দিনে, নিমন্ত্রিত শত-শত ভদ্রলোকের সমক্ষে" সন্দেশের সরা তো কেড়ে নিলেনই, তার উপর "তার গলায় গামছা দিয়া মনের সাধে প্রহার করিলেন।" তারানাথ অন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সম্বন্ধে এমনই অশ্রদ্ধাপরায়ণ ও ঈর্ষালু যে, রাজকুমার ন্যায়রত্নের মতো পণ্ডিতের নামে বিদায়ের অর্থ ধার্য করেছিলেন ৮ টাকা। সেটা রাজকুমার ন্যায়রত্নের পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে করে, বিদ্যাসাগর ৮ টাকা কেটে ১২ টাকা করে দেন। রাজকুমার বিদায় নেবার সময়ে সেই টাকাকেও উপযুক্ত মনে না করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তারানাথ অম্লানবদনে বলেন, "ও-কাজ আমি করিনি, বিদ্যাসাগর করেছে, কেননা রাজকুমার বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রচনার বিরোধিতা করেছেন। এই জঘন্য মিথ্যাচারকে কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ সহ্য করতে পারেন নি। তিনি তারানাথকে বলেন, "বাচস্পতি মহাশয়, আপনি এ কী অন্যায় কথা বলছেন ?" এই বলে তিনি বিদায়ের ফর্দ তারানাথের সামনে ধরে বললেন, "দেখুন, আপনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নামে ৮ টাকা লিখেছিলেন ; তা অন্যায় বিবেচনা করে বিদ্যাসাগর মহাশয় ৮-এর জায়গায় ১২ করেছেন। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত আক্রোশে ন্যায়রত্নের বিদায় কমিয়ে দিয়েছেন, এমন কথা বলা আপনার ঠিক হয়নি।" তখন নাকি "জোঁকের মুখে চুণ পড়েছিল।" [এ জোঁকের তাহলে চুণ-প্রতিরোধী ক্ষমতা তেমন বাড়েনি !!]

তারানাথ-সংহার-পর্ব কিছু লক্ষ্য করা যাক।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তারানাথ যা লিখেছিলেন, তাকে বিদ্যাসাগর এমনভাবে খণ্ডন করেন যে, তারানাথের সংস্কৃতবিদ্যার জাঁক ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। ভাইপো তাঁর 'অতি অল্প হইল' শুরু করেছেন ছড়া দিয়ে, এবং তর্জার সময়ে যেমন চড়া কথায় আসর মাত করার চেষ্টা করা হয়, এখানেও তাই করা হয়েছে :

"এত কাল পরে সব ভেঙে গেল ভুর।
হতদর্প হইলে বাচস্পতি বাহাদুর ॥
সকলের বড় আমি, মম সম নাই।
কিসে এত দর্প করো ভেবে নাহি পাই ॥

অতি দর্পে লঙ্কাপতি সবংশে নিপাত।
অতি দর্পে বাচস্পতি তব অধঃপাত॥
দর্পে ফেটে পড়ো, সবে করো তৃণজ্ঞান।
অহঙ্কারী নাহি কেহ তোমার সমান॥
তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন।
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্বাচীন॥"[২২]

শেষ দুটি লাইনে ভাইপো বলতে কিছু বাকি রাখেন নি। এর সঙ্গে আরও বলেছেন, "খুড়ো খেপেছে," "খুড়োর দফা রফা হয়েছে", খুড়ো সংস্কৃত লিখতে গিয়ে "বিলক্ষণ ছরকট" করেছেন, "খুড়ো মনের সাধে দেদার ভুল" লিখেছেন। ভাইপো ছাপার খরচের ভয়ে খুড়োর সব ভুল দেখাতে পারেন নি, খানিক দেখালেন, মনে হয় খুড়ো তাতেই ঠাণ্ডা হবেন ইত্যাদি। ভাইপোর নিবেদন :

"আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, খুড়ো আর যেন সংস্কৃত লিখিয়া বিদ্যা খরচ না করেন। খুড়োর লজ্জা-সরম কম বটে। কিন্তু লোকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়। দোহাই খুড়ো, তোমার পায়ে পড়ি, এমন করে আর চলিও না।"[২৩]

তারানাথ ভাইপোর সতর্কবাণীকে মূল্য দেননি। তাছাড়া ওই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের জন্য তাঁর মর্যাদাহানিও হয়েছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। 'ফাজিল চালাক' ভাইপো তাতে আরও তেতে উঠে 'আবার অতি অল্প হইল' প্রকাশ করলেন। শুরু হলো, খুড়োর বুদ্ধিভ্রংশ নিয়ে। অন্য লোকে গাল দিলে খুড়ো নির্বিকার, কিন্তু ভাইপো খুড়োর আপনজন, তার একটি দুটি হিতবাক্যও তিনি সইতে পারেন না। ব্যাপারটা বোঝাতে ভাইপো যে-ছড়া শোনালেন, তাতে খুড়োর প্রতি ভক্তির পূর্ণ ষোলকলা : "গাধা সকল ভার বইতে পারেন, / কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারেন না।" খুড়োর অতি-চালাকি সম্বন্ধে ভাইপোর ধমক : "বক্কেশ্বররা আপনি ভিন্ন আর সকলকে বক্ক অর্থাৎ বোকা মনে করে এবং সকলের কাছেই ফাজিল চালাকি করিয়া বেড়ায়। খুড়ো সেইরূপ চালাকি করিয়া আমার পুস্তকের জবাব লিখিয়াছেন।" বিদ্যাক্ষেত্রে খুড়োকে চোর এবং জালিয়াত প্রমাণ করে (তার জন্য ভাইপো যথেষ্ট বিদ্যাঘূর্ণন প্রতিভা দেখিয়েছেন) ভাইপো বললেন, "উপযুক্ত ভাইপো খুড়োর জালসাজি ধরিয়া তাঁহাকে ভদ্রসমাজের বিচারে সমর্পণপূর্বক বিচারকর্তাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, যথার্থ বিচার করিয়া খুড়োকে মাফিক আইন সাজা দিতে আজ্ঞা হয়। অপরাধীর যথার্থ দণ্ড না হইলে সমাজের অমঙ্গল।" খুড়োর সঙ্গে চটাচটিতে যে সামাজিক-জীবনে ক্ষতি ঘটতে পারে, সে বিষয়ে ভাইপো সচেতন, কেননা খুড়ো অন্যের মা-বাপ মরলে দলাদলি করে শ্রাদ্ধ পণ্ড করার ক্ষমতা ধরেন। কিন্তু ভাইপোও ডরাবার পাত্র নন : "আমি বড় ডাংপিটে,...কোনো কারণে ভয়

পাইবার ছেলে নই ; খুড়ো যতবার লিখিবেন, আমি ততবার লিখিব।" এবং সে লেখায় "চাপা খেউড়ও" থাকবে। একটু আভাস ভাইপো দিয়ে রেখেছিলেন। তারানাথের সঙ্গে তাঁর পুত্র জীবানন্দ ভাইপো-বিরোধী তর্জায় দোয়ারি ছিলেন। বাপকে তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ব্যাটা অসহ্য। "হতভাগার ব্যাটা কি শুভক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল !!! এই পৃথিবীতে অনেকের বুদ্ধি আছে, কিন্তু খুড়োর মতো খোশবৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।...কোনও-কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে খুড়োর কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক। আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে সেটা বিষম টোকো ও পোকা খেকো।" খুড়োর পাণ্ডিত্যে কেবল নয়, চেহারার সৌন্দর্যেও ভাইপো মুগ্ধ : "খুড়োর দোষ দেখাইয়া দিলে তিনি চটিয়া লাল হইয়া ওঠেন। এই সময়ে খুড়োর কালো মুখে লালের আভা মারিলে যে-শোভা অর্থাৎ বাহার হয়, তাহা বর্ণনাতীত।" কেবল রূপে নয়, গন্ধেও খুড়ো অতুলনীয়— বলাবাহুল্য তা বিদ্যা-ব্যাপারে : "তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সংস্কৃত বিদ্যা কেবল তাঁর পেটেই অন্তঃসলিলা বহিতেছে। খুড়ো অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে ; কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই ; সুতরাং অপচার ও উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে ; মধ্যে মধ্যে যে নিঃসরণ হইতেছে, তাহার সৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে।"

ভাইপো নিজের কথাগুলিকে সুখসেব্য করার জন্য মাঝে মাঝে গল্পের চাট দিয়েছেন। উপভোগ্য দুটি গল্প পাচ্ছি। খুড়োর বিদ্যার সংগ্রহ আছে কিন্তু তাদের ব্যবহার করার মতো বুদ্ধি নেই, ফলে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। গল্পটি সেই অবস্থা বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে।—

এক বিখ্যাত অধ্যাপকের চৌপাড়ীতে [চতুষ্পাঠীতে] এক ব্যক্তি ১০-১২ বৎসর ধরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি স্বগ্রামে ফিরলে গ্রামের লোক খুব খুশি হয়ে তাঁর জন্য চৌপাড়ী তৈরি করে দিল, ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থাও করল। তারা নিশ্চিন্ত হলো—আর বিধান নেবার জন্য অন্যত্র যেতে হবে না। কিন্তু তাদের অভিপ্রেত কাজ হলো না, কারণ এই নবীন অধ্যাপক পুঁথিপত্তর ঘেঁটে উল্টোপাল্টা ব্যবস্থা দিতে লাগলেন। অনেক সময় কোনো ব্যবস্থাই দিতে পারলেন না। গ্রামের লোক উত্ত্যক্ত হয়ে এঁর গুরু বিখ্যাত অধ্যাপকের কাছে হাজির হয়ে অনুযোগ করল, আপনি ওঁকে কী পড়িয়েছেন, ওঁর কিছুমাত্র বিদ্যা আছে বলে তো মনে হয়না। বৃদ্ধ অধ্যাপক তাদের ঠাণ্ডা করার জন্য উপমা দিলেন : মনে করো তোমরা অন্ধকার ঘরে তাড়াতাড়ি অনেক জিনিস এনে ভর্তি করেছ। ঘরে আলো ছিলনা বলে যেখানে যে-জিনিস রাখা উচিত তা রাখতে পারো নি। এই অবস্থায় কেউ তোমাদের কোনো একটা জিনিস তাড়াতাড়ি এনে দিতে বললে তোমরা তো ঠিক জিনিসটি আনতে পারবে না, উল্টোপাল্টা জিনিস এনে দেবে। তেমনি

তোমাদের অধ্যাপক তাড়াতাড়ি অনেক বিদ্যা পেটে পুরেছেন, এখনও সব সাজানো হয়নি, তাই গণ্ডগোল হচ্ছে। বৃদ্ধ আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, কিছু সময় যাক, সাজানো হোক, দেখবে, তারপর আর কোনো গোলযোগ থাকবে না।[২৪]

গল্পটি বলবার পরে ভাইপো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, বৃদ্ধ অধ্যাপকের কথা তো ঠিক, কিন্তু খুড়োর যে নিয়তিকাল নিকটে এসে গেল, কবে আর সাজাবেন!

খুড়ো বিদ্যাসাগরের মতো নন যে, "ভুল দেখাইয়া দিলে আহ্লাদিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ ভুলের সংশোধন করেন; এবং যদি আর কোথাও ভুল থাকে তাহা দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা ও অনুরোধ করেন।" ভুল দেখিয়ে দিলে খুড়ো "মর্মান্তিক চটেন", এবং ভুল করেছেন তা কদাপি স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় গল্পটি এই প্রসঙ্গেই:

জমিদারের তহবিলে টাকা নেই, সরকারে খাজনা দাখিল করা হচ্ছে না, জমিদারী লাটে উঠবে, অথচ দেওয়ানের সে-সম্বন্ধে যেন কোনো গা নেই। উদ্বিগ্ন জমিদার দেওয়ানকে ডেকে বললেন, "আর সময় নেই, খাজনা দাখিলের জন্য কি করছেন?" দেওয়ান বললেন শান্তভাবে, "আপনি সেজন্য ভাববেন না।" খাজনা কিন্তু দাখিল করা হলো না, ফলে জমিদারী লাটবন্দী হলো। জমিদার আবার দেওয়ানকে ডাকালেন। তখনও দেওয়ান অভয় দিলেন, কিন্তু খাজনা দেওয়া হলো না। ফলে জমিদারী নিলামে উঠল। সে সংবাদ শুনে জমিদার হতাশ ও বিপন্ন হয়ে দেওয়ানকে বললেন, "আপনি গোড়া থেকে ভরসা দিয়ে শেষকালে আমার সর্বনাশ করলেন?" দেওয়ান তখনও অভয় দিলেন: "আপনি অকারণে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? কালেক্টর সাহেব নিলাম করছেন করুন, গোলাম দখল দিবে না।"

গল্পটি শুনিয়ে ভাইপো হেসে বললেন, "পৃথিবীসুদ্ধ লোক ফয়তা দিলেও খুড়ো দখল দিবেন না।"[২৫]

ভাইপোর হাসির অনেকটাই বাইরের রঙিন মুখোশ। তার নীচে ছিল ভয়ংকর মুখ। বিদ্যাসাগর খুড়োর জন্য কী করেছেন, প্রথমে তা বললেন:

"বিদ্যাসাগরের তুল্য খুড়োর যথার্থ হিতৈষী মিত্র ভূমণ্ডলে নাই। খুড়ো এখন মানুন বা না-মানুন, তাঁর মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সকলের মূল বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সহায়তা ব্যতিরেকে খুড়োর কালেজে প্রবিষ্ট হইবার কস্মিন্‌কালেও সম্ভাবনা ছিলনা। বিদ্যাসাগর যেরূপ অদ্ভুত চেষ্টা ও কষ্টস্বীকার করিয়া খুড়োকে কালেজে অধ্যাপকের তক্তে বসাইয়াছিলেন, তাহা কাহারও সাধ্য নহে। খুড়ো আমার মহাশয় ব্যক্তি; এখন বড় লোক হয়ে সে সকল ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, খুড়োর গায়ে মানুষের চামড়া

নাই। যাতে বিদ্যাসাগরের মর্মান্তিক হয়, পিতা পুত্রে সে চেষ্টায় ক্ষণকালের জন্যও অলস ও অমনোযোগী নহেন। বিদ্যাসাগরের কুৎসা করা, খুড়োর কুলতিলক জীবানন্দ-ভায়ার শরীরধারণের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে।"

এবং পরে ভাইপো দুটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে, এবং তাদের বঙ্গানুবাদ দিয়ে, সরাসরি অভিশাপ দিয়েছেন :

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।।

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক—এই তিন, যতকাল চন্দ্র-সূর্য থাকিবেন, নরকভোগ করিবেক।

সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।।

যে ব্রহ্মহত্যা করে, সে সেতুবন্ধে, সমুদ্রে, ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয় ; কিন্তু মিত্রদ্রোহীর কিছুতেই পাপমোচন হয়না।"[২৬]

॥ ৪ ॥

বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হবার বেশ কিছু বছর পরে, সে-বিষয়ে আন্দোলন যখন ঝিমিয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যদের প্রাণে হিন্দুধর্ম গেল গেল আতঙ্ক চাগিয়ে উঠল— আর তারই প্রকোপে উক্ত সভার চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠানে নবদ্বীপের মুখ্য স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন সংস্কৃত ভাষায় বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক বক্তৃতা করে বসলেন, সেটি সমাচারচন্দ্রিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হলোও। এই বিলম্বিত জাগরণ এবং দন্তকড়মড়ি দেখে উপযুক্ত ভাইপোর মুখও চুলকে উঠল। তারই সৃষ্টি 'ব্রজবিলাস'। ভাইপোর দাবি, এটি পঞ্চ উল্লাস-এ গ্রথিত গদ্য মহাকাব্য। এর বিজ্ঞাপনেই চড়া সুর। তার মধ্যে "শিমুলগাছ তেল" কাহিনীটি আছে (সেটি অন্যত্র বলেছি ; সেইসঙ্গে 'বাবু ও পটল' এবং 'ছোট ছেলেকে পুঁতলে তুলে পোড়ানো যায়' গল্প দুটিও) এবং রয়েছে নরকে প্রবেশাধিকারের গল্পটি।

নরকে কে যাবে? ভাইপোর সিদ্ধান্ত : "যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনো স্থান থাকে, এবং কাহারও পক্ষে সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন, এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন।"

তবে টিকিকাটাদের ভরসা দিয়ে ভাইপো বলেছেন, নরক জায়গাটা নিন্দের নয়। পরন্তু তা যে খুবই মজাদার তা জানাতে ভাইপো সত্য কাহিনী শুনিয়েছেন।

কিছুদিন আগে কলকাতার এক ভদ্রসন্তান বেয়াড়া ইয়ার হয়ে উঠেছিল। সে একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে ভেবে তার গুরুদেব তাকে উপদেশ শোনালেন : "বাপু, তুমি যদি এইভাবে চলো তাহলে তোমাকে নরকে যেতে হবে ; সে বড়ো

ভয়ানক জায়গা ; তোমার কি নরকে যাবার ভয় নেই ?” বয়ে গেলে কি হবে, উক্ত ভদ্রসন্তান বেআদব মোটেই নয়, রীতিমতো বিনয়ী ও মধুরভাষী। সে বলল, “আপনি কি বলছেন গুরুদেব ? নরক মন্দ জায়গা ? ভেবে দেখুন, সেখানে কারা যাবেন ? যত প্রবলপ্রতাপ রাজ-রাজড়া, সবাই নরকে যাবেন। ধনে-মানে পূর্ণ যত লোক, সবাই যাবেন। আর (একটু মিষ্টি হেসে) সেখানে যাবে যত মৃদুভাষিণী চারুহাসিনী বারবিলাসিনীরা, সঙ্গে থাকবে তুখোড় ইয়ারের দল। নরক তো গুলজার। স্বর্গে যাবার জন্য আছেন আপনাদের মতো টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল। আমি মহাগুলজার নরকেই যেতে চাই।”

শ্রীব্রজবিলাস মহাকাব্যের প্রথম উল্লাস শুরু হয়েছে ছড়া দিয়ে :

“ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদমস্তক গুণে রতনে মণ্ডিত ॥
শুভক্ষণে তাঁরে মাতা ধরিলা উদরে।
নাহি দেখি সম তাঁর ভুবন ভিতরে ॥
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি।
রূপের তুলনা নাই যেন রতিপতি ॥
রসিকের চূড়ামণি সর্বগুণাকর।
সুশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর ॥
সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়।
যেই যে বিধান চায় সেই তাহা পায় ॥
এ বিষয়ে কেহ নাই তাঁহার সমান।
একমাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান ॥
তাঁহার গুণের কিছু করিব বর্ণন।
অবহিত চিত্তে সবে করহ শ্রবণ ॥”

ভাইপো অতঃপর গুছিয়ে ব্রজনাথের গুণবর্ণনা করলেন বটে ! ব্রজনাথ নদীয়াবাসী। সুতরাং তিনি “নদীয়ার চাঁদ” উপাধির ন্যায্য অধিকারী। কয়েক শো বছর আগে একজনকে, শ্রীচৈতন্যকে, নদীয়ার চাঁদ বলা হতো। ভাইপোর বিবেচনায়, শ্রীচৈতন্যের রঙ ফরসা ছিল বলেই অমন বলা হয়। অথচ রূপের নয় গুণের বিচারেই ‘চাঁদ’ উপাধি দেওয়া সঙ্গত। তাহলে তো সেটি শ্রীচৈতন্যের নয়, ব্রজনাথেরই প্রাপ্য। অবশ্য অমন একটা সুন্দর উপাধির দাবিদার আরও একজন হয়ে পড়েছেন—ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ে কি ব্রজনাথ, কি ভুবনমোহন, কেউ আগু-পাছু নন। এক্ষেত্রে উপায় কি—এক আকাশে তো দুই চাঁদ থাকতে পারে না ! উপযুক্ত ভাইপো নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত দিলেন (মনোরম সে শব্দচাতুর্য) :

“একজন বই দুজনের নদীয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একেবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভালো দেখায় না। এবং

ওই উপলক্ষে দুজনে হুড়হুড়ি ও গুঁতগুঁতি করিয়া মরিবেন, সেটাও ভালো দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায়, সমাংশ করিয়া, দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, বিদায় করা উচিত।"[২৭]

তর্জা গাইতে নেমে উপযুক্ত ভাইপো তাঁর উপযুক্ত খুড়োকে ঘায়েল করতে কী পথ নেবেন, তা খোলাখুলি বলেছিলেন :

"উপযুক্ত ভাইপো খুড়োর সঙ্গে বিচার করিতে পিছপাও হইবেন, যদি কেহ ভুল ভ্রান্তিতেও সেরূপ ভাবেন, তিনি যত বড় ধনী, যত বড় মানী, যত বড় বিদ্বান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় হাকিম, যত বড় আমলা, যত বড় তঁ্যাদড়া, যত বড় ব্যাদড়া হউন না কেন, তাঁহার মনোহর গাল বসরাই গোলাপের মতো টুকটুকেই হউক আর রামছাগলের মতো চাঁপদাড়িতে সুসজ্জিত ও সুশোভিতই হউক—ঠাস্‌ঠাস্‌ করিয়া দশবার জোড়া চড় মারিয়া সেই বেআদবকে চিরকালের জন্য দুরস্ত করিয়া দিব।···যদি উপেক্ষা করিয়া, অথবা ভয় পাইয়া, অথবা আরও কোনও নিগূঢ় কারণের বশবর্তী হইয়া, খুড়ো মহাশয় উত্তরদানে বিমুখ হন, দুয়ো দুয়ো বলিয়া, হাততালি দিয়া, ইয়ারবর্গ লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করিব ; পরে রীতিমতো বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, মড়মড় করিয়া খুড়োর ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।"

ঘাড় ভেঙে ফেললে খুড়োর পক্ষে বাঁচা শক্ত, খুড়ো হয়ত মরেই যাবেন, আহা, তাতে তো ভাইপোর পাপ হবে। ভাইপো সেখানেও নির্ভয়। প্রথমত এদেশে কাকে পাপ বলে তাই ঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। সাধারণত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, জাল সাক্ষ্য, জাল দলিল, জাল মোকদ্দমা—এইসব অন্যত্র পাপকাজ বলে নির্ণীত। কিন্তু "ওই সমস্ত, পবিত্র সাধুসমাজের নিরন্তর অনুষ্ঠান ও আন্তরিক অনুমোদন দ্বারা বহুকাল হইল সদাচার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।" তবে ওই পণ্ডিতসমাজ বাহ্যত অপেয় পান, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যা গমনকে পাপকাজ বলেন বটে। সেখানেও পণ্ডিতদের কাণ্ডকারখানা দেখে ভাইপো সন্দিহান।—"সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে, সুরাপানে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না ; সাহেবদের মতো খানা খাইলে,··বিষয়াপন্ন লোকে বাড়িতে হাড়ি ও মুসলমান পাচক নিযুক্ত করিয়া গোমাংস, শূকরমাংস প্রভৃতি বিশুদ্ধ বস্তু পাক করাইয়া খাইলে,··বেশ্যালয়ে মদ্য মাংস সেবনপূর্বক আমোদ-আহ্লাদ করিয়া রাত্রি কাটাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না।" একমাত্র পাপ হতে পারে, পণ্ডিতদের বিধান অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ মারলে। আর সবাই জানে খুড়ো ব্রাহ্মণ। "খুড়োর ঘাড় ভাঙিলে হয় গোহত্যার, নয় ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবেক।" গো ব্রাহ্মণকে সমদৃষ্টিতে দেখে, ভাইপো জানালেন—ওহেন পাপের ঝুঁকি নিয়েই তিনি খুড়োর ঘাড় ভাঙবেন। ভাইপোর সমদৃষ্টি আরও অগ্রসর—আত্মবৎ সর্বভূতেষু করে তিনি বললেন, "আমি বিদ্যাবাগীশ খুড়োদের মতো গর্দভচূড়ামণি।"

"বিদ্যাভুড়ভুড়ি বিদ্যাবাগীশদের" জাতিকুল সম্বন্ধে ভাইপোর গবেষণা

এখানেই শেষ হয়নি। তাঁর জনমেজয় নামক খুড়োর উপাধি—'কবিরত্ন'। সময়োচিত কর্ণদোষে ভাইপো 'কবিরত্ন'-র বদলে 'কপিরত্ন' শুনেছিলেন—এবং ব্যাকরণের সূত্র নির্দেশ করে জানালেন, আপাতত 'কপিরত্ন' রাখাই সঙ্গত, কারণ, ব্যাকরণ অনুযায়ী 'কপিরত্ন'-কে 'কবিরত্ন' করা যাবে, কিন্তু কবিরত্ন-কে কপিরত্ন করা কোনোমতে সম্ভব নয়। "ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে, স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত প স্থানে ব হয়, কিন্তু ব স্থানে প পাইবার বিধান নাই।" জনমেজয় খুড়োর সঠিক উপাধি ঠিক কী হবে, তা পুরোপুরি সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ভাইপো তাই 'কপিরত্ন' বহাল রাখার পক্ষপাতী।

এখানেও শেষ নয়:

"প্রামাণিক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, [ওই] ঘটকচূড়ামণি প্রথম দশায় 'কচি পাঁঠা'—এই অপূর্ব উপাধি পাইয়াছিলেন। 'বোকা পাঁঠা' উপাধি হইলে তিনি লোকালয়ে অধিকতর বলবিক্রমশালী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন, এই প্রবল যুক্তি দেখাইয়া কেহ কেহ 'কচি' শব্দস্থলে 'বোকা' শব্দ বসাইতে চাহিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে নানা তর্ক ও বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল। অবশেষে 'বোকা পাঁঠা' অপেক্ষা 'কচি পাঁঠা' মোলায়েম, নিরবচ্ছিন্ন এই বিবেচনায় 'কচি পাঁঠা' উপাধিই সাব্যস্ত হইল। এই অনুসারেও 'কপিরত্ন' উপাধি সাব্যস্ত হওয়াই ঘটকচূড়ামণি খুড়ো মহাশয়ের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধিসিদ্ধ হইতেছে।"

ভাইপো, খাঁটি বা মেকী, কোনো ভদ্রতার ধার ধারেন নি। ব্রজনাথের সঙ্গে তাঁর লড়াই বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে। ছদ্মবেশী পণ্ডিত ভাইপো সে লড়াই করেছেন বটে! নিছক তলোয়ার খেলায় না থেমে তিনি গদাযুদ্ধও শুরু করেছিলেন; আর সেই যুদ্ধে কোমরের নীচে মার ন্যায়ানুমোদিত না হলেও অবধারিত। তিনি ন্যায়যুদ্ধ করতে চাননি অসৎ লোকের সঙ্গে। সেকালে স্মৃতির পণ্ডিতরা বিধান দেবার সময়ে মুদ্রার ঝণৎকার শুনলে 'স্মৃতি' বিস্মৃত হতেন। "ইহা কাহারও অবিদিত নাই, বিদ্যাবাগীশ খুড়া মহাশয়েরা ব্যবস্থা বিষয়ে কল্পতরু।" আর কল্পতরু যেহেতু সকল প্রার্থনাই পূরণ করে, তাই এঁরাও একবার একটা ব্যবস্থা দিয়ে, সেই বিষয়ে বিপরীত ব্যবস্থা দিতে দ্বিধা করেন না। সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর সঠিক শ্রাদ্ধাধিকারী কে, সে বিষয়ে সমস্যা ঘটলে ব্রজনাথ গোড়ায় যে-বিধান দিয়েছিলেন, পরে ঠিক তার উল্টো বিধান দিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এ কি, আপনি পূর্ব ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করেছিলেন, এখন ঠিক তারই উপর দোষারোপ করে বিপরীত পক্ষের পোষকতা করছেন?" ব্রজনাথের উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর হতবাক। "বিদ্যারত্ন সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত বচন-ফচন দেখা যায়?" কিছুটা সামলে নিয়ে বিদ্যাসাগর ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন, "আপনি যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, আমিও পারি। কিন্তু ওরূপ পরিচয় দেওয়া দূরে থাক, যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি

অপমান বোধ হয়। বলিতে কি, আপনাদের আচরণের জন্য ব্রাহ্মণজাতির মান একেবারে গিয়াছে।"

ভাইপো তাই এঁদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার অপেক্ষা চরিত্রবিচারেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। বিদ্যারত্ন ও তাঁর সাগরেদ সমর্থকদের সম্বন্ধে তিনি ছড়া কেটেছেন : "হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র পাত্র, / যেমন পোড়ারমুখ দেবতা, তেমনই ঘুঁটের ছাই নৈবেদ্য।" বাড়িতে বিধবা থাকলে কোন্ উপকার, সে সম্বন্ধে মর্মঘাতী ব্যঙ্গোক্তির যে-রচনা আগে উৎকলন করেছি, তা এই ব্রজবিলাসের মধ্যেই ছিল।

অর্থলোভী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের একটি বর্ণনা উপস্থিত করেই 'ব্রজবিলাস' প্রসঙ্গ শেষ করব। বর্ণনাটিতে ঘৃণামাখানো ছবি আছে :

"খুড়ো মহাশয়েরা গুড়কলস-পিপীলিকা। গুড়ের কলসীর মুখ এমন বন্ধ করা আছে যে, তাহাতে কোনও মতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং গুড় খাইবার আশা সুদূরপরাহত। তথাপি পিপীলিকারা গুড়ের গন্ধেই মাত হইয়া কলসীর চারিদিকে সারি বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। সেইরূপ বিদ্যাবাগীশ খুড়ো মহাশয়েরা পয়সা পান বা না-পান, পয়সার গন্ধে অন্ধ হইয়া, 'যদি পাই' এই প্রত্যাশায় পয়সাওয়ালার গদীর নীচে গরুড়ের ন্যায় বসিয়া, শ্লোক পড়িয়া, তোষামোদ ও জল উঁচু নীচু করেন, এবং যৎকিঞ্চিৎ লাভের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, ইহকালে ও পরকালে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া পয়সাওয়ালাদের খাতিরে তাঁহাদের অভিমত ব্যবস্থায় অবিকৃতচিত্তে স্ব-স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন।"[২৮]

॥ ৫ ॥

'বিনয় পত্রিকা,' 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' নামে লেখা হয়নি। এখানে লেখক-নাম 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ'। লেখাটি পূর্বের মতো ফাজিল-চালাকের ভঙ্গিতে লেখা নয়। যশোহর হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভার প্রকাশিত প্রতিবেদনের (সমাচার-চন্দ্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছিল) উত্তর দেওয়া হয়েছে এতে, অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্যের সঙ্গে। তবে এর মধ্যেও 'কৌতুককর উপাখ্যান' বাদ যায়নি। সেটি পূর্বোক্ত 'পোড়াব, না পুঁতব' কাহিনী।

'রত্নপরীক্ষা'-য় আবার পূর্বের ছাঁদ ফিরে এসেছে। এর মধ্যে তিনটি রত্নের গাথা—ওই তিনজনই হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিধবাবিবাহের আশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর। ওঁরা হলেন—মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন এবং প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মধুসূদন স্মৃতিরত্নের উপরই মূল আক্রমণ। তবে ওঁর রচনা অনুমোদন করেছিলেন বলে বাকি রত্নদ্বয় তূণের বাড়তি শরগুলি পেয়েছেন।

রত্নপরীক্ষা-র 'বিজ্ঞাপন' থেকেই শস্ত্রাঘাত শুরু। লেখাটি ভাইপো-র নামে প্রচারিত নয়—তা প্রচারিত 'উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য' এই নামে। নামবদলের

কারণ ? ভাইপো কি ভয়ে রণভঙ্গ দিলেন ? মধুসূদন ন্যায়রত্ন আস্ফালন করে বলেছেন, আমি যা লিখেছি তা অকাট্য, কেউ সাহস করে তার উত্তর লিখতে পারল না। তাঁর সামনে কি ভাইপোও সাহস হারালেন ? ভাইপোর সহচর দুঃখের সঙ্গে এইসব প্রশ্ন করেছিলেন। ভাইপো তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "আরে না না, আমি যে-রকম ডাংপিটে, তাতে ভয় খাওয়া আমার ধাতে নেই। তবে"—খুব বিষণ্ণভাবে বললেন—"ব্রজবিলাস লিখে আমি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন খুড়োর মানবলীলা সংবরণের কারণ হয়েছি। হাঁ, আমার বিষময়ী লেখনীর আঘাতেই যে তিনি গত হয়েছেন, তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নেই।"

নিতান্তই ছদ্মদুঃখ। ব্রজনাথের মৃত্যুও বিদ্যাসাগরকে নরম করতে পারে নি। ভাইপোর এই বক্র কণ্ঠস্বর: "আমাদের সমাজে গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রজবিলাস লিখিয়া কোন্ পাপে লিপ্ত হইয়াছি বলিতে পারি না।" নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করেই চললেন:

"এ অবস্থায় [মধুসূদন স্মৃতিরত্ন সম্বন্ধে] আর আমার মধুবিলাস লিখিতে সাহস ও প্রবৃত্তি হইতেছে না। মধুবিলাস লিখিলে হয়ত আমায় পুনরায় ঐরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইবেক। বিশেষত স্মৃতিরত্নখুড়ি বুড়ি নহেন। তাঁহাকে ইদানীন্তন প্রচলিত প্রণালী অনুসারে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবেক, সেটিও নিতান্ত সহজ ভাবনা নহে।"

আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধেই বই লিখেছিলেন।

ভাইপোসহচর বিদ্যাবুদ্ধিতে ভাইপোর চেয়ে কম নন। এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তিনি অভেদাত্মা। মধুসূদন স্মৃতিরত্নের পঞ্চ সিদ্ধান্তকে তিনি প্রয়োজনীয় যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। স্মৃতিরত্নকে ভাইপোসহচর বিশেষ ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন—সংস্কৃত কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের একটি চিঠি ছাপিয়ে, যেটি তিনি মধুসূদন স্মৃতিরত্নের পুস্তিকা পেয়ে লেখেন। প্রশংসাপ্রত্যাশী স্মৃতিরত্নের লেখার প্রশংসা তো মহেশচন্দ্র করেনই নি, পরন্তু নানা অশুদ্ধি দেখিয়ে স্মৃতিরত্নের বিদ্যার আস্ফালনকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগরী রীতিতে বিদ্রূপও করেছেন। তাঁর মতে, স্মৃতিরত্ন 'পতিরন্যো বিধীয়তে'—এই বচনের ভ্রান্ত অর্থ করে চরিত্র-দূষণের পথ খুলে দিয়েছেন। স্মৃতিরত্নের ভাষ্য মানতে হলে, বিদেশস্থ স্বামীর সংবাদ না পাওয়া গেলে স্ত্রীরা পুত্রকামনায় ক্রমাগত দেবর-সঙ্গত হতে পারবে। এই মারাত্মক ভাষ্যের কথা বলার পরে মহেশচন্দ্র লিখেছেন:

"বিধবাবিবাহ ঘৃণিত ব্যাপার বলিয়া, তাহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে গিয়া, অতীব পবিত্র, সাধুজনসমাদৃত নিয়োগব্যবস্থা প্রচার করিয়া, জগতের, বিশেষত কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের আপনি বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাতে কেবলমাত্র বিধবার উপকার ; আপনার ব্যবস্থাতে সধবা

ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেরই উপকার আছে দেখিতেছি। বিশেষত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে, ঘরের কুলবধূকে অন্যের গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়, আপনার মতে তাহা নহে ; ঘরের বউ ঘরে থাকিবে, দেবরের উপকার হইবে, অথচ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিণ্ডের সংস্থান হইবে। ইহারই নাম, 'গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকে ; পিতৃলোকের তৃপ্তি।' সুতরাং আপনার সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইলেও অনেকে, বিশেষত কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, উহা সাদরে গ্রহণ করিবেন।"

এর পরেই শেষ মার :

"আপনি নিজে একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়াই বোধ হয় পরাশরবচনের এই সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।"

দীর্ঘ পত্র শেষে, যা স্মৃতিরত্নের অপসিদ্ধান্তের অপরূপত্ব দেখাতে ব্যাপৃত, মহেশচন্দ্র সাবধান করে লিখেছিলেন :

"আপনি পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া ভালো করেন নাই। দেশীয় পণ্ডিতদিগকে পুনরায় 'ভাইপোস্য' দ্বারা অপদস্থ হইতে হইবে। 'ভাইপোস্য'-র দ্বিগুণ অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে, এজন্য বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম।"

এই বইয়েও ভাইপোসহচর শাস্ত্রবিচারের সঙ্গে চরিত্রবিচার জুড়ে দিয়েছিলেন। শাস্ত্র মানুষের তৈরি—মানুষের জন্য। কোনো অন্যায়কারী ন্যায়শাস্ত্রী হতে পারে না। তেমন অন্যায়ের ঘটনার দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, ধর্মরক্ষার দাবিদাররা আসলে ধর্মব্যবসায়ী ছাড়া কিছু নয়। শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণরা, তাঁদের নীতি অনুযায়ী, গোপগৃহের শ্রাদ্ধে যোগদান করতে বা দান গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু দেখা গেল. ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্নসহ অজস্র 'সদ্‌ব্রাহ্মণ' নদীয়া জেলার মুড়াগাছা গ্রামের তিনকড়ি ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং "উঁহাদিগের জগদ্ব্যাপী অভিমান প্রায় ৫০০০ টাকা পণে বিক্রীত হইয়া উক্ত ঘোষকে স্বর্গস্থ করিয়াছে।" এহেন অশাস্ত্রীয় কাজ কেন করলেন তার একটা হ্যা-হ্যা উত্তর তাঁরা দেন : "অস্মাকীনাং নৈয়াকুনামর্থনি তাৎপর্যং শব্দীন কোশ্চিন্তা—আমরা নৈয়ায়িক, অর্থ পাইলেই চরিতার্থ হই. শব্দ অর্থাৎ লোকনিন্দার ভয় রাখি না।"

কেবল ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নয়, মনুস্মৃতির সিদ্ধান্তও ব্রাহ্মণদের পক্ষে : "সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্"—পৃথিবীতে যে-কিছু বস্তু আছে, সমস্তই ব্রাহ্মণের স্বত্বাস্পদীভূত। "এই মানবীয় ব্যবস্থা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, [ভাইপোসহচর স্বতঃই সিদ্ধান্ত করেছিলেন] এই পৃথিবীতে যে-সকল বস্তু আছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মণজাতির সম্পত্তি। সুতরাং টাঁকশাল, তেরেজরি, বাঙ্গালবেঙ্ক, রাজার বাড়ি, জমিদারের বাড়ি, তালুকদারদের বাড়ি, ব্যবসাদারদের বাড়ি প্রভৃতি যে-কোনও স্থানে যে-কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্তই ব্রাহ্মণের। এমন স্থলে, কি গোপ, কি কৈবর্ত, কি কলু, কি সেকরা, কি হাড়ি, কি বাগদি, কি মুচি, কি চণ্ডাল, কাহারও বাড়িতে গিয়া

ইচ্ছামতো অর্থ আনিলে ব্রাহ্মণকে, বিশেষত ধর্মধ্বজ অধ্যাপক মহোদয়দিগকে পরকীয় অর্থ গ্রহণের জন্য দোষভাগী হইতে হইবেক কেন ?"[২৯]

গোপভবনে গমনের উচ্চতর, মহত্তর কারণও উক্ত ব্রাহ্মণগণের মুঠোয় ছিল :

"সভার মাঝে প্রধান মহাশয় নাকি দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া বক্তৃতা করেন যে, 'ভগবান দ্বাপর-শেষে কৃষ্ণ-অবতারে গোপকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন। তদ্রূপ আমিও আজ সেই গোপকুল পুনরুদ্ধার করিলাম'।"

এর পরে ভাইপোসহচরের বিদ্রূপের মধ্যে মধুরসের অংশ শুকিয়ে গিয়ে শুধু ঘৃণার ফুৎকারটুকু অবশিষ্ট ছিল :

"যে-সময়ে এইসব অবতার, সে কালে প্রবল ঝটিকা, ভয়ানক জলপ্লাবন, অস্বাভাবিক উল্কাবর্ষণ, নিরন্তর ভূমিকম্পন, মুহুর্মুহু দুর্ভিক্ষ ও দুর্বিষহ সর্বত্রব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশ নষ্ট হইবে, ইহা আশ্চর্য কি! ধন্য মহাত্মাগণ! আপনারাই কলির দূত জানিলাম।"

ক্রোধ অসহ্য, তবু হাসি। হাসির অনেকগুলি গল্প রত্নপরীক্ষায় আছে। তাদের মধ্যে "মহীলতা মানে কেঁচো," "চার বিদ্যাবাগীশ ও আদালতের সেরেস্তাদার," "কেনারাম ও কেবলরাম"-এর গল্প অন্যত্র বলা হয়েছে। এখানে একটি গল্প দিয়ে অধ্যায় শেষ করব।—

"এক বিদ্যাবাগীশ কোনও বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহাকে সর্বস্ব দিব।' এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মণী নিরতিশয় ব্যাকুলা হইয়া কাতরবচনে কহিলেন, 'তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ও-রূপ সর্বনাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না ; এখনই কেহ বুঝাইয়া দিয়া সর্বস্ব লইয়া যাইবেক ; ছেলেগুলি খেতে না পাইয়া মারা পড়িবেক।' তখন বিদ্যাবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'আরে হাবি, তুই সেজন্য ভাবিস কেন ? আমি যদি না-বুঝি, কার বাপের সাধ্য আমায় বুঝায়' ?"[৩০]

ঠিক ঠিক।

কান্নায় পোড়া হাসি

॥ ১ ॥

এদেশের সেরা মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর, মানুষ সম্পর্কে, বিশেষত বাঙালী মানুষ সম্পর্কে, সবচেয়ে তিক্ত উক্তি করেছেন। কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের এই মনোভাবকে 'নরজাতিদ্বেষ' বলে চিহ্নিত করেছেন। "শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope নরজাতিদ্বেষী হইয়াছিলেন [কৃষ্ণকমল লিখেছেন]। বিস্তর লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য হইয়াছিল যে, অনেক সহ্য করিয়া শেষটা তিনি অসংযতবাক হইয়া পড়িয়াছিলেন।···শেষাশেষি সভ্যজাতি ও সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।"[১]

মানুষ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের চরম উক্তিও তাঁরই। যদি শুনতেন, কেউ তাঁর নিন্দা করছে, তখন তিক্ত হাসির সঙ্গে বলতেন, "আমার নিন্দা করছে : রও রও. ভেবে দেখি, সে-ব্যক্তি আমার নিন্দা করবে কেন ? কই, তার কোনো উপকার করেছি বলে তো মনে পড়ছে না !"[২]

এদেশ সম্বন্ধে তাঁর চরম নৈরাশ্যের উক্তি :

"এদেশের উদ্ধার হতে বহু বিলম্ব আছে। পুরনো স্বভাব ও প্রবৃত্তির মানুষের চাষ উঠিয়ে দিয়ে, সাত পুরু মাটি তুলে ফেলে, নতুন মানুষের চাষ করতে পারলে, তবে যদি এদেশের ভালো হয়।"[৩]

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতার একাধিক কাহিনী আগে দিয়েছি। একের পর এক সেগুলি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তেমন আরও একটি-দুটি :

বিদ্যাসাগরের দাতাকর্ণ খ্যাতি। তাঁর কাছে কেঁদে পড়লে কিছু-না-কিছু জুটে যায়। এক অচেনা লোক এসে তাঁকে কাতর আবেদন জানাল—"চোরে আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে, বাড়ি ফেরার পয়সা পর্যন্ত নেই, যদি সেই পাথেয়টুকু অন্তত দেন, আপনার চরণে বাঁধা থাকব।"

বিদ্যাসাগর দিলেন।

বাইরে এসে লোকটি দাঁত বার করে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। সঙ্গীকে বলল, "তুমি ভাই ঠিক খবর দিয়েছিলে। বিদ্যাসাগর শালাকে বেশ ঠকানো যায়।"[৪]

এ তো দরিদ্র সাধারণ লোক। বাবু লোকেরা আরও দড়। এক ব্যক্তি "উচ্চপদস্থ ও যশস্বী"। লোকটির উচ্চপদ ও যশ বিদ্যাসাগরের কল্যাণেই—তিনি ওই ব্যক্তির চাকরি করে দিয়েছিলেন। লোকটির কাছে বিদ্যাসাগর একদিন একটি চিঠি দিলেন—কোনো একজনের একটা চাকরি করে দেবার জন্য। উচ্চপদস্থ লোকটির অধীনে চাকরি খালি ছিল। বিদ্যাসাগরের সুপারিশ-পত্র নিয়ে প্রার্থী উক্ত বাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বাবু তখন মজলিশে—

ইয়ারবর্গকে নিয়ে সোফায় বসে আলবোলায় তামাক টানছেন। প্রার্থী তাঁর হাতে বিদ্যাসাগরের চিঠি দিলেন। তা পড়ে তিনি তামাক টানতে-টানতে মুচকে-মুচকে হাসতে লাগলেন। বয়স্যারা জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি ?" বাবু, হাত উলটে—"ব্যাপার আর কি ? বিদ্যেসাগর ব্যবসা ধরেছে। লোক পাঠাচ্ছে —চাকরি করে দাও।" বাবু ইঙ্গিতে হাসলেন।[৫]

শেষ বয়সে ভাঙা শরীর এবং ক্ষতবিক্ষত মন সারাতে বিদ্যাসাগর কার্মাটারে যেতেন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকতে পারতেন না। চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানে বেশিদিন থাকেন না কেন ? বিদ্যাসাগরের চোখ জলে ভরে এল। "আমি সেখানে থাকব—তাহলে এদের হবে কি"—বলে মাসিক দানের হিসাবের খাতা চণ্ডীচরণের সামনে ফেলে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। "কেন, অপরের হাতে কিছুটা ভার দিলেও তো পারেন"—চণ্ডীচরণের চোখে-মুখে বোধহয় এই অনুক্ত প্রশ্নটা জেগে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগর : এক আত্মীয়-বন্ধুর হাতে ২৫০০ টাকা দিয়ে তিন মাসের জন্য বিদায় নিয়ে কার্মাটার গিয়েছিলাম। যাবার সময়ে বলে গিয়েছিলাম, মাসে মাসে যাদের যা প্রাপ্য দিয়ে দিও। আমার এমন কপাল যে মাস যেতে না যেতে চারদিক থেকে খবর আসতে লাগল, 'আমাদের পেটে ভাত নেই, উনুনে হাঁড়ি চড়ে না, কেউই মাসোহারার টাকা দেয়নি।' যাকে টাকা দিয়ে এসেছিলাম, তাকে চিঠি লিখলাম—কোনো জবাব নেই। তখন তাগাদার জ্বালায় অস্থির হয়ে কলকাতায় ছুটে এলাম। আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লোকে মাসোহারার টাকা পায়নি কেন ?' সে বলল, 'অন্য কাজের খুব চাপ ছিল, তাই দিয়ে উঠতে পারিনি।' এই বলে সে সরে পড়ার তালে আছে, আমি কি করি, লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে বললাম, 'আচ্ছা, কাজের চাপে টাকা না-হয় দিতে পারনি, এখন তাহলে টাকাটা ফেরত দাও, আমি যাকে যা দেবার দিয়ে যাই।' আমার পরমাত্মীয়টি তাতে বলল, 'হাঁ—তা—টাকাটা—অন্য—বাবদে—খরচ হয়ে গেছে'।"

বলতে বলতে বিদ্যাসাগরের মুখে ক্ষোভ দুঃখ ও অভিমানের থরথর কাঁপন। "বিষাদপূর্ণ উত্তেজনার" সঙ্গে বললেন, 'তখনই ২৫০০ টাকা ধার করে এনে প্রত্যেকের তিন মাসের মাসোহারা একসঙ্গে দিয়ে, কর্মাটারে বাকি দু'মাসের বিশ্রামের জন্য যাই।'"[৬]

প্রবঞ্চনার ধরন কি এক রকম ? বিদ্যাসাগরের অস্ত্রে বিদ্যাসাগরকে মারার বিচিত্র দৃষ্টান্ত আছে। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ দুইয়েরই প্রতিবাদী। বিধবাবিবাহ আইন পাস করিয়ে, এবং তার ব্যবস্থা করে যখন তিনি উল্লসিত—তখন তাঁর মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে তাকে পুড়িয়ে দিয়েছে কোনো-কোনো বিধবাবিবাহবীর। সপত্নীক অবস্থাতেই তারা বিধবাবিবাহ করে বসেছে। বিদ্যাসাগর "এইরূপ প্রবঞ্চকের আচরণে নিরতিশয় মর্মপীড়া ভোগ করিয়াছেন।"[৭]

বিদ্যাসাগর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে একদিন চণ্ডীচরণকে একটি উদ্ভট

শ্লোক শুনিয়েছিলেন : "কুরঙ্গমারঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গমীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ / একঃ প্রমাদী স কথনং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ।" তারপর ব্যাখ্যা করে বলেন, "একটি ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে জীবগণ বিনষ্ট হয়, সেখানে মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত। কোথায় তাদের শাসন করবে, তা নয়—তাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতর জন্তু অপেক্ষা হীন ঘৃণ্য কাজ করে যাচ্ছে।"

উত্তেজনায় অধীর হয়ে তিনি বলেছিলেন, "ইতর জন্তু কারা? যাদের তা বলা হয় তারা, নাকি মানুষেরা? মানুষ সব অপকর্মই করতে পারে। তাহলে শৃগাল, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র—এইসব জীবদের কেন ইতর জন্তু বলব—কেন? কেন?"[৮]

॥ ২ ॥

তিন খণ্ডের আখ্যানমঞ্জরীর পাতা ওলটালে বিস্মিত হয়ে দেখতে হয়—বিদ্যাসাগর কত সংখ্যায় কৃতজ্ঞতা ও প্রত্যুপকারের কাহিনী বলেছেন। কৃতঘ্নতার কাহিনীও আছে, তবে সংখ্যায় অল্প। ধর্মশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়াশীলতা, বদান্যতা, আতিথেয়তা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, ভ্রাতৃস্নেহ, অপত্যস্নেহের বিষয়ে বহুসংখ্যক কাহিনী সেখানে মেলে। জাতীয় শিক্ষক বিদ্যাসাগর—ছাত্রদের চরিত্রগঠনের জন্য সদ্‌গুণাবলী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে তিনি প্রদত্ত শিক্ষার সুফল দেখতে পাননি। অথবা সামাজিক নৈতিকতার অভাব দেখেই ওই ধরনের কাহিনী সংকলনে তাঁর প্রয়াস? আরও লক্ষ্য করা যায়, নিস্পৃহতার একাধিক কাহিনী দিলেও তিনি নিজে ওই গুণটির প্রতিভূ হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর মতো হৃদয়বান মানুষ আঘাতে আঘাতে জর্জর হয়ে নিস্পৃহ হবার শক্তি হারিয়েছিলেন।

এবং তিনি কেবল অর্থলোভী সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নয়, সাধারণ-ভাবে ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু এই কাহিনী শুনিয়েছেন :

কলকাতার এক উচ্চপদস্থ বাঙালী কর্মচারী পীড়িত হলে তাঁর চিকিৎসক বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দেন। চিকিৎসক বিদ্যাসাগরের পরিচিত। বিদ্যাসাগরের কামাটারের বাড়িটি সেজন্য যদি কিছুদিনের জন্য পাওয়া যায়, তার অনুরোধ করতে চিকিৎসক মহাশয় উক্ত রোগীকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে হাজির হলেন। রোগীর পরিচয় দিতে গিয়ে চিকিৎসক উৎসাহের সঙ্গে বললেন—"ইনি অতিশয় ভদ্রলোক।" বিদ্যাসাগর হাসলেন।

বিদ্যাসাগর : ওঁর সঙ্গে যখন আমার আলাপ নেই তখন তোমার কথা মানতে বাধ্য। তবে এ-পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভদ্রলোক তো বড়ো একটা দেখতে পাই না।[৯]

প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ছাত্র; ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি চাকরি ছেড়ে নিমতলায় কাঠের গোলা করেছিলেন। সূর্যকুমার সর্বাধিকারী ও জয়গোপাল পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে

বিদ্যাসাগর ছাত্রের গোলা দেখতে গেছেন। নগেন্দ্রনাথ ব্যস্তসমস্ত হয়ে আসন পাততে যাচ্ছেন, বিদ্যাসাগর বারণ ক'রে কাঠের উপরই বসে পড়লেন। কাঠের গোলা করলে কি হবে, নগেন গাঙ্গুলি ইংরেজিশিক্ষিত, তাই তাঁর হাতে ছিল 'কনটেমপোরারি রিভিউ'। বিদ্যাসাগর ধমক দিয়ে বললেন, "ব্যবসা করতে বসেছিস, হাতে ওই পত্রিকা কেন? একান্তই যদি বই রাখতে হয়, ব্যবসাদারের মতো রামায়ণ মহাভারত রাখ না।" ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগরকে দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। বিদ্যাসাগর শুধোলেন, "আরে, এত লোক জমেছে কেন?" নগেন্দ্র বললেন, "আপনাকে দেখতে।" বিদ্যাসাগর মজা পেয়ে বললেন, "তবে তুই ঘণ্টা বাজা, ঘণ্টা বাজা।"

তাঁর শিক্ষিত ছাত্র ব্যবসা করছে দেখে স্বয়ং ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর খুশি হয়ে ব্যবসা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। এবং যেহেতু নিরন্তর প্রবঞ্চিত তিনি, ব্যবসার নগদ-ধার প্রসঙ্গ তুললেন।

নগেন্দ্র : আজ্ঞে, ধারেও বেচি, নগদেও বেচি।

বিদ্যাসাগর : ধার কাকে দিস?

নগেন্দ্র : আজ্ঞে, ভদ্রলোক দেখে ধার দিই।

বিদ্যাসাগর : ভদ্রলোক কি করে বুঝিস?

নগেন্দ্র : চেহারা দেখে বুঝি।

বিদ্যাসাগর : দূর মূর্খ, ভদ্রলোক ঠিক করবি চেহারায় নয়, ব্যবহারে। ব্যবহার করে করে যখন দেখবি মানুষটি খাঁটি, সে তার চেহারা যাই হোক, তাকে ধার দিবি, নচেৎ কিছুতেই নয়।[১০]

বড় দুঃখেই তিনি পৃথিবীর মনুষ্যজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, এক ভাগে পড়ে ঠকবাজের দল, অন্যভাগে ঠকে-যাওয়ার দল। একদিকে আছে বোকা গরুরা, অন্যদিকে তাদের দুইবার গুরুরা! রাজনারায়ণ বসুকে এই মর্মে ছড়া শুনিয়েছিলেনও :

"পৃথিবীতে যত ব্যাটা—সব ব্যাটা গরু,
যে যারে ঠকাতে পারে সেই তার গুরু।"[১১]

সুতরাং 'যেথায় আছে দীনের হতে দীন', সেইখানে এই ঈশ্বরচন্দ্রের 'চরণখানি রাজে।'

বিদ্যাসাগর আম-পোস্তায় হরিশচন্দ্র গুঁই ও শীতলচন্দ্র গুঁইয়ের দোকানে আম কিনতে গিয়ে বেশ খানিকক্ষণ গল্প না করে আসতেন না। সেখান দিয়ে যাবার সময়ে বাবু-মহাশয়রা বিদ্যাসাগরের 'মর্যাদাহীন' ব্যবহার দেখে বড়ো লজ্জা পেতেন। একজন তো অনুযোগ করে বলেছিলেন, "আপনি এত বড়মানুষ, আর ও হলো সামান্য দোকানদার—আপনি ওখানে বসেন কেন?" ভদ্রলোকটি এই উত্তর পেয়েছিলেন—"আমি ওখানে বসে গল্প করি কেন জানো—এই তোমাদের মতো বড়লোকদের চেয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করে অনেক বেশি সুখ পাই বলে।"[১২]

পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে বিদ্যাসাগর যেতেন, তা আগেই বলেছি। তার কাছাকাছি বিদ্যাসাগরের পূর্বপরিচিত রামধন-মুদির দোকান। রামধন বিদ্যাসাগরকে 'খুড়ো' বলে ডাকে। খুড়ো গাড়ি করে যাচ্ছে—দেখে তার আহ্লাদ হলো, ডাক দিল—"ও খুড়ো, কেমন আছো, ভালো তো ?" বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ সেখানে হাজির। রামধন খাতির করে তাঁর বসার জন্য চট বিছিয়ে দিল। তাতে বসে 'খুড়ো' তাঁর গরিব দোকানী 'ভাইপো'র সঙ্গে গল্প জমালেন—থেলো হুঁকোয় টান দিতে দিতে। ঠিক সেই সময়ে রাজবাটীর এক ব্যক্তি "সুবৃহৎ অশ্বযোজিত রাজশকটে সান্ধ্যসমীরণ সেবনের" জন্য বেরিয়েছেন। গাড়ি মুদির দোকানের কাছাকাছি গেলে, বিদ্যাসাগরকে সেখানে ওই অবস্থায় দেখে তাঁর মাথা হেঁট। ইচ্ছা হলো, বিদ্যাসাগরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। কিন্তু তাই-বা করেন কি করে! লোকটিকে যে লঙ্ঘন করে চলে যাওয়া যায় না! মানসম্ভ্রম খানিক গিলে, বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে, কোনোক্রমে নমস্কারাদি জানাতে হলো। তারপর একদিন তাঁদের আবার দেখাসাক্ষাৎ হলে বিদ্যাসাগরই কথাটা পাড়লেন।

বিদ্যাসাগর : সেদিন আমার সঙ্গে ওই অবস্থায় দেখা হয়ে বড় বিপদে পড়েছিলে, নয় ? খুব লজ্জা হয়েছিল ?

রাজবাটীর মানুষটি : লজ্জা হবে না ? আপনি পথে-ঘাটে ওইরকম করে বসে আছেন, দেখলে লজ্জা তো হবেই।

বিদ্যাসাগর : ঠিক ঠিক। এক কাজ করো, তাহলে আর লজ্জা পাবার কারণ থাকবে না। আমার সঙ্গে পরিচয় রেখো না—তাহলে পথে-ঘাটে তোমাদের অপদস্থ হতে হবে না। (কড়া স্বরে) তোমাদের খানকতক চেয়ার আছে বলে তোমরা বড়লোক, আর ওর চটের আসন সুতরাং ছোটলোক। শোনো, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেই বেশি তৃপ্তি পাই। বলো তো, তোমাদের বাড়ি আর আসব না।[১৩]

[শম্ভুচন্দ্র ও চণ্ডীচরণের বর্ণনা জড়িয়ে উপরের বিবরণ হাজির করেছি। শম্ভুচন্দ্রের বিবরণের একটা অংশ গ্রাহ্য করার নয়। তিনি লিখেছেন, বিদ্যাসাগরকে দেখেও উক্ত রাজাবাবু মুখ ফিরিয়ে চলে যান। আমরা বিদ্যাসাগরের চরিত্র যতটা বুঝেছি তাতে বলতে পারি, বাবু যদি মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন, তাহলে তাঁর দিকে বিদ্যাসাগরের মুখও কদাপি ফিরত না।]

ইন্দ্র মিত্র একটি চমৎকার কাহিনী সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে বিদ্যাসাগর এক ধনীলোকের বাড়িতে বসে আছেন আরও কয়েকজনের সঙ্গে। মাথায় টানাপাখা। সেই সময়ে তাঁর কাছে এক দারোয়ান এসে উপস্থিত, একটা চিঠি নিয়ে। প্রখর রোদে এসেছে, ঘাম ঝরছে, মুখ টকটকে লাল। বিদ্যাসাগর তাকে নিজের পাশে পাখার নীচে বসতে বললেন। বাবুদের সঙ্গে একাসনে সে বসতে পারে না। বিদ্যাসাগর হাত ধরে বসালেন। সে চলে যাবার পরে, উপস্থিত ভদ্রজনেরা অনুযোগ করতে লাগলেন। "এটা

আপনি কী করলেন পণ্ডিত মহাশয় ? আমরা যে-আসনে বসে আছি সেখানে একজন দারোয়ানকে বসিয়ে আপনি ভালো করেন নি। এতে আমাদের মান থাকে না।” বিদ্যাসাগর শুনলেন, কিন্তু অভ্যাসমতো জ্বলে উঠলেন না, পরিবর্তে কিছু মধুমাখা বাক্য উপহার দিলেন—তবে অবশ্যই সেগুলি মধুমাখা হুল।

বিদ্যাসাগর : আগে বিচার হোক, তবে আমাকে দোষী করো। বিচার কিভাবে হবে, হিন্দুমতে না অন্যমতে ? হিন্দুমতে বিচার শোনো : এই দারোয়ান কনৌজী ব্রাহ্মণ, এরা আমাদের জল পর্যন্ত ছোঁয় না। তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দা আজ এখানে থাকলে, ওর পায়ের ধুলো এই জাজিমে না পড়ে তোমাদের মাথায় উঠত। অন্য মতে বিচার শোনো : আমরা সকলে পাঁচশো সাতশো হাজার টাকা মাইনে পাই, এই দারোয়ান পাঁচ টাকা মাইনে পায় ; তাই বলে আমি ওকে অবজ্ঞা করতে পারি না, কারণ আমার বাবা বড়বাজারে এক দোকানে পাঁচ টাকা মাইনেয় কাজ করতেন। ওকে অবজ্ঞা করার আগে তাহলে আমার বাবাকে অবজ্ঞা করতে হয়। হয়ত এখানে আমাদের মধ্যে আরও কেউ-কেউ আছে যাদের বাবা কিংবা ঠাকুর্দা পাঁচ টাকা মাইনেয় কাজ করে গেছেন।[১৪]

বিচারকের আসনে বিক্রমাদিত্য ?' না, বিক্রমে আদিত্য—বিদ্যাসাগর।

॥ ৩ ॥

মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার-করা বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে নুন দিয়ে মোটা চালের ভাত খেতেন, যাতে পূর্বজীবন ও বর্তমান জীবনের মধ্যে যাতায়াতের সেতু অটুট থাকে, সেকথা আগে জেনেছি। সেইভাবেই তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে যাতায়াতের অভ্যাস বজায় রাখতে কখনো কুলি, কখনো মালি, কখনো পাইক, কখনো পাচক সাজতেন। এসব সাজ করার সময়ে তিনি মজাবোধও করতেন। মানুষের জীবনে—বেশে ও ছদ্মবেশে কি সত্যই কোনো পার্থক্য আছে ? মূলে নগ্ন মানুষের যে-কোনো বেশই তো ছদ্মবেশ !

তাঁকে তো উড়িয়া বেয়ারা রূপে অনেকেই দেখেছেন। তাঁর মতো মানুষের ভারবাহী জীব এদেশে আর কে ছিলেন ? তাঁকে বাগানের মালী রূপেও দেখা গেছে।

নগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেছেন। বিদ্যাসাগর তখন সামনের বাগানের ঘাস নিড়োচ্ছিলেন। সেই সময়ে মেদিনীপুরের চারজন ভদ্রলোক এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর যা চেহারা, এবং বাগানে তিনি যা করছিলেন—তদনুযায়ী আগত ব্যক্তিরা ঠিক করলেন—লোকটি নির্ঘাত মালী।

আগন্তুকরা জিজ্ঞাসা করলেন, “ওহে, বিদ্যাসাগর মশাই আছেন ?”

—“আপনারা একটু বসুন, তিনি একটু ব্যস্ত আছেন।”

খানিক পরে তাঁরা বললেন, “ওহে, তামাক খাওয়াতে পারো ?”

—“আজ্ঞে হাঁ, পারি।”

চারটে হুঁকোয় সাজা তামাক এসে গেল।

কিছু সময় গেল। তামাক খেতে খেতে ভদ্রলোকরা ব্যস্ত হয়ে বললেন—"ওহে, দেখোনা, বড্ড দেরি হচ্ছে যে!"

ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগরের হাতের কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি কাছে এসে বললেন—"কি প্রয়োজন বলুন?"

—"তুমি বিদ্যাসাগরকে খবরই দাও না!"

বিদ্যাসাগর সবিনয়ে বললেন—"আজ্ঞে ওই নামেই আমি পরিচিত।"

ভদ্রলোকেরা হতভম্ব। তারপর কাড়াকাড়ি করে বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলো নিলেন। কল্পকথার একটি মানুষকে বাস্তবে পুরো মাপে পেয়ে তাঁরা বললেন—"হাঁ, সত্যই বিদ্যাসাগর।"[১৫]

পরবর্তী কুলি-কাহিনীতে বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপগর্ভ সৌজন্য।

কার্মাটার রেল-স্টেশনে এক বাঙালী ডাক্তারবাবু নেমেছেন, হাতে ছোট একটি ব্যাগ। ব্যাগ ছোট কিন্তু মানুষটি বড়, কেননা তিনি ডাক্তারবাবু। সুতরাং 'কুলি কুলি' বলে ঘন ঘন হাঁক। কুলি এসে গেল, এবং বাবুর মাল তুলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে পালকিতেও তুলে দিল। তারপর পয়সা না নিয়ে কুলি চলে যায় দেখে, উদার ডাক্তারবাবু তাকে মাল বওয়ার পয়সা নিতে বললেন।

কুলির ভিতর থেকে বিদ্যাসাগর বেরিয়ে এসে বললেন, "পয়সা লাগবে না। আপনি ছোট ব্যাগটি নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই সাহায্য করলুম। আমার নাম, ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।"

না, বিদ্যাসাগরকে একেবারে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়নি। তিনি ডাক্তারবাবুর সবিশেষ লজ্জা এবং একটি প্রতিজ্ঞা লাভ করেছিলেন—"আর আমি কখনো স্বহস্তে কাজ করতে সংকুচিত হবো না।"[১৬]

পরের কাহিনীতে এক দারুণ হুল্লোড়বাজ ছোকরার দেখা মিলেছে।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী শ্বশুরবাড়ি যাবেন—সঙ্গে যাবে কে? সর্বাধিকারী যাচ্ছেন পালকি করে, সঙ্গে দুই পাইক—বিদ্যাসাগর ও ভরত শিরোমণি। সাজ করেছেন খাঁটি পাইকের মতোই। পৈতে কাঁধ থেকে নামিয়ে কোমরের ভিতরে লুকিয়েছেন, কাঁধে নিয়েছেন লাঠি, চলছেন পালকির আশে পাশে হেলতে দুলতে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে তাঁরা সর্বাধিকারীর শ্বশুর মহাশয়কে সেলাম করলেন। অনেকখানি হেঁটে এসেছেন, স্নান করা দরকার। পুকুরে স্নান করতে গেলেন। সাঁতার কাটছেন—তখন তাঁদের দেখে চিনে ফেললেন সর্বাধিকারীর স্ত্রী। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাড়িতে খবর দিলেন। পাইকরা তখন সন্ধ্যা করছেন (বিদ্যাসাগরও?), তবে একগলা জলে দাঁড়িয়ে, পাছে পৈতে দেখা যায়। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সর্বাধিকারীর শ্বশুর মহাশয় ছুটে এলেন। গলায় কাপড় দিয়ে নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে তিনি বললেন, "আপনাদের পরিচয় পেয়েছি, কেন আমাকে ছলনা করছেন? আসুন, আপনাদের সেবা করে কৃতার্থ হই।" বিদ্যাসাগর বললেন, "কী বলছেন কর্তা? আমরা বাবুর সঙ্গে এসেছি, আমরা

পাইক। সিধে দিন, আমরা নিজেরা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেবো।" শ্বশুর মশায় বললেন, "অপরাধ বাড়াবেন না। আমরা কায়স্থ, ব্রাহ্মণের চিরদাস। আপনাদের সেবা করতে অনুমতি করুন।"

আর পারা গেল না। ছদ্মদুঃখ এবং উচ্চহাসি মিশিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন, "ওরে ধরে ফেলেছে রে! এত করেও পাইক হতে পারলুম না!"[১৭]

জীবনে আলো না অন্ধকার, কোনটি বেশি, তা নিয়ে দীর্ঘ অমীমাংসিত তর্ক চালানো যায়—যেহেতু ব্যাপারটি অমীমাংস্যেয়। তবে লোকভেদে প্রাপ্তির পরিমাণ কম বেশি হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনে প্রবঞ্চনা-প্রাপ্তির ইতিহাসই দীর্ঘতর—তাঁর চরিত্রানুযায়ী। সে যাই হোক, আকাশজোড়া কালো মেঘের কথা বলবার সঙ্গে মেঘফাটা রোদের কথাও বলে নেওয়া উচিত।

তার আগে বিদ্যাসাগরের ছায়া-জড়ানো একটি বাঙাল-কাহিনী শুনে নেব।

বিদ্যাসাগর তখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে থাকেন। একদিন দুপুরে আহারান্তে খালিগায়ে হুঁকোহাতে তিনি বসে আছেন—গলদ্‌ঘর্ম হয়ে একটি লোক হাজির। বিদ্যাসাগরকে তিনি চেনেন না। রেগে টং, চড়া কর্কশ স্বর।

—বিদ্যাসাগর মশায় কোথায়?

—কেন?

—তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কি?

—দেখা হবে। কিন্তু আপনি দেখা করতে চান কেন?

—তাঁকে সেরে যাব। বড়লোক দেখতে কলকাতায় এসেছিলাম। বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি। কারো দেখা পেলাম না। এখন বিদ্যাসাগরের খোঁজে এসেছি। দেখে যাই তিনি কেমন?

—একটু তামাক ইচ্ছে করুন।

—নাঃ, তামাক-টামাক নয়। দেখা হবে কিনা বলুন?

—আহারাদি হয়েছে?

—আহার? জলস্পর্শও হয়নি। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে।

—আহা, একটু শান্ত হয়ে বসুন না, জলযোগ করুন।

—এত কথা বাড়াচ্ছেন কেন বলুন তো? দেখা হবে কিনা বলে দিন?

বিদ্যাসাগরের ইঙ্গিতে এরই মধ্যে ভালোমতো জলযোগের বস্তু হাজির। উগ্র লোকটি বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরোধে জলযোগ করলেন। শান্ত হয়ে হুঁকো হাতে নিলেন।

—এবার তাহলে বিদ্যাসাগরকে ডাকুন।

—আমিই সেই ব্যক্তি, যাকে দেখতে চাইছেন।

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—আপনি—ই—ই—!

হাঁ, অবশ্যই উনি—বিদ্যাসাগর।[১৮]

॥ ৪ ॥

ফেরা যাক প্রবঞ্চনা-কথায়।

প্রথমে একটি ছাত্রের অভিভাবক-কাহিনী।

কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে ধরে বসেছেন—একটি অনাথ বালককে বিনা বেতনে তাঁর বিদ্যালয়ে পড়তে দিতে হবে। কয়েকদিন পরে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখেন, সেই ছেলেটি অত্যন্ত দামী পোশাক পরে ছোটাছুটি খেলা করছে। ছেলেটি ঠিক কে? সন্দেহবশে সন্ধান নিয়ে জানলেন, ওটি সেই বিনাবেতনের অনাথ বালকটি বটে। গোড়ায় ভাবলেন, ছেলেটির পারিবারিক অবস্থা আগে ভালো ছিল, হঠাৎ পড়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে পুরনো দামী পোশাক পরছে। কিন্তু এ কী কাণ্ড—ছেলেটির জন্য দুধ সন্দেশ এসে গেছে। তখন আরও খোঁজ নিয়ে জানলেন, যে-সম্পন্ন বন্ধুর অনুরোধে তিনি অনাথ ছেলেটির বিনাবেতনে পড়বার ব্যবস্থা করেছেন, সেই বন্ধুটি হলো ছেলেটির জামাইবাবু। কোন্ ঘৃণা ওই লোকটির বিষয়ে যথেষ্ট হতে পারে—যে পাষণ্ড মরবার সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিল!![১৯]

এবার একটি বালক-বিবরণ।

উত্তরপাড়া স্কুলের নীচুক্লাসের একটি ছেলের চিঠি পেলেন বিদ্যাসাগর। পত্রের মর্ম এই:

"আমি পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক। সংসারে কেহই নাই। পরের বাড়ি একমুঠা ভাত খাইয়া বহুকষ্টে লেখাপড়া শিখিতেছি। এমন একটি পয়সা নাই যে, গঙ্গাপার হইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করি। যদি দয়া করিয়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে নিশ্চিন্তমনে একটা বৎসর লেখাপড়া করিতে পারি।"

বিদ্যাসাগরের স্বতঃই বিগলিত হৃদয়, এখন তাতে তুফান উঠল—দুমুঠো খেতে পায়না এমন গরিব ছেলে, তার উপর লেখাপড়া করতে চায়! তিনি অবিলম্বে ডাকযোগে বইগুলি পাঠালেন—পাঠাতে লাগলেন বছর-বছর—স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত। সেই সময়ে একদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে ছেলেটির নাম বলে তার খবর জিজ্ঞাসা করলেন। প্রধান শিক্ষক বললেন, ওই নামের কোনো ছেলেকে তো তাঁর মনে পড়ছে না। বিদ্যাসাগর ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমি বেশ মাস্টার তো! একটা ছেলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণী (এখনকার দশম শ্রেণী) পর্যন্ত প্রতি বছর আমার কাছ থেকে ক্লাসে উঠেছি বলে বই নিচ্ছে, ডাকে-পাঠানো সেসব বই সে সংগ্রহ করছে, অথচ তুমি বলছ, ওই নামের কোনো ছেলে নেই? তুমি কি তোমার ছাত্রদের চেনো না?" প্রধান শিক্ষক কি করেন, বিদ্যাসাগরের মুখের উপর কথা বলা যায়না। তিনি এইটুকু বললেন, "আমি কালই খোঁজখবর করে আপনাকে জানাব। এমন হতে পারে, ছেলেটির দুটি নাম আছে।"

প্রধানশিক্ষক মহাশয় ফিরে গিয়ে, গোটা স্কুল খুঁজেও ওই নামের কোনো ছাত্র পেলেন না। তবে ওই নামের এক ছোকরা পুস্তকবিক্রেতা খুব কাছেই আছে বটে। তাকে ডেকে আনিয়ে চাপ দিতে শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করল, হাঁ, বছর বছর বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে বই আনিয়ে বিক্রি করেছে। প্রধান-শিক্ষক সে সংবাদ বিদ্যাসাগরকে জানালেন।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "যে-দেশের বালক এমন প্রবঞ্চক, সে-দেশের ভালো কি সহজে হবে?"[২০]

এর উল্টোদিকে উল্টোচরিত্রের ছেলেও আছে। নইলে পৃথিবীর ভারসাম্য থাকত না।

বিদ্যাসাগর প্রায়ই বর্ধমানে যেতেন—বিশেষত বর্ধমানবাসী প্যারীচাঁদ মিত্রের সৌহার্দ্যের টানে। তাঁর দয়ার সাগর খ্যাতি তাঁর আগে আগে ছুটত। সুতরাং বর্ধমান স্টেশনে নামলেই তাঁকে দুঃখী মানুষেরা ঘিরে ফেলত। একবার একটি দীনহীন-বেশ, জীর্ণশীর্ণ-শরীর বালক তাঁর কাছে এগিয়ে এসে একটি পয়সা চাইল। ছেলেটির মুখ দেখে কেন জানি তিনি আকৃষ্ট হলেন। ছেলেটিকে কাছে ডেকে বললেন, "তুই এক পয়সা চাইছিস, আমি যদি তোকে চার পয়সা দিই।" ছেলেটি ভাবল, উনি তার সঙ্গে তামাশা করছেন।

—মহাশয়, ঠাট্টা করেন কেন? দেবার হলে একটা পয়সা দিন।

—না রে, ঠাট্টা নয়। সত্যি যদি চারটি পয়সা দিই, কি করবি?

—তাহলে দু'পয়সায় খাবার কিনব, দুটো পয়সা মাকে গিয়ে দেব।

—যদি তোকে দু'আনা দিই?

ঠাট্টা মাত্রা ছাড়াচ্ছে মনে করে ছেলেটি চলে যাচ্ছে—বিদ্যাসাগর তার হাত ধরে ফেললেন।

—সত্যি সত্যি বল্ না, তুই দু'আনা পেলে কি করবি?

ছেলেটির চোখে জল এল।

—তাহলে চার পয়সার চাল কিনে নিয়ে যাই, আর চার পয়সা মাকে দিই।

—যদি তোকে চার আনা দিই?

ছেলেটি অভিমানভরে ছটফট করে বিদ্যাসাগরের হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে চাইল। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাকে বাগিয়ে ধরে আছেন।

—বল্ না, চার আনা পেলে কি করবি?

ছেলেটি উপায়ান্তরহীন হয়ে উত্তর দিল।

—তাহলে দু'আনায় দু'দিন খাওয়া চলবে, বাকি দু'আনায় আম কিনে বেচব। দু'আনার আমে চার আনা হবে। তাহলে আবার দু'দিন চলবে। আবার দু'আনার আম কিনব। এমনি করে যতদিন চলে।

বিদ্যাসাগর তাকে একটি টাকা দিলেন।

বছর-দুই পরে বিদ্যাসাগর বর্ধমানে গেছেন। স্টেশনে তিনি প্রায়ই একটি

চেনা দোকানে গিয়ে বসতেন। সেখানে ঢুকতে যাচ্ছেন—একটি হৃষ্টপুষ্ট বালক এসে তাঁকে বলল, “মহাশয়, একবার আসুন, আমার দোকানে যেতে হবে।” বিদ্যাসাগর বললেন, “তুমি কে বাপু ? আমি তো তোমাকে চিনি না। তোমার দোকানে যাব কেন ?”

ছেলেটির চোখে জল।

—আপনার মনে নেই। আমি সেই ছেলে যে আপনার কাছে একটি পয়সা চেয়েছিল, আর আপনি তাকে একটি টাকা দিয়েছিলেন। আমি তখন খেতে পেতুম না।

বিদ্যাসাগর অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছেলেটি বলতে লাগল :

—আমি সেই এক টাকায় দু'আনার চাল কিনে, বাকি চৌদ্দ আনায় আম কিনে বেচেছিলুম। তার লাভে আরও আম কিনে বেচলে বেশ পুঁজি হলো। এখন তা দিয়ে এই মনিহারী দোকানটি করেছি।[২১]

বিদ্যাসাগর দুঃখে বহু কান্না কেঁদেছেন। এবার কাঁদলেন আনন্দে।

দুনিয়ার মজাদারির শেষ নেই। তিনি যার বড়ো চাকরি করে দিয়েছেন, সেই লোকটির কাছে যখন এক দুঃস্থ ব্যক্তির জন্য ছোটখাট চাকরি দেবার সুপারিশপত্র পাঠিয়েছেন—তখন সে কেবল উপেক্ষা করেনি, তাঁর বিষয়ে ইতর মন্তব্যও করেছে। আবার প্রিয়নাথ দত্তের কী বিপরীত ব্যবহার! উক্ত দুঃস্থ ব্যক্তি নাছোড়বান্দা হয়ে, তাঁর কাছ থেকে আর একটি সুপারিশপত্র আদায় করে প্রিয়নাথ দত্তের কাছে হাজির হয়েছিল। প্রিয়নাথ একটি সরকারী বিভাগের বড়বাবু। তাঁর দপ্তরে কয়েকটি চাকরির খালি ছিল। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিলনা বলে তাঁকে বিদ্যাসাগর গোড়ায় চিঠি লিখতে চাননি। যাই হোক, তাঁর চিঠি পেয়ে প্রিয়নাথ লোকটিকে চাকরির পরীক্ষায় বসতে বললেন। সে পরীক্ষায় সপ্তম হলো। অথচ চাকরির সংখ্যা পাঁচ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিঠি—তার মর্যাদা রাখতে হবে। প্রিয়নাথ উপরওয়ালাকে বলে-কয়ে, আরও দুটি পদ বাড়িয়ে নিয়ে, লোকটিকে চাকরি দিলেন।

চমৎকৃত বিদ্যাসাগর না বলে পারলেন না—“বিচিত্র সংসার! আমি যার প্রকৃত উপকার করেছি, সে আমার কথা রাখল না। আর উপকার করা তো দূরের কথা, যাঁর সঙ্গে আমার আলাপমাত্র নেই, তিনি আমার মর্যাদারক্ষা করলেন!”[২২]

চিতাবাঘ যেমন তার রঙ বদলাতে পারেনা, তেমনি সংসার তার বিচিত্র রঙের চামড়াও বদলাতে অপারগ।

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় এক ব্যক্তি সংবাদপত্রের সম্পাদক। অন্য একজনের চাকরির জন্য বিদ্যাসাগর তাঁকে বলতে গেলেন। সম্পাদক ইতিমধ্যে ন্যায়াবতার। বিদ্যাসাগরের অনুরোধ শুনে যথোচিত গাম্ভীর্যসহ বললেন,

"অমন অনুরোধ আপনি করবেন না। আমি এখন সম্পাদক। আমি যদি সাহেব-সুবোকে অনুরোধ করি, তাহলে স্বাধীনভাবে লেখা সম্ভব হবে না।"

এই পরম ধর্মকথা শুনে বিদ্যাসাগর উঠে পড়লেন। কথাবার্তার সময়ে সেখানে কোনও সওদাগর অফিসের সদর-মেট উপস্থিত ছিলেন। তিনিও উঠে পড়ে বিদ্যাসাগরের অনুসরণ করে তাঁকে ধরে ফেললেন। তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে বিদ্যাসাগরকে বললেন, "মহাশয়, লোকটির কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি হলে চলবে? তা যদি চলে, আমার অধীনে ওই মাইনের চাকরি খালি আছে।"

বিদ্যাসাগর পুনশ্চ চমৎকৃত এবং 'বিচিত্র সংসার' ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের আদর্শে শ্রদ্ধাবান, তাঁর পরম অনুগত জীবনীকার চণ্ডীচরণের ব্যক্তিগত জীবনে যদি কষ্টের মধ্যেও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় থাকে, তাহলে সেটি আশ্চর্যের কিছু হয়না। তবু কাহিনীটি জেনে নেওয়া যেতে পারে।

চণ্ডীচরণ তখন যুবক, কঠিন অসুখে পড়েছেন, অফিস থেকে দীর্ঘসময়ের ছুটি নিতে হয়েছে, নিজের স্বাস্থ্য সংকট-অবস্থায় এবং সংসার অচল। খবর পৌঁছল বিদ্যাসাগরের কাছে। তিনিও তখন শয্যাশায়ী। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে চণ্ডীচরণের কাছে পাঠালেন—"অসুস্থ না হলে তিনি নিজেই চণ্ডীচরণের কাছে যেতেন; চণ্ডীচরণের যদি এসে দেখা করার শক্তি থাকে, একবার যেন আসে।" চণ্ডীচরণ কোনোক্রমে এলেন। তাঁকে বিদ্যাসাগরের শয্যাপার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হলো—ওঁর অবস্থা দেখে চণ্ডীচরণের "প্রাণে ত্রাস ও গভীর ক্লেশসঞ্চার" হলো। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বিদ্যাসাগর কথা বলছিলেন।

বিদ্যাসাগর: তোমার কি খুব বেশি অসুখ?

চণ্ডীচরণ: আজ্ঞে হাঁ।

—ছুটি নিয়েছ, বেতন পাও কত?

—অর্ধেক।

—চলে কি রকমে?

—ঋণ করে।

—মাসে কত টাকা ঋণ হচ্ছে?

—তিরিশ-চল্লিশ টাকা।

—এ টাকার সুদ দিতে হয়?

—আজ্ঞে হাঁ, হয়।

—তোমরা আজকালকার ছেলে, কোনো কথা বলতে ভয় হয়, কোন্ কথায় ইন্‌সল্ট হয়ে পড়বে, তার তো ঠিক নেই।

চণ্ডীচরণ অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। সবিনয়ে তিনি বললেন, "আমায় যা জিজ্ঞাসা করবার করুন, কারণ ওই রকম বললে আমার পক্ষে

কষ্টের কারণ হবে। আপনার কোনো আদেশই আমার পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নয়।"

বিদ্যাসাগর : সুদ দিয়ে অন্যত্র টাকা ধার করা অপেক্ষা বিনা সুদে আমার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ মাসে মাসে নিলে হতো না ? যখন সুবিধা হবে দু'এক, দু'চার টাকা করে শেষ করলেই তো হবে।

চণ্ডীচরণ : আপনার মতো মহাজনের কাছ থেকে ওই কড়ারে টাকা নিলে তা কি আর শোধ করতে পারব ?

বিদ্যাসাগর : নাই পারলে।

চণ্ডীচরণ : আপনার টাকায় আমার চেয়ে অনেক গরিবের অন্নসংস্থান হয় ; তাদের বঞ্চিত করা কি উচিত ?

অপূর্ব রসরহস্যময় মুখভঙ্গিমা করে বিদ্যাসাগর বললেন, "ওরে বাবা, আমি তো বুঝতে পারিনি তুমি মস্ত লোক !"

চণ্ডীচরণ নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "না, আমি ও-অর্থে বলিনি।"

বিদ্যাসাগর : তা হোক, না হয় তুমিও আমার কিছু খেলে।

চণ্ডীচরণ : দেখি, নিতান্ত অচল হলে আমিই আপনাকে বলব।

বিদ্যাসাগর : বলি, অচল আর কাকে বলে ?

চণ্ডীচরণ : যে কয়দিন চলে চলুক।

বিদ্যাসাগর : তোমার অবস্থা যা দেখছি, তারপর তো সাবাড় হয়ে যাবে।

চণ্ডীচরণ : সাবাড় হবার মতো হয় তো আমিই আপনাকে বলব ।

আবার সেই স্নেহ ও রঙ্গের হাসিতে বিদ্যাসাগরের মুখ ভরে গেল।

বিদ্যাসাগর : হাঁ, তোমার সাবাড় হবার অবস্থা হয়ে আসছে তা বুঝে আমার টাকাটি নিও, তাহলে আর শোধ দেবার দায় থাকবে না। তা হবেনা বাপু। তুমি জ্যান্ত থাকার অবস্থায় টাকা নাও তো নাও, নইলে সাবাড় হবার সময়ে কিছু মিলবে না। টাকা আমি জলে ফেলতে পারব না।

একটু গম্ভীর হয়ে বিদ্যাসাগর বললেন, "বাড়ি গিয়ে হিসেব করে কতগুলি টাকা তোমার বাড়তি লাগছে তা আমাকে জানাবে, আমি মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দেব।"

যদিও বিদ্যাসাগরের "কোনো আদেশই উপেক্ষার বিষয় নয়," তবু এক্ষেত্রে চণ্ডীচরণ দীর্ঘসময় গা-ঢাকা দিলেন। তারপর ভালো হয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এখানেও বিদ্যাসাগরের রহস্য। চণ্ডীচরণকে প্রতিশ্রুত কয়েকটি টাকার চিন্তায় যেন তাঁর ঘুম হচ্ছিল না। সব শুনে নিশ্চিন্ত হলেন। হাসিভরা কণ্ঠে বললেন, "তুমিও বাঁচলে, আমিও বাঁচলাম।"[২৩]

ট্রাজেডির মতো কমেডিরও লেখক-অভিনেতা বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর-দারোগা কাহিনী তার নমুনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কর্মচারী কৈলাসচন্দ্র বসু বিদ্যাসাগরের পরিচিত। তিনি একদিন এক ভদ্রলোককে নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে হাজির

হলেন। ভদ্রলোকটি নাটোরের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর। তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন। বিদ্যাসাগরকে ভদ্রলোকের বিপদের কথা কৈলাসচন্দ্র জানালেন: এঁকে এক মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ; নিরপরাধ হলেও নিম্ন আদালতে ৬ মাসের কারাবাসের আদেশ হয়েছে ; হাইকোর্টে আপিল করেছেন ; এঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য ৭০০ টাকায় নিযুক্ত হয়েছেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ; এঁর বাড়ি থেকে গতকাল টাকা আসার কথা থাকলেও টাকা আসেনি ; আজ প্রথম শুনানীর দিন ; ইনি এখন অথৈ জলে ; বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি মনোমোহন ঘোষকে একটা চিঠি দিয়ে দেন তাহলে তিনি আজকার কাজটি করে দেবেন ; তারপর টাকা এলেই মিটিয়ে দেওয়া হবে ; এক সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই টাকা আসবে।

বিদ্যাসাগর চুপ করে সব শুনলেন, তারপর দৃঢ়ভাবে বললেন, "না, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। যার এক পা জেলে, অন্য পা বাইরে, তার টাকা বাকি রেখে আমি অন্যকে কাজ করতে বলি কি করে? তিনি কি মনে করবেন? তারপর, মনোমোহন বিলাত যাওয়ার পর থেকে তার সঙ্গে আমার প্রায় কোনো যোগাযোগ নেই। এক্ষেত্রে এই ধরনের অনুরোধ করা শোভন নয়। তুমি নিজে তাঁকে বলো না কেন—তিনি তো শুনেছি বিপন্নের বন্ধু। তাঁর সঙ্গে আমার অনুরোধ-উপরোধের সম্পর্ক থাকলে না-হয় অনুরোধ করা যেত। তা নেই। সুতরাং আমার পক্ষে ও-কাজ করা সম্ভব নয়।"

বিদ্যাসাগর বলে যাচ্ছেন—আর তা শুনে পুলিশ-কর্মচারী আতঙ্কে শিউরে-শিউরে উঠছেন। তিনি কাঁদতে লাগলেন। বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস সেই সঙ্গে।

"শুনেছি, কোথাও যার কিনারা হয়না, সে এখানে আশ্রয় পায়। আমার তাও গেল।"

বিদ্যাসাগর সহ্য করতে পারলেন না। কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন। "মাই ডিয়ার ঘোষ" পর্যন্ত লিখে আর কলম চলল না।

"নাঃ, আমার দ্বারা হবে না।"

বিপন্ন লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "তবে কি আমাকে জেলে যেতেই হবে?"

কথাগুলো তীক্ষ্ন শরের মতো বিদ্যাসাগরকে বিঁধল। চিঠির কাগজ সরিয়ে রেখে তিনি ব্যাঙ্কের চেকবই বার করলেন। সাতশো টাকার একটা চেক লিখে সেটি দিয়ে বললেন, "মনোমোহনকে বলো, সে যেন আগামীকাল বেলা সাড়ে এগারোটার আগে চেক ব্যাঙ্কে না পাঠায়।"

বিদ্যাসাগরের ব্যাঙ্কে তখন কোনো টাকা ছিল না। যেভাবে হোক পরদিন সকালে তিনি টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেবেন।

পুলিশ-কর্মচারী হাইকোর্টের বিচারে ছাড়া পেলেন। চতুর্থ দিনে তিনি সাতশো টাকা নিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কাছে উপস্থিত।

সংবাদ শুনে বিদ্যাসাগর কোনোই আনন্দপ্রকাশ করলেন না, বরং কড়া-চোখে দারোগার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি ভদ্রসন্তান হয়ে আমাকে এমন

প্রবঞ্চনা করলে ?" আর কৈলাসবাবুকে বললেন, "তুমি সেই চাতুরীতে ওকে সাহায্য করলে ?"

দু'জনেই হতভম্ব। বাক্যস্ফূর্তি হলো না। বিদ্যাসাগরের তখনও কড়া গলা :

বিদ্যাসাগর : তুমি না বলেছিলে, তুমি পুলিশে কাজ করো ?

দারোগা : (সভয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগর : না, একথা সত্য হতে পারে না, তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ।

দারোগা : না না, সত্যি বলছি, আপনি সন্ধান নিলেই জানতে পারবেন, আমি নাটোর পুলিশের সাব-ইনস্‌পেক্টর।

এতক্ষণে কৈলাসচন্দ্র রহস্যের আঁচ কিছুটা পেয়েছেন।—"আপনি ঠিক কি বলছেন বলুন তো ?"

বিদ্যাসাগর হাসলেন।

"তোমাদের কথা মিথ্যা ছাড়া আর কি মনে করব ? এই দীর্ঘকালের মধ্যে কত লোক দেব বলে টাকা ফেরত দেয়নি। নিরুপায় লোকদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, কিন্তু সুপরিচিত সম্পন্ন লোকেরাও প্রয়োজনে টাকা নিয়ে সব সময়ে ফেরত দেয়নি—অন্তরঙ্গদের কথা বলাই বাহুল্য। যে-দেশে নামী-দামী সাধু লোকেরা টাকা নিলে আর দিতে চায়না, সে-দেশে তুমি পুলিশের দারোগা হয়ে, সাতদিনের কড়ারে নেওয়া টাকা চারদিনের মাথায় ফেরত দিতে এসেছ ? কেমন করে তোমাকে পুলিশের লোক বলে বিশ্বাস করি বলো ?"

দারোগাবাবু জীবনের সেরা পুরস্কার পেলেন। তাঁকে বসিয়ে যখন বিদ্যাসাগর কথা বলতে লাগলেন, তখনো গলায় রহস্যের রেশ :

"অনেক সময় হাইকোর্টের জজেরা মোকর্দমা বুঝতে না পেরে আসামীকে খালাস করে দেন। তোমারও দেখছি তাই হয়েছে। সাতদিনের কড়ারে টাকা নিয়ে যে চারদিনে ফেরত দেয়, তার দারোগাগিরির চাকরি গিয়ে জেল খাটাই উচিত।"

দারোগাবাবুর মনোভাব ও অভিব্যক্তির কথা এখানে না বললেও চলে। তিনি বিদ্যাসাগরের হাতে টাকা তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর হাঁক দিলেন, "ওহে, আট আনা কম দিয়ে গেলে কেন ?" দারোগাবাবু অপ্রস্তুত, ছি ছি, টাকা ঠিকমতো গুনে দিইনি। তিনি কাঁচুমাচু হয়ে তাকিয়েছেন, বিদ্যাসাগর বললেন, "আমি যাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলুম, তাঁকে ইতিমধ্যে টাকা দিয়ে দিয়েছি। তাহলে তোমার শোধ-করা টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হলে গাড়ি ভাড়া কি আমাকেই দিতে হবে ? উঁহু, আট আনা না পেলে তোমার ও-টাকা বাক্সে তুলছি না।" তারপর তিনি হতাশভাবে বললেন, "আমার লোকসানের বরাত। যখন লোকসান কিছু করলে আরও কিছু করে যাও।"

ভোজ্যপানীয় আকণ্ঠ গ্রহণ করে, বিদ্যাসাগরের লোকসান বাড়িয়ে, এবং নিজে অতি মহার্ঘ অভিজ্ঞতায় ধনী হয়ে, দারোগাবাবু বাড়ি ফিরেছিলেন।[২৪]

॥ ৫ ॥

বিদ্যাসাগরের হাসির কথা লিখতে গিয়ে বারে-বারে ধাক্কা খেতে হচ্ছে —যতই হাসুন, সত্যই কি তিনি হাসির মানুষ? হাসিকে কি তিনি নিজের জীবনে আমন্ত্রণ জানাতেন না—কমিক রিলিফ হিসাবে? বিদ্যাসাগরের পক্ষে কি দুঃখই নিয়তি নয়—যাকে তিনি নিজে রচনা করেছেন?

পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি বলি, বৃহত্তর জীবনদর্শনের অভাবই বিদ্যাসাগরের যন্ত্রণার মূলে! বুঝতে পারছি, কথাটা আপাতত কঠিন, এমন-কি অশ্রদ্ধেয় মনে হবে। যিনি মানবপ্রেমের মুখ্য প্রতিভূ বলে ঘোষিত, তাঁর জীবনদর্শন ছিলনা—কী অশালীন এই উক্তি! তবু কেন কথাটা বললাম?

সকলের সঙ্গে সমভাবে, কিংবা অধিকভাবে, আমি বিদ্যাসাগরকে মানব-প্রেমের মহাবিগ্রহ বলে স্বীকার করি। কিন্তু ওই প্রেমবোধ তাঁর এসেছিল সাক্ষাৎ অনুভূতি থেকে। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, মানুষ দুঃখে আছে, তা দেখে মানুষ আমি, আমার নিদারুণ যন্ত্রণা—শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মানুষের দুঃখ দূর করব। বিদ্যাসাগর তাই করেছেন। কিন্তু এই মানুষ কে, তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের পূর্বাপর রূপ কি—নিশ্চয় সে বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা ছিল—কিন্তু তার রূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অথচ পৃথিবীর অন্য অনেক বিরাট মানবতাবাদীদের মধ্যে কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে এক ধরনের দার্শনিক বিশ্বাসের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সে দার্শনিক বিশ্বাসকে ঈশ্বরবাদী হতে হবে এমন নয়। অজ্ঞেয়বাদী বুদ্ধ, ঈশ্বরবাদী খ্রীস্ট থেকে শুরু করে একালের বস্তুবাদী মার্কস বা বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ —সকলেরই মানব-মাঙ্গলিক কর্মের পিছনে ছিল বৃহত্তর দর্শন। মানুষের মঙ্গলের চেষ্টা তাঁরা বা তাঁদের অনুগামীরা করেছেন, মানুষের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার মারও তাঁরা খেয়েছেন, রক্তাক্ত হয়ে মানুষের অকৃতজ্ঞতার বিরুদ্ধে আর্তনাদও করেছেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্য সরিয়ে সান্ত্বনা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের নিজ নিজ দর্শনের মধ্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ, মানুষের হিংস্র নীচতার কথা অগণ্যবার বলেও—'মানুষের ধর্ম' রচয়িতা তিনি—উচ্চারণ করেছেন—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।" এঁরা তাই 'নরদ্বেষী' হয়ে উঠতে পারেন নি। মানুষ ভালো এবং মন্দ, দুইই। অনেক সময়ে আপাত ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি। মানুষ উপকার পেলে প্রত্যুপকার করবে? না করাই তো সাধারণ রীতি। প্রার্থী, নিজের প্রার্থনার লজ্জা ঢাকতে, দাতার নিন্দা করে প্রমাণ করতে চায়—ও-ব্যক্তির দান নেবার বান্দা সে মোটেই নয়। এ তো সাধারণ মনস্তত্ত্ব। বিদ্যাসাগরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কেন তাঁকে এই শিক্ষা দিল না? একমাত্র উত্তর—তাঁর নির্ভরতা ছিল কেবল প্রতীয়মান সত্যে—সর্বাত্মক সত্যে নয়। সর্বাত্মক সত্যের মধ্যে ভালো মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, সবই আছে। বিদ্যাসাগর তাঁর মনীষাকে অনালোকিত রাখতে চেয়েছিলেন ছবির অপর পিঠ সম্বন্ধে। তিনি

উজাড় করে দিয়েছেন, কিন্তু প্রতিদানে মানুষের কৃতজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন নি। বিদ্যাসাগরের অন্যতম অনুগামী বিবেকানন্দ যেখানে এই সুগভীর জীবনদর্শন উচ্চারণ করতে পেরেছেন—"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী—সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া'—"দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল"—"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়"—সেখানে বিদ্যাসাগর মানুষের নীচতায় বিপর্যস্ত হয়ে মুখ ফিরিয়েছেন মানুষের দিক থেকে। বিদ্যাসাগরের স্থান এ-পৃথিবীতে নেই, সেকথা বিবেকানন্দই বলে গেছেন—"হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ-জগতে নাহি তব স্থান।" ওই কথা জেনেই এ-জগতে থাকতে হবে—বিদ্যাসাগর তা মানতে পারেন নি। তিনি ভালবাসবেনই, মানুষের ভালো করবেনই, মানুষ তাঁর আকাঙ্ক্ষামতো ভালো হয়ে উঠুক, তা চাইবেনই—না হলে আর্তনাদ করবেন। সেই আর্তনাদ হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ মানবপ্রেমের আর্তনাদ। অশান্ত এক কান্না—যার আশ্রয় নেই কোনো দর্শনে।

॥ ৬ ॥

বিদ্যাসাগরের পলায়ন তাই অরণ্যমধ্যে। সে-অরণ্যের মনুষ্যবৃক্ষ সাঁওতালগণ। সভ্যতা কলুষিত করেনি—এমন সদ্যোজাত মানুষ তারা—কোনো এক অলৌকিক শক্তিতে তারা নবজন্মকে সহস্র-সহস্র বৎসর দীর্ঘায়ত করতে পেরেছে। সভ্যতার কালো হাত তাদের ছুঁয়ে হয়ত কখনো-কখনো বিচলিত করেছে, কিন্তু তার পরেই অন্তর্নিহিত শুদ্ধতায় সেসব তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং কিছুটা নির্জনবাসের সুবিধার জন্য বিদ্যাসাগর কার্মাটারের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতেন। সেখানে গিয়ে সাঁওতালদের মুখে বাঙালী জাতি সম্বন্ধে শুনলেন, "বাঙালীরা লোক ভালো নয়।"[২৫] সেকথা শুনে কি বিদ্যাসাগরের মনে বিখ্যাত কাহিনীটি মনে পড়ে নি—নির্বোধ অথচ অহংকারী রাজাকে এক ঠকবাজ বুঝিয়েছে, আপনাকে এমন আশ্চর্য কাপড় পরাবো, যা কেউ অসৎ হলে দেখতে পাবে না—কিন্তু সৎলোক অবশ্যই সে কাপড় দেখবে। লোকটি রাজার ইতি-কাপড় খুলিয়ে, তাঁকে নেতি-কাপড় পরিয়ে, অনেক টাকা নিয়ে সরে পড়ল। রাজা সগর্বে সেই অভিনব বস্ত্র পরে, হাতিতে চড়ে, শোভাযাত্রায় বেরুলেন। পথের ধারে জড়ো-হওয়া লোকজন যা দেখল তা কহতব্য নয়। কিন্তু কিছু বলতেও পারল না—বললেই অসৎ প্রমাণিত হয়ে গর্দান যাবে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল একটি বাচ্চা ছেলে। সে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"রাজা ল্যাংটো, রাজা ল্যাংটো।" বিদ্যাসাগর যখন সাঁওতালদের মুখে "ঝুটা বাঙালী" শুনলেন, তখন কি তাঁর মনে হয়েছিল—এই বালকস্বভাব সাঁওতালরা হাততালি দিয়ে একই ধরনের কথা বলছে?

সাঁওতাল পরগণায় আজ বাঙালীদের ঠাঁই প্রায় নেই, কিন্তু তখন ছিল। তখনকার একটি ঘটনা বিদ্যাসাগরের মুখে কৃষ্ণকমল শুনেছেন। একই ঘটনার কথা বিখ্যাত হিন্দী কবি হরিশ্চন্দ্রও শুনেছেন বিদ্যাসাগরের মুখে। বিহারীলাল সেটি সংগ্রহ করে উপস্থিত করেছেন :

"পূর্বে কর্মাটাঁড়ে জমি-জমার আঁটাআঁটি সুহরন্দ ছিল না। অনেকে অনেক সময় জমি কিনিয়া, অপরের জমি টানিয়া লইতেন। একজন বাঙালীবাবু একবার এইরূপ একটু জমি টানিয়া লইয়া বেড়া দেন। অভিযোগ হইয়াছিল। অভিযোগে হাকিমের তদন্তে আসিবার কথা ছিল। যেদিন হাকিমের আসার কথা, সেইদিন কতকগুলি সাঁওতাল বাবুটির জমিতে চাষ করিতেছিল। বাবুটি তাহাদিগকে বলেন—'হাকিম আসিলে তোরা বলিস, বেড়ার ভিতরের জমি সব বাবুর।' হাকিম আসিলে সাঁওতালগণ উক্তরূপ কথা বলিল। কিন্তু হাকিম দুই-একবার ভালো করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা আর সত্য না বলিয়া পারিল না।"[২৬]

সুতরাং সাঁওতালরা বাবুদের বিশ্বাস নাও করতে পারে। সেজন্য বিদ্যাসাগরের কথায় তারা বিশ্বাস করে নি—যখন তিনি কর্মাটারে বাগান তৈরি করার কাজে কয়েকজন সাঁওতালকে লাগিয়ে দু'আনার বদলে চার আনা রোজ দেবেন বলেছিলেন, তারা হেসে উঠেছিল। 'ঝুটা বাঙালীর' এ একটা নতুন ঝুট্। তিনি কিন্তু বিশেষ জোরের সঙ্গে দ্বিগুণ পয়সা দেবেন বলেন। সাঁওতালরা কাজে লাগল, কাজের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, তিনি তাদের কাজ থামাতে বললেন, তারা ভাবল কাজ থামালে ডবল রোজের পয়সা পাবে না। বিদ্যাসাগর যখন বিশেষভাবে বারণ করলেন, তখন তারা বলল, পুরা কাজ না করলে পুরা রোজ কি তুই দিবি? রোজ না পেলে আমরা খাব কি?" শেষ-পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের নির্বন্ধে পড়ে তাদের কাজ বন্ধ করতে হয়েছিল—এবং তারা তাদের জীবনের অষ্টম আশ্চর্যের সম্মুখীন হয়েছিল যখন সেইদিনের জন্য চার আনা রোজ সত্যই তারা পেয়েছিল।[২৭]

ভালবাসার একটি অপরূপ কাহিনী এইবার :

বিদ্যাসাগর কয়েকজন সাঁওতালকে আহারে নিমন্ত্রণ করেছেন। বাবুদের বাড়িতে সাঁওতালরা খায় না—জাত যাবে বলে! খাওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণ করতে পঞ্চায়েত বসল, বিদ্যাসাগরের চরিত্র পর্যালোচনা করে তারা অনুমতি দিল। বিদ্যাসাগর ভালো ভালো খাবারের আয়োজন করেছিলেন। যারা ৮-১০ দিন অন্তর হয়ত একবেলা ভাত খেতে পায়, তারা উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন দেখে বলাবলি করতে লাগল, বুঝি স্বর্গের দেবদূত তাদের মধ্যে হাজির হয়েছেন। আহার শেষে তারা বিদ্যাসাগরকে নমস্কার করে বলেছিল, "কে তুই মহাপুরুষ বল্? তুই আমাদের দুঃখ বুঝেছিস। তোকে আমরা ছাড়ব না।" তারা বিদ্যাসাগরকেও নিমন্ত্রণ করেছিল। তিনি নিমন্ত্রণ রাখার জন্য এক বৃদ্ধা সাঁওতাল-নারীর কুটীরে গেলেন। সেখানে অবিলম্বে দলে দলে

সাঁওতাল হাজির। সকলের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মিষ্ট কথা বলতে লাগলেন। চলে আসার সময়ে বৃদ্ধা নারী কয়েকটি কাঁচকলা, কতকগুলি কুতরুল ফল ও অন্য বনফল তাঁর চাদরের কোণে বেঁধে দিতে গেল। বিদ্যাসাগর মিষ্টি কথায় বললেন, "মা, এত কেন আমায় দিবি? এগুলো থাকলে তোদের ছেলেরা একদিন খেয়ে বাঁচবে।" বৃদ্ধা তখন বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে তাকাল, বিদ্যাসাগরও তার দিকে তাকিয়ে রইলেন—আর দু'জনের চোখ দিয়েই দরদর করে জল ঝরতে লাগল।[২৮]

মনে হয়, এই ঘটনা বিদ্যাসাগরের কর্মাটারে যাতায়াতের গোড়ার দিকে হয়েছিল।

•

এই সূত্রে বিবেকানন্দ-জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যাইই—জীবনের শেষ পর্বে সাঁওতাল কেষ্টাকে স্বামীজীর খাওয়ানোর বিবরণটি। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ'-এ তার অনবদ্য বর্ণনা আছে। সেটির বদলে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আর একটি অল্প-জানিত সংবাদ তুলছি:

"১৮৯৮ অব্দে ৺শিবকৃষ্ণ দাঁ'র ঠাকুরবাটীতে পরমহংস মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে মিস মার্গারেট নোবল (তখনও ইঁহার নাম সিস্টার নিবেদিতা হয় নাই) উৎসব দেখিতে আইসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণ করিতে থাকেন। সেই সময়ে অর্ধনগ্ন সাঁওতাল কুলি ঝাঁকে করিয়া মাটি বহিতেছিল। কুলিগুলি কৌপীনমাত্র-ধারী, মস্তকে কাঠের চিরুনী, দেহ বেশ সুস্থ। তাহাদিগকে দেখাইয়া স্বামীজী মিস নোবলকে বলিলেন, 'Look, here is the soul of the nation।' ইহাদের জন্য স্বামীজীর যেরূপ ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়াছি, সেরূপ কাহারও দেখি নাই। উৎসবক্ষেত্রের চারিদিক শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কাহারও উদ্দেশে কিছু না বলিয়া, দরিদ্র নগণ্য সরল সাঁওতালের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল কেন?"[২৯]

সাঁওতালদের কাছে বিদ্যাসাগর কেবল দশভুজ নন, দশরূপ ছিলেন। পিতা-মাতা-ভ্রাতা-বন্ধু-পুত্র—কি নন! উজাড় করে তিনি ভালবাসা দিতেন—তার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি—ক্ষুধার অন্নে, শীতের বস্ত্রে, রোগের ঔষধে। বিদ্যাসাগর তাঁর চেনাশোনা কনিষ্ঠদের সাধারণত তুই বলতেন, তা জেনেছি। কিন্তু তাঁর নিজের প্রাণও তো 'তুই'-ডাক শোনার জন্য আতুর থাকত—যা তাঁর পিতা-মাতা বা শিক্ষক ছাড়া কারও মুখে শুনতে পেতেন না। শেষ পর্যন্ত তা অজস্র ধারায় পেয়েছিলেন কার্মাটারে, সাঁওতালদের ঘরে ঘরে—তাঁর জন্য আবাহনের সেই প্রাণকাড়া ভাষা—'তুই আসেছিস্!'[৩০]

এর পরে আমাদের হারানো স্বর্গোদ্যানের কয়েকটি ছবি।

'সদা সত্য কথা কহিবে'-র বিদ্যাসাগর 'মিথ্যা কথা' কহিতেন, এবং তেমন মধুর মিথ্যা সত্যের লাবণ্য বাড়িয়ে তুলত। তেমনই একটি কাহিনী:

একটি সাঁওতাল এসেছে, তার সঙ্গে একটি মেয়ে। সাঁওতালদের প্রার্থনায় দীনতা বা আড়ষ্টতা থাকে না। সে তার সঙ্গিনী মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "একে একখানা কাপড় দে।" বিদ্যাসাগর মজায় আছেন। "না, কাপড় নেই, আর ওকে দেবই বা কেন?" সাঁওতালের দাবি—"সে কি, দিবিনা কেন, দিতেই হবে।" (সত্যই তো, বিদ্যাসাগর কাপড় দেবেন না দরকারে—একি হয়!)। বিদ্যাসাগর একই ভাবে বললেন, "কাপড় নেই।" "হুঁ, কাপড় নেই, বললেই হলো! দে, তোর চাবি, সিন্দুক খুলে দেখব।" বিদ্যাসাগর চাবি এগিয়ে দিলেন। সাঁওতাল সিন্দুক খুলে দেখল, বিস্তর কাপড় ঠাসা। সে একটি ভালো কাপড় বার করে এনে মেয়েটিকে (নিশ্চয় সে তার প্রাণের প্রণয়িনী) মেয়েটিকে দিল। ঠোঁটে হাসি, দু'চোখে নিবিড় সুখ নিয়ে বিদ্যাসাগর তাকিয়ে রইলেন।

আর একটি কাহিনী।

দুটি সাঁওতাল মেয়ে এল তাঁর কাছে। একটি আর একটিকে দেখিয়ে বলল, "ইটা আমার বিহান হয়, তুই একে একটা কাপড় দে।" বিদ্যাসাগর বললেন—বলাবাহুল্য মুখে নিষেধ এবং চোখে প্রশ্রয় এঁকে নিয়ে—"হাঁ রে, কাপড় কোথায় পাবো?" ইতিমধ্যে সাঁওতালদের মধ্যে—বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি আমাদেরও সম্পত্তি—এই আত্মবোধ এসেছে। মেয়েটি বলল, "চল্ তো, সিন্দুকটা খুলবি।" বিদ্যাসাগর সিন্দুক খুলে দিলেন। দেখা গেল, তা কাপড়ে ভর্তি। মেয়েটি বলল, "ইয়েঃ, তুইও মিছা কথা শিখলি, হেঃ।" বিদ্যাসাগর ছদ্মদুঃখে বললেন, "তোদের দেশে এসেই তো শিখলাম।" বিদ্যাসাগর যা শুনতে চাইছিলেন—মানুষকে দিয়ে যে-কথাটা বলাবার জন্য তাঁর সারা জীবনের ব্যর্থ চেষ্টা—সেই কথাটা শুনলেন—"আমরা মিছা কথাটা কই না। আমরা জানতাম, তুই মিছা কথাটা বলতে পারিস না।"[৩১]

সভ্য সমাজের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত একজন মানুষই ওই কথাটা বিদ্যাসাগরকে বলতে পারতেন—রামকৃষ্ণ পরমহংস! আর এ তো আমরা শুনেছি, বাইরের আকারে পরমহংস আর শিশু, একই রকম।

আলেখ্যদর্শন এখনো শেষ করা যাচ্ছে না।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন:

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যখন কর্মাঠারে বাটী তৈয়ারী হয় তখন আমার বাবা কাষ্ঠের জিনিসপত্র সরবরাহ করেন। তাঁহাকে সরবরাহ করিতে দিবার কারণ এই যে, ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কর্মাঠারে যান। ইঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে যান। পেঁৗছিলে অনেক ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে (সাঁওতালদের) তাঁকে ঘিরে বলল, 'দাদা, আমাদের জন্য কী এনেছিস্?' তাহারা পূর্বে তাঁহাকে নিজেদের ফরমাইজ-মতো জিনিস আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। কেহ বলিল, 'আমার আরসি কই', কেহ বলিল, 'চিরুনী কই', কেহ বলিল, 'ঘুনসি কই', ইত্যাদি। তিনি সুমধুর হাসিয়া বলিলেন, 'সব এনেছি, সব দিচ্ছি।' তাদের সব জিনিস

দিয়ে দিলেন। তৎপরে বাগান হইতে ফুল আনিয়া প্রত্যেক মেয়ের মাথায়, কর্ণে প্রভৃতি স্থানে পরাইয়া দিয়া স্বর্গীয় হাসি হাসিতে লাগিলেন। তারাও মহানন্দে হাসিতে লাগিল। ফুল পরাইয়া দিবার সময় বাবা বলিলেন, 'এ কি করিতেছেন?' তিনি বলিলেন, 'তুই বেটা এ বুঝিবিনে। ওদের মনে এখনও পাপ স্পর্শায় নি—ওরা কত সরলচিত্ত!'"[৩২]

আর একটি বর্ণনা দিয়েই স্বর্গোদ্যান থেকে বিদায় নেব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিবিড় বিস্ময়ভরা সেই রচনা।

হরপ্রসাদ তখন কার্মাটারে বিদ্যাসাগরের কাছে আছেন।—

"রৌদ্র উঠিতে না উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল—'ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচগণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার ভুট্টা-কটা নিয়া আমায় পাঁচগণ্ডা পয়সা দে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টা-কটা লইলেন, ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল—তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল—'আমার আটগণ্ডা পয়সা দরকার।' বিদ্যাসাগর মহাশয় আটগণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম—'বারে, এ তো বড়ো আশ্চর্য! খরিদ্দার দর করে না—দর করে যে বেচে!' বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন। তার-পর দেখি, যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার বিরাম নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন?' তিনি বলিলেন—'দেখ্‌বি রে দেখ্‌বি।'…

"[ভুট্টা কেনার মধ্যে দুটো 'কুড়ি-বাইশ বছরের সাঁওতাল ছুঁড়ি' বিদ্যাসাগরের কাছে এসে বলেছিল, 'ও বিদ্যেসাগর, আমাদের কিছু খাবার দে', এবং উঠোনে ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু ঘরে নানা রকম মিষ্টান্ন মজুত থাকলেও তাদের খেতে দেননি, কারণ তার রস ওরা বুঝবে না। সব মানুষের জন্য সব জিনিস নয়, এ বোধ বিদ্যাসাগরের ছিল। ভুট্টা কেনার মধ্যে বিদ্যাসাগর একবার দ্রুত পায়ে কয়েক মাইল হেঁটে গিয়েছিলেন এক সাঁওতাল ছেলের চিকিৎসার জন্য। তারপর—].

"বাংলায় আসিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো—সব রকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে—কোনো দলে পাঁচ জন, কোনো দলে আট জন, কোনো দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলা শুক্‌না পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল—'ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে।' বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা সেই শুক্‌না কাঠ ও পাতায় আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা সেঁকে, আর খায়—ভারি স্ফূর্তি। আবার চাহিয়া লয়—কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারটা

ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশিকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল—'খুব খাইয়েছিস বিদ্যেসাগর।' ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। আমিও আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম—এ-রকম বোধহয় আর দেখিতে পাইব না।"[৩৩]

সত্যই ও-দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ দৃশ্যের নায়ক-চরিত্র বিদ্যাসাগর হারিয়ে গেছেন; দৃশ্যের দর্শক-লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরাও আর নেই।

॥ ৭ ॥

কার্মাটারের স্বর্গোদ্যান থেকে বিদায় নিয়ে স্থূল মর্ত্যধামে প্রবেশ সুখের হয় না। বিদ্যাসাগরের বন্ধুদের একটা মোটামুটি তালিকা চণ্ডীচরণ দাখিল করেছেন।[৩৪] বিদ্যাসাগর এই বন্ধুদের "সকল অবস্থায় সংবাদ রাখিতেন, তাঁহাদের বিপদে মাথা পাতিয়া দিতেন, বন্ধুসেবায় কোনো ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না।"

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এঁদের সকলের বন্ধুত্ব কি অবিচলিত ছিল? চণ্ডীচরণ একটু ঢোক গিলে বলেছেন, "বন্ধুদিগের কাহারও-কাহারও দ্বারা সময়ে-সময়ে ক্লেশ পাইলেও তাঁহার বন্ধুমণ্ডলী পরম গৌরবের স্থল।"

কোন্ বন্ধুর সঙ্গে কোন্ কারণে তাঁর মনোবিবাদ হয়েছিল, তার পুরো কাহিনী আমরা জানিনা, এবং যতখানি জানি, তাও এখানে পরিবেশনের প্রয়োজন নেই। আমাদের এই হাসির সন্ধানে যাত্রাপথ কী বন্ধুর—তাই দেখাতে কেবল কিছু ঘটনার উল্লেখ করব।

মহেন্দ্রলাল সরকার উনিশ শতকের বাংলায় প্রধান পুরুষদের একজন। তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ। আগে ছিলেন নামকরা অ্যালোপ্যাথ, পরে কুল ভেঙে হোমিওপ্যাথ হওয়ায় চিকিৎসা-জগতে এবং সামাজিক জীবনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' নামক বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠাতা, 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামক মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু সম্পাদক, এবং একাধিক সরকারী সম্মানে ভূষিত। এসব কথা আগে বলেছি। তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সৌহার্দ্য-সম্পর্ক হয়েছিল, তাঁর বিজ্ঞান-সংস্থায় বিদ্যাসাগরের দানও আছে। মহেন্দ্র সরকারের স্বভাবে ছিল প্রখরতা, বাক্যে তীক্ষ্ণতা, আচরণে কঠোরতা। জীবনে অনেক কাজ করেছেন—তাতে নিষ্ঠার একগুঁয়ে ভাব ছিল। সেইসঙ্গে 'আমি মুখের উপর সত্য কথা শুনিয়ে দিতে পারি'—এই অভিমান। এসব ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে বিদ্যাসাগরের খানিক আদল ছিল, কিন্তু ছিলনা বিদ্যাসাগরীয় মহিমা—সেই সমুদ্রবিশাল হৃদয় তো সুলভ নয়। বিহারীলাল সরকারের লেখা থেকে দেখেছি—উভয়ের ব্যক্তিত্বের সংকট এমন পর্যায়ে

পৌঁছেছিল যে, পরস্পরের মুখ দেখা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। চার চোখের মিলন পুনশ্চ হয় বিদ্যাসাগরের শেষ শয্যাপার্শ্বে, যখন মহেন্দ্র সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে দেখতে যান। অথচ মনোবাদের কারণ অতি সামান্য। বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠা কন্যার অসুখ হয়, বিদ্যাসাগর মহেন্দ্র সরকারকে ডেকে পাঠান। যে-কোনো কারণেই হোক, মহেন্দ্র সে-চিঠি তখনি খুলে পড়েন নি, পরে পড়ে চিকিৎসা করতে আসেন। দেরীতে আসার কারণ শুনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হন; "ইহাতেই মনোবাদের সূত্রপাত। ক্রমে মনোবাদ এতদূর ঘনীভূত হইয়াছিল যে, কোনো স্থানে দুই জনের সাক্ষাৎ হইলে চারি চক্ষু একত্র হইত না।" বাহ্য কারণ যাই হোক, এর পিছনে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ব্যাপারটি অবশ্যই ছিল। "মৈত্রী-বিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর মহাশয় [বিহারীলাল লিখেছেন] কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিগত মৈত্রীর পুনরুদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেন না। মৈত্রী-উদ্ধারের এরূপ অনাকাঙ্ক্ষা মানবচরিত্রের মহত্ত্ব-পরিচায়ক নহে নিশ্চিতই; কিন্তু কৃতাত্মনির্ভর ও তেজস্বী পুরুষে প্রায়ই এরূপ দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে।"[৩৫]

মধুসূদনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের শেষ বিচ্ছেদ নাকি এমনই ব্যবহারঘটিত ত্রুটির সূত্রে—অন্তত বিহারীলালের লেখা থেকে তাই পাই। "মাইকেল শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আদৌ সদ্ব্যবহার করেন নাই। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় মাইকেলকে 'বাবু' সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। মাইকেল সে পত্র প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাতফেরত বাঙালীদিগকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন না।"[৩৬]

ঘটনাটি যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে, বোঝাকে ডুবিয়েছিল যে শাকের আঁটিটি—এটি তাই। মধুসূদনের প্রতিভার পরিচর্যা বিদ্যাসাগর করতে প্রস্তুত ছিলেন, সাধ্যসীমাকে অতিক্রম করেও তা করেছেন, কিন্তু মধুসূদনকে সাহেব-রূপে খাড়া রাখার কাজটা তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকছিল। 'বাবু' সম্বোধন করলে মধুসূদন চটবেন, বিদ্যাসাগর অবশ্যই জানতেন—কিন্তু বাপু হে, যদি বাঁচতে চাও তাহলে হয় পুরো সাহেব হও, এবং তা হবার মতো কাজকর্ম করো, নচেৎ বাবু হয়ে থাকো; আসলে তুমি একটি উচ্ছৃঙ্খল বাবু ছাড়া কিছু নও—বিদ্যাসাগর হয়ত বিদ্রূপের সঙ্গে 'বাবু' সম্বোধন করে তাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শেষের দিকে বিদ্যাসাগরের সুপ্রসিদ্ধ বদান্যতা মধুসূদনের দিকে একেবারেই রুদ্ধস্রোত হয়ে পড়েছিল। মদ্য ও নিয়তিই অপব্যয়ের সঙ্গে মধু-র সেব্য—বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন। তবু সেই দুরন্তের সম্বন্ধে তাঁর ভিতরকার কান্না থামে নি। মধুসূদনের মৃত্যুর পরে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে অর্থপ্রার্থনায় গেলে "তিনি বহু আলাপ ও বিলাপের পর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাহার জান্ রাখিতে পারি নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।"[৩৭]

এর পূর্বে ছিল এক অপূর্ব ইতিহাস—মানব-সম্পর্কের বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত

মহানাট্য। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের জীবনী-পাঠকদের কাছে তা বিশেষ পরিচিত। মধুসূদনের ধর্মান্তর বিদ্যাসাগরকে বিচলিত করেছিল, এমন সংবাদ আমাদের কাছে নেই। মধুসূদনের বিদ্রোহী অমিত্রছন্দ বিদ্যাসাগরের গাঢ় মিত্রছন্দের সংস্কারকে গোড়ায় ঈষৎ উদ্বাস্ত করলেও ক্রমে তিনি নিজের বিদ্রোহী স্বভাবের প্রভাবে মধুসূদনকে সমাদর-পুরস্কার অর্পণ করেছিলেন। ব্যারিস্টার হয়ে আসার জন্য মধুসূদনের বিলাতগমনের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল —ব্যারিস্টারি সম্বন্ধে মোহের জন্য নিশ্চয়ই নয়, মধুসূদনের মধ্যে জাগ্রত মহাবিশ্বের বিশাল স্বপ্নের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মমত্বের জন্যই। অনর্গল ব্যয়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে মধুসূদন যখন ফ্রান্সে কারাগারের তটে ধাক্কা খাচ্ছেন, এবং লিখিত আর্তনাদ পাঠাচ্ছেন, তখন তিনি অর্থ পাঠিয়ে মধুসূদনকে রক্ষা করেছিলেন চূড়ান্ত লাঞ্ছনার হাত থেকে ; মধুসূদনের স্বদেশীয় আত্মীয়-বন্ধুদের ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতিপূরণ তিনি করেছিলেন ; তাঁরই সাহায্যের রজ্জু ধরে মধুসূদন বেপরোয়া খরচের গর্তের মধ্যে ঝুলতে ঝুলতে ব্যারিস্টারী পাস করেন, এবং স্বকীয় বিদ্যাক্ষুধা ও সাহিত্যক্ষুধায় একাধিক ইউরোপীয় ভাষা শিখেও ফেলেছিলেন ; তারই মধ্যে তিনি প্রবাসে ফেনিয়ে-ওঠা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাপ্রীতিতে শেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টিও করেছেন—চতুর্দশপদী কবিতাবলী। মধু দেশে ফিরলে যাতে অসুবিধায় না পড়েন সেইভাবে দেশী পল্লীতে তাঁর জন্য বিদ্যাসাগর সুপ্রসর বাড়ি সাজিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু—

হাঃ হাঃ হাঃ। মাইকেল এম এস ডাট্, এস্কোয়ার, বার-এ্যাট-ল, কখনও দেশী পল্লীতে থাকতে পারে !! অভিজাত সাহেবী হোটেল-ভিন্ন তাহারে ধরিবে কেবা ! সেখানে পণ্ডিত পৌঁছলে তাঁকে জড়িয়ে, গালে চুমো খেয়ে, ঘূরপাক নাচ চলবে ; তবে তার হোটেলে থাকার এবং মদের ফোয়ারা ছোটাবার পয়সাটা ধার করে ওই পণ্ডিতকেই জোগাড় করে দিতে হবে। এমন-কি পণ্ডিতের বাড়িতে যদি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে অতিথিসেবার জন্য মদের বোতল জোগাড় করে রাখার ফরমাসও পণ্ডিতকে লেখা চিঠিতে জানাতে ডিয়ার মধুর বাধা নেই।

বিদ্যাসাগর হেরে গেলেন। হারকিউলিসের ঘাড়ও ভারে নুয়ে পড়ে !! মধুসূদনের জন্য তিনি হাজার-হাজার টাকা ধার করেছেন, বিশ্বাস করে চেনাশোনা লোকেরা সেই টাকা বিদ্যাসাগরকে দিয়েছেন, কিন্তু কত দিন তাঁরা টাকা ফেলে রাখবেন ? তাঁদের তাগিদে বিদ্যাসাগর তীব্র অপমান বোধ করছিলেন। "এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক [বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে চিঠিতে লিখেছিলেন] এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে, রাত্রিতে নিদ্রা হয়না। অতএব আপনার নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমার পরিত্রাণ করেন। পীড়া-শান্তি ও স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্তত ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য হইয়া

উঠিয়াছে।···কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোনোমতেই যাইতে পারিব না।"৩৮

দুশ্চিন্তায় বিদ্যাসাগরের রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না—হাঁ, তা না-হতে পারে। তাঁদের মতো মানুষদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি লাইনের কণ্ঠহার কি যথেষ্ট ধারশোধ নয়—"অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার, তার নিত্য জাগরণ।" তবু—যখন "মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো"—তখন কবিতার খুঁটিতে তাকে ঠেকানো যায় না। বিদ্যাসাগরকে শেষ পর্যন্ত 'না'-এর দ্বারা ছেদ টানতে হল। মধুসূদনকে তিনি ইংরাজিতে চিঠি লিখলেন, (মধুসূদন যে 'বাবু' হতে গররাজি) বঙ্গানুবাদে তা এই : "প্রিয় দত্ত, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু অতীব দুঃখের সঙ্গে এই ধারণায় উপনীত হইয়াছি যে, আপনার ব্যাপারে কোনোই আশাভরসা নাই। আমি বা অন্য যে-কেউ, যদি তিনি অতীব ধনশালী না হন, যত চেষ্টাই করুন না কেন, আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। তালি মারিয়া বাঁচাইবার অবস্থা পার হইয়া গিয়াছে।"

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক ঠিক কী ছিল ? দাতা ও গ্রহীতার পরিচিত সম্পর্ক অবশ্যই নয়। মধু সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনে নিঃসন্দেহে নিবিড় স্নেহ ও শ্রদ্ধা। মধুসূদন বিধাতার অবুঝ অশান্ত সৃষ্টি, সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন, যাঁতে আছে শৈশবের তীব্র কৌতূহল, মুহুর্মুহু আশা আকাঙ্ক্ষার ছটফটানি, দুহাতে জড়িয়ে গ্রহণ, পরক্ষণে বর্জন, হাসি, কান্না, চীৎকার। অথচ সে এক বিরাট প্রতিভা, এবং—হাঁ, অসামান্য সেই পাণ্ডিত্য। কদাচিৎ এমন চরিত্র দেখা যায়। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের স্বর্গে ও শ্মশানে ছোটাছুটি করা উন্মত্ত এক মানুষ। সুরা—মধুসূদনের জীবনসত্য। প্রতিভার সহর্ষ উদ্দীপনার মতো সেই তরল অনল মধুসূদনকে জ্বালিয়ে তোলে ; তার পরে নেশার ঘোর যখন কাটে তখন অবসাদের ক্লান্ত শ্বাসে উচ্চারিত হয়—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় / তাই ভাবি মনে, / জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু-পানে ধায়, / ফিরাব কেমনে !"

মরণান্ত যন্ত্রণাস্বর তাঁর—"দিন দিন আয়ুহীন / হীনবল দিন দিন / তবু এ আশার নেশা ঘুচিল না, এ কি দায়।"

এহেন মধুসূদন নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন—এই পৃথিবীতে বিভিন্ন দায় নিয়ে বিভিন্ন মানুষ এসেছেন ; বিদ্যাসাগর এসেছেন করুণার সিন্ধু হয়ে, সুতরাং তাঁকে যেভাবে হোক সেই ভূমিকা রক্ষা করতে হবে—আর আমি এসেছি বেপরোয়া হয়ে মাতামাতি করার কাজ নিয়ে,—তারই মধ্যে মনের আনন্দে রসের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ঢেউ তোলার কাজও আমারই। হয়ত ভেবেছিলেন, ভারতীয় পণ্ডিত হয়েও বিদ্যাসাগর কর্মবিভাগ তত্ত্ব বোঝেন না কেন ? বিদ্যাসাগরের হলো পোষক রাজার দায়—আর আমার কবির দায়।

মধুসূদন এইসব ভেবেছিলেন কিনা জানি না। স্বয়ং বিধাতাও তা ভেবেছিলেন কিনা জানবার উপায় নেই—শুধু জানি—মধুসূদন বিদ্যাসাগরের

কাছে যেমন অনেক নিয়েছিলেন, ফেরত কম দেননি। কালের পটে অক্ষয় কিছু প্রশস্তি (তার গায়ে সাময়িক প্রয়োজনের যে-ছাপই থাক না কেন) তাঁরই রচনা। তার সেরা অংশ :

"যে মানুষটির কাছে আমি আবেদন জানিয়েছি, তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ঋষির প্রতিভা ও প্রজ্ঞা, ইংরাজের সতেজ কর্মশক্তি এবং বাঙালী মায়ের হৃদয়।"

কবিতার মধ্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হিমালয়ের তুলনা করেছেন। সাগরের তুলনাও রয়েছে :

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে ;
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু !"

বিদ্যাসাগর যখন পীড়িত, যখন তাঁর কাছে যাবার মতো সম্পর্ক ঘুচে গেছে, তখনো বেদনা পাবার মতো হৃদয় মধুসূদনের ছিল। বিদ্যাসাগরের পীড়া 'রাক্ষস' ছাড়া কিছু নয়—তা বাণাঘাত করেছে 'বঙ্গরত্ন'কে—

"বুঝিতে কি পারো,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে ?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারংবার।"

বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের সম্পর্কের মধ্যে হাসির সন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। শেষ পর্যন্ত মন ফিরে গেছে কেবল আলোকোজ্জ্বল একটি দৃশ্যের কাছে—স্পেনসেস্ হোটেলে বিদ্যাসাগর যেতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরে মধুসূদনের ঘূর্ণি-নাচ, গালে চুম, উচ্চ হাসি—এবং ব্যতিব্যস্ত বিদ্যাসাগরের স্মিত হাসি—"আঃ, মধু, কি করো, ছাড়া, ছাড়ো— ।"

কৈশোরে ও যৌবনে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার—হাস্যে পরিহাসে কত প্রহর কেটেছে তাঁদের, শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিচ্ছেদ রেখার দুই প্রান্তে তাঁরা সরে গেলেন—মাত্র ৪১ বৎসরে মদনমোহনের দেহান্তকালেও তাঁরা পুনর্মিলিত নন। মদনমোহনের মৃত্যুর পরে তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনীতে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ তুলে উভয়ের সম্পর্কের স্মৃতিকে বিষাক্ত করে তুলেছিলেন। বিদ্যাসাগরকে আত্মসমর্থনে 'নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস' পুস্তিকা লিখে প্রমাণ করতে হয়েছিল—বেতালপঞ্চবিংশতি তাঁর নিজেরই রচনা, মদনমোহনের সঙ্গে যৌথ সৃষ্টি নয়, এবং মদনমোহনের সুপারিশসূত্রে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ পাননি। এর উল্টোদিকের সংবাদ—সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদ মদনমোহন পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই। মদনমোহন মৃত্যুকালে যথেষ্ট টাকা রেখে গেলেও তাঁর বৃদ্ধা মাতাকে আত্মীয়-স্বজন দেখেন নি, সে-কাজ বিদ্যাসাগরকেই করতে হয়েছিল—তাও দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে ওই লেখায় বিদ্যাসাগরকে জানাতে হয়। অথচ একদা বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের মধ্যে কী নিবিড় ভালবাসাই না ছিল! "পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম

বন্ধুতা জন্মিয়াছিল [চণ্ডীচরণ লিখেছেন], বিদ্যাসাগর মহাশয় যে-সকল শুভানুষ্ঠানের সূচনা করিতেন, মদনমোহন তাহার প্রত্যেকটিতে আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন। অনেক অনুষ্ঠানে উভয়ের এরূপ আগ্রহ দেখা যাইত যে, কে পরিচালক আর কে পরিচালিত তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন হইত।"[৩৯] মদনমোহন সংস্কারমুক্ত পুরুষ, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রস্তাবে তিনি স্বাক্ষরকারী, স্ত্রী-শিক্ষার প্রবল সমর্থক, সে-বিষয়ে কেবল জোরালো প্রবন্ধ লেখেন নি ("সর্বশুভকরী পত্রিকায়' প্রকাশিত সেই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি ইন্দ্র মিত্র পুরোপুরি তাঁর গ্রন্থে ছেপেছেন), বেথুন স্কুল খোলা হলে, সমালোচনার পরোয়া না করে সেখানে নিজের দুই মেয়েকে পড়তে পাঠিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একত্রে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামক ছাপাখানার ব্যবসা খুলেছেন, যাতে ন্যস্ত ছিল উভয়ের গ্রন্থস্বত্ব।

এহেন বন্ধুত্বে চিরবিচ্ছেদ ঘটল। এই "উৎকট মনোমালিন্য কেন জন্মিল, কেন বিদ্যাসাগর তর্কালঙ্কারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিলেন," তার ভিতরের কথা জানলেও কৃষ্ণকমল জানাতে অস্বীকার করে-ছিলেন, কেবল এইটুকু তাগিদে পড়ে বলেছিলেন, তা "প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে।"[৪০] স্মর্তব্য, কৃষ্ণকমল বিভিন্ন ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় পিছপাও হননি, মদনমোহনের সাহিত্যপ্রতিভার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, এমন পর্যন্ত বলেছেন যে, মদনমোহন বাংলা লেখা না ছাড়লে বিদ্যাসাগরের মতোই নবধারার সূত্রপাত করতে পারতেন।[৪১] মদনমোদন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনায় আটকে থাকেন নি, জজ-পণ্ডিত হয়েছেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। "আমি এখনও বলিতেছি যে, [কৃষ্ণকমলের উক্তি] আমার মনে হয়, তিনি যদি ডেপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাংলা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে-প্রশংসা পুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি, তাহা অর্ধেক ভাগ করিয়া দুইজনকে দিতে হইত।" মদনমোহন কেন তাঁর প্রতিভার অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন নি, তার উপযুক্ত ব্যাখ্যাও কৃষ্ণকমল করেছেন: "বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহসংসারে উন্নতিলাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে 'ক্যারেকটর' কহে, অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা এবং অকুতোভয়তা—এই সকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় ['বোধ হয়' লিখে উনি নিজেকে খানিক বাঁচিয়েছেন] কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আসমান্-জমিন্ প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে-বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়ত vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কিনা সন্দেহ।"[৪২] অথচ তর্কালঙ্কারের তেজস্বিতার অভাব ছিল না। একবার এক বড়োদরের সাহেব কর্মচারী তাঁকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পরিহাসছলে ডাক দিয়েছিলেন —লোকটিকে ভদ্র ব্যবহার করবার মতো সমঝে দিতে পেছপাও হননি। ইয়েটস্

সাহেবের সঙ্গে বাংলা ভাষা নিয়ে বচসা হবার সময়ে সাহেব যখন চটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কোথায় বাংলা শিখেছেন," তখন এই ব্যঙ্গোক্তি শুনেছিলেন, "কোথায় আবার—বিলাতে।"[৪৩]

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিচ্ছেদের দুঃখ মদনমোহনকে এমনই বেজেছিল যে, উভয়ের বন্ধু শ্যামাচরণ বিশ্বাসকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—যাঁর সহায়তা-বলে তাঁর ডেপুটি চাকরি প্রাপ্তি, সেই তিনি বিরূপ হয়েছেন, এক্ষেত্রে চাকরিতে ইস্তফা দিতে ইচ্ছা করছে। "আমি এই সাব-ডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহা অপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্তিহীনচিত্তে কর্ম-কাজ করিতেছি।...আমার বাল্যসহচর, একহৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই। আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি।"[৪৪]

এই সব তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল, তর্কালঙ্কারের উন্নতির মূলে বিদ্যাসাগর, উভয়ের বিচ্ছেদের মূলে তর্কালঙ্কারের দোষ, এবং উচ্চতর পদ-লোভের কারণেই তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনার কাজ ছেড়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই কি শেষ কথা ? এখানেও কি ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কথাটা আসে না ? বিদ্যাসাগরের সর্বাঙ্গে বিপুল গুণাবলীর বর্ম মোড়া ছিল বলে কি তিনি আলিঙ্গন-অসাধ্য হয়ে ওঠেন নি ? তাঁর কাছ থেকে সরে গেলেই শান্তি, তাতেই আত্মমর্যাদার রক্ষা—একথা কি মদনমোহনের মনে হতে পারে না ?

॥ ৮ ॥

আমার সুস্পষ্ট ধারণা, বিদ্যাসাগরের প্রতিভাবান মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের তেমনই মনে হয়েছিল।

দীনবন্ধু বিদাসাগরের ছায়াতেই বেড়ে ওঠেন। শৈশব থেকে কলকাতায় দাদার সঙ্গে থেকেছেন, দাদার সর্ব কাজে সহায়তা করেছেন, দাদা যখন পড়া-শোনায় ডুবে আছেন, তখন দশ বৎসরের বালক তিনি, গৃহকাজ করে গেছেন। পড়াশোনা সাঙ্গ হবার পরে যেসব চাকরি করেছেন, সে-সকলই দাদার চেষ্টাতে পাওয়া। বিদ্যাসাগর গোড়ার দিকে মনে করতেন, তাঁর চাকরিজীবন এবং আয় অনিশ্চিত, তাই মেজভাই যদি চাকরি করে তাহলে তার মাইনেতে সংসার চলতে পারে। একবার বাস্তবিক তাই হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্তের সঙ্গে মতভেদের ফলে বিদ্যাসাগর চাকরি ছাড়লে তাঁদের কলকাতার সংসার দীনবন্ধুর আয়েই কোনোক্রমে চলত, একথা শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষ্যে পাচ্ছি।[৪৫] বিদ্যাসাগর এই ভাইকে নিজের সমগুণসম্পন্ন মনে করতেন। কেবল বিদ্যাক্ষেত্রে নয়, চারিত্রের ক্ষেত্রেও এঁর মধ্যে বিদ্যাসাগরের ছায়া ছিল। "অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় যথার্থ একজন দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, পরম দয়ালু ও অমায়িক লোক ছিলেন"—শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন। বরিশালে থাকাকালে দীনবন্ধু অনেক স্কুল স্থাপন

করেছেন ; কলকাতায় অবস্থানকালে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন ; "এমন-কি এক-এক সময়ে দরিদ্র রোগীর নিশীথ সময়ে বাক্স বহিবার লোক না থাকিলে স্বয়ং বাক্স মাথায় করিয়া দরিদ্র রোগীর ভবনে উপস্থিত হইতেন।" বীরসিংহ গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের কথা শুনে সেখানে হাজির হন চিকিৎসার জন্য ; "তথায় দিবারাত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা করিতেন, অপরাহ্লে চারটার সময়ে স্বয়ং পাক করিয়া আহার করিতেন।" গ্রামে থাকাকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন, তারপর কলকাতায় ফিরলে ওই অসুখেই তাঁর জীবনান্ত হয়।[৪৬]

এহেন দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তার দুটি ঘটনা স্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে এসেছে। একটি হলো, তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যবসায়—সংস্কৃত যন্ত্র ও ডিপজিটারির সমস্বত্ব দাবি করেন, এবং দাবি আদায়ের জন্য মোকর্দমা করতে চান। দীনবন্ধুর বক্তব্য, ওই প্রেসের পিছনে তাঁর টাকা আছে, এবং তিনি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রেসটিকে দাঁড় করাবার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি স্কলারশিপের ও চাকরির টাকা আপনার হস্তেই দিয়া আসিয়াছি, এবং আপনার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়া আসিয়াছি।...সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারি আপনার একার সম্পত্তি নহে, সুতরাং উহাতে আপনার একলার স্বত্ব নাই। কারণ আমাদের উভয়ের অর্থে ও পরিশ্রমে ওই দুই সম্পত্তি অর্জিত হইয়াছে।" মামলা শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায় নি, উভয়ের সম্মতিতে নিযুক্ত দুই সালিশী, দ্বারকানাথ মিত্র ও দুর্গামোহন দাশের বিচারে বিদ্যাসাগরের স্বত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৭]

জানিনা মামলা হলে কী দাঁড়াত—অবিভক্ত পরিবারের কারো দ্বারা কোনো সম্পত্তি অর্জিত হলে, সে সম্বন্ধে স্বত্বসূচক বিশেষরকম লেখাপড়া না থাকলে, তা সাধারণভাবে যৌথসম্পত্তি বলে গৃহীত হবার কথা। যাই হোক, পরিষ্কার দেখা যায়, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন অর্থ বা সম্পত্তিলোভে প্রেস ও পুস্তকালয়ের উপর দাবি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নি। সর্বব্যাপারে বিদ্যাসাগরের একনায়কী মনোভাবের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযোগ। বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ, তাতে তিনি উদ্ব্যস্ত, সেই অবস্থায় বিনা পণে ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রেসের ব্যবসা চালনার ভার দিয়ে দিলেন, অথচ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার পণে অনেকেই ওই ব্যবসা নেবার উমেদার। "আপনি যেরূপ উদারপ্রকৃতি, তাহাতে সমস্ত বিষয়ই নষ্ট করিতে পারেন।" দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের আপত্তি এখানেই। মামলায় সালিশীদের বিচার যখন দীনবন্ধুর বিপক্ষে গেল, তখন তিনি বিদ্যাসাগরের দেওয়া মাসিক ভাতা নিতে অস্বীকার করেন। বিদ্যাসাগর গোপনে দীনবন্ধুর পত্নীকে সেই টাকা দিলে তা জানতে পেরে দীনবন্ধু ফেরত দিয়েছিলেন।[৪৮]

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন আত্মমর্যাদাবান মানুষের আচরণই করেছিলেন। সেই প্রখর আত্মমর্যাদা আর একবার দেখা গিয়েছিল। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত

দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের কোনও বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয়। এ-কারণ, তেজস্বী দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ওই কর্মে রেজাইন দেন।"[৪৯]

বিদ্যাসাগর এইসব ঘটনায় মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। দীনবন্ধু অবশ্য তাঁর দাদার মতো পৌরুষকে মনুষ্যত্বের উপরে উঠতে দেননি। বিদ্যাসাগরের মানসিক কষ্ট দেখে, এবং পিতা ও অন্য ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের কথা মান্য করে, তিনি মাসিক ভাতা নিতে স্বীকৃত হন। তারপর জীবনের শেষ দিনগুলি শান্তভাবে কাটিয়েছিলেন।[৫০]

বিদ্যাসাগরের মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তি কয়েকটি বিষয়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে—বস্তুর অপর পৃষ্ঠে দৃষ্টি দিতে ভুলে গেছি। প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড বিদ্যাসাগর কি নিজের আত্মীয়-স্বজনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ নন? যে যত ছোট মাপের মানুষই হোক, সে মাথা তুলতে চাইবেই। 'হাত তোলা' হয়ে জীবন কাটাতে হলে মনে গ্লানি জমে। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ঝগড়াঝাটি দেখে বিদ্যাসাগর ভাইদের পৃথক করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। উত্তম কথা। কিন্তু যাঁরা পৃথক হয়ে গেলেন তাঁদের তো পৃথক উপার্জন নেই। তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল বিদ্যাসাগরের দানের উপরই। ভূমিনির্ভর একান্নবর্তী পরিবারে যে-ব্যবস্থা চলে, চাকুরিজীবী বা ব্যবসায়ী পরিবারে তা চলে না। বিদ্যাসাগর প্রথমে চাকুরিজীবী, তারপরে ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে হেয়ার স্কুলের বহু বছরের চাকরি ছাড়িয়ে মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজের সেক্রেটারির চাকরি দিলেন। কর্মদক্ষ সূর্যকুমার প্রতিষ্ঠান দুটির অনেক উন্নতি করলেন। তারপর বিদ্যাসাগর যেই শুনলেন, টাকাকড়ির ব্যাপারে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, অমনি তিনি এক কথায় সূর্যকুমারের চাকরি ছাড়িয়ে, অন্য একজনকে তখনি হাঁক দিয়ে ডেকে এনে সেই চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।[৫১] এর দ্বারা, হাঁ, বিদ্যাসাগরের ন্যায়দণ্ড খাড়া রইল, কিন্তু তা সহসা বৃত্তিচ্যুত জামাতার কাছে মোটেই আহ্লাদের ব্যাপার হলো না। সূর্যকুমার তো হেয়ার স্কুলের চাকরি ছাড়তে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না![৫২] মেট্রোপলিটানের চাকরি যাবার পরে সূর্যকুমার আর শ্বশুরের ভাতার জন্য অপেক্ষা না করে "সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উদরান্নের জন্য ভিন্ন দেশে, ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন লোকজনমণ্ডলীর মধ্যে যাত্রা করিলেন।"[৫৩]

বিদ্যাসাগরের মাসোহারায় যাঁর গোটা জীবন কেটেছে, সেই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। ইনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে ৭-৮ বছরের ছোট, সংস্কৃত কলেজে পড়া শেষ করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের সর্বাদি জীবনীসহ একাধিক গ্রন্থরচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনকালে ইনি তাঁর নির্দেশমতো গ্রামের সবরকম কাজকর্ম দেখাশোনা

করতেন, এঁর হাত দিয়েই অনেকের মাসোহারা বিলি হতো। একবার এঁর চাকরি নেবার ইচ্ছা হয়,[৫৪] সম্ভবত বিদ্যাসাগরের অনিচ্ছায় তা কার্যকর হয়নি। চণ্ডীচরণ অভিযোগ করেছেন, ইনিই বিদ্যাসাগরের চিরতরে গ্রামত্যাগের মূলে। এই নিয়ে তর্ক উঠেছে। শম্ভুচন্দ্র সবেগে এক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব অস্বীকার ক'রে —ঘটনার মূলে ছিল দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন কর্তৃক বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত মাসোহারা প্রত্যাখ্যান করা—এমন কথা লিখেছেন। ইন্দ্র মিত্র বিচার করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন—শম্ভুচন্দ্রের আচরণও এক্ষেত্রে কম দায়ী নয়।

ঘটনা এই: কেচকাপুর স্কুলের হেডপণ্ডিত মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মনোমোহিনী নামক এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বিয়ে করতে চান। এই বিয়েতে বিদ্যাসাগরের সম্মতি ছিল। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্রের এক চিঠি পেয়ে শম্ভুচন্দ্র মনোমোহিনীকে বাড়িতে আশ্রয় দেন, কারণ বীরসিংহ গ্রামে বিধবা-বিবাহের বিরোধী অনেক। বিদ্যাসাগর এসে হাজির হন। তাঁকে গ্রামের হালদারবাবুরা ধরে পড়েন, যাতে তাঁদের পরিবারের ভিক্ষাপুত্র মুচিরামের এই বিধবাবিবাহ না হয়। যে কোনো কারণেই হোক বিদ্যাসাগর ওঁদের কথা দেন—এই বিয়ে হবে না; এবং তিনি এই বিয়ের সঙ্গে সংস্রব রাখবেন না। সেজন্য মনোমোহিনীকে বিদ্যাসাগরের বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়। কিন্তু বিয়ে আটকানো যায়নি। বিদ্যাসাগরের প্রায় নাকের ডগায় বিয়ে হয়েছিল। সেই ঘটনা তাঁকে কঠিন আঘাত করে—কেননা তিনি কথা দিয়ে তা রাখতে পারেন নি। তাঁর পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠেছিল—কারণ, তিনি অধিকন্তু জেনেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে পারিবারিক বিদ্রোহ হয়েছে। উক্ত বিয়ের সম্পাদক হলেন তাঁর তিন ভাই—দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র (তিনি যতই অস্বীকার করুন, এই বিয়েতে প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে তিনি সবিশেষ সক্রিয়) ও ঈশানচন্দ্র, এবং পুত্র নারায়ণচন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র (দীনবন্ধু-পুত্র) গোপালচন্দ্র। এঁদের সকলের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল ঈশানচন্দ্রের তীক্ষ্ম উদ্ধত কথাগুলিতে।

"[বিবাহের] পরদিন প্রাতঃকালে ঈশানচন্দ্র দাদার নিকট উপস্থিত হইলে দাদা বলিলেন [শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন] 'ঈশান, তুমি কেন বিবাহ দেওয়াইলে, ইহাতে আমার বড় অপমান হইয়াছে।' ঈশান উত্তর করিল, 'কৈলাস মিশ্র ও আমি গত পরস্য আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বিধবাবিবাহ ন্যায্য কিনা তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, ইহা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত বলিয়া আমি স্বীকার করি, কিন্তু হালদারবাবুদের মনে দুঃখ হইবে।' ইহাতে কনিষ্ঠ সহোদর উত্তর করিলেন, 'লোকের খাতিরে এইসকল বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দূষণীয়।' ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, 'তুই কি এখনও সেইরূপ দুর্মুখ আছিস এবং এইরূপই কি চিরকাল থাকিবি'?"[৫৫]

ধরে নেওয়া যাক, এই ক্ষেত্রটিতে বিদ্যাসাগরের আচরণই সঠিক, তাঁর আত্মীয়বর্গের নয়, কিন্তু বিদ্যাসাগর কেন হালদারদের ওই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা বিদ্যাসাগরের কোনো জীবনীকারই স্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে

পারেন নি। আমরা কেবল দূর থেকে ঘটনাটির তীব্র তিক্ততায় এবং পরবর্তী শোচনীয় পরিণতিতে শিহরিত। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর যেন সহসা দেখলেন —পৃথিবীতে তিনি কতখানি নিঃসঙ্গ। অনুভব করলেন, তাঁর মর্যাদাকে কিভাবে তুচ্ছ করতে পারেন তাঁর আদরে ও অন্নে পালিত মানুষেরা !—কিভাবে তাঁরা তাঁর আদর্শের প্রাণগত রূপকে বাক্যগত রূপের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করে দিতে পারেন !! তাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আচরণে আত্মখণ্ডন তো ছিলই।

বিদ্যাসাগরের স্মৃতি ও স্বপ্নের গ্রাম বীরসিংহ। ওই ঘটনা ও আরও অনেক ঘটনার সম্মিলিত আঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি চিরতরে গ্রাম ত্যাগ করে আসেন। নিজের বুকের রক্তে ডুবিয়ে আত্মীয়দের কাছে কতকগুলি চিঠি লিখেছিলেন, তেমন মর্মপীড়ন কদাচিৎ দেখা যায়।

মাকে লিখলেন :

"নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোনো বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোনো সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষত ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্বের মতো নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয়না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ-জন্মের মতো বিদায় লইতেছি।"

পিতাকে লেখা পত্রে উপরের কথাগুলির অতিরিক্ত এই কথা আছে :

"সাংসারিক বিষয়ে আমার মতো হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে-বিষয়ে কোনও অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই।... সংসারী লোকে যে-সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনের অন্তঃকরণেও যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে-বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

পিতার কাছে পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটার সম্ভাবনা, সেকথা বলে তিনি বারবার মার্জনা প্রার্থনা করেছেন।

পত্নী দিনময়ীকেও সংসারবৈরাগ্য বিষয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলি লেখেন। তার পরে :

"এক্ষণে তোমার নিকট এ-জন্মের মতো বিদায় লইতেছি, এবং বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখনও কোনও দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে।... পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে এবং অন্যেরও বিষম ক্লেশদায়িনী হইবে।"[৫৬]

ভাইদেরও একই ধরনের বৈরাগ্যসূচক চিঠি লেখেন, এবং সকলকেই এই আশ্বাস দেন—তাঁর বৈরাগ্য অন্যের অনশনের কারণ যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা

করে দেবেন।

বিদ্যাসাগর এর পরেও কুড়ি বছরের বেশি বেঁচেছিলেন কিন্তু কখনও বীরসিংহ গ্রামে পদার্পণ করেন নি। তিনি কাঁদতেন—গ্রামটির কথা মনে পড়লেই। "শেষ দশায় কলিকাতায় অবস্থানকালে যখন ক্ষুদ্র পল্লী বীরসিংহের গ্রাম্য চিত্রসকল তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত, তখন প্রাণটি দেহত্যাগ করিয়া ...বীরসিংহ অভিমুখে ছুটিত, তখন অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেন।... অশ্রুপাত করিয়া...দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, 'আর সব শেষ হইয়াছে'।"[৫৭]

বিদ্যাসাগরের জীবনকালে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ শম্ভুচন্দ্র করতে পারেন নি, কিন্তু নানা ব্যাপারে যে তিনি জ্যেষ্ঠের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন, তা বিদ্যাসাগরের দেহান্তপরে প্রকাশিত তাঁর রচনাদির মধ্যে দেখা যায়। সে সকলের মধ্যে আছে এক ধরনের নীরব প্রতিবাদ। ১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দের মধ্যে তাঁর লেখা দুই খণ্ডে 'চরিতমালা' প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে কেবল দেশীয় বিশিষ্ট মানুষদের জীবনকথাই বর্ণিত হয়েছিল—যেখানে বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী'-তে শুধু বিদেশীয় বিখ্যাতদের চরিতকথা। শম্ভুচন্দ্রের 'চরিতমালা' কি বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী'-র পরিপূরক, নাকি প্রতিবাদ? সবচেয়ে লক্ষণীয়—শম্ভুচন্দ্র কর্তৃক তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত রচনা। 'চরিতমালা'-র মধ্যে নিবেশিত তারানাথের জীবনকথাকে কিছু বাড়িয়ে তিনি পৃথক বইয়ের আকারে প্রকাশ করেন ১৩০০ বঙ্গাব্দেই।[৫৮] তারানাথের বিপুল পাণ্ডিত্য সমকালে স্বীকৃত, সে-বিষয়ে কৃষ্ণকমলের গুণগান আগেই লক্ষ্য করেছি—বিদ্যাসাগর কিন্তু বহুবিবাহসূত্রে তাঁর দুটি বেনামা পুস্তিকায় তারানাথকে বিষাক্ত আক্রমণ করেছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য পর্যন্ত ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয় হয়েছিল—এইসব কথা মনে রাখলে, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে শম্ভুচন্দ্রের তারানাথ-জীবনী বিস্ময়কর বৈকি। এর থেকে আরও বুঝতে পারি, বিদ্যাসাগরের জীবনকালে তাঁর পরিবারের অনেককে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে থাকতে হয়েছিল—অন্নদাসত্বের গ্লানির সঙ্গে। শম্ভুচন্দ্র ওই বই তখনই লিখেছিলেন যখন বিদ্যাসাগরের হাত থেকে মুষলপ্রহারের সম্ভাবনা ছিল না।

অন্নদাস শম্ভুচন্দ্র বাহ্যত বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পোষকতা করলেও, নারায়ণচন্দ্র বিধবাবিবাহ করার পরে, বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই নিজ পুত্রের বিয়ের সময়ে "তাঁহার ভাবী কুটুম্বের নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, জ্যেষ্ঠ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সামাজিক সংস্রব রাখেন না।"[৫৯]

পরিবারের মানুষগুলির প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিরূপতা কেন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে? তাঁরা সবাই অযোগ্য ছিলেন বলে? সাধারণ মাপে দীনবন্ধু বা

শম্ভুচন্দ্র তা ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের মহিমা তাঁরা স্বীকার করতেন, তাঁদের জন্য দাদার বিপুল স্নেহ ও ত্যাগের কথাও বারবার বলেছেন—তবু বিদ্যাসাগরের পাশে বা পিছনে চলতে চলতে তাঁরা উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়েছেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যে তাঁরা বিরাটত্বের পাশে সহমর্মিতার অভাব লক্ষ্য করেছেন। বিদ্যাসাগর অন্য মানুষকে বিচার করতেন নিজের দিক দিয়ে—তার দিক দিয়ে নয়। তেমন আপসহীন আদর্শবাদীকে দূর থেকে পূজা করা যায়, তাঁকে নিয়ে ঘর করা যায়না।

মর্মে মর্মে এই কথাটি বুঝেছিলেন পত্নী দিনময়ী। আট বছরের "অতি সুলক্ষণা ও দর্শনীয়া" এই "পাদুকা কন্যার" কোষ্ঠীর ফল উত্তম—"এই কন্যা যাহাকে দান করা হইবে, সর্বপ্রকারে তাঁহার অচলা লক্ষ্মী হইবে।"[৬০] দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অন্তে ৬২ বৎসর বয়সে দিনময়ী দেহত্যাগ করেন—তার আগে কয়েক বৎসর ধরে কঠিন সাবিত্রী ব্রত করেছেন। বিখ্যাত স্বামীর ছায়ায় তাঁর চিত্র আবৃত হলেও, এবং তিনি বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত পত্নী নন, এমন একটা ধারণা ইতস্তত বলবৎ থাকলেও, তিনি সামান্য নারী ছিলেন না। "দিনময়ী প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ন্যায় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। দানধ্যানেও তাঁহার পূর্ণ প্রবৃত্তি ছিল।"[৬১] দিনময়ী অতিরিক্ত সংস্কারের দাসত্বও করতেন না। 'ইন্ডিয়ান নেশনে'র সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন এন ঘোষ নামেই বেশি পরিচিত) বিদ্যাসাগরের কলেজের অধ্যাপক এবং তাঁর খুবই স্নেহভাজন, এমন যে, বিদ্যাসাগর এবং দিনময়ী নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। একবার নগেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ফিরে হাত-মুখ ধোওয়ার জলের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মা ও স্ত্রী দিনময়ীদেবীর সঙ্গে কথায় আটকে থাকায় বাড়ির পরিচারিকাকে জল আনতে বলেছেন, কিন্তু দাসী অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় জল আসছে না —তখন দিনময়ী উঠে এলেন হাতে জল দিতে। নগেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "একি মা, আপনি জল এনেছেন! আপনার আনা জলে আমি হাত-মুখ ধোব? আপনি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি আপনার দাসানুদাস—ও যে আমার পক্ষে বড় আস্পর্ধার কাজ হবে।" দিনময়ী স্নিগ্ধস্বরে বলেছিলেন, "বাছা, তুমি আমাকে মায়ের মতো দেখো। ছেলের সব কাজ তো মা-ই করবে। তুমি দ্বিধা করো না, আমাকে মায়ের কাজ করতে দাও।"[৬২]

এই মায়ের ভূমিকাতেই দিনময়ীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর সংঘর্ষ। অনেক কষ্টে পুত্র নারায়ণকে তিনি পেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন বিদ্যাসাগরের কোনো সন্তান হয়নি, তাঁর প্রায় ৩০ বছর বয়সে নারায়ণের জন্ম হয়। সন্তানের জন্য দিনময়ী অনেক ব্রত মানত করেছেন। চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "নারায়ণের ঔষধ সেবনে সন্তান হওয়ায় পুত্রের নারায়ণচন্দ্র নাম রাখা হইয়াছিল।"[৬৩] (পরে ক্রমান্বয়ে তাঁদের চারটি কন্যা হয়)। ওহেন পুত্রের প্রতি মায়ের স্নেহ অতিরিক্ত হয়ই। নারায়ণ বিধবাবিবাহ করেন। বিদ্যাসাগরের সন্দেহ ছিল—দিনময়ী এই বিয়ে অনুমোদন করবেন কিনা। সেজন্য কলকাতায় বিবাহানুষ্ঠানের

সময়ে তাঁকে খবর দেননি। কিন্তু দিনময়ী বিদ্যাসাগরের সংস্কারকাজের দ্বারা কিছু প্রভাবিত থাকায়, অথবা পুত্রের প্রতি বিশেষ স্নেহবশে—কলকাতায় এসে পুত্রবধূকে কোলে নিয়ে আনন্দাশ্রু মোচন করতে করতে বলেছিলেন, "বিবাহানুষ্ঠানে যোগদানের সুখে আমাকে বঞ্চিত করে তোদের কি লাভ হলো ? বউ নিয়ে তো আমাকেই ঘর করতে হবে।" তিনি পুত্রবধূর প্রতি শেষপর্যন্ত স্নেহরক্ষা করেছিলেন।[৬৪]

অথচ দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সর্ব কর্মে অনুগত সহায়ক বলে আত্মপরিচয়-দানকারী শম্ভুচন্দ্র, যিনি বিদ্যাসাগরের আত্মখণ্ডন দেখাবার উৎসাহে সামান্য কয়েক মাস আগে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাবিবাহে ইন্ধন জুগিয়াছেন, (মুচিরামের চিঠিতে তা স্পষ্ট)—তিনি নারায়ণের বিধবাবিবাহে আপত্তি জানালেন এই বলে, "নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব-মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার ত্যাগ করিবেন।" সেই আপত্তিতে অসাধারণ বিদ্যাসাগরীয় উত্তরের একাংশ এই : "আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি ; এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারীবিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ-বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।"

তার পরে ইস্পাতকঠিন কিছু কথা :

"...সে বিবেচনায় কুটুম্ব-বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব-মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহই হইত না।... আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।...আমার বক্তব্য এই যে, [আমার সঙ্গে] আহার-ব্যবহার করিতে যাহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ—অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে।"[৬৫]

বিদ্যাসাগরের একমাত্র চিন্তা ছিল দিনময়ী সম্বন্ধে, সেকথা তিনি নারায়ণকে বলেছিলেনও : "পুত্রের উপর পিতার অপেক্ষা মাতার অধিক অধিকার ; তোমার গর্ভধারিণী যদি তোমার এ-বিবাহে অমত করেন, তাহা হইলে আমি থাকিতে পারিব না।"[৬৬] সেই অমত করার সুযোগ না দিয়ে (?),

দিনময়ীর অনুপস্থিতিতে, কলকাতায় তিনি পুত্রের বিয়ে দিয়েছেন—এবং
যখন দিনময়ী স্নেহে ও আনন্দে পুত্রবধূকে গ্রহণ করেছিলেন, তখন জীবনের
এক খণ্ডকালে পারিবারিক সহমর্মিতার সুখনীড়ে বাস করেছেন। তারই
শক্তিতে বলেছেন, এই বিশেষ বিধবাবিবাহের কারণে কেবল তিনি নন,
নারায়ণও কুটুম্ব-বিচ্ছেদে পরাঙ্মুখ নন। কুটম্বের সঙ্গে আত্মীয়দেরও তিনি
মনে রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শম্ভুচন্দ্রও পড়তে পারেন। কিন্তু বুদ্ধিমান
শম্ভুচন্দ্র ব্যাপারটাকে তত দূরে গড়াতে দেননি। এবং তিনি অবশ্যই এমন
কৌশল জানতেন, যার দ্বারা পূর্বোক্ত মুচিরামের বিয়ের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ
ভূমিকা সত্ত্বেও (বিদ্যাসাগর কি তা ধরতে পেরেছিলেন ?), বিদ্যাসাগরের
অনুমোদনে সংসার চালনার আর্থিক কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। এই
ব্যাপারে দিনময়ী ও নারায়ণের সঙ্গে শম্ভুচন্দ্রের সংঘাত চলছিলই। সাংসারিক
ব্যাপারে আমাদের কোনো মূল্যই নেই—এই অভিমান ও ক্রোধ দিনময়ী ও
নারায়ণের মধ্যে জাগতে পারে। বিদ্যাসাগরকে লেখা শম্ভুচন্দ্রের অনুতপ্ত
চিঠির একাংশে তা দেখা যায়, "...যে দাদা আমার মানের জন্য স্ত্রীর সহিত
মনান্তর করিয়াছেন...।"৬৭ শম্ভুচন্দ্র প্রমুখই যে, নারায়ণের বিরুদ্ধে
বিদ্যাসাগরের মনকে বিরূপ করার ধারাবাহিক চেষ্টা করে গিয়েছেন, তা
নারায়ণচন্দ্র-প্রদত্ত কাগজপত্র দেখে চণ্ডীচরণের মনে হয়েছিল, এবং তা ইঙ্গিতে
বলেছেনও, "পুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত
রাখিতে অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন।"

পুত্র নিয়েই যে স্বামীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিশেষ মনান্তর, তা
বিহারীলাল খুলে বলেছেন। নারায়ণের অনেক দোষ দিল (কি কি দোষ, তা
অবশ্য ঠিকভাবে কোনো জীবনীকারই জানাতে পারেন নি), এবং যে
বিদ্যাসাগর এক সময়ে পুত্রের বিধবাবিবাহের কীর্তিতে গৌরববোধ করে
লিখেছেন, হাঁ নারায়ণ এইবার পিতার পুত্র বলে আত্মপরিচয় দেবার যোগ্যতা
অর্জন করেছে—সেই পুত্রকে তিনি মৃত্যুর ১৫ বছরেরও বেশি আগে, ১৮৭৫
সালের উইলে, ত্যাজ্যপুত্র করেন। উইলের কঠিনতম কথাগুলি এই : "আমার
পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী
ও কুপথগামী, এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব
ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি।"

এই ছিল দিনময়ীর জীবনের প্রধান দুঃখ-ক্ষত, যার থেকে অবিরাম বিন্দু
বিন্দু রক্ত ঝরেছে। বিহারীলাল সরকার স্পষ্ট করেই তা লিখেছেন :

"বর্জিত পুত্র নারায়ণের জন্য পতির সহিত তাঁহার অনেক সময় বাদ-
বিসংবাদ ঘটিত। এই বাদবিসংবাদই সদ্ভাব ত্রুটির মূল কারণ হইয়াছিল।
অনেক সময় তিনি গোপনে পুত্রকে অর্থসাহায্য করিতেন। এমন-কি নিজের
অলঙ্কার পর্যন্ত বন্ধক দিতেন। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত হইয়া
তাঁহাকে টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করিতেন। [দিনময়ীর] পিতা শত্রুঘ্ন যেমন
তেজস্বী ছিলেন, কন্যা দিনময়ীও তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট

একবার কোনো জিনিস চাহিয়া না পাইলে তিনি দুর্জয় অভিমানে অভিভূত হইতেন। তেজস্বী বিদ্যাসাগর তাহার জন্য বিচলিত হইতেন না। এইরূপে মনোবিবাদ ঘটিত।"[৬৮]

জানিনা এখানে কেন নারীর নিজস্ব অধিকারের প্রশ্ন ওঠেনি? উপার্জনকারী স্বামীই কেবল ব্যয়-ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করবেন—এই অলিখিত সিদ্ধান্ত তাহলে বিদ্যাসাগর-পরিবারে বলবৎ ছিলই !!

দিনময়ী ১৩ অগস্ট ১৮৮৮-তে রক্ত-আমাশয় রোগে মারা যান। মৃত্যুর সময়ে তিনি কপালে করাঘাত করছিলেন, ব্যাকুল হয়ে বলছিলেন, "কর্তাকে ডাকো, কর্তাকে ডাকো, ১০-১২ বছরের মনের দুঃখের কথা একবার বলে যাই।" জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদ্যাসাগরকে ডেকেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেন, "বুঝেছি, তাই হবে, সেজন্য ভাবতে হবে না।"[৬৯]

পত্নীশোক বিদ্যাসাগরকে গভীরভাবে বেজেছিল। "গার্হস্থ্য ব্যাপারে মতের অমিল হওয়ায় [তিনি যদিও] স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন, [ক্ষুদিরাম বসু লিখেছেন] কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অসুখের সময়ে যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন ও তাঁর মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর চতুর্থী শ্রাদ্ধের দিন আমরা গিয়ে তাঁর চেহারা দেখে বুঝলাম যে, তাঁর মনে বেশ আঘাত লেগেছে। খেতে বসে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কি রকম লাগছে, তিনি বললেন, রকম আর কি, ছাই ছাই লাগছে।" মানুষের জীবনে শোকের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিষাদময় এই আত্মবিদ্রূপও করেছিলেন, "দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে, কান্না যাবে, অন্ন খাবে অনায়াসে।"[৭০]

পত্নীর শেষ অনুরোধ তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কিছুকাল পুত্রকে সপরিবারে কলকাতায় ও ফরাসডাঙ্গায় কাছে এনে রাখেন, শেষ পীড়ার সময়ে নিকটে থেকে পরিচর্যা করতে অনুমতি দেন।[৭১] কিন্তু পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। নারায়ণ যে নানা ব্যাপারে ঘোর অপরাধী ছিলেন, তা পিতাকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকেই বোঝা যায়। চণ্ডীচরণকে তিনি যখন বিদ্যাসাগর-জীবনীর উপাদান সরবরাহ করেন তখন এই আত্মগৌরব রক্ষা করেছিলেন, "আমার কথা বলিতে গিয়া বাবার প্রতি যেন কোনও অবিচার করিবেন না। তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা করিতে যদি আমার হীনতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবেন না।"[৭২] বিদ্যাসাগরকে লেখা নারায়ণের যে-দুটি চিঠি চণ্ডীচরণ প্রকাশ করেছেন, সেগুলির মধ্যে আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্য বাকচাতুরী ছিল কিনা, এই প্রশ্ন সন্দিগ্ধ বুদ্ধি তুলতে পারে, কিন্তু বিদ্যাসাগর সেসব পড়ে যে কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন তাও সত্য। প্রকাশিত প্রথম পত্রে নারায়ণ বলেছিলেন, বাইরের দিক থেকে তখন তিনি উপায়ী, ও সুখী, কিন্তু অন্তরে অবিরাম কীটদংশন। "পূর্বকৃত পাপগুলি স্মরণ হইতেছে ও মন অনুতাপে বিকৃত হইতেছে ; কেবল মনে হইতেছে, হায়, যদি সে সকল পাপকার্য দ্বারা পিতৃচরণে অপরাধী না হইতাম।"

পিতৃপরিত্যক্ত বলে জনসমাজে তিনি হেয় হয়ে আছেন ; এর থেকেও বড় দুঃখ, বৃদ্ধ পিতা পীড়িত, তাঁর সেবা করতে পারছেন না ; তদুপরি বেদনা, "যদি পুত্রকে পা দিয়া ঠেলিয়া গেলেন, তবে পৌত্রটি জনসমাজে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে ?" তাঁর শেষ প্রার্থনা, "কুকুর যেমন অন্নমুষ্টি খাইয়া নিরন্তর প্রভুর চিত্তানুবর্তন করে, এ হতভাগাও কুকুরের অধম হইয়া প্রভুর পদতলে পড়িয়া থাকিবে।"৭৩

দ্বিতীয় পত্র নারায়ণ লিখেছেন মাতৃবিয়োগের পরে। পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হবার পরে মা-ই ছিলেন একমাত্র আশ্রয়। সেই মাকে হারিয়ে পৃথিবী যখন শূন্য, তখন পিতা কিছুটা সদয় হয়েছেন—এই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। "বহু-দিন অনাহারের পর উপাদেয় আহার পাইলে লোকের অন্তরে যেমন একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি জন্মে, ১৪ বৎসরের পর মহাশয়ের শ্রীমুখের বচনামৃত পান করিয়া হতভাগ্যের অন্তরাত্মা পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছে।…কেবল সেই সময় এই ভাবিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে যে, যদি এই কৃপাদৃষ্টি আমার দুঃখিনী মা দেখিতে পাইতেন তবে আমার জীবন সার্থক হইত। মা গো, একবার চাহিয়া দেখো মা, তোমার হতভাগা নারায়ণ পিতৃচরণে আশ্রয় পাইয়াছে।"৭৪

॥ ৯ ॥

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিজীবনের করুণতম দিকটি নারায়ণচন্দ্র তাঁর প্রথম চিঠিতে খুলে ধরেছিলেন। চিঠির যে-অংশে উপকৃত স্বজনবর্গের অকৃতজ্ঞতার কথা ছিল, চণ্ডীচরণ সে অংশ ছাপেন নি। তার পরে :

"…সুতরাং বহু পরিবার-পরিবৃত হইয়াও আপনি একাকী ; ছেলে, জামাই, ভাই—একজনও মনের মতো হইলে, তাহার উপর ভার ফেলিয়া, পীড়ার সময় দশ দিন নিভৃতভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন। যখন-যখন আপনার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক মুখ, ও ক্ষীণস্বরে কথা-কহা আমার মনে উদয় হয়, তাহার উপর সকল ঝঞ্ঝাট পোয়ানো মনে পড়ে, অথবা পীড়িত হইয়া একমাত্র চাকর সহায় লইয়া কর্মাটাড়ে যাওয়া মনে হয়, তখন ভাবি, এখনও কেন বাঁচিয়া আছি।"৭৫

১৮৮৮ সালে নারায়ণের এই চিঠি লেখার সময়ে, বিদ্যাসাগরের কাছে দুই-জনের কেউই নেই যাঁদের উত্তরীয় বা আঁচলের তলায় তিনি সান্ত্বনা ও শান্তির আশ্রয় খুঁজতে পারতেন। ১২ বছর আগে পিতা ঠাকুরদাসের (১২ এপ্রিল ১৮৭৬), তারও ৫ বছর আগে (১২ এপ্রিল ১৮৭১) মাতা ভগবতীদেবীর, দেহান্ত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের তীব্র দীপ্তি, এবং সেকালের পক্ষে আশ্চর্য সংস্কার-মুক্ত মাতা ভগবতীদেবীর আলোকিত মহিমার পাশে, তাঁর পিতা ঠাকুরদাস ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছেন, এমন ধারণা বিদ্যাসাগরের জীবনীগুলি পড়ে আমার মনে হয়েছে। আমার এ ধারণা ভুল হতে পারে। হয়ত অনেকেই ঠাকুরদাসকে সমুজ্জ্বল আকারেই পেয়েছেন। আমার দুঃখ, আমি তেমন করে পাই নি।

কিন্তু পেতে পারতাম, যদি তথ্যগুলিকে আগে নির্দিষ্টভাবে পর্যালোচনা করতাম।

ঠাকুরদাস সংসারজীবনের সাধারণ পোশাকের মধ্যে অসাধারণ একটি চরিত্রকে বহন করেছেন। সে অসাধারণত্ব বৈপ্লবিক অগ্নুদ্গারের নয়—তা সুদৃঢ় স্বাভাবিকত্বের। আর পাঁচজন সংসারীর মতো সংসারের দুঃখ-কষ্ট, দায়-দায়িত্ব, স্নেহ-প্রীতি, সবকিছু আস্বাদন করার কালেই কিভাবে মনকে মুক্ত রাখা যায়, এবং ঐতিহ্যগত জীবনের শ্রেয় লক্ষ্যের দিকে তাকে এগিয়ে দেওয়া যায়—তার প্রতীক-দৃষ্টান্ত ঠাকুরদাসের জীবন।

১৪-১৫ বছরের একটি ছেলে একদা গ্রামের পরিচিত ভূমি ছেড়ে একলা বেরিয়ে পড়েছিল অপরিচিত শহরের উদ্দেশে—অর্ধাহারী বা অনাহারী মা ও ভাইবোনদের অন্নসংস্থানের জন্য। তারপর শুরু হয়েছিল তার দারুণ কষ্টের লড়াই—পথে-ঘাটে শুয়ে, কিছু খেয়ে বা না-খেয়ে। এই কষ্টের জীবন অভিনব কিছু নয় এই দেশে—কত ছেলেই তো এইভাবে পথে পথে ঘুরছে। আসল কথাটা হলো, ঠাকুরদাস-নামক কিশোর-বালকটি উপার্জন করতে চাইছিল নিজের জন্য নয়, ক্ষুধাক্লিষ্ট মা ও ভাইবোনদের জন্য। যখন সে অতি সামান্য টাকার চাকরি পেল—তখন সেই সামান্যের অতি সামান্য অংশ নিজের জন্য রেখে, বাকি অংশ পাঠিয়ে দিতে লাগল গ্রামে—নিজের পরিবারবর্গের কাছে। অবস্থার কিছু উন্নতি হলে (মাইনে ৮-১০ টাকা পর্যন্ত নাকি উঠেছিল), পিতার নির্বন্ধে তিনি বিয়ে করলেন, ছেলেপুলে হলো—সেই ছেলেদের ক্রমে শহরে এনে রাখলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্য। বড় ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রের মেধায় তিনি খুশি হয়েছিলেন। নিজে যদিও গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে 'ইঙ্গরেজী' শিখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল, ঈশ্বর ভালো করে এদেশীয় বিদ্যার রত্নাগার সংস্কৃতের অধীশ্বর হোক—গ্রামে গিয়ে টোল খুলে ছাত্র পড়াক। তিনি একটি বিলীয়মান স্বপ্নকে লালন করবার দুশ্চেষ্টাও করেছেন—ওই টোলে অধ্যাপকের গৃহে বাস করে, তাঁরই অন্নে পালিত হয়ে, ছাত্ররা বিদ্যাশিক্ষা করবে। সেজন্য ঈশ্বরচন্দ্রের বৃত্তির টাকায় গ্রামে কিছু-কিছু জমিও কিনেছিলেন। পরে হয়ত ওই স্বপ্ন সার্থক হবার সম্ভাবনা নেই দেখে পুত্রকে বৃত্তির টাকায় সংস্কৃত পুঁথি কিনতে নির্দেশ দেন। পুত্রের শিক্ষাপর্বে কিন্তু তিনি 'বাঁধ ভেঙে দাও' পিতৃস্নেহের বন্যা ছোটান নি। দাঁতে দাঁত দিয়ে যাঁকে খালি পেটে লড়াই করতে হয়, তাঁর পক্ষে হৃদয়ের বিলাসচর্চায় উৎসাহ বোধ করা সম্ভব নয়। সারাদিনের খাটুনির পরে রাত্রে ঘরে ফিরে যখন দেখতেন, প্রদীপ জ্বালিয়ে তার সামনে বই খোলা রেখে, ঈশ্বর ঘুমোচ্ছে, তখন তাকে মাত্রাছাড়া নিষ্ঠুর প্রহার করতেন—ঈশ্বরচন্দ্রের ঘুম এবং প্রদীপের তেলের দাম, এই দুই অপব্যয়ের জন্য। সেটাই কিন্তু শেষ কথা ছিলনা। যথেষ্ট শিক্ষিত না হলেও তিনি পুত্রের পড়ায় যোগ দিতেন, জিজ্ঞাসাবাদ করে নানা বিদ্যার অংশ নিজের কানে তুলে নিতেন। (রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের ঘণ্টা দুই-তিন ঘুম, তারপর জাগরণ ও পাঠাভ্যাস ; তারপর ঠাকুরদাসের

অনুরূপ ঘুম ; শেষে ভোররাত্রে উভয়ের বিদ্যাচর্চা—এই ছিল কিছু সময়ের রুটিন)। ঈশ্বরচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগর হলেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠা ঘটল, তখন তিনি চাইলেন, তাঁর পিতা চাকরি ত্যাগ করুন।—না, তা করব কেন? এখনো আমার কর্মক্ষমতা আছে, এখনি পুত্র-অন্নের উপর বৃহৎ পরিবার নিয়ে নির্ভর করার দরকার কী (ঠাকুরদাসের সাত পুত্র, তিন কন্যা, অনেকেই জীবিত এবং পুত্রদের কেউ কেউ বিবাহিত, তাছাড়া ঘাড়ে পড়েছে এমন মানুষ তো আছেই)—এইসব ভেবে ঠাকুরদাস আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুত্র যখন নিজ দাবিতে নাছোড় হলেন তখন তিনি—আমি কদাপি অপরের গলগ্রহ হইব না—এই ধরনের দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞা করে বসেন নি—পিতা গোড়ায় পালন করবেন পুত্রকে, পুত্রও শেষে পালন করবে পিতা-মাতাকে—এই তো স্বাভাবিক রীতি। ঠাকুরদাস কর্মত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তাঁর মনিব এতদিন ঠাকুরদাসের কর্মনৈপুণ্য ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বোঝাতে চাইলেন—"ছেলেমানুষের কথায় কাজ ছেড়ে দিয়ে তার পরাধীন হওয়া তোমার উচিত নয় ; যখন তুমি অসমর্থ হয়ে পড়বে তখন ওই ছেলে যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সাহায্য না করে তখন তো আর চাকরিতে ফেরা যাবে না", ইত্যাদি। আহত গৌরবের সঙ্গে ঠাকুরদাসের সমুন্নত উত্তর : "আমার পুত্র সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মশীল, আমায় দেবতা-জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তার কথা আমি অবহেলা করতে পারব না। যদি তাকে অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র জানতাম, তাহলে কখনই কর্মত্যাগ করতাম না।"[৭৬]

তিনি গ্রামে বাস করতে লাগলেন, নিজের মর্যাদা, পুত্রের গৌরব, এবং সাংসারিক দায় নিয়ে। এরই শক্তিতে কিভাবে তিনি গ্রামের রাজাধিরাজ দারোগাকে বাড়িতে ডাকাতির পরে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিলেন, সে-কাহিনী আগে জেনেছি। বিদ্যাসাগর পিতার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন। টোল করতে পারেন নি, কিন্তু বিদ্যালয় করে দিয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও ছাত্রাদি মিলিয়ে ৬০-৭০ জনের আহারের আয়োজন হতো বাড়িতে। বাজার-হাট ঠাকুরদাসই করতেন। "আমি বাল্যকালে বিলক্ষণ অন্নকষ্টে থেকেছি, অতএব অন্নদানই সর্বপ্রধান কর্ম," তিনি বলতেন।[৭৭] বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের সর্ববৃহৎ সংকটাকীর্ণ সংস্কারকাজ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এখানেও ঠাকুরদাস মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। শম্ভুচন্দ্র এ-বিষয়ে তাঁর আগ্রহী সমর্থনের কথা বললেও অন্য ঐতিহাসিকরা ঠিক তেমন বলেন নি, মায়ের সমর্থনের কথাই অধিক উচ্চারিত—কিন্তু ঠাকুরদাস নির্দিষ্টভাবে বিরোধী ছিলেন না। থাকলে তিনি সেকথা গোপন রাখার মতো মানুষ ছিলেন না, এবং বিদ্যাসাগর পুরো মন নিয়ে ঝাঁপ দিতেও পারতেন না। ঠাকুরদাসের আসল চরিত্রকে প্রকাশ করেছে তাঁর এই উক্তিগুলি —"নেমে পড়ার আগে ভালো করে শাস্ত্রবিচার করে নেবে ; যদি উপযুক্ত সমর্থন পাও এগোবে ; আর, একবার শুরু করলে কিছুতে পেছিয়ে আসবে না, আমি বারণ করলেও নয়।" বিধবাবিবাহের কারণে যখন চতুর্দিকে

বিদ্যাসাগরের বাপান্ত হচ্ছিল তখন ঠাকুরদাসের সকৌতুক উক্তি পুনশ্চ স্মরণ করতে পারি, "ঈশ্বর, তোমাকে আর পিতৃশ্রাদ্ধ করতে হবে না—চারিদিকে আগেভাগেই তা হয়ে যাচ্ছে।" গ্রামেও ঠাকুরদাসের ব্যক্ত বা গুপ্ত, নানাধরনের লাঞ্ছনা হয়েছে। সেসব নিয়ে তিনি ঢাক পেটান নি। এই তো স্বাভাবিক, মূল্য না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না—তাঁর মনোভাব ছিল। নিজের প্রতিপত্তির কোনো সুযোগ তিনি নেন নি। (কিন্তু শহরবাসী ছেলের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য শ্রীমন্ত সর্দারকে তিনি পাঠিয়েছিলেন)। বিদ্যাসাগরের অনুগত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন—তিনি কলকাতায় থাকাকালে বিদ্যাসাগরের মুখে তাঁর পিতার উপরে গ্রাম্য উৎপীড়নের কথা শুনেছিলেন—বীরসিংহ গ্রামে গিয়ে ঠাকুরদাসকে বলেন, "দেখুন, শুনেছি আপনার উপর অনেকে অত্যাচার করে, তাদের নামগুলি আমাকে দিন, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করব।" ঠাকুরদাস বলেছিলেন, "আরে, ঈশ্বর থাকে কলকাতায়, কার মুখে কী শুনেছে, আর তোমাকে বলেছে। তার উপর নির্ভর করে এখানকার লোকদের তুমি কিছু বলো না। আমি বেশ সদ্ভাবেই আছি।" হাকিম চলে যাবার পরে ঠাকুরদাস উপদ্রবকারীদের কাছে খবর পাঠালেন—"হাকিম তোমাদের নাম চেয়েছে, আমি বলেছি, আমরা সদ্ভাবেই আছি, তোমাদের নাম দিইনি। তোমরা একটা কাজ করবে—হাকিম আমাদের বাড়িতে এলে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে যাবে, তাহলে আর কোনো গোলমাল থাকবে না।"[৭৮] চণ্ডীচরণ বলেছেন, "এরূপ লোক দুর্লভ।" আমরা সে কথার সমর্থন করে, যোগ করব—সমাজের পাদপ্রদীপের নীচে অবস্থিত এইসব নিঃশব্দ মানুষই সমাজকে ধারণ করে থাকেন।

একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা তিনি, দায়দায়িত্ব নিয়ে মোটামুটি সুখেই ছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র ঈশান ও নাতি নারায়ণের স্নেহের জালে জড়িয়েছিলেন, তাঁর অতিরিক্ত প্রশ্রয় তারা পাচ্ছিল, বিদ্যাসাগরের সেটা ভালো লাগছিল না, পরিহাসে মোড়া এই তিরস্কারটি তিনি পিতাকে করেছিলেন:

"বাবা, আপনি নাকি নিরামিষাশী? কে বলে নিরামিষাশী? দু'বেলা দুটি কাঁচা মাথা খাচ্ছেন।"[৭৯]

কিন্তু স্থায়ী সুখ বলে কিছু নেই। বিদ্যাসাগরের পারিবারিক গণ্ডগোল বাড়ছিল। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—এই কান্নার পাত্র নন ঠাকুরদাস। জীবনে প্রাপ্তির সঙ্গে অপ্রাপ্তিকে মেনে নিতে হয়। তাছাড়া ব্রাহ্মণ-বংশের রক্তের মধ্যে বানপ্রস্থ বলে একটা ব্যাপার আছে। পরিণত বয়সে সংসার-ত্যাগ ও কাশীবাস—এই তো সদ্‌গৃহস্থের জীবনশেষের স্বাভাবিক কামনা। তবু আটকে দিলেন, কিন্তু মায়াবন্ধনের উপর নামল এক স্বপ্নের মোহমুদ্গর। তিনি স্বপ্নে দেখলেন (অগ্রহায়ণ ১২৭২), "শীঘ্রই তোমার বাসভূমি শ্মশান হবে।" আশঙ্কিত ঠাকুরদাস বিখ্যাত গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে কোষ্ঠীর ফল গণনা করিয়ে দুঃস্বপ্নের পুরো সমর্থন পেলেন: শীঘ্রই বিদ্যাসাগরের

শনির দশা আরম্ভ হবে ; তাঁর আত্মবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হবে ; তিনি দেশত্যাগী হবেন ; একটুও সুখী হবেন না ; কোথাও স্থিতি করতে পারবেন না, ইত্যাদি।[৮০] এই স্বপ্ন-তথ্য ও কোষ্ঠী-তথ্য, শম্ভুচন্দ্র দিয়েছেন। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দায় পাঠকের। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, স্বপ্ন বা না-স্বপ্ন, কোষ্ঠী বা না-কোষ্ঠী—গৃহশ্মশানের দাহগন্ধ অল্পস্বল্প ঠাকুরদাস পেতে শুরু করেছিলেন। তিনি জানতেন, বুক পেতে দিলেও অনিবার্যকে নিবারণ করা যায় না। মানুষের পক্ষে বিশেষ বয়সে সংসারকে পথ ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গল। ঠাকুরদাস কাশীবাসের সংকল্প করলেন। আতঙ্কিত বিদ্যাসাগর পিতাকে থামাতে চাইলেন। আকুলভাবে পিতাকে চিঠি লিখলেন : "এই বয়সে কোথায় যাবেন আপনি ? পুত্র পৌত্রাদি নিয়ে আপনার সাজানো সংসার, তাকে ফেলে একলা যেতে চাইছেন কাশীতে, সেখানে নিজের হাতে সব কাজ করতে হবে, এ সহ্য করব কি করে ?"[৮১] বীরসিংহে উপনীত হয়ে, পিতাকে প্রশ্ন করলেন, "বলুন, কেন আপনি কাশী যেতে চাইছেন ? যদি পুণ্যার্থে যান, কিংবা সংসারবৈরাগ্যে যান, তাহলে কথা নেই ; কিন্তু যদি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সংসার চালাবার টাকা পাচ্ছেন না বলে কাশী যেতে চান, তাহলে আমি উপযুক্ত টাকার বন্দোবস্ত করে দেব।" ঠাকুরদাস স্পষ্টই বলেন, পুণ্যার্থেই তিনি কাশী যেতে চান। বিফল হয়ে বিদ্যাসাগর নারায়ণচন্দ্রকে বললেন, "দ্যাখ, তুই যদি ঠাকুর্দাকে আটকাতে পারিস।" নয়নমণি নারায়ণের কথায় ঠাকুরদাস একটু নরম হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাজে বাগড়া দিতে সদাই প্রস্তুত তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র, চড়া গলায় পিতাকে বললেন, "আপনার আর কোনো মতে সংসারীভাবে থাকা ভালো নয়, আপনার কাশীতে গিয়ে থাকাই উচিত।"[৮২]

ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থাপনায় কাশী গেলেন ১৮৬৫ সালের শেষের দিকে। সেখানে এগারো বছর বাস করার পরে ১৮৭৬-এর ১২ এপ্রিল কাশীতেই তাঁর দেহান্ত হয়।

কাশীতে যাবার কয়েক বছর পরে (১৮৬৯-এর মাঝামাঝি) তিনি গৃহদাহে নিজের বাড়ি ভস্মীভূত হবার কথা শুনেছেন। পুত্রদের বিরোধের কথা তাঁর কানে পৌঁছেছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের বৈরাগ্যসূচক ব্যথাবিদ্ধ পত্র তিনি পেয়েছিলেন। পুত্রের যন্ত্রণা পিতার বুকে কম বাজেনি। কিন্তু তিনি নিজ স্বভাবে হৃদয়বাহুল্যকে সীমা ছাড়াতে দিতেন না। পুত্রের বৈরাগ্যকে তিনি খাঁটি বৈরাগ্য বলে মনে করেন নি। দুষ্ট মানুষদের হাতে মার-খাওয়ার ফলরূপী ওই বৈরাগ্যের আসল চেহারা তিনি খুলে ধরেছিলেন প্রত্যুত্তর-পত্রে : "তুমি যে চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাও, এ অতি অনুচিত। আর তুমি যে এমন সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করো, সে কেবল আমার মনে বেদনা জন্মানো মাত্র।" তার উত্তরে বিদ্যাসাগর অধিকতর বেদনাপূর্ণ পত্রে জানান, তাঁর ইচ্ছা ছিল, জনক ও জননীর জীবনকাল পর্যন্ত সংসারে থাকবেন, "কিন্তু উত্তরোত্তর সকলেই আমার উপর এত নির্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকল পক্ষ হইতেই এত অত্যাচার হইতে লাগিল যে, আমার ক্ষমতায় আর সে-সকল সহ্য

করিয়া কালহরণ করা হইয়া উঠিল না।"[৮৩] শেষ পর্যন্ত বহুদর্শী ঠাকুরদাসের কথাই ঠিক হয়েছিল, বিদ্যাসাগর "সংসারযাত্রায় বিসর্জন" দিতে পারেন নি। পিতাও নিজ সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কাশীতে তিনি স্থায়ী সঙ্গিনী হিসাবে পত্নীকে পান নি। ভগবতীদেবী কাশীবাস করা অপেক্ষা বীরসিংহ গ্রামে থেকে পরিবার-সংসার ও গ্রাম-সংসার দেখাশোনা করাকেই নিজ কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। কাশীতে একবার স্বামীর কাছে উপনীত হয়ে তিনি এই অনুযোগ করেন, "আয়ু অনেকখানি অবশিষ্ট থাকতেই তোমার পক্ষে কাশীবাস করা উচিত হয়নি, এতে অনেকদিন ধরে তোমাকে কায়িক কষ্ট পেতে হবে।" এই আশ্বাসও দিয়েছিলেন, "আমার কষ্টের পরিমাণ কিন্তু কম হবে, কারণ আমি তোমার কাছে এই কাশীতে এসে তোমার আগেই দেহত্যাগ করব।"[৮৪] সে প্রতিশ্রুতি ভগবতীদেবী রক্ষা করেন। ১২৭৭ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বিসূচিকা রোগে ভগবতীদেবী কাশীতে দেহত্যাগ করেছিলেন। "তিনি পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আত্মীয়-স্বজন—চারিদিক পরিপূর্ণ ও সুপ্রসন্ন দেখিয়া, কর্তার নিকট পদধূলি চাহিতে-চাহিতে ও সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে লোকলীলা সংবরণ করেন।" দীর্ঘ দিনের জীবনসঙ্গিনী বিদায় নিচ্ছেন, বেদনার অন্ত নেই, তবু কঠিন শক্তিতে আত্মসংবরণ করে ঠাকুরদাস বলেছিলেন, "তোমায় আমি আর কি আশীর্বাদ করব, তুমি পুণ্যবতী স্ত্রী, আপনার পুণ্যে আপনিই আগে চললে, তোমারই জিত হলো।"[৮৫] ঠাকুরদাস আরও পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন, ওই কালে তাঁর পুত্ররা তাঁর কাছে মাঝে মাঝে গেছেন, কিন্তু তিনি যথাসম্ভব নিজের ভার নিজেই বয়েছেন। কাশীতে 'পুণ্যার্থ' গেছেন, তাই "প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিবস কেদারঘাটে জপতপ সমাপনান্তে, দেবালয় পর্যবেক্ষণ-পূর্বক, সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আগমন করিয়া, পাকাদি-কার্য সম্পন্ন করিতেন।"[৮৬] গোড়ার দিকে বাঙালীটোলায় পুরোহিত মাতঙ্গীপদ ভট্টাচার্যের বাড়ির অতি জঘন্য এক ঘরে থাকতেন ; তাঁর উদাসীনতার জন্য তাঁর জিনিসপত্র উক্ত পুরোহিত ও তাঁর পত্নী আত্মসাৎ করতেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে, বিদ্যাসাগর উপস্থিত হয়ে বাসাবদলের ব্যবস্থা করেন। তাতে লোভী বাড়িওয়ালা মুঠোর জিনিস ফসকে যায় দেখে বিদ্যাসাগরাদির নামে যথেষ্ট নিন্দা ক'রে, ("তোমার পুত্রগণ নাস্তিক" ইত্যাদি) তাদের সংস্পর্শে না থাকার হিতোপদেশ দান করেন। ঠাকুরদাস সেসব কথায় কর্ণপাত করেন নি। মাতঙ্গীপদ-জাতীয় বাঙালী ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে তাঁর এত বিতৃষ্ণা জন্মেছিল যে, মহারাষ্ট্রীয় ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদেরই সেবা-পূজা করতে থাকেন, কেননা তাঁরা যথার্থই শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারী। কাশীতে থাকাকালে নিশ্চয়ই তিনি নিজের পুরো মর্মচ্ছেদন করতে পারেন নি। ছোট ছেলে ঈশান সংসারের দায়-দায়িত্ব না নিয়ে উড়নচণ্ডী হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সে-বিষয়ে মনের কষ্টের কথা তিনি তাঁর "ধর্মশীল, সত্যপরায়ণ, পিতৃভক্তি-পরায়ণ" জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন। সংসারে অশান্তির সংবাদে তিনি কাশীর বানপ্রস্থ জীবনেও বিচলিত হতেন, কিন্তু কখনই জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে তাঁর আস্থা বিচলিত হয়নি।

কেবল স্নেহ নয়, তাঁর মনে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গৌরববোধ ও শ্রদ্ধাও ছিল। দীনবন্ধু কুম্ভকারকে সঙ্গী করে তিনি এক বৎসর ধরে পশ্চিমভারতে তীর্থ-পর্যটন করেন (অনেকটাই পদব্রজে করতে হয়েছিল), তার মধ্যে পুষ্কর-তীর্থ থেকে বিদ্যাসাগরকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "তুমি আমার বংশে রামাবতার ; তোমার পিতা বলিয়া এ-প্রদেশের সকল স্থানের লোকই আমাকে সমাদর করিয়া থাকেন ; অথচ তুমি কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, মথুরা, বৃন্দাবন, জ্বালামুখী, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থে কখনও আগমন করো নাই। তোমার শব্দপরিচয়ে আমি সকলের নিকট পরিচিত হইতেছি ?"[৮৭] সন্ধ্যাদি করেনা, পুজা করেনা, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যেতে গররাজি, ঈশ্বরবিশ্বাস আছে কিনা সন্দেহজনক, এমন পুত্র সম্বন্ধে—বহু বৎসর ধরে কাশীবাসী, নিত্য জপ-তপে ও মন্দিরে প্রণাম নিবেদনে রত, শাস্ত্রবিশ্বাসী পিতার অন্তিম ইচ্ছা আমাদের চমৎকৃত করে, এবং একথা বুঝতে সাহায্য করে—ঐতিহ্যবাদী ও ঐতিহ্যবাহী কিছু মানুষ একই সঙ্গে কিভাবে অসার সংস্কার ছেদন করতে পারেন।

শম্ভুচন্দ্র সংবাদ দিয়েছেন—ঠাকুরদাস একটি অন্তিম ইচ্ছাপত্র রচনা করে বিদ্যাসাগরের হাতে অর্পণ করেছিলেন :

"আমার অন্তিম সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র নিকটে থাকিবে, ও দাহাদিকার্য সম্পন্ন করিয়া, কাশীতেই আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে। আমি যে-সকল মহারাষ্ট্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতাম, তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। তৎপরে স্বয়ং গয়ায় যাইয়া গয়াকৃত্য সমাধা করিবে।"[৮৮]

'নাস্তিক' পুত্রের হাতে আস্তিক পিতা তাঁর মরণান্ত দেহটি পর্যন্ত সমর্পণ করার ইচ্ছা জানিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতীদেবীর চরিত্র জাতীয় সম্পদ, এবং বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি কিংবদন্তী। ঐ মাতা-পুত্রের সম্পর্কের কথা বাঙালী পাঠকের এতই জানা যে, বেশি বলার দরকার নেই। বিদ্যাসাগর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য লেখাটির অনেকখানি অংশে ভগবতী-চরিতকথা। মাতার কথায় বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে অগ্রসর হন, শম্ভুচন্দ্রের এই বক্তব্য বিতর্কাধীন হলেও, ভগবতীদেবী যে সর্বান্তঃকরণে পুত্রের ওই প্রয়াসকে সমর্থন করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। পুনর্বিবাহিত ব্রাহ্মণ বালবিধবাদের সঙ্গে যখন অন্যে অন্নগ্রহণে সংকুচিত, তখন তিনি তাদের নিয়ে একপাতে খেয়েছেন।[৮৯] বীরসিংহ গ্রামে সর্বশ্রেণীর দরিদ্র মানুষের ঘরে গিয়ে তিনি তাদের অভাবপূরণের চেষ্টা করতেন, সম্ভাব্য অতিথিদের জন্য অন্ন প্রস্তুত করে তিনি অপেক্ষা করে থাকতেন, পুজোর ধুমধামে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা দীনদুঃখীকে অন্নবস্ত্র দেওয়াকে শ্রেয়তর কাজ মনে করতেন, সাদামাঠা মোটা কাপড় পরেই জীবন কাটিয়েছেন, নিয়মিত চরকা কাটতেন, অলঙ্কার পরা পছন্দ করতেন না, যে-তিন অলঙ্কার তিনি পুত্রের কাছে চেয়েছিলেন সেগুলি

হলো—দাতব্য বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, এবং দরিদ্র ছাত্রদের বাসস্থান। এমন কত ঘটনাই আছে। তাঁর সংস্কারমুক্ত বিশ্বজনীন মনের কথাচিত্র পাই ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার হ্যারিসন-সাহেবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে, সামনে বসিয়ে, নিজের রাঁধা খাদ্যাদি খাওয়ানোর মধ্যে। সাহেব যখন তাঁর সম্পদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন গরবিণী মাতার স্মরণীয় উক্তি, পুত্রদের দেখিয়ে যা বলেছিলেন—"কেন, আমার চার ঘড়া ধন।" বিদ্যাসাগরের অনুরোধে তিনি হডসন সাহেবের স্টুডিওতেও গেছেন (মতান্তরে পাইকপাড়ার রাজবাটীতে) পোর্ট্রেট আঁকার সিটিং দিতে। যে-ছবি আঁকা হয়েছিল, তার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিখ্যাত। ইন্দ্র মিত্র অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে ২৮ মার্চ ১৮৬৮ তারিখের যে-মন্তব্য উৎকলন করেছেন, তার মধ্যেও বিদ্যাসাগর-জননীর ছবি যে, বাঙালী সতী-মাতার প্রতীকচিত্র হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে সানন্দ ঘোষণা আছে: "পাঠকগণ, আপনারা কি বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে গিয়াছেন? সেই গৃহের উত্তরদিকে যে-একটি স্ত্রীলোকের ছবি টাঙানো আছে, সেইটি বিদ্যাসাগরের মাতার ছবি। এই রত্নগর্ভধারিণীর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬০-৬১ বৎসর হইবেক। ইনি গৌরাঙ্গী, বার-চৌদ্দ আনা মূল্যের একখান কস্তা-পেড়ে সাটী পরা, অলঙ্কারের মধ্যে কেবল হস্তেতে শাঁখা আছে। কিন্তু যদি কোনও চিত্রকর নির্দোষিতা, লজ্জা ও হিন্দু সতীর ছবি চিত্র করিতে ইচ্ছা করে, তবে ওই পটের অবিকল নকল করিলে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই।"[৭০]

বিদ্যাসাগর তাঁর পিতার ছবিও আঁকিয়েছিলেন। পিতা ও মাতার ছবি না দেখে প্রাতে জলগ্রহণ করতেন না! জীবনের একেবারে শেষ অবস্থায়, যখন "বাকশূন্য অচেতন", তখন "কি এক মন্ত্রপ্রভাবে" সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরে গিয়ে মায়ের ছবির দিকে নিস্পন্দনয়নে তাকিয়ে "অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জন" করেছিলেন—সে সংবাদ বিহারীলালের গ্রন্থ থেকে আগেই সংকলন করেছি।

মায়ের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের অসংবরণীয় শোক, ও বেশ কিছুদিনের কৃচ্ছ্রসাধনার কথা বলাই বাহুল্য। সে শোক কখনই নিবৃত্ত হয়নি। হয়তো স্তম্ভিত থেকেছে, সামান্য বাতাসেই যা উত্তাল। মাতার দেহান্তের পরে অনেকগুলি বছর কেটেছে; বিদ্যাসাগর তখন নিতান্ত অসুস্থ; চণ্ডীচরণ দেখা করতে গেছেন, কথাপ্রসঙ্গে ভগবতীদেবীর গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন; অমনি শিশুর মতো বিদ্যাসাগরের আকুল কান্না। চণ্ডীচরণ অপ্রস্তুত: "আপনি এত কষ্ট পাবেন জানলে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতামই না।" বিদ্যাসাগর কাতরস্বরে বলেছেন, "তুমি আমাকে কষ্ট দিলে কোথায়? তুমি তো যথার্থ বন্ধুর কাজ করলে। তোমার জন্যই তো এখন আমার মায়ের কথা মনে পড়ল, মায়ের নামে দু'ফোঁটা চোখের জল পড়ল।"[৭১]

এমন মায়ের সঙ্গেও বিদ্যাসাগর বিচ্ছিন্ন ছিলেন বছরের পর বছর—এবং তা তাঁর নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই হয়েছিল। ১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর গ্রাম

ত্যাগ করে আসেন, ১৮৭১ সালের ১২ এপ্রিল কাশীতে ভগবতীদেবী লোকান্তরিত হন। তাঁর মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। গ্রামত্যাগের পরে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ বোধহয় কেবল একবার কাশীতেই হয়েছিল। মা থেকে গিয়েছিলেন গ্রামে। মাতৃদর্শনের জন্য বিদ্যাসাগরের সমস্ত আকুলতার সামনে দুর্জয় অভিমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল —না, তিনি কোনোমতে গ্রামে ফিরে যাবেন না।

॥ ১০ ॥

না, তিনি কারও দান নেবেন না। ঋণ নিতে পারেন, তবে তা শোধ করবেন কড়া ক্রান্তিতে। বিধবাবিবাহ দিতে তাঁর প্রচুর ধার হয়েছিল। বন্ধুদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্য অবশ্য নিয়েছিলেন, তার পরিমাণ বেশি ছিল না। মূল বোঝা নিজেই বয়েছেন। আর···সেই বোঝার নীচে অপর কোনো মানুষকে কাঁধ পাততে দেবেন না। অহঙ্কারী? অবশ্যই। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক তাঁর বন্ধু প্যারীচরণ সরকার। সেই কাগজে একবার বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করার জন্য সাহায্যের আবেদন বেরুল। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি কাগজেও তাই। মুহূর্তে জ্বলে উঠলেন বিদ্যাসাগর। শীতল কঠিন ভাষায় সংবাদপত্রে লিখলেন: মহদাশয় ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলে নিজেরা বিধবাবিবাহ ফান্ড তৈরি করতে পারেন, কিন্তু আমার ধার শোধ করবার জন্য তাঁদের ব্যস্ত হতে হবে না। এটার সঙ্গে আমার ব্যক্তি-মর্যাদার সম্পর্ক। তাকে ক্ষুণ্ন হতে দিতে পারি না, ইত্যাদি। এই সঙ্গে তিক্তভাষায় জানিয়েও দিয়েছিলেন, কেন তাঁকে অত বেশি ঋণ করতে হয়েছে। প্রথম বিয়ের আয়োজনে ১০ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। "কিন্তু অতিব্যয়ের শুদ্ধ ইহাই কারণ নহে। মফঃস্বলে যাঁহারা এ সংস্কারের জন্য—বিধবাবিবাহের জন্য—চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নানারূপ অন্য বিপদে পড়িতে হইতেছে; আহত প্রহৃত হইতে হইতেছে; কোথাও-কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামাদিতেও লিপ্ত হইতে হইতেছে—ইহার প্রতিবিধান আদালত হইতেই করিতে হইতেছে। বলাবাহুল্য এ-কার্য কখনই অনল্প-ব্যয়সাধ্য নহে।"[৯২]

কারো সাহায্য নেব না, একলা পথে চলব—সত্যই বন্দনীয় অহঙ্কার! তবু কান্না কেন? কেন ফেনিয়ে-ওঠা অভিমান ও অভিযোগ? কেন বিশ্বাস-ঘাতকতা নিয়ে 'অপূর্ব ইতিহাস' গ্রন্থ রচনা—মৃত্যুর পাঁচ-ছয় বৎসর আগে—১৮৮৫ সালের শেষাংশে? আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রস্তুত এই পুস্তিকাটিকে—'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ড বলা যায়। এর পরিশিষ্টে ৬টি সংস্কৃত শ্লোকের গদ্যে ও পদ্যে অনুবাদ আছে। ডঃ সুকুমার সেন একটি মূল শ্লোক এবং তার পদ্যানুবাদ উৎকলন করেছেন: "পরিতোষয়িতা ন কশ্চন স্বগতো যস্য গুণোহস্তি দেহিনঃ। / পরদোষকথা-ভিরল্পকঃ স্বজনং তোষয়িতুং স ইচ্ছতি।" "নাহি হেন কোনো গুণ নিজের

যাহার / জনময়ে পরিতোষ যাহে সবাকার / সেই নীচ করি পরদোষের কীর্তন / স্বজনে তুষিতে সদা করে অকিঞ্চন।"৯৩

একদিকে ক্ষোভের জালা, অন্যদিকে সহনের যন্ত্রণা—একের পর এক মৃত্যু দর্শনের। বহু বৎসর আগে চতুর্থ ভাই হরচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল। সেই প্রতিভাবান ভাইটিকে বড় ভালবাসতেন, তার উপর অনেক আশাভরসা রাখতেন—তার মৃত্যুশোক ভুলতে পারেন নি। মাতা চলে গেলেন, পিতা চলে গেলেন—তাঁর সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরী ও বিশ্বেশ্বর। যে-পত্নীকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন, যাঁর কাছ থেকে দুঃখও পেয়েছেন, অথচ পাকে-পাকে যিনি মনে ও জীবনে জড়িয়েছিলেন, তিনিও নেই। বড় জামাই গোপালচন্দ্র সমাজপতি একান্ত প্রিয়পাত্র, সেও অকালে বিদায় নিল। নিজের বিধবা কন্যাটির অবস্থা দেখে কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল। কন্যার মতো কৃচ্ছ্রসাধনা করে তার বেদনায় অংশ নিতে চেয়েছেন। বৃথা সে চেষ্টা। ভাইয়েরা মুখ ফিরিয়েছে। নিকটবর্তী অনেক মানুষের মুখোশখোলা মুখ দেখে শিউরে শিউরে উঠেছেন। পরবর্তী যে জামাতাকে বড় বিশ্বাস করে নিজের রক্ত দিয়ে তৈরি-করা মেট্রোপলিটান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভার দিয়েছিলেন, সেও পুরো মাপে সৎ হলো না, তাকেও বর্জন করতে হলো। যার হাত ধরে বার্ধক্যের সময় পথ চলতে পারতেন, বহু স্বপ্নের সেই পুত্রের হাত তাঁর মনে হয়েছিল ক্লেদাক্ত, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ইতিহাসের এই বিরাট পুরুষ—আশায়, আদর্শে, প্রতিজ্ঞায়, বজ্রোজ্জ্বল মানুষটি—হয়ে দাঁড়ালেন ইতিহাসের প্রধান এক ট্রাজিক চরিত্র। সেই ছিল তাঁর নিয়তি—আর, তার নির্মাণে তাঁর নিজের ভূমিকাও অল্প নয়। তাঁর বিরাটত্ব কি কখনো অপরের স্বাভাবিক অল্পতাকে স্বীকার করেছে? কখনও কি একটু থেমে ভাববার চেষ্টা করেছে—তাঁর বলার মতো অন্যেরও কিছু বলার থাকতে পারে, যে-মানুষদের কথায় মহিমার ছোঁয়া নেই, কিন্তু সাধারণ জীবনের প্রয়োজনের ঘোষণা আছে? "বলো মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম—" তিনি রামচন্দ্র। কিন্তু 'রামাবতার'-এর বীর্য যে ক্ষমাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল!! চরিত্রে যিনি যুধিষ্ঠির, আত্মঘোষণায় তিনি দুর্যোধনের কথাকেই কার্যত ব্যবহার করেছেন—"দুর্যোধন বহে নিজ হস্তে নিজ নাম।" কৃষ্ণের মতো মুষল তুলে তিনি নিজ পুত্রের এবং আত্মীয়দের উপর নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণের নীলভীষণ মহানিয়তির রহস্যময়তা তো মানুষের সাধ্য নয়—যত বড় মানুষই তিনি হন!

বিদ্যাসাগরের বিরাটত্ব আমাদের দূরে ঠেলে দেয়।

অথচ কঠিন বর্মের মধ্যে তাঁর আতুর প্রাণ কাঁদছিলই। তিনি পরের জন্য কেঁদেছেন, নিজের জন্যও কেঁদেছিলেন। তাঁর চেহারা বদলে গিয়েছিল। যৌবন যা ছিল "অতুল প্রতিভা ও কমনীয়তার কুসুমকান্তিপূর্ণ সৌম্যমূর্তি," বার্ধক্যে তা হয়ে উঠেছিল "গভীর বিষাদের ঘন রেখা"-যুক্ত কালিমাময়।৯৪ জীবনের শেষ দিনগুলিতে স্বপ্ননীড় তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর

কলকাতার বাড়ি কন্যা ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে ভরা। রচিত স্বপ্নের সেই ছবি :

“শেষ দশায় কলিকাতায় কন্যাগুলিকে লইয়া যখন বাদুড়বাগানের বাটীতে বাস করিতেন, সেই সময় তাঁহার বালক দৌহিত্ররা তাঁহার পরম আরামের স্থল হইয়াছিল।...শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের [পরে ‘সাহিত্য’-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি] মুখে শুনিয়াছি, এক-একদিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারস্থ সকলে মিলিত হইতেন। কন্যারা এক-এক কোণে এক-একজন দাঁড়াইতেন, দৌহিত্রগুলি কেহ-বা দক্ষিণে, কেহ-বা বামে, কেহ-বা সম্মুখে, কেহ-বা পশ্চাতে! বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। মধ্যে মধ্যে সকলেই চর্বিত তাম্বুলের উমেদার হইতেন। সকলকে একবারে দেওয়া সম্ভব হইত না, তাই পর্যায়ক্রমে পরে-পরে পান দিতেন। তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কন্যা ও দৌহিত্রদের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল। প্রসাদের প্রার্থী হইবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, ‘আচ্ছা একটু বিলম্ব কর, সম্বরা দেই।’ তাহার অর্থ এই যে, পান খাইতে-খাইতে একবার তামাক খাইতে হইবে।”[৯৫]

দৌহিত্রদের নিয়ে নানা হাসিঠাট্টা :

“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকাতে শব্দরূপের উদাহরণস্বরূপ ‘নর’ শব্দের উল্লেখ ছিল। পরে উহা পরিবর্তিত হইয়া ‘গজ’ শব্দে পর্যবসিত হয়। সুরেশ সমাজপতি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাস্য করিয়া উত্তর দেন, ‘মনে করিয়াছিলাম, তোরা দুটা ভাই নর, এখন দেখছি তোরা নর নয়, তোরা দুটি গজ’।”[৯৬]

কিন্তু ছন্দ থাকলেই ছন্দ-ভঙ্গ হয়। কথায় বলে, শিশুর মুখে ভগবান কথা কন। শিশুমুখে তেমন ভগবদ্‌বাক্য শুনে বিদ্যাসাগর চমৎকৃত। যথা—

বিদ্যাসাগর তাঁর সর্বকনিষ্ঠ শিশু-দৌহিত্র রামকমলকে খুব ভালবাসতেন। পারিবারিক সান্ধ্য সম্মেলনে ওই শিশুই ছিল কেন্দ্রমণি। বিদ্যাসাগর তাকে দেবার জন্য নূতন সিকি, দুয়ানি, টাকা ইত্যাদি মজুত রাখতেন। সে চাইলেই তা দিতেন। একটি প্রশ্ন তিনি তাকে করতেন, এবং তার কাছ থেকে যে-উত্তর পেতেন, তা তাঁর সকরুণ পরিহাসের বিষয় হয়েছিল।

দাদু : দাদা, তুমি কাকে ভালবাসো ?

নাতি : তোমাকে খুউব ভালবাসি। তোমার চেয়ে ওই নতুন সিকি দুয়ানিকে আরও বেশি ভালবাসি।

দাদু : সকলেই তাই করে। তুমি বোঝ না তাই বলে ফেলো, অন্যরা বোঝে বলে স্বীকার করে না।[৯৭]

এই তো সংসার—বিদ্যাসাগর বলতেই পারেন। তাঁর বড়ো নাতি সুরেশচন্দ্রের বিলাত যাবার শখ হয়েছে! শখ নয়, একেবারে ব্যাকুলতা। বিদ্যাসাগরের অনুমতি পাওয়া শক্ত বুঝে, তাঁর অজ্ঞাতসারে বিলাতযাত্রা করবেন স্থির করে ফেললেন। তারপর গেছেন মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে। বুদ্ধিমতী মা

উপযুক্ত জবাব দিলেন, "তুমি যেমন ছেলে হয়ে আমাকে না-বলে যেতে পারছ না, তেমনি আমি মেয়ে হয়ে আমার বাবাকে না-বলে কি করে অনুমতি দেব বলো ?" এক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্রের পক্ষে মাতামহের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। সেজন্য তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে যাচ্ছেন আর ফিরে আসছেন, মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। বিদ্যাসাগর বুঝলেন যে, একটা বিশেষ-কিছু প্রয়োজন আছে। বললেন, "মনে হচ্ছে, তোর কিছু দরকারি কথা আছে। কী, সেকথা বলেই ফেল না ?" সুরেশচন্দ্র বললেন, "আমি বিলেত যাব।" বিদ্যাসাগর রহস্য করে বললেন, "বিলেত যাবি ? ব্যারিস্টার হয়ে আসবি ? তারপর তো চাকরির জন্য আমার কাছেই উমেদারী করবি।" স্বর বদলে বললেন, "না, তা হবে না। এখন টাকাকড়ির বড়ো টানাটানি। এ অবস্থায় পেরে উঠব না।"

এর পরে যেকথা তিনি অন্তরাল থেকে শুনতে পেলেন, তা তাঁর বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। সুরেশচন্দ্র তাঁর মাকে শোনাচ্ছিলেন, "আমার বাবা থাকলে কি আর তোমার বাবার কাছে আবদার করতে যেতাম ?"

যাতনায় ও কান্নায় ছটফট করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের আর কি করবার কিছু ছিল ? দৌহিত্রকে বুক-নিঙড়ানো স্বরে বলেছিলেন, "তোরা আমাকে পর ভাবিস্, নয় ? হাঁরে, তোর বাবা থাকলে সে যা করত, আমি তার থেকে কি কিছু কম করছি ?"৯৮

বিদ্যাসাগর যখন কথামালার গল্পগুলি লিখছিলেন, তখন কি জানতেন, অনেকগুলি গল্পে তিনি আত্মজীবনীর অংশ লিখে যাচ্ছেন ? শেষ বয়সে একটি গল্পকে তিনি বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন, নিজের অবস্থা বোঝাবার জন্য। বলেছিলেন, "কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। কথামালায় বৃদ্ধ ঘোটকের গল্প আছে। আমি সেই বৃদ্ধ।"৯৯

কথামালায় গল্পটির নাম, 'অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক'। গল্পটি মোটামুটি এই :

এক বুড়ো চাষার একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। একদিন সে বাজারে যাচ্ছে, সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে তার পুত্র, এবং টাট্টু ঘোড়াটি। পথ দিয়ে কয়েকটি ফচ্‌কে ছেলে যাচ্ছিল হাসি-তামাশা করতে করতে। ওই তিন জন তাদের নজরে পড়ল। তাদের একজন বন্ধুদের বলল, "দ্যাখ দ্যাখ, মজা দ্যাখ—কী নির্বোধ লোক দুটো। ওরা অনায়াসে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারে। তা না করে ঘোড়ার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে।"

সত্যই তো। ন্যায্য ঠাট্টা। বৃদ্ধ তা বুঝে, নিজের ছেলেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে পাশে পাশে হেঁটে চলল। খানিক পরে পথের ধারে দেখা গেল, কয়েকজন মরুব্বি গোছের বৃদ্ধ কি যেন নিয়ে ঘোর তর্কবিতর্ক করছেন। তাঁদের একজনের নজরে যেই-না বুড়ো চাষা এবং তার ঘোড়ায় চড়া পুত্র ধরা পড়েছে, অমনি তিনি বিজয়ীর ভঙ্গিতে সঙ্গীদের বললেন, "দ্যাখো দ্যাখো, আমি যা বলছিলাম তার হাতে হাতে প্রমাণ। একালে বৃদ্ধের কোনো সম্মান নেই। নইলে বুড়ো বাপ হেঁটে যাচ্ছে, আর মহাপুরুষ পুত্র যাচ্ছেন ঘোড়ায় চড়ে—এ

হয় কখনো ?" বৃদ্ধ এর পর চাষার ছেলেকে সজোরে ধমক দিয়ে বললেন, "ওরে পাপিষ্ঠ, তোর লজ্জা হয় না—বুড়ো বাপ হেঁটে যাচ্ছে, আর তুই ব্যাটা যাচ্ছিস ঘোড়ায় চড়ে ?"

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে, ঘোড়া থেকে নেমে তাতে বাপকে চড়াল। আরও খানিক যাবার পরে তাদের দেখতে পেল কয়েকটি স্ত্রীলোক। তারা চটে অস্থির। খর্‌খরে গলায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "বুড়ো মিন্‌ষের আক্কেল বটে। নিজে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, আর কচি ছেলেটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বলিহারি।"

বুড়ো চাষা সেকথা শুনে ঘোড়ার উপর ছেলেটাকেও তুলে নিল। দুজনের ভারে ধুঁকতে ধুঁকতে টাট্টু ঘোড়া চলল।

তারা চলেছে। এক ভারিক্কী লোক তাদের দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে, শোনো শোনো, বলি, ঘোড়াটি কার ?" চাষা বলল, "ঘোড়াটি আমার।" ভদ্রলোক বললেন, "তা বাপু, ঘোড়াটি তোমার বলে তো মনে হচ্ছে না ! তোমার হলে কি তুমি এত নির্দয় হতে ? কোন্‌ বিবেচনায় তোমরা একটা ছোট ঘোড়ার উপর দুজনে চড়ে বসেছ ?" বিব্রত চাষা বলল, "তা, কি করলে উচিত কাজ হয় বলুন ?" ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা এতক্ষণ ঘোড়াকে বহু কষ্ট দিয়েছ। এখন তোমাদের উচিত ঘোড়াকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া।"

সঠিক ভর্ৎসনা। উচিত উপদেশ। পিতা ও পুত্র ঘোড়া থেকে নেমে, দড়ি দিয়ে ঘোড়ার পা বাঁধল ; তারপর পায়ের ভিতর বাঁশ ঢুকিয়ে, ঘোড়াকে কাঁধে করে নিয়ে চলল। এইভাবে তারা হাজির হলো বাজারের কাছে। কী তামাশার দৃশ্য ! লোক জড়ো হয়ে গেল মজা দেখতে। বাজারের কাছে একটা খাল ছিল, খালের উপর পুল। তারা পুলের উপর উঠেছে। দুটো লোক জ্যান্ত ঘোড়াকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এমন দৃশ্য লাখে মেলে না। চারিদিকে হাসির হুল্লোড়, প্রচণ্ড হাততালি, বাহবা। আওয়াজ এমন হলো যে, ঘোড়া ভয় পেয়ে, ছটফট করতে করতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে ফেলল, ফলে খালের জলে পড়ে গেল—মরেও গেল।

লোকের ঠাট্টা তামাশায় চাষাটি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও বিরক্ত। তার উপর সম্বল ঘোড়াটির মৃত্যু। সে খানিক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এই ভাবতে-ভাবতে ফিরে চলল, "আমি সকলকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।"

হাসির গল্প—বিদ্যাসাগরের জীবনে কান্নার গল্পের রূপ ধরেছিল।

"বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে,'—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত প্রবচন। বিদ্যাসাগর তাঁর মনের ক্ষত নিরাময়ের জন্য 'বনে সুন্দর' সাঁওতালদের মধ্যে চলে যেতেন। কিন্তু তাঁকে ফিরে আসতে হতোই নগর-জীবনে। অনেক দায় সেখানে জমিয়ে রেখে গেছেন—তার মূল্য শোধ করতেই হবে। কার্মাটাঁড় তাঁর দেহ-মনের স্বাস্থ্যনিবাস—কর্মক্ষেত্র নয়।

নগরজীবনে কী আছে তাঁর জন্য ? ক্লান্ত নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ একবার একটি শিশুকন্যার কোমল হাত গলায় জড়িয়ে জীবনের জ্বালা জুড়োতে চেয়েছিলেন। শিশুটি তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা প্রভাবতী। বিদ্যাসাগরের বড় সুখের ওই বাৎসল্যলীলা ! কিন্তু তা যে সে-ই মানুষটির জীবনের লীলার অন্তর্গত যেখানে আগমনীর সুর বাজতে না বাজতে বিজয়ার কান্নার ঢেউ ওঠে ! প্রভাবতী তিন বছর বয়সেই মারা গেল। তাকে স্মরণ করে বিদ্যাসাগর বিজয়ার গদ্যকাব্য লিখেছিলেন, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। প্রকাশের জন্য লেখেন নি—রচনার চিত্রপটখানি একান্তে দেখে সংগোপনে কাঁদবার জন্যই তা লিখেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন, "মৃত্যুর তিন-চারি মাস পূর্বেও" বিদ্যাসাগরকে লেখাটি একান্তে পড়তে দেখা গেছে। বিদ্যাসাগরের দেহান্তের পরে সুরেশচন্দ্র এটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

লেখাটির প্রতি শব্দ ভালবাসার অমৃতরসে ডোবানো। এত নিবিড় আকুল বর্ণনা কদাচিৎ দেখা যায়। এ যেন বুকের উপরকার ত্বকটি সরিয়ে দিয়ে খুলে ধরা হয়েছে—শিরা, রক্ত-মাংস ও আরও ভিতরের হৃৎপিণ্ডকে। এর মধ্যে অনেক সুখলীলার ছবি আছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে শুধু সান্ত্বনাহীন হাহাকার। শিশুটির জীবন যখন শেষ হয়ে আসছিল—তখন সে তীব্র পিপাসায় ছটফট করছে—অথচ তাকে জল দেওয়া যাবে না—ডাক্তারের বারণ। তৃষ্ণার জলের বদলে প্রবঞ্চনাময় মিষ্টবাক্য—শয্যাপার্শ্বে বসে বিদ্যাসাগর তাই দিয়েছেন তাকে। "যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি অবধারিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে কখনই তোমায় পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না।" উৎকট তৃষ্ণায় অধীর হয়ে শিশুটি জল চেয়ে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকত—সে দৃশ্য বিষে ডোবানো শূলের মতো বিদ্যাসাগরের মর্মে চিরদিনের জন্য গাঁথা ছিল।

সেকালের রীতিতে বিদ্যাসাগর এই তিন বৎসরের কন্যাটির সঙ্গে গিন্নী-সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন। শিশুরাও তখনকার দিনে এই খেলায় অভ্যস্ত ছিল। সেই ছবিগুলি একের পর এক তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সরে যায় :

"যেন তুমি আমার ক্রোড়ে বসিয়া আহার করিতে-করিতে 'মাগী শোলো' (শুইল) বলিয়া আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিতেছ।... আমি আদর করিয়া তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম। তদনুসারে তুমিও মাগী-শব্দে আত্মনির্দেশ করিতে। তোমার এই দৈনন্দিন মঞ্জুল শয়নলীলা নয়নগোচর করিয়া ব্যক্তিমাত্রেই পুলকিত হইতেন।"

কর্তা গিন্নীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়না, এমন শ্মশানগৃহ বাংলায় কোনোকালে ছিল না। এক্ষেত্রে মাগ ভাতারে ঝগড়া হতোই।

"তুমি এই নিয়মিত কৃত্রিম ঝগড়ার সময়ে এরূপ স্বরভঙ্গি, বাক্যবিন্যাস, ও অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে যে, তদ্দর্শনে নিতান্ত পামরের হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দপ্রবাহে ও অননুভূতপূর্ব কৌতুকরসে উচ্ছলিত হইত।"

ভালবাসার স্বভাবই হলো নিঃসপত্ন অধিকার দাবি। ও-রাজ্যে ভাগাভাগি

চলে না। তাহলেই 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস হয়ে যাবে, যেখানে অনুশীলনের ট্রেনিং পাওয়া প্রফুল্ল তিন সপত্নীর মধ্যে স্বামীর সমবণ্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে তা নেই :

"আমি বাহিরের বারান্ডায় বসিয়া আছি। তুমি বাড়ির ভিতরে নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময় শশী (রাজকৃষ্ণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভালবাসিবেন না।' তুমি অমনি শিরশ্চালন-পূর্বক 'ভাল বাসুবি, ভাল বাসুবি', এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন আমি 'ভালবাসিব' বলিয়া অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সেদিন সকলের অনুরোধে 'আর ভালবাসিব না' বারংবার বলিতে লাগিলাম। তুমিও প্রতিপদে 'না ভাল বাসুবি' এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি স্ফূর্তিহীন বদনে, 'তুই ভাল বাসুবিনি, আমি ভাল বাসুবো', এই কথা এরূপ মধুর স্বরভঙ্গি ও প্রভূত স্নেহরস-সহকারে বলিয়া বিরত হইলে যে, সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।"

না, আমারই ভুল। প্রেমের সর্বোচ্চ ভাবটি তিন বছরের শিশুরও আয়ত্ত ছিল। প্রতিদান পাই আর না-পাই, আমার ভালবেসেই সুখ।

অভিমানপর্ব শেষ হওয়ার ছবিও আছে :

"যেন আমি 'খাব খাব' বলিয়া তোমার মুখচুম্বনের নিমিত্ত আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছি—তুমি 'এই খা' বলিয়া ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমিও 'খাব না' বলিয়া মুখ ফিরাইতেছি। তুমি 'তবে এই খা' বলিয়া বামের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, 'ও খাব না' বলিয়া মুখ ফিরাইতেছি। অবশেষে তুমি আর কিছু না বলিয়া, আপন অধর আমার অধরে অর্পিত করিতেছ।"

আরও কত ছবি—ছবির পর ছবি। কান্নার সাগরে প্রদীপগুলি ঢেউয়ের তালে তালে আলো ছড়িয়ে একে একে ডুবে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগর শেষ প্রার্থনা এই জানিয়েছিলেন :

"বৎসে, তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না। একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের, এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে আমাদের মতো অবিরত দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।"

প্রভাবতীর মৃত্যু যত শোকাবহই হোক, বিদ্যাসাগর কিন্তু এই পোড়া দেশে তার দীর্ঘজীবন কামনা করতে পারেন নি। এই নৃশংস সংসারে প্রভাবতী বয়ঃপ্রাপ্ত হলে কি সুখের জীবন পেত? হয়ত সংসারে দুর্বহ দীর্ঘজীবনের, হয়ত বৈধব্যের, অশেষ যাতনা তাকে সহ্য করতে হতো। প্রভাবতী মুক্তি পেয়ে গেল। তবু—সে যে আলো কেড়ে নিয়ে গেল বিদ্যাসাগরের জীবন থেকে!

"...ইদানীং একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া এই বিষময় সংসার অমৃত-

বোধ করিতেছিলাম।...বৎসে, তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল বলিতে পারি না। তুমি অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের কার্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানীং তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে।"[১০০]

বিদ্যাসাগর পরের জন্য কাঁদতেন—সুপ্রসিদ্ধ এই উক্তি। তিনি নিজের জন্য কেঁদেছেন—স্বীকৃত হোক এই সত্য।

আর হাসি? বিদ্যাসাগরের হাসির অনেক আয়োজন করেও আমাকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছে। তিনি যদি হাসির রাজা হন—তিনি যে কান্নার মহারাজা।

তবু হাসি।

"একবার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার-মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া কর্মাটাঁড়ে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি পরিষ্কারের ভার লইয়াছিলেন। ইহাতে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় লজ্জিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, 'ইহার জন্য লজ্জা কি? বায়না দিয়ে রাখলাম'।"[১০১]

বায়না তো দিলেন। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রয়ে রাজি ছিলেন কি? সেবা করব, কিন্তু সেবা নেব না—অটুট ছিল তাঁর এই অভিমান।

"যতক্ষণ-না চৈতন্যলোপ হইয়াছিল ততক্ষণ কাহাকেও তিনি সহজে মলমূত্র বা বমনাদি পরিষ্কার করিতে দিতেন না। সে পক্ষে কেহ উদ্যোগী হইলে বরং বিরক্ত হইতেন।"[১০২]

অপরের মলমূত্র পরিষ্কার বাইরের ক্রিয়া—তার মূলে যে-মন সক্রিয় বিদ্যাসাগর তারই সন্ধানী।

রামকৃষ্ণ-শিষ্য এবং বিবেকানন্দের গুরুভাই, স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ববঙ্গে গেছেন। সেখানে ভক্ত সমাবেশে নানা কথা বলছেন। এক ভদ্রলোক তাঁকে বারবার উত্ত্যক্ত করতে লাগলেন, "আপনি আমাদের স্বামীজীর কথা বলুন, তাঁর প্রেমের কথা।" স্বামী প্রেমানন্দ তখন ফিরে দাঁড়ালেন, সুন্দর সুগৌর মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে টকটকে লাল, চোখ জ্বলছে। "প্রেম? প্রেমের কথা? তাহলে শোনো। এক ব্যাপারী ফিরি করে ঘুরছিল—'প্রেম নিবি গো, প্রেম নিবি গো?' লোকে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল, 'হাঁ নেব, দাম কত?' ব্যাপারী বলল, 'কাঁচা মাথা, কাঁচা মাথা।' স্বামীজীর প্রেম পেতে চাও? কাঁচা মাথা দিতে পারবে?"

বিদ্যাসাগরের দুর্ভাগ্য, প্রেমের জন্য কাঁচা মাথা দেবার মতো মানুষদের তিনি কাছে পাননি।

তাই যখন তাঁর হাসি দেখি, তা কেবল আকাশভরা কালো মেঘের প্রান্তে রূপোলি রেখা। এ সংসারে হাসা যায়না। বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা তাই। এ সংসারে কেবল পাগলই হাসতে পারে।

চন্দননগরের রাস্তায় বিদ্যাসাগর একদিন দেখলেন, একটি পাগল ছেলে কেবল হাসছে। কি মজাদার কাণ্ড! লোক জুটে গেছে তার চার ধারে। তাকে নিয়ে সকলের হাসির শেষ নেই।

একমাত্র বিদ্যাসাগর সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।[১০৩]

———

তথ্যপঞ্জী

ধর্ম-ধ্বজা ও ধর্ম-মজা

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে', ('Men I Have Seen' পুস্তকের অনুবাদ), পৃ. ২৪-২৬, প্রথম সং, ১৯৬৩, অনুবাদিকা, মায়া রায়। এর পরে, 'শিবনাথ : মহান' এইভাবে উল্লিখিত হবে।
২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ৪৬৬, প্রথম আনন্দধারা সংস্করণ, ১৩৭৬। এর পরে, 'চণ্ডীচরণ'।
৩. চণ্ডীচরণ, ৪৬৬-৬৭।
৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম কথিত, ২য় ভাগ, পৃ. ২৯৫, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৩৭। এর পরে, 'কথামৃত'।
৫. বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ৩০৫, প্রথম ওরিয়েন্ট সংস্করণ, ১৯৮৬। এর পরে 'বিহারীলাল'।
৬. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ', পৃ. ২৩১-৩২, বুকল্যান্ড সংস্করণ, ১৯৬২। এর পরে, 'শম্ভুচন্দ্র'।
৭. চণ্ডীচরণ, ৪০৫ ; শিবনাথ : মহান, ১৪।
৮. শম্ভুচন্দ্র, ২০৩-০৪।
৯. ঐ, ২১৪-১৫।
১০. ঐ, ৩৩।
১১. বিহারীলাল, ৩১৭-১৮।
১২. শশিভূষণ বসু, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ. ৫৪৯। ইন্দ্রমিত্র-এর 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, ১৯৬৯) উদ্ধৃত, ৬৪০। শেষোক্ত গ্রন্থটি এর পরে, 'করুণাসাগর' বলে উল্লিখিত হবে।
১৩. চণ্ডীচরণ, ৪৬৭।
১৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'প্রবন্ধাবলী', প্রথম খণ্ড, ৮ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬৩৩।
১৫. কথামৃত, পঞ্চম খণ্ড (১৩৩৯ সং), ২৮।
১৬. কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (বিপিনবিহারী গুপ্ত-এর 'পুরাতন প্রসঙ্গে' কৃষ্ণকমলের উক্তি সংকলিত), বিদ্যাভারতী সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃ. ১৩১-৩২। এর পরে, 'পুরাতন : কৃষ্ণকমল'।
১৭. ক্ষুদিরাম বসু, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', পঞ্চপুষ্প, আষাঢ় ১৩৩৬ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬৪১।
১৮. শশিভূষণ বসু, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৩ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬৪০।
১৯. পুরাতন প্রসঙ্গ : কৃষ্ণকমল, ৩০৪।
২০. করুণাসাগর, ৬৪০।
২১. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৩০৪।

২২. বিহারীলাল, ৮৭।
২৩. চণ্ডীচরণ, ৪৬৭।
২৪. বিহারীলাল, ১১০।
২৫. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১৭৯।
২৬. ঐ, ১৭৯-৮০।
২৭. বিহারীলাল, ২৯৯-৩০০।
২৮. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, (মণ্ডল বুক হাউস সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৬), ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৯-৬০, ৩৭০-৭২। এর পরে, 'রচনাবলী'।
২৯. মণিলাল সিংহ-রায়, 'স্মৃতিপূজা' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬৪৪।
৩০. চণ্ডীচরণ, ৪৬৬।
৩১. রচনাবলী, ১ম, ভূমিকা (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), ৪০-৪১।
৩২. বিহারীলাল, ১৫৩।
৩৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, (১৩৬৯), ৪০৫।
৩৪. করুণাসাগর, ৫৮৯।
৩৫. শম্ভুচন্দ্র, ২৭২।
৩৬. চণ্ডীচরণ, ৪৬৫।
৩৭. ঐ, ৪৬৮।
৩৮. ক্ষুদিরাম ; করুণাসাগর, ৬৪১।
৩৯. শম্ভুচন্দ্র, ১৫৯।
৪০. চণ্ডীচরণ, ৩৪৫।
৪১. বিহারীলাল, ৩৫৯।
৪২. চণ্ডীচরণ, ৪৬৮-৬৯।
৪৩. ঐ, ৪৬৯।
৪৪. বিহারীলাল, ১৬৩-৬৪।

মানুষটি কেমন

১. চণ্ডীচরণ, ২৬৬।
২. Marie Louise Burke, 'Swami Vivekananda in America, New Discoveries', (1958), p. 568.
৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকা হরপ্রসাদের রচিত, ১৩৩৮), ৪-৫। এর পরে 'হরপ্রসাদ' নামে উল্লিখিত হবে।
৪. শম্ভুচন্দ্র, সনৎকুমার গুপ্ত লিখিত ভূমিকায় উদ্ধৃত, পৃ. [২২]।
৫. চণ্ডীচরণ, ৯১।
৬. ঐ, ৩৪৩-৪৪।
৭. ঐ, ৩৬১।
৮. বিহারীলাল, ৩৭।

৯. শম্ভুচন্দ্র, ২৪।
১০. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৭৯।
১১. ঐ, ১২১।
১২. শিবনাথ : মহান, ৪।
১৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত', সিগনেট সংস্করণ (১৩৫৯), ৪১।
১৪. ঐ, ২৭।
১৫. নবীনচন্দ্র সেন, 'নবীনচন্দ্র-রচনাবলী', 'আমার জীবন', প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৩৬৬, পৃ. ১৩২। এর পরে, 'নবীনচন্দ্র'।
১৬. ঐ, ১৩৩।
১৭. ঐ, ১৫০।
১৮. চণ্ডীচরণ, ৪০৫-০৬।
১৯. ঐ, ৪৬১-৬২।
২০. ঐ, ৪৬-৪৭।
২১. বিহারীলাল, ৩৭।
২২. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১০৪।
২৩. শম্ভুচন্দ্র, ১৫৯।
২৪. চণ্ডীচরণ, ২৮৯।
২৫. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১০৪।
২৬. ঐ, ৩০৬।
২৭. রচনাবলী, ৪র্থ, ৩৬৯।
২৮. ঐ, ৪র্থ, ৩৭৪।
২৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', তৃতীয় পরিচ্ছেদ। (ব্যবহৃত বইয়ের সংস্করণ অংশ ছেঁড়া)।
৩০. ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
৩১. বিহারীলাল, ৪৪।
৩২. চণ্ডীচরণ, ৪৫-৪৬।
৩৩. শম্ভুচন্দ্র, ৪২।
৩৪. ঐ, ৪৭-৪৮।
৩৫. ঐ, ৩৩।
৩৬. ঐ, ৭৯।
৩৭. ঐ, ৮৩।
৩৮. ঐ, ১৭৬।
৩৯. চণ্ডীচরণ, ৪০৭।
৪০. বিহারীলাল, ৩৬৮-৬৯।
৪১. শম্ভুচন্দ্র, ১৭০।
৪২. বিহারীলাল, ২৬৭-৬৮।

৪৩. শম্ভুচন্দ্র, ১৮২।
৪৪. চণ্ডীচরণ, ১৭৫-৭৬।
৪৫. চণ্ডীচরণ, ৪৭২।
৪৬. শিবনাথ : রামতনু, অষ্টম পরিচ্ছেদ।
৪৭. শম্ভুচন্দ্র, ১৬৭-৬৮।
৪৮. চণ্ডীচরণ, ৪৩১।
৪৯. বিহারীলাল, ২৭৮।
৫০. শম্ভুচন্দ্র, ১৬৯।
৫১. বিহারীলাল, ২৭৮-৭৯।
৫২. তত্ত্ববোধিনী, ১৭৮২ শক, মাঘ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ২৮।
৫৩. ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, 'জীবতত্ত্ব', জন্মভূমি, ফাল্গুন, ১৩০৮ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ২৭-২৮।
৫৪. বিহারীলাল, ২৫।
৫৫. শম্ভুচন্দ্র, ১৬।
৫৬. চণ্ডীচরণ, ৩৫।
৫৭. ঐ, ২৮।
৫৮. ঐ, ৪৪-৪৫।
৫৯. ঐ, ৩৩৬-৩৭।
৬০. ঐ, ৩৩৭।
৬১. ঐ, ৪২।
৬২. শম্ভুচন্দ্র, ৩৮।
৬৩. চণ্ডীচরণ, ২৩৪-৩৫।
৬৪. বিহারীলাল, ১৫০।
৬৫. শম্ভুচন্দ্র, ৯৮।
৬৬. বিহারীলাল, ১৫০।
৬৭. হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, 'সেকালের সংস্কৃত কলেজ', প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩২ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ১৫১।
৬৮. পুরাতন, ৮।
৬৯. রচনাবলী, ৪র্থ, ৩৭৫-৭৬।
৭০. ঐ, ৪র্থ, ৩৭৪-৭৫।
৭১. বিহারীলাল, ৯৩।
৭২. ঐ, ৯২-৯৩।
৭৩. ঐ, ৯২।
৭৪. চণ্ডীচরণ, ৪০৭।
৭৫. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৮০।
৭৬. বিহারীলাল, ৯০-৯১।
৭৭. শম্ভুচন্দ্র, ২১২।

৭৮. বিহারীলাল, ৯৩।
৭৯. ঐ, ৯৩-৯৪।
৮০. হরপ্রসাদ, ১১-১২।
৮১. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৭৯।
৮২. চণ্ডীচরণ, ৪৩০।
৮৩. বিহারীলাল, ৩৬০।
৮৪. চণ্ডীচরণ, ৪০৮।
৮৫. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৩২৯।
৮৬. বিহারীলাল, ১৬২।
৮৭. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১৩০।
৮৮. চণ্ডীচরণ, ৩৫।
৮৯. হরপ্রসাদ, ১২-১৩।
৯০. শম্ভুচন্দ্র, ৯৮।
৯১. ঐ, ১০১-০২।
৯২. বিহারীলাল, ১৬৬।
৯৩. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১২৮।
৯৪. মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্রুতি-স্মৃতি', ১ম ভাগ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃ. ২২। এর পরে 'শ্রুতি-স্মৃতি'।
৯৫. যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'আমার দেখা লোক', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত ৪২।
৯৬. বিহারীলাল, ৩৬৩।
৯৭. ঐ, ১৬৬।
৯৮. শম্ভুচন্দ্র, ২৩০।
৯৯. ঐ, ২৩৮।
১০০. বিহারীলাল, ৩৮৭।
১০১. ঐ, ২১৯-২০।
১০২, ঐ, ১৬৩।
১০৩. শম্ভুচন্দ্র, ৩৬।
১০৪. বিহারীলাল, ৫২-৫৩।
১০৫. চণ্ডীচরণ, ৪০৯।
১০৬. ঐ, ৪০৯।
১০৭. কথামৃত, ৩য়, ৩-২।
১০৮. হরপ্রসাদ, ৭।
১০৯. চণ্ডীচরণ, ৪৩১।
১১০. শম্ভুচন্দ্র, ২২৬।
১১১. বিহারীলাল, ২৭২-৭৩।
১১২. শিবনাথ : মহান, ২০।

১১৩. শম্ভুচন্দ্র, ২১৫-১৬।
১১৪. চণ্ডীচরণ, ১৫৯-৬০।
১১৫. বিহারীলাল, ২৭৯।
১১৬. চণ্ডীচরণ, ১৬০-৬১।
১১৭. বিহারীলাল, ২৭৯।
১১৮. শম্ভুচন্দ্র, ২৩৬-৩৭। চণ্ডীচরণ, ১৬০, বিহারীলাল, ২৭৯।
১১৯. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, 'স্মৃতিরেখা' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৮০।

রস রসনা রসিক

১. চণ্ডীচরণ, ৩৮।
২. রচনাবলী, ৪র্থ, ৩৬৩।
৩. ঐ, ৪র্থ, ৩৬৪।
৪. ঐ, ৪র্থ, ৩৬৮।
৫. শম্ভুচন্দ্র, ২১৩।
৬. ঐ, ২৮-২৯।
৭. চণ্ডীচরণ, ৩৩।
৮. বিহারীলাল, ৪৩।
৯. ঐ, ২২৯।
১০. রচনাবলী, ৪র্থ, ৩২২।
১১. চণ্ডীচরণ, ৩৩৯।
১২. শম্ভুচন্দ্র, ৩৭।
১৩. বিহারীলাল, ২৫৩।
১৪. ঐ, ২৫৪।
১৫. হরপ্রসাদ, ২৩-২৪।
১৬. ঐ, ২২৮-২৯।
১৭. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও নানা নিবন্ধ' পুস্তকে উদ্ধৃত, ১৫৮।
১৮. হরপ্রসাদ ২৪-২৬।
১৯. হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, 'গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬৩০-৩১।
২০. চণ্ডীচরণ, ৩৮৭।
২১. শশিভূষণ বসু, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৩ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৩।
২২. তারকনাথ বিশ্বাস, গ্রন্থাবলী ৩য়, খণ্ড ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৪৩।
২৩. কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'বঙ্গের রত্নমালা' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৪।
২৪. চণ্ডীচরণ, ৩৮৭।
২৫. ঐ, ৩৯৬।

২৬. শম্ভুচন্দ্র, ১৭০-৭৫।
২৭. বিহারীলাল, ৩৬২-৬৩।
২৮. শম্ভুচন্দ্র, ৩৭।
২৯. চণ্ডীচরণ, ৪৪৭-৪৮।
৩০. শম্ভুচন্দ্র, ৬৬-৬৭।
৩১. চণ্ডীচরণ, ৯৮।
৩২. শম্ভুচন্দ্র, ২৬৪-৬৫।
৩৩. চণ্ডীচরণ, ৪৩০-৩১।
৩৪. বিহারীলাল, ২১৫।
৩৫. হরপ্রসাদ, ১৯।
৩৬. ঐ, ১৯।
৩৭. ঐ, ১০-১১।
৩৮. চণ্ডীচরণ, ৪০১।

পাদুকা পুরাণ

১. বিহারীলাল, ৩২০-২১।
২. ঐ, ৩২১।
৩. ঐ, ৩২৪-২৫।
৪. ঐ, ৩২৫।
৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৪৮।
৬. চণ্ডীচরণ, ৭৭-৭৮।

ধুতি চাদরের বর্ম

১. ভগিনী নিবেদিতা, 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', ৫ম সংস্করণ, ১৩৫৮, ৩৩-৩৪।
২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'নিবেদিতা লোকমাতা' ১ম, ১৩৪-৩৫।
৩. শম্ভুচন্দ্র, ৩০।
৪. ঐ, ১৯৩।
৫. ঐ, ১৯৮।
৬. চণ্ডীচরণ, ৪১২।
৭. ঐ, ৩৫৩-৫৪।
৮. শম্ভুচন্দ্র, ১২২-২৩।
৯. রজনীকান্ত গুপ্ত, 'প্রতিভা' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ২৩৪।
১০. শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 'বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ২৩৫।
১১. ঐ, ২৩৫।
১২. শম্ভুচন্দ্র, ৯৮, চণ্ডীচরণ, ১০৪।

১৩. চণ্ডীচরণ, ৪৫৬-৫৭।
১৪. বিহারীলাল, ৩২০।
১৫. হরপ্রসাদ, ১৩।
১৬. চণ্ডীচরণ, ৩৫৪-৫৫।
১৭. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভাপতির অভিভাষণ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গাব্দ ১৩০৬ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ১০-১১।
১৮. চণ্ডীচরণ, ৪৫৭।

কবিতা রসের খনি

১. রচনাবলী, ৪র্থ, ৩২২-২৪।
২. ঐ, ৪র্থ, ৩২১-২২।
৩. প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, 'প্রাচীন কবিতা', সাহিত্য সংহিতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ১৪৩।
৪. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১০৫-০৬।
৫. বিহারীলাল, ৩৬১।
৬. নিবেদিতা, 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', ৩৫।
৭. বিহারীলাল, ১৮৪-৮৫।
৮. ঐ, ১৯৫-৯৬।
৯. ঐ, ২০১।
১০. ঐ, ২০১-০৩।
১১. ঐ, ২০২।
১২. ঐ, ২০২।
১৩. ঐ, ১৮২-৮৩।
১৪. চণ্ডীচরণ, ২১৮।
১৫. শম্ভুচন্দ্র, ১১৩।
১৬. করুণাসাগর, ৩০০।
১৭. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাশরথি রায় পাঁচালী' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ২৮২।
১৮. করুণাসাগর, ২৮৯।
১৯. ঐ, ২৯৪-৯৫।
২০. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ২৫।
২১. ঐ, ২৫, ৩০-৩১, ৪৫-৪৬।
২২. ঐ, ৪৯-৫০।
২৩. রচনাবলী, ৪র্থ, ৩৬।
২৪. ঐ, ৪র্থ, ৩৬।
২৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ৪৫।
২৬. করুণাসাগর, ৩৫৩-৬২।

২৭. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'সেকালের ছড়া ছবি ও প্রহসনে বঙ্কিমচন্দ্র', আনন্দবাজার ১৩ জুলাই, ১৯৭০।
২৮. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৩০২-০৩।
২৯. করুণাসাগর, ৩৬৭।
৩০. 'শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৬৬।
৩১. চণ্ডীচরণ, ১৭৬।
৩২, পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৫২।
৩৩. বিহারীলাল, ১২০-২১।

মজলিশী পণ্ডিত

১. শ্রুতি-স্মৃতি, ৭৪-৭৫।
২. ঐ, ৪১-৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৯-৫০।
৩. নবীনচন্দ্র, ১৩৮।
৪. চণ্ডীচরণ, ৯৫।
৫. হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, 'সেকালের সংস্কৃত কলেজ', প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩২ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬০১।
৬. চণ্ডীচরণ, ৪০৪। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'বঙ্গের রত্নমালা' ২য় ভাগ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৮৫-৮৬।
৭. বিহারীলাল, ১৪৯।
৮. পুরাতন : অমৃতলাল বসু, ২০৭।
৯. বিহারীলাল, ৩৮৬।
১০, ক্ষুদিরাম বসু ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৮০-৮১।
১১. শ্রুতি-স্মৃতি, ১১।
১২. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১২৩।
১৩. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৮০।
১৪. বিহারীলাল, ১৪৮-৪৯।
১৫. ঐ, ৩৬৪।
১৬. হরপ্রসাদ, ২১-২২।
১৭. শিবনাথ : মহান, ৮-৯।
১৮. বিহারীলাল, ২৮৮।
১৯. চণ্ডীচরণ, ১৪৭।
২০. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ২৮।
২১. ঐ, ১২৫-২৬।
২২. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১২৫।
২৩. বিহারীলাল, ১৪৭-৪৮।
২৪. রচনাবলী, ভূমিকা, ১ম [৩]।

২৫. রচনাবলী, ১ম, ৩৬৩।
২৬. ঐ, ১ম, ৩৬৫।
২৭. ঐ, ১ম, ৪০৩।
২৮. ঐ ৪র্থ, ৩৫২।
২৯. ঐ, ৪র্থ, ৫৭-৫৮।
৩০. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ২৭৫।
৩১. হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬০০।
৩২. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৭৮।
৩৩. রচনাবলী, ২য়, ২৯।
৩৪. চণ্ডীচরণ, ৩৩৩-৩৪।
৩৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর', ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০২ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৫৮৫-৮৬।
৩৬. শ্রুতি-স্মৃতি, ৯৬।
৩৭. হরপ্রসাদ, ১২-১৮।
৩৮. চণ্ডীচরণ, ৩২৮।
৩৯. নবীনচন্দ্র, ২৮২।
৪০. বিহারীলাল, ৩৮৭।
৪১. রচনাবলী, ৪র্থ, ৫৭০-৭১।
৪২. ঐ, ৪র্থ, ৫১২-১৩।
৪৩. ঐ, ৪র্থ, ২৬০-৬১।
৪৪. ঐ, ৪র্থ ৫১৭।
৪৫. ঐ, ৪র্থ ৬০৩-০৪।
৪৬. ঐ, ৪র্থ, ৬০৪-০৫।
৪৭. ঐ, ৪র্থ, ৪৮৩-৮৪।

কিংবদন্তীর মৃত্যু—কিংবদন্তী অমর

১. Nagendra Nath gupta, 'Seven Noble Lives' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৫৮।
২. Prabuddha Bharata, January 1927.
৩. চণ্ডীচরণ, ৪২৩।
৪. শম্ভুচন্দ্র, ৩১৬।
৫. ঐ, ১৭৪।
৬. ঐ, ২৭৮।
৭. চণ্ডীচরণ, ৮-৯।
৮, শম্ভুচন্দ্র ৩০।
৯. চণ্ডীচরণ, ৩৮।
১০. শম্ভুচন্দ্র, ১০৭-০৮।

১১. বিহারীলাল, ১৭২-৭৩।
১২. চণ্ডীচরণ, ১৯৪-৯৫।
১৩. করুণাসাগর, ২৭৪-৭৫।
১৪. বিহারীলাল, ১৭২।
১৫. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১৩১।
১৬. বিহারীলাল, ৯৪-৯৫।
১৭. চণ্ডীচরণ, ৭২।
১৮. শম্ভুচন্দ্র, ২৬০।
১৯. করুণাসাগর, ১২১।
২০. ঐ, ৫৯৪-৯৫।
২১. শ্রুতি-স্মৃতি, ৯৮-৯৯।
২২. করুণাসাগর, ৪৪৮।

বিদ্যাসাগরী কুঠারের ঝলমলানি ও ঝিকিমিকি

১. শম্ভুচন্দ্র, ১২৬-২৭।
২. বিহারীলাল, ২১২-১৩।
৩. শ্রুতি-স্মৃতি, ৫৪।
৪. বিহারীলাল, ৩৮।
৫. ঐ, ১৪৯।
৬. চণ্ডীচরণ, ৩২২।
৭. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী,' ৬৭-৬৮।
৮. স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ৪৯-৫০।
৯. প্রমথনাথ বসু, 'স্বামী বিবেকানন্দ' ৩য় সংস্করণ, ৩৯।
১০. বিহারীলাল, ১১৩।
১১. চণ্ডীচরণ, ৮৬।
১২. শম্ভুচন্দ্র, ৬৯-৭০।
১৩. ঐ, ৬৭।
১৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত', সিগনেট সংস্করণ (১৩৫৯), ২৮২।
১৫. হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ১৪৪।
১৬. চণ্ডীচরণ, ৯০।
১৭. ঐ, ৯৫-৯৬।
১৮. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১২৭।
১৯. মণিলাল সিংহ-রায়, 'স্মৃতি-পূজা' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬৬০-৬২।
২০. বিহারীলাল, ২৬৩।
২১. শম্ভুচন্দ্র, ১৮৫-৮৬।
২২. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১২৪।

২৩. বিহারীলাল, ৩৮৮।
২৪. শ্রুতি-স্মৃতি, ৯৪।
২৫. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৭৮।
২৬. ঐ, ১২৩-২৪।
২৭. ঐ, ১২৪।
২৮. শিবনাথ : মহান, ৭-৮।
২৯. ঐ, ২৬-২৭।
৩০. রচনাবলী, ৪র্থ, ৩০১-০২।
৩১. পরিমল গোস্বামী, 'স্মৃতিচিত্রণ' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৮২।
৩২. শ্রুতি-স্মৃতি, ২৬।
৩৩. বিহারীলাল, ৩৩১।
৩৪. Sricharan Chakravarti, 'Life of Pandit Isvarchandra Vidyasagara' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত ১৮৫।
৩৫. নবীনচন্দ্র ২৭০।
৩৬. Subal Cnandra Mitra, 'Isvar Chandra Vidyasagar' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত ৩৮২।
৩৭. শ্রুতি-স্মৃতি, ৯৩-৯৪।
৩৮. ঐ, ৯৩।
৩৯. হরপ্রসাদ, ৮।
৪০. রচনাবলী, ৪র্থ, ৬৬১।
৪১. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ২৯।
৪২. চণ্ডীচরণ, ২০৭।
৪৩, বিহারীলাল, ১৯১।
৪৪. শম্ভুচন্দ্র, ১১০।

কুঠারের কোপ

১. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ৩২০।
২. বিহারীলাল, ১৭৫-৭৬।
৩. ঐ, ১৭৮।
৪, ঐ, ৩০৮-০৯।
৫. ঐ, ৩০৯।
৬. ঐ, ৩০৯-১০।
৭. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১২০-২২।
৮. ঐ, ৭৮-৭৯।
৯. ঐ, ১২৩।
১০. হরপ্রসাদ, ৬।
১১. রচনাবলী, ৪র্থ, ৪৩।

১২. রচনাবলী, ৪র্থ, ৪৭৪।
১৩. ঐ, ৪র্থ, ৪৭৪।
১৪. ঐ, ৪র্থ, ৪৭৪-৭৫।
১৫. ঐ, ৪র্থ, ৪৮১।
১৬. ঐ, ৪র্থ, ৪৮৯-৯০।
১৭. ঐ, ৪র্থ, ৪৯৩।
১৮. ঐ, ৪র্থ, ৫০৮-০৯।
১৯. ঐ, ৪র্থ, ৫০৯।
২০. ঐ, ৪র্থ, ৫০৯।
২১. ঐ, ৪র্থ ৫১১-১২।
২২. ঐ, ৪র্থ ৪৪৪।
২৩. ঐ, ৪র্থ, ৪৪৬।
২৪. ঐ, ৪র্থ, ৪৬০।
২৫. ঐ, ৪র্থ, ৪৬৮-৬৯।
২৬. ঐ, ৪র্থ, ৪৫১-৫২।
২৭. ঐ, ৪র্থ, ৪৮৭।
২৮. ঐ, ৪র্থ, ৫১৩।
২৯. ঐ, ৪র্থ, ৬০১।
৩০. ঐ, ৪র্থ, ৫৬১।

কান্নায় পোড়া হাসি

১. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১২৩।
২. চণ্ডীচরণ, ৪৪৬।
৩. ঐ, ৪৪৬।
৪. কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩১-৩২।
৫. বিহারীলাল, ২১৬-১৭।
৬. চণ্ডীচরণ, ৩৭৫-৭৬।
৭. ঐ, ২৫৫-৫৬।
৮. ঐ, ৪৪৭।
৯. বিহারীলাল, ৩৮৮।
১০. শ্রুতি-স্মৃতি, ২৩-২৪।
১১. সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৪৬৬।
১২. শম্ভুচন্দ্র, ২২৯।
১৩. ঐ, ১৬৫-৬৬ ; চণ্ডীচরণ, ৪৫৬।
১৪. কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৫১।
১৫. শ্রুতি-স্মৃতি, ২৪-২৫।

১৬. মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, 'সদালাপ', ২য় খণ্ড ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৩৪।
১৭, শ্রুতি-স্মৃতি, ৯৭-৯৮।
১৮. চণ্ডীচরণ, ৪৪৩-৪৪ ; বিহারীলাল, ২৬৩-৬৪।
১৯. চণ্ডীচরণ, ৪৩৬।
২০. ঐ, ৪৩৬-৩৭।
২১. বিহারীলাল, ১৮৫-৮৬।
২২, ঐ, ২১৭।
২৩. চণ্ডীচরণ, ৪৪৪-৪৬।
২৪. ঐ, ৪৩৮-৪০।
২৫. শম্ভুচন্দ্র, ২০৮।
২৬. বিহারীলাল, ৩৩১ ; পুরাতন, ১২৭।
২৭. রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার থেকে প্রকাশিত ও বিতরিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৪৭০-৭১।
২৮. ঐ, ৪৭১।
২৯. শ্রুতি-স্মৃতি, ৬-৭।
৩০. শম্ভুচন্দ্র, ২১৯।
৩১. ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', মানসী, ভাদ্র ১৩১৮ ; করুণাসাগরে উদ্ধৃত, ৪৬৯-৭০।
৩২. শ্রুতি-স্মৃতি, ২৩।
৩৩. হরপ্রসাদ, ৯-১২।
৩৪. চণ্ডীচরণ, ৩৯৩।
৩৫. বিহারীলাল, ২৯৪-৯৫।
৩৬. ঐ, ২৩৭।
৩৭. চণ্ডীচরণ, ৪২১।
৩৮. ঐ, ৪১৯।
৩৯. ঐ, ৬৫।
৪০. পুরাতন : কৃষ্ণকমল, ১০৫, ৩০৬।
৪১. ঐ, ৩০-৩১।
৪২. ঐ, ৭৭-৭৮।
৪৩. ঐ, ১৬২।
৪৪. চণ্ডীচরণ, ৮৫।
৪৫. শম্ভুচন্দ্র, ৭৩।
৪৬. ঐ, ২৯৩-৯৪।
৪৭. ঐ, ২৮১-৮২।
৪৮. ঐ, ২৮৩ !
৪৯. ঐ, ২৯৩।

৫০. শম্ভুচন্দ্র, ২৮৩।
৫১. যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কতিপয় অপ্রকাশিত গল্প', বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৬০; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত ৪১০।
৫২. শম্ভুচন্দ্র, ১৩৩-৩৪, ২১৭।
৫৩. সরযূবালা দেবী, 'বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন', ব্রহ্মবিদ্যা, ভাদ্র ১৩২৭ ; করুণা-সাগর-এ উদ্ধৃত, ৪১০।
৫৪. শম্ভুচন্দ্র, [৩]।
৫৫. ঐ, ৩০০।
৫৬. চণ্ডীচরণ, ৩৫৮-৬১।
৫৭. ঐ, ৩৫৭।
৫৮. শম্ভুচন্দ্র [৪-৫]।
৫৯. চণ্ডীচরণ, ৫০৭।
৬০. শম্ভুচন্দ্র, ৩২।
৬১. বিহারীলাল, ৩৬০।
৬২. করুণাসাগর, ৪৪৯।
৬৩. চণ্ডীচরণ, ৮৭।
৬৪. ঐ, ২৫৩।
৬৫. ঐ, ২৫৩-৫৪।
৬৬. ঐ, ২৫৩।
৬৭. ঐ, ২৬৩।
৬৮. বিহারীলাল, ৩৬০।
৬৯. চণ্ডীচরণ, ৩৭৪ ; বিহারীলাল, ৩৫৯।
৭০. ক্ষুদিরাম বসু ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৪৫২।
৭১. চণ্ডীচরণ, ৩৬৮।
৭২. ঐ, ৩৬৫।
৭৩. ঐ, ৩৬৫-৬৮।
৭৪. ঐ, ৩৭৩-৭৪।
৭৫. ঐ, ৩৬৭।
৭৬. শম্ভুচন্দ্র, ৫১।
৭৭. ঐ, ১০১।
৭৮. চণ্ডীচরণ, ৩৮২।
৭৯. শম্ভুচন্দ্র, ৮৭ ; চণ্ডীচরণ, ৩৪৫।
৮০. শম্ভুচন্দ্র, ১৫৬-৫৭।
৮১. ঐ, ১৫৭-৫৮।
৮২. বিহারীলাল, ২০৭, শম্ভুচন্দ্র, ১৫৮।
৮৩. চণ্ডীচরণ, ৩৬২।

৮৪. শম্ভুচন্দ্র, ১৯৮।
৮৫. চণ্ডীচরণ, ৩৭৭।
৮৬. শম্ভুচন্দ্র, ২০২।
৮৭. ঐ, ১৪২।
৮৮. ঐ, ২২০-২১।
৮৯. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মা ও ছেলে', ১ম ভাগ ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৬৫৪।
৯০, করুণাসাগর, ৬৫২।
৯১. চণ্ডীচরণ, ৩৭৮।
৯২. বিহারীলাল, ২৭০-৭১ ; শম্ভুচন্দ্র, ১৯৪।
৯৩. করুণাসাগর, ৬০৬-০৭।
৯৪. চণ্ডীচরণ, ৩৬১।
৯৫. ঐ, ৩৭৬।
৯৬. শ্রুতি-স্মৃতি, ৯৪।
৯৭. চণ্ডীচরণ, ৩৭৬-৭৭।
৯৮. ঐ, ৩৮৫-৮৬।
৯৯. বিহারীলাল, ২৭৭।
১০০. রচনাবলী, ৪র্থ, ৪২৩-২৮।
১০১. বিহারীলাল, ৩৩১।
১০২. ঐ, ৩৬৮।
১০৩. ক্ষুদিরাম বসু ; করুণাসাগর-এ উদ্ধৃত, ৪।
